দিব্য দৃষ্টি

বা

স্বর্গরেণু

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ বিরচিত



শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
বেলুড়

প্রকাশিকা
সন্ন্যাসিনী শিবপ্রিয়া ভারতী
শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
২১১এ গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়
পোঃ বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া
পশ্চিম বঙ্গ

প্রথম প্রকাশ—১৩৬৭

মূল্য—ছয় টাকা মাত্র

কলিকাতায় প্রাপ্তিস্থান

(১) শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

(২) মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
শ্রীনির্মল কুমা..র
নতুন প্রেস
৩৫।১ বীডন ষ্ট
কলিকাতা-৬

নিবেদন

গত চার পাঁচ বৎসর যাবৎ আমাদের ধর্মচক্রে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে, তৎসমুদায় যথাসময়ে মদীয় দিনলিপিতে সযত্নে লিখিয়া রাখিয়াছি। যে কোন দেশের অধ্যাত্ম ডায়েরী অপেক্ষা এই ঘটনাবলী অধিকতর অলৌকিক ও অর্থপূর্ণ। এইজন্য ইহার কিয়দংশ 'কল্কিগীতা'য় ও অধিকাংশ বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। বাংলা ভাষায় ধর্মসাধনার এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য বিবরণ অধুনা বাহির হয় নাই বলিলেই চলে। ইহার তুলনা রামায়ণে, মহাভারতে ও ভাগবতাদি মহাপুরাণে দেখা যায়। ধর্মানুরাগী পাঠক-পাঠিকা স্থির চিত্তে এই দুই গ্রন্থ পাঠ করিলে ধর্মজীবনে বিপুল প্রেরণা ও প্রদীপ্ত আলোক পাইবেন। এই মৌলিক পুস্তক-যুগল পরস্পর পরিপূরক ও ব্যাখ্যামূলক। সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ ও সিদ্ধাসাধিকা মহাগৌরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী 'কল্কিগীতা'য় দিয়াছি। তাঁহারা উভয়ে এই সকল ঘটনার মূলদেশে অবস্থিত এবং আমিও এইগুলির সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। সৌভাগ্যক্রমে, জগন্মাতা তাঁহাদের দর্শনসমূহের কিঞ্চিৎমাত্র অংশীদার আমাকেও করিয়াছেন। ইহার অল্পমাত্র 'ভাবমুখে' ও 'সুদর্শন' পত্রিকাদ্বয়ে বাহির হইয়াছে, বেলুড় ধর্মচক্রে শ্রীমৎ স্বামী ভৈরবানন্দ পরমহংসের ৫১ তম শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠান স্মরণার্থ এই গ্রন্থ উৎসর্গ করা হইল।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় নামকরণের ঘটনাটি উল্লেখ করিতেছি। ১৪ই মার্চ বুধবার [redacted] বৈকালে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী বাগনান সমীপে রামনগর গ্রামে কোন ভক্তগৃহে দোতালার বারান্দায় বসিয়া চা খাইতেছিলাম। তখন একটি স্থানীয় ভদ্রলোক আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিলেন, কলিকাতা রামকৃষ্ণ

বেদান্ত মঠ হইতে প্রকাশিত 'তীর্থরেণু' গ্রন্থে স্বামী অভেদানন্দের উপদেশাবলী পাঠে আমি আনন্দিত হয়েছি। এমন সময় দৈবযোগে একটি পিতৃলোকবাসী সূক্ষ্মদেহী এসে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং শূন্যে লিখে আমাকে জানালেন, আপনার প্রকাশমান 'দিব্যদৃষ্টি' গ্রন্থ ধার্মিক পাঠক সমাজে স্বর্গরেণুতুল্য সমাদৃত হইবে। তৎকর্তৃক বড় বড় বাংলা অক্ষরে শূন্যে লিখিত 'স্বর্গরেণু' শব্দদ্বয় আমি স্পষ্টভাবে পড়িলাম। এই জন্য বর্তমান পুস্তকের দ্বিতীয় নাম রাখিয়াছি 'স্বর্গরেণু'।

'কল্কিগীতা' ও 'দিব্যদৃষ্টি' নামক গ্রন্থদ্বয়ে বেলুড় ধর্মচক্রের আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ। ধর্মচক্রের ইহলৌকিক ইতিহাস অকিঞ্চিৎকর হইলেও পারমার্থিক ইতিহাস অবিস্মরণীয়।

আধুনিক কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠান এরূপ সৌভাগ্য লাভে গৌরবান্বিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অধুনা সমগ্র ভারতে কোন্ আশ্রম এরূপ দিব্যচক্ষুবিশিষ্ট সমাধিসম্পন্ন দুই মহাপুরুষ ধারণে ধন্য হইয়াছে? এই দুই ত্রিনয়ন দেবোপম মহামানবের দর্শনসমূহ শাস্ত্রজ্ঞান ও স্বানুভূতির আলোকে অভ্রান্ত উপলব্ধি করিয়া আমার জীবৎকালেই এই সকল প্রকাশ করিলাম। আমার এই দুই অমর সন্তানের জীবন ও দর্শনাদি স্বীকার ও প্রমাণ করিতে আমি গৌরবান্বিত হইতেছি এবং এই গ্রন্থদ্বয় বর্তমান ধর্মজগতের নিকট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ উপস্থাপিত করিতেছি। এই দুই গ্রন্থ অবলম্বনে কল্কিবাহন স্বর্গীয় শ্বেতাশ্ব দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছে। আমার পারমার্থিক দিনলিপি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। এই দুই গ্রন্থ ধর্মী সমাজে সমাদৃত হইলেই যথাসময়ে তৃতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইবে।

জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইলে স্থূল জগৎ ও সূক্ষ্ম জগৎ যুগপৎ কিরূপে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়নে জানা যায়। এই গ্রন্থ শ্রীমৎ স্বামী ভৈরবানন্দ পরমহংস ও সমাধিবতী সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী সরস্বতীর আলোক-চিত্রদ্বয়ে সুশোভিত। ইহার প্রচ্ছদপট বালিনিবাসী তরুণ শিল্পী শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বহুযত্নে অংকিত। এই প্রচ্ছদপট অংকণের ইতিহাসও আশ্চর্য্যজনক। উক্ত পটে প্রাকৃত নয়ন-যুগলের উপরে অপ্রাকৃত তৃতীয় নয়ন অংকিত। প্রথমে কোন শিল্পী স্বীয় বুদ্ধিবলে শুধু তৃতীয় নয়ন পেনসিলে অংকিত করিয়া ডিজাইনটি আমাকে দেখালেন। ঐদিন সন্ধ্যার ধূসর আঁধারে নাটমন্দিরে আলো না জ্বালিয়া আমি ও মহাগৌরী উক্ত শিল্পীকে ডিজাইন কিরূপ হবে তাহা ভাবিতে ও বলিতেছিলাম। তখন আমাদের সমক্ষে একটি দিব্যদেহী আবির্ভূত হয়ে আমাদিগকে কোন দিব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদপট স্পষ্টভাবে দেখালেন। ক্ষণকাল মধ্যে আমরা উভয়ে বুঝিলাম, ইনি ছদ্মবেশী ব্যাসদেব ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। আমরা তাঁকে সভক্তি প্রণাম করিতেই তিনি অন্তর্হিত হলেন। এই বৃত্তান্ত আমি ভৈরবানন্দজীকে ধর্মচক্রে বলিলাম। তিনি মাকড়দহে ফিরে ব্যাসদেবকে যোগবলে আহ্বানপূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি বাবাকে প্রচ্ছদপটের ডিজাইন দেখিয়েছিলেন? বাবা জানতে চান, সেটি কিরূপ হলে ভাল হয়।" তখন ব্যাসদেব, যিনি যৌবনে দ্বাপর যুগে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন, আবির্ভূত হয়ে সহাস্যে ভৈরবানন্দকে বললেন, "হ্যাঁ, আমিই তাকে উহা দেখিয়েছিলাম। পরিকল্পিত প্রচ্ছদপটে প্রাকৃত চক্ষুদ্বয় নীচে ও তৃতীয় নয়ন বা জ্ঞান চক্ষু উপরে অংকিত হলে দিব্য ভাবব্যঞ্জক হবে।

আর তৃতীয় চক্ষু থেকে বিদ্যুদ্বর্ণ জ্যোতিচ্ছটা বিচ্ছুরিত হবে, যেমন মদন-ভস্ম-কালে শিবের তৃতীয় নেত্র হতে বেরিয়েছিল অথবা যেমন কপিলমুনির তৃতীয় চক্ষু থেকে দিব্য অগ্নি বেরিয়ে সগররাজার ষাটহাজার পুত্রকে ভস্মীভূত করেছিল।" ভৈরবানন্দ পরমহংস এই ব্যাসোক্তি আমাকে পত্রে লিখে জানালেন এবং আমি সেই চিঠি ঐ শিল্পীকে দেখালাম। পুনরায় সেই শিল্পী এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট পেন্সিলে এঁকে আনলেন। পরদিন প্রাতে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে নবোদিত সূর্য্যালোকে আমি ও মহাগৌরী ঐ ডিজাইন দেখিলাম, উহাতে প্রাকৃত নেত্রদ্বয়ের বহিষ্কোণ উর্ধমুখী হয়েছিল। তখন আমি ভাবলাম, উল্লিখিত বহিষ্কোণদ্বয় সমান্তরাল বা ঈষৎ নিম্নমুখী হলে লক্ষ্যার্থসূচক হবে। আমার মনোভাব সমর্থন করতে অবিলম্বে চিরঞ্জীবী ব্যাসদেব দক্ষিণ বারান্দায় আমাদের সম্মুখে স্পষ্টভাবে স্বীয় তিন নয়ন দেখালেন। ব্যাসদেবের পদ্মপলাশসদৃশ বিশাল নয়নত্রয় দর্শনে আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হলাম। অনন্তর তদনুসারে প্রচ্ছদপট পরিবর্তনার্থ অন্য শিল্পীকে নির্দেশ দিলাম। উক্তরূপ দৈবনির্দেশে এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট বহুল প্রয়াসে অংকিত হয়েছে। ঐরূপ অসংখ্য অদ্ভুত ঘটনা বর্তমান গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বর্ণিত। মনোযোগী পাঠক-পাঠিকা এই সকল ঘটনা বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, এই মহাগ্রন্থ আদ্যোপান্ত পড়িলে নিশ্চয়ই উহার অলৌকিকত্বে অভিভূত হইবেন। আধুনিক কলিযুগে এইরূপ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হইতে পারে, তাহা জড়বাদী মানুষ ভাবিতে পারে না। এই সকল ঘটনা কণামাত্র মনঃকল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে। যেমন চর্মচক্ষু জড়বস্তু স্পষ্টভাবে

দেখে, তেমনি দিব্যচক্ষু সূক্ষ্মজগতে দিব্যদর্শন করে। বস্তুতঃ দিব্যচক্ষু উন্মীলিত না হইলে ধর্মরহস্য বা শাস্ত্রমর্ম সম্যক্ উপলব্ধ হয় না এবং সূক্ষ্মজগৎও দেখা যায় না। গোপালপুরের দানশীল ভক্তবীর শ্রীরামনারায়ণ সাউ এই গ্রন্থ প্রকাশার্থ দুইশত টাকা দিয়াছেন।

বৈচিত্র্য রক্ষার্থ ইহাতে সারদাদেবীর পুণ্যস্মৃতি প্রভৃতি কয়েকটি নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। ধর্মচক্রে দুর্গোৎসব, সারস্বতোৎসব, গঙ্গোৎসব ও সূর্য্যোৎসবাদি বর্ণনপ্রসঙ্গে শাস্ত্রবাক্য নানাস্থানে উদ্ধৃত হয়েছে। মোক্ষযজ্ঞে বা গোপাললীলায় যাহা লিখিত হয়েছে, তাহা পড়িলে প্রতীত হইবে, এই গ্রন্থরত্ন যুগশাস্ত্র বা যুগবেদের ভূমিকা। ভৈরবানন্দজীর অলৌকিক যোগশক্তি সম্বন্ধে আরও অনেক ঘটনা সংগৃহীত আছে। অল্পবয়স্কা সন্ন্যাসিনী মহাগৌরীর জীবনে প্রত্যহ যে সকল দিব্যদর্শন ঘটে, তৎসমুদায় সংগ্রহ ও প্রকাশ করিলে আরও একখানি রামায়ণ বা মহাভারত বিরচিত হইবে। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে 'কল্কির কৈফিয়ৎ ও বর্তমান ধর্মগ্লানি' শীর্ষক সুদীর্ঘ নিবন্ধ ভূমিকা স্বরূপ মনোযোগ সহকারে সর্বপ্রথম অধ্যয়ন করিবার জন্য অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাকে ঐকান্তিক অনুরোধ জানাইতেছি। জরাগ্রস্ত এবং অন্ধপ্রায় হয়েও বহু শ্রম, বহু ব্যয় করে এই গ্রন্থ প্রকাশপূর্বক আমি দিব্যদায় হতে মুক্ত হলাম, দৈব নির্দেশ পালন করিলাম। এই গ্রন্থপাঠে ধর্মপিপাসু নরনারী কিঞ্চিৎ উপকৃত হইলেই আমার সর্বশ্রম সার্থক হইবে।

হরি ওম্ তৎসৎ।

বৈশাখী শুক্লাদ্বাদশী
কল্কিজন্মতিথি, ১৩৬৭

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
বেলুড়

কল্কির কৈফিয়ৎ

ও

বর্তমান ধর্মগ্লানি

—এক—

মৎপ্রণীত ও সদ্যপ্রকাশিত 'কল্কিগীতা' পড়ে অনেক পাঠকপাঠিকা আমাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছেন, "আপনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবৎ ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে নানা পুস্তকে ও প্রবন্ধে এবং অসংখ্য ভাষণে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে পূর্ণাবতাররূপে প্রচার করার পর এখন তাঁকে খণ্ডাবতার বলে ঘোষণা করছেন কেন? ইহার সদুত্তর-স্বরূপ নিম্নোক্ত বজ্রোপম কৈফিয়ৎ 'দিব্যদৃষ্টি' পুস্তকের প্রারম্ভেই দিতেছি। কঠোর কর্তব্যের তাড়নায় ও প্রদীপ্ত বিবেকের প্রেরণায় এই কৈফিয়তের বিষয় বহু দিবা-রাত্রি ভেবেছি, দুশ্চিন্তায় আমার অন্তঃস্থল আলোড়িত হয়েছে ও অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি। সম্প্রতি কোন অপরাহ্নে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ব্যথিত হৃদয়ে মহাগৌরীকে বলিলাম, "যাঁকে সমগ্র জীবন আরাধ্য ইষ্টদেব ও পূর্ণশক্তি অবতার বলে উপাসনা করেছি, আজ তাঁকে খণ্ডশক্তি অবতার বলে প্রচার ও অন্য ইষ্টদেব বরণ করায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদগণ আমার প্রতি ক্ষুব্ধ, রুষ্ট হবেন না ত?" দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না

মহাগৌরী সরস্বতী অদূরে দাঁড়িয়ে সহাস্যে আমাকে জানালেন, "আপনার কথা শুনে ঠাকুর মন্দিরে বসে হাসছেন।" তখন ঠাকুরের হাসির অর্থ না বুঝলেও পরে নিঃসংশয়ে জানিলাম, তাঁর বহু পার্ষদ ও শ্রীমা সারদা এই অপ্রিয় কৈফিয়ৎ লেখার জন্য অতিশয় বিচলিত হয়েছেন। সে যাহা হোক, জীবন-সায়াহ্নে আমি সনাতন হিন্দুশাস্ত্র ও মোক্ষধর্মের মর্য্যাদা রক্ষার্থ এবং লোককল্যাণনিমিত্ত অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি।

ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ পূর্ণশক্তি অবতারগণের নিজস্ব বীজমন্ত্র আছে। তাঁদের আবির্ভাবের বহু বর্ষ পূর্বে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিবৃন্দ তাঁদের বীজমন্ত্র ধ্যানযোগে পেয়েছিলেন। পূর্ণশক্তি কল্কিদেব অবতীর্ণ হবার চব্বিশ বৎসর পূর্বে তাঁর স্বতন্ত্র বীজমন্ত্রও ধ্যানযোগে আমরা পেয়েছি; কিন্তু শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ স্ব স্ব ইষ্টবীজেই পূজিত ও চিন্তিত হন। ইঁহাদের স্বতন্ত্র বীজমন্ত্র নাই। যদি তাঁরা পূর্ণশক্তি অবতার হন, তাঁহাদের নিজস্ব বীজমন্ত্র নাই কেন? শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণবীজে ও শ্রীরামকৃষ্ণ মায়াবীজে আরাধিত হন। দশ অবতারের মধ্যে পরশুরাম ও বুদ্ধদেব খণ্ডশক্তি বলে তাঁরা ইষ্টরূপে উপাসিত হন না এবং তাঁদের নিজস্ব বীজমন্ত্রও নাই। মোক্ষশাস্ত্র অনুসারে খণ্ডশক্তির বীজমন্ত্র থাকে না ও তাঁরা ইষ্টরূপে উপাস্য হন না। শ্রীরামকৃষ্ণমন্ত্র মধ্যে যে মায়াবীজ সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা কালীবীজ বা দেবীবীজ। পুরুষ দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেবীবীজে পূজা বা চিন্তা করা অনুচিত, অবিহিত। পুরুষকে নারীর পোষাক পরালে যেমন অসুন্দর হয়, এই মন্ত্রও তদ্রূপ অশাস্ত্রীয় ও অফলপ্রদ হয়েছে। যদি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য পূর্ণশক্তি অবতার হতেন, তাঁদের স্বতন্ত্র বীজমন্ত্র নিশ্চয়ই থাকিত।

স্ব স্ব ইষ্টবীজে এই দুই দেবোপম মহাপুরুষের পূজা করা ও দীক্ষা দেওয়া শাস্ত্রসম্মত নহে। ইষ্টদেব ভগবান বা দেবতা হলে তাঁর কোন না কোন ভক্তসাধক নিশ্চয়ই দৈবযোগে বা সাধনবলে বীজমন্ত্র পেতেন। বিষ্ণুপুরাণাদি শাস্ত্র বলেন, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শ্রী, যশঃ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয় শক্তি বা ভগ যাঁহাতে একাধারে পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত, তিনিই ভগবান বা অবতার। অতএব পূর্ণশক্তি অবতার ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ঈশ্বরকল্প হন। ঐশ্বর্য্য ত্রিবিধ—ধনৈশ্বর্য্য, যোগৈশ্বর্য্য ও বিদ্যৈশ্বর্য্য। বীর্য্যও ত্রিবিধ—দৈহিকবীর্য্য, অস্ত্রবীর্য্য (ক্ষাত্রশক্তি) ও যোগবীর্য্য (যোগবলে শত্রুজয়)। শ্রীও ত্রিবিধ—রূপে সুশ্রী, কমলা পত্নীরূপে বর্তমান, যে কাজে হাত দেন তাহা শ্রীসম্পন্ন ও সাফল্যমণ্ডিত হয়। যশঃও ত্রিবিধ—উল্লিখিত ঐশ্বর্য্যত্রয় যাঁতে বিদ্যমান, তিনিই প্রকৃত যশস্বী। জ্ঞানও ত্রিবিধ—পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান, রাষ্ট্রতত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বজ্ঞান। বৈরাগ্যও ত্রিবিধ—আত্মীয়স্বজনে অনাসক্তি, কামিনীকাঞ্চনে অনাসক্তি ও স্বযশে অনাসক্তি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণত্রয় এই আঠার শক্তিকে ক্রিয়াশীল করে। এই একুশ শক্তি যাঁতে পূর্ণভাবে বর্তমান, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পূর্ণাবতার বা ইষ্টরূপী ভগবান পদবাচ্য। ভগবান শ্রীরামে ও শ্রীকৃষ্ণে এই একুশ শক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। তাই তাঁরা বাল্যকাল থেকেই অনায়াসে অলৌকিক দিব্যকর্ম সম্পাদন করেন। মৎস্য, কূর্ম, বরাহাদি জন্তুমূর্তি অবতার চতুষ্টয় বাদ দিলেও বামন এবং নরসিংহ পূর্ণাবতার ছিলেন। এই একুশ শক্তি নিয়ে পূর্ণশক্তি অবতার ধরাতলে অবতরণপূর্বক অধর্ম বিনাশ ও সদ্ধর্ম স্থাপন করেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যে ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণে শুধু এই তিন মূল ঐশ্বর্য্য প্রকটিত

ছিল—জ্ঞান, বৈরাগ্য ও যশঃ। সেইজন্য পরশুরামবৎ এই দুই অবতারকে খণ্ডশক্তি বলাই শাস্ত্রসঙ্গত। অতএব ইঁহাদের নামে প্রণব ও ইষ্টবীজ সংযোগপূর্বক মন্ত্রদীক্ষাদান অশাস্ত্রীয়। পূর্ণশক্তি অবতার স্থূলশরীরেও তত্ত্বাতীত ব্রহ্মমূর্তি হন। যিনি স্থূল শরীরে তত্ত্বাতীত পূর্ণশক্তি নন, তাঁকে ইষ্টজ্ঞানে পূজাধ্যান করা নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। এই হেতু কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্য এখনও চৈতন্যমন্ত্রে দীক্ষা দেন না। ইহাই শাস্ত্রবিহিত। স্বামী বিবেকানন্দ স্বরচিত সংস্কৃত স্তোত্রে বলেন, যিনি রামরূপে ত্রেতায় ও কৃষ্ণরূপে দ্বাপরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনিই অধুনা রামকৃষ্ণরূপে পুনরায় আবির্ভূত—সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষঃ রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্। 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' শীর্ষক বাংলা নিবন্ধে স্বামিজী স্পষ্টভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে ঘোষণা করেছেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পয়লা জানুয়ারী কাশীপুর উদ্যানবাটীতে নাট্যাচার্য্য গিরিশ ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে নতজানু হয়ে প্রায় ত্রিশটি ভক্ত সহ করজোড়ে বললেন, ব্যাস বাল্মীকি যাঁর মহিমা বর্ণনা করতে পারেন নি, আমি তাঁর কথা কি বলব? সুতরাং গিরিশ ঘোষও ঠাকুরকে অবতার বলে স্বীকার করেছেন। এই সকল উক্তি ভক্তিবিশ্বাসের আতিশয্যে উচ্চারিত, যোগদৃষ্টিসিদ্ধ নহে।

নিম্নলিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রে—ওঁ হ্রীঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ সাধারণতঃ দীক্ষা দেওয়া হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রে' এই মন্ত্র সন্নিবিষ্ট। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কোন কোন পার্ষদ বা প্রশিষ্য হ্রীঁ বীজের সহিত ক্রীঁ বীজ যোগ করিয়া দীক্ষা দিয়াছেন। এই দীক্ষামন্ত্রদ্বয় জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু হৃদয়স্থ অনাহত পদ্মে চক্রাকারে ঘুরিয়া হৃদয়ের নিম্নে নামিতে থাকে।

আর ইহা যে দেবীর বীজমন্ত্র, তার নাম প্রণব ও বীজ সহ উচ্চারণ করলে—ওঁ,হ্রীঁ (বা ক্রীঁ) কালিকায়ৈ নমঃ—জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু হৃৎপদ্মে চক্রাকারে ঘুরিয়া উপরে উঠিয়া কণ্ঠদেশস্থ বিশুদ্ধপদ্মে আঘাত করে, প্রাণবায়ু ঊর্ধ্বগামী হয়। যে দেবতার যে বীজ, তাহা তন্নামযুক্ত না হলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না, শুভ ফল দেয় না। এইরূপ মন্ত্র সারা জীবন জপ করিলেও চিত্ত শুদ্ধি হয় না বা যোগদ্বার খুলে না। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র অনুসারে যোগদ্বার না খুলিলে, প্রাণবায়ু সুষুম্না নাড়ী মধ্যে প্রবেশ না করিলে মন কদাপি ঊর্ধ্বগামী হয় না। সারদামন্ত্র সম্বন্ধেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। শ্রীমা সারদা মহামায়া বা অন্যতমা মহাবিদ্যা বগলার অংশভূতারূপে পূজিতা ও চিন্তিতা হন; কিন্তু সারদাদেবীরও নিজস্ব বীজমন্ত্র নাই। তাঁকে তাঁর ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রীর বীজমন্ত্রে পূজা ও চিন্তা করা হয়। সুতরাং সারদামন্ত্র—ওঁ ঐঁ সারদাদেব্যৈঃ নমঃ—মোক্ষপ্রদ সিদ্ধমন্ত্র নহে এবং এই মন্ত্রে দীক্ষাদান অনুচিত। এই মন্ত্র জপ করলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু নিম্নগামী হয়, মন রজো থেকে তমো গুণে—অনাহত থেকে মণিপুরে নেমে যায়। যেমন নোঙ্গর ফেলে জোরে দাঁড় টানিলেও নৌকা চলে না, তেমনি এই মন্ত্র শতবর্ষ জপিলেও মন উপরে উঠে না। ইহা যোগবলে জানা যায়। মন্ত্রতত্ত্ববিৎ ভৈরবানন্দ ইহা পুনঃ পুনঃ যোগবলে পরীক্ষা করে দেখেছেন। হৃৎপদ্ম রজোগুণের স্থান। যে কোন নৈষ্ঠিক সাধক এক মনে উক্ত মন্ত্রদ্বয় জপ করিলে পূর্বোক্ত প্রকার মান্ত্রী ক্রিয়া অনুভব করতে পারেন। সকল সাধক-সাধিকা জপ করে স্বীয় মনকে ঊর্ধ্বগামী করতে চান, কেহই স্বীয় মনকে নিম্নগামী করতে

চান না। যে মন্ত্র জপ করলে মন নিম্নমুখী হয়, তাহা মোক্ষপ্রদ ইষ্টমন্ত্র হতে পারে না। প্রণব সহ এক দেবতার বীজমন্ত্র অন্য দেবতার সঙ্গে সংযোগান্তে জপ করলেও শুভ ফল লাভ হয় না। যে রোগের যে ঔষধ, তাহা সেবন না করলে রোগী রোগমুক্ত হয় না। অসাম্প্রদায়িক অসংকীর্ণ নিরপেক্ষ সত্যসন্ধিৎসু সাধক-সাধিকা এই মন্ত্রবিদ্যা অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূজামন্ত্র ওঁ ঐং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বিরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা পদ্ধতি'তে পাওয়া যায়। এই মন্ত্রে দেশে-বিদেশে লক্ষ লক্ষ গৃহে ও মঠে-আশ্রমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজারতি করা ও নৈবেদ্যাদি দেওয়া হয়। অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণকে নৈবেদ্য বা অন্নভোগাদি নিবেদন করিলে সমস্ত ঋষি বা সকল দেবতা উহা গ্রহণ করেন না। উহা আমরা আমাদের মন্দিরে বহু বার প্রত্যক্ষ করেছি। আর দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, কালী, শিব, বিষ্ণু বা গণেশ প্রভৃতি দেবতাকে নৈবেদ্যাদি নিবেদন করলে সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণ সানন্দে উহা গ্রহণ করেন। যাঁদের জ্ঞান-চক্ষু খুলেছে, দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে, তাঁরাই এই মন্ত্রতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, অন্যে নহে। ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অগস্ত্য, শংকর, রামানুজ, মাধ্ব, বল্লভ, শংকরদেব প্রভৃতি আচার্য্যবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য ধর্মগুরুরূপে অবশ্যই পূজ্য ও প্রণম্য। ব্যাস, বশিষ্ঠাদি সিদ্ধঋষিকে যে অর্থে ভগবান বলা হয়, সেই অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণকেও ভগবান বলা চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা দেবাংশসম্ভূত বলে স্বামী ভৈরবানন্দ পূর্বে বলিলেও পরে যোগবলে

তাঁদের পূর্বজন্মের মানব অস্তিত্ব জানতে পেরেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের কোন কোন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুরূপে পূজিত ও বন্দিত হন। দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সাধুভক্তগণ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীগুরু মহারাজরূপে সম্বোধিত হন। ইহাই যথার্থ শাস্ত্রীয় বিধান। জয় শ্রীগুরু মহারাজজীকী জয়—এই জয়ধ্বনিতে ভারতাকাশ প্রতিধ্বনিত হউক, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীসারদাকে ইষ্টরূপে পূজা বা ধ্যান করিলে শত জন্মেও মোক্ষলাভ হবে না। ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ এবং ওঁ সারদাদেব্যৈ নমঃ—এই দুই মন্ত্রে যথাক্রমে ঠাকুর ও শ্রীমাকে ধর্মগুরুরূপে পূজা করা উচিত। এই দুই মন্ত্র মধ্যে হ্রীঁ বা ক্রীঁ বা ঐঁ প্রভৃতি বীজ সংযোজন অশ্রেয়স্কর ও অফলপ্রদ। রামকৃষ্ণ আন্দোলন মোক্ষধর্ম অপেক্ষা সেবাধর্মকে অধিকতর প্রাধান্য প্রদান করায় ইহা সমগ্র ভারতে ও পাশ্চাত্য জগতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত সহস্রাধিক আশ্রম স্থাপিত হয়েছে। ইহা সাময়িক যুগধর্মকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়ায় সনাতন মোক্ষধর্ম উপেক্ষিত হয়েছে! তাই ইহাতে ভারতীয় সাধনস্রোত লুপ্তপ্রায়। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরীর সহিত আমি অনেক রামকৃষ্ণ আশ্রমে গিয়ে দেখেছি, তত্রস্থ দেবালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীসারদা বা কোন দেবতাই নাই! সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর অধর্মকে প্রশ্রয় দেবার জন্য বিগত ডিসেম্বর মাসে ইষ্টদেবী মহামায়ার দুর্লংঘ্য নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা পার্ষদবৃন্দ সহ বেলুড়মঠ ছেড়ে জয়রামবাটীস্থ সারদামন্দিরে বিরাজ করছেন এবং বেলুড়মঠ পাঁচ শতাধিক যমকিঙ্করগণ কর্তৃক অধ্যুষিত হয়েছে। যে সম্প্রদায়ে বা প্রতিষ্ঠানে মোক্ষধর্ম ও যুগধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয় না, তাহাতে

ধর্মগ্লানি প্রবেশ করে। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ একটি খুব সত্যকথা বলেছেন, বাদশাহী আমলের টাকা এই যুগে চলে না। তাই রামশক্তি বা কৃষ্ণশক্তি দ্বারা কলিমল সম্যক্ বিনষ্ট হবে না এবং অপ্রমেয় কল্কিশক্তি দ্বারাই কলিমল সমূলে বিধ্বস্ত হবে। নানকাদি দশগুরুকে অর্ধকোটী শিখ নরনারী গুরুজ্ঞানে ভক্তি করে, ইষ্টজ্ঞানে নহে। মধ্যযুগে আবির্ভূত চৈতন্য, কবীর, শংকর, মাধ্ব ও রামানুজাদি ধর্মাচার্য্যগণকেও ইষ্টজ্ঞানে উপাসনা করা অনুচিত। ইষ্ট ও গুরু এক নহে।

কালক্রমে পার্থিব সাধক বিশুদ্ধ বৈদিক সাধনার অধিকার হারাইল, ওঁকার উপাসনায় অনধিকারী হইয়া পড়িল। তখন শিব, শক্তি, বিষ্ণু, গণেশ ও সূর্য্য—এই প্রধান পঞ্চ দেবতার উপাসনা ভারত সমাজে প্রবর্ত্তিত হইল। তখন হইতে প্রধানতঃ এই পঞ্চ দেবতাই ইষ্টরূপে আরাধ্য হইলেন। উক্ত মর্মে কপিলগীতাতে আছে—

গণেশো ভাস্করো বিষ্ণুঃ রুদ্রশক্তিশ্চ শাশ্বতম্।
বেদগর্ভেষু পূজ্যাস্তু পঞ্চায়তনদেবতাঃ ॥

আর ভৈরব যামল গ্রন্থে আছে—

একং ব্রহ্ম নিরাকারং সাকারত্বমুপাগমৎ।
ধ্যানার্থং স্বাত্মভক্তানাং সৃষ্টাদৌ পঞ্চমূর্তিভিঃ ॥
সূর্য্যো গণপতি বিষ্ণুঃ মহেশো ভগবত্যপি।
পঞ্চৈতা দেবতা প্রোক্তা শ্রুতিভিঃ ব্রহ্মমূর্তয়ঃ ॥
এতৈর্বিমুচ্যতে জন্তুর্জন্ম-সংসার-বন্ধনাৎ।
পঞ্চদেবৈর্বিনা মুক্তির্ন ভবেৎ অন্যদৈবতৈঃ ॥

উদ্ধৃত চারি শ্লোকের মর্মার্থ এইরূপ—নিরাকার ব্রহ্ম শিবাদি পঞ্চমূর্তিতে সাকারত্ব সংপ্রাপ্ত হইলেন। এই দেবতাপঞ্চক পঞ্চ ব্রহ্মমূর্তিরূপে, পরমাত্মার পঞ্চ প্রতীকরূপে প্রকটিত। স্বয়ং পরমাত্মাই স্বেচ্ছায় এই পঞ্চমূর্তি পরিগ্রহ করেছেন। ইঁহাদের উপাসনা করিলে পরমাত্মার উপাসনাই করা হয়। ইঁহারাই পরমাত্মানির্দিষ্ট পঞ্চবিধ ইষ্টদেবতা এবং ইহাদের পঞ্চ বীজমন্ত্র—ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ হ্রীং (অথবা ক্রীং) কালিকায়ৈ নমঃ, ওঁ গং সর্বসিদ্ধিদাতা-গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ, ওঁ বং শ্রীবিষ্ণুদেবতায়ৈ নমঃ এবং ওঁ গৌং গগনদেবায় নমঃ। ব্রহ্মস্বরূপে সমারূঢ় হয়ে এই পঞ্চদেবতা জীবকে মুক্তিদানে সম্যক্ সমর্থ, অন্য কোন দেবতা নহে। গীতার নবম অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, ইন্দ্রাদি দেবোপাসনা, অর্যমাদি পিতৃগণের উপাসনা ও বিনায়কাদি ভূতগণের উপাসনা মুক্তিপ্রদ নহে। শ্রীবিষ্ণুর পূর্ণশক্তি অবতারের উপাসনাই মুক্তিপ্রদ। সুতরাং রাম, কৃষ্ণ, কল্কি, বামন ও নরসিংহ—বিষ্ণুর এই পঞ্চ পূর্ণশক্তি অবতারও জীবকে মোক্ষদান করিতে পারেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও ইষ্টপদবাচ্য দেবতা নহেন। কারণ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলজাত ও তাঁর লয় আছে, কিন্তু বিষ্ণু ও শিবের লয় নাই।

ঈশানাদি দ্বাদশ শিব, কালিকাদি দশ মহাবিদ্যা, বাসুদেবাদি সপ্তবিষ্ণু, রামাদি পঞ্চ পূর্ণশক্তি অবতার ও গণেশাদি আঁঠার গণপতি, ষষ্ঠী, শীতলা, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, গৌরী, ইন্দ্র, বায়ু, কৌমারী, কার্তিক, অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবতার নিজস্ব বীজমন্ত্র আছে। দশাবতারের মধ্যে হংস, মৎস্য, কূর্ম ও বরাহ—এই জন্তুমূর্তি অবতার চতুষ্টয় মানব শরীরে বিদ্যমান বলে ইষ্টরূপে আরাধ্য নহেন। এতাবৎ

খণ্ডাবতার পরশুরামও ইষ্টপদবাচ্য হন নাই। মহাভারতে ও বিষ্ণুপুরাণে বুদ্ধদেব অবতাররূপে পরিগণিত নহেন। দ্বাদশ শতকে ভক্তকবি জয়দেবই বুদ্ধদেবকে দশাবতারেয় অন্তর্ভুক্ত করে তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে প্রচার করলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, বুদ্ধদেব নির্বাণকলা পর্য্যন্ত সাধনপূর্বক নির্বাণ লাভ ও প্রচার করলেন। তদূর্ধ্বে বিসর্গ শক্তি সাধন তিনি করেন নাই, বেদান্তোক্ত পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন নাই।" সুতরাং বৌদ্ধ নির্বাণ গীতোক্ত ব্রহ্মনির্বাণ অপেক্ষা নিম্নতর নির্বিকল্প সমাধি। ভগবান পতঞ্জলিকৃত যোগ-শাস্ত্রোক্ত নির্বিকল্প সমাধি মধ্যেও নানা স্তর বিদ্যমান। অতএব বুদ্ধদেবকে ইষ্টাসনে বসান উচিত নয়। তিনি ধর্মগুরুরূপে বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন ও এক-তৃতীয়াংশ মানব জাতির পুজা পাচ্ছেন। অবতার দেব-মানব, মায়া মনুষ্য, প্রাকৃত মানববৎ তাঁর পূর্ব জন্ম নাই। আর বুদ্ধদেব স্বয়ং স্বীয় পাঁচশত পূর্বজন্মের কাহিনী নিজ মুখে বলেছেন। এই সকল কাহিনী বৌদ্ধ জাতকে লিপিবদ্ধ। তিনি পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন নি বলে কল্কির সময়ে আবার জন্মাবেন ও কল্কিলীলার সহায়ক হবেন। বৌদ্ধধর্ম মূলতঃ নীতিধর্ম বলে সমগ্র প্রাচ্য জগতের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই দার্শনিকপ্রবর শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, বৌদ্ধধর্ম ethical idealism বা সুনীতিময় আদর্শবাদ। উহা যদি মোক্ষধর্মে বেশী জোর দিত, তাহলে উহা প্রাচ্য জগতের ধর্মরূপে গণ্য হইত কিনা সন্দেহ। আর মোক্ষই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু বা বর্গ বলে উহা চীনে চেন ও জাপানে জেন বা যোগধর্ম সাধনে নিযুক্ত হয়েছে। অতএব নরসিংহ, বামন, রাম, কৃষ্ণ ও কল্কি—এই পঞ্চ পূর্ণশক্তি অবতারই ইষ্টদেবতার আসনগ্রহণে জীবোদ্ধারে সমর্থ।

এই পঞ্চাবতারের উপসনা বিষ্ণু উপাসনার নামান্তর মাত্র। এই পঞ্চাবতারের স্বতন্ত্র বীজমন্ত্র আছে। নরসিংহের বীজমন্ত্র—ওঁ নং নরসিংহদেবায় নমঃ। ইহা সত্যযুগের মধ্যস্তরে ভক্তবীর প্রহ্লাদের সময় প্রকাশিত হয়। তখন শ্রীমদ্‌ভাগবত বিরচিত হয় নাই। ভাগবতের পরে ভগবান শব্দের অধিক প্রয়োগ আরম্ভ হয়। রামচন্দ্রের বীজমন্ত্র—ওঁ শ্রীরামচন্দ্রদেবায় নমঃ। ইহা ত্রেতাযুগের শেষভাগে আবিষ্কৃত। কৃষ্ণের বীজমন্ত্র—ওঁ ক্লীং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের শেষাংশে আবির্ভূত হন। বামনের বীজমন্ত্র—ওঁ বং বামনদেবায় নমঃ। আমি তিন চারবার বামনদেবের ও একবার নরসিংহের দর্শনলাভে ধন্য হয়েছি। বামন ও নরসিংহ উভয়ে পূর্ণাবতার। বামনও কারো কারো ইষ্ট হন। যাদের ইষ্ট বাসুদেব, তাদের ইষ্ট বামনই। কারণ বামন বাসুদেবের রুদ্রমূর্তি। বাসুদেবের বীজমন্ত্র—ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। বামন মন্ত্র ও বাসুদেব মন্ত্র অর্থতঃ অভিন্ন। যাঁরা বাসুদেবের বিরাট মূর্তিতে মনস্থির করতে না পারেন, তাঁরা বামন ধ্যান করলেই ফল পাবেন। বামনই প্রহ্লাদের পৌত্র বলিকে ছলিবার সময় ঐ বিরাট মূর্তি ধরেছিলেন, দুই পদে মর্ত্য ও স্বর্গ অধিকারান্তে তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপন করলেন। কল্কির বীজমন্ত্র—ওঁ কৌং কল্কিদেবায় নমঃ। ইহা বেলুড় ধর্মচক্রে মন্ত্র-বিদ্যাপারদর্শী ভৈরবানন্দ পরমহংস কর্তৃক ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে অথবা বঙ্গীয় ১৩৬৭সালের চৈত্র মাসে ধ্যানযোগে আবিষ্কৃত হয়।

শিবাদি পঞ্চদেবতার মধ্যে সূর্য্যেরও স্বতন্ত্র বীজমন্ত্র আছে। প্রাচীন ভারতে ও মিশরে সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত ছিল। উড়িষ্যার কোণারকে সূর্য্যমন্দির ও কাশ্মীরে মার্তণ্ড মন্দির ইহার প্রকৃষ্ট

প্রমাণ। অথর্ববেদে আছে—সূর্য্যো আত্মা জগতঃ তস্থুতশ্চ। ইহার অর্থ, সূর্য্যই স্থূল জগতের প্রাণস্বরূপ ও পরিচালক। পূর্বোক্ত পঞ্চ দেবতার মধ্যে সূর্য্যই প্রত্যহ স্থূল মূর্তিতে দৃশ্য ও পূজ্য হন। তাই প্রাত্যহিক দেবপূজায় সূর্য্যার্ঘ প্রদান বিধেয়। বৈদিক গায়ত্রী উপাসনা সূর্য্যোপাসনার রূপান্তর মাত্র। সূর্য্যের ইষ্ট বিষ্ণু বা নারায়ণ। তাই শাস্ত্রমতে নারায়ণ হিরণ্ময়বপু শংখচক্রধারী, সরসিজাসনে উপবিষ্ট ও সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী। সূর্য্য তাঁর সিদ্ধ ভক্তকে বিষ্ণুর হাতে তুলে দেন। বিষ্ণু তাঁর সিদ্ধ ভক্তকে তদীয় ইষ্টদেবী মহামায়ার হস্তে অর্পণ করেন। মহামায়া তাঁর সিদ্ধ ভক্তকে শিবহস্তে সমর্পণ করেন। আর শিব তাঁর সিদ্ধ ভক্তকে কোলে নিয়ে ব্রহ্মধামে, মোক্ষধামে পৌছিয়ে দেন। উক্ত মর্মে মুণ্ডক উপনিষদে (৩।২।৪) আছে—তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম। সিদ্ধাবস্থায় স্থূল সূর্য্য ব্রহ্মসূর্য্যে পরিণত হন। সূর্য্যদ্বার দিয়াই জীবন্মুক্ত সিদ্ধসিদ্ধাগণ ব্রহ্মধামে মহাপ্রয়াণ করেন।

বৈষ্ণব সাধনার সপ্ত স্তরে সপ্তমন্ত্র ও সপ্তনাম পাওয়া যায়—কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেব, মহাবিষ্ণু, কেশব ও মাধব। শাক্ত সাধনার দশস্তরে দশ মহাবিদ্যার দশ মন্ত্র বর্তমান—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, কমলা ও মাতঙ্গী। শৈব সাধনার দ্বাদশ স্তরে দ্বাদশ মন্ত্র ও দ্বাদশ নাম আছে।—শিব, আশুতোষ, পশুপতি, জলেশ্বর, নাগেশ্বর, পরমেশ্বর, ঈশান, অঘোর, ভৈরব, কালভৈরব, জগদীশ্বর ও নির্জলেশ্বর। সকল সাধককে শেষ কালে শিবসাধন করিতে হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অন্তিম সময়ে শিবত্বের সাধন করেছিলেন। এই বিষয় মহাভারতের

অনুশাসন পর্বে চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত পঞ্চাধ্যায়ে লিপিবদ্ধ। গাণপত্য সাধনার আঠার স্তরে আঠার প্রকার বীজমন্ত্র আছে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, ললনা, আজ্ঞা, নাদ, বিন্দু, শক্তিপীঠ, সহস্রদল পদ্মের দ্বাদশদল পদ্ম, হংসরূপ নিরঞ্জন, শূন্যস্থান, চতুর্বিংশতিতত্ত্বপীঠ, মহাকুণ্ডলিনী, পরম শিব, নির্বাণকলা ও বিসর্গশক্তি বা পরমাত্মা। এই আঠার চক্রমধ্যে দশ চক্র ব্যক্ত এবং এই অষ্ট চক্র গুপ্ত—ললনা, মহাকুণ্ডলিনী, নির্বাণকলা, বিসর্গশক্তি, নাদ, বিন্দু, শক্তি ও শূন্যস্থান। এই আঠার চক্রের সাধন বা যোগ গীতার আঠার অধ্যায়ে বিবৃত। গণেশ দেবতার বীজমন্ত্র—ওঁ গং সর্বসিদ্ধিদাতা-গণপতি-দেবতায়ৈ নমঃ। এই মুক্তিপ্রদ সিদ্ধমন্ত্র অষ্টাদশাক্ষর। ত্রেতাযুগের শেষভাগে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য কর্তৃক গাণপত্য সাধন প্রচারিত হয়। গণপতি উপনিষদে ও গণেশ পুরাণে এই সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে গণেশোপাসনা সমধিক প্রচলিত। এই কৈফিয়তের শেষ ভাগে আঠার প্রকার গণেশ সাধনার মন্ত্রাদি লিখিত হয়েছে। শুক্রাচার্য্যের পরে সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দই সর্বপ্রথম পূর্বোক্ত আঠার প্রকার গণেশ সাধন যোগবলে অবগত হয়েছেন। আধুনিক মোক্ষশাস্ত্র ও মন্ত্রশাস্ত্র নানা স্থানে বিকৃত, প্রক্ষিপ্ত ও অশুদ্ধ। কলিকালে অধিকাংশ বীজমন্ত্র লুপ্ত-গুপ্ত হয়েছে। শ্রীমৎ স্বামী ভৈরবানন্দ পরমহংস মন্ত্রোদ্ধারবিজ্ঞানে পারদর্শী। তিনি এই বিলুপ্ত বিজ্ঞানে কশ্যপ মুনির কাছে শিক্ষা করেছেন। তিনি যে সকল বীজমন্ত্র পুনরুদ্ধার করেছেন, তৎসমূহ এই গ্রন্থের নানা স্থানে উল্লিখিত। যে যোগশক্তি দ্বারা তিনি মন্ত্রোদ্ধারে ও মন্ত্রশক্তি

নির্ণয়ে সমর্থ, তাহা যে কোন সাধক-সাধিকাও যৌগিক সাধন দ্বারা লাভ করতে পারেন। এই সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ পরমহংস মন্তব্য করেন, "যদি কোন সাধক বা সাধিকা দিব্যদৃষ্টি বা জ্ঞানচক্ষু লাভে প্রয়াসী হন, তাহলে তাঁকে স্বপ্রকৃতি অনুযায়ী ইষ্টমন্ত্ররূপ মহা বিমানে আরোহণ ও যৌগিক সাধনরূপ বর্ম পরিধান করে এবং ত্রাটক যোগরূপ দূরবীণ ও প্রাণায়ামরূপ অক্সিজেন নিয়ে ঊর্ধলোকে উঠতে হবে, যেমন সম্প্রতি রাশিয়ার দুই অভূতপূর্ব মহাকাশচারী গ্যাগারিন ও টিটভ স্পুটনিক চড়ে পৃথিবী পরিক্রমা করেছিলেন। পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহ আড়াই হাজার মাইল দূরেও সূর্য্যগ্রহ নয় কোটী বিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। আর যে ঊর্ধলোকে মন উঠলে জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়, দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়, তাহা প্রাকৃত মনোভূমি থেকে পূর্বোক্ত দূরত্ব অপেক্ষা বহু কোটী গুণ উর্ধে বর্তমান।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রচার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঘটনা নিঃসংশয়ে জানা গিয়াছে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর অনুরোধে রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ তৎকালীন অগ্রগণ্য দুই শতোধিক পণ্ডিতের মহাসভা আহ্বান করেন। উহাতে সমাগত সুবিখ্যাত শশধর প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণাদি শাস্ত্রে দশাবতার উল্লিখিত। তন্মধ্যে একমাত্র অবতার কল্কি অদ্যাপি অনাগত। যদি শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে গণ্য করা হয়, তাহলে অবতারের সংখ্যা দশাধিক হয়ে যায় ও শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হয়।" উক্ত নাটমন্দিরে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিতগণ

কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, "আমি দেখি, তিনি ও আমি অভিন্ন।" তখন ভৈরবী ব্রাহ্মণী দেখালেন, শ্রীরামকৃষ্ণের,বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদ চিহ্ন ফুটে উঠেছে; যাহা বিষ্ণুর বক্ষে ছিল। ঠাকুরের হাতে উপরে ও নীচে বিষ্ণুধৃত অলংকারাদির দাগ দেখা যাচ্ছে ও কপালে বিষ্ণুর তিলক ফুটে উঠেছে। ঠাকুরের গায়ে ঐ সব বিষ্ণু চিহ্ন দেখিয়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী বললেন, এই সকল বিষ্ণুচিহ্ন থাকায় এঁকে অবতার বলা যায়। তখন সুপণ্ডিত শশধর বললেন, "শাস্ত্র-সঙ্গত বিষ্ণুচিহ্ন ব্যতীত এঁর অবতারত্বের অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।" তখন ভৈরবী ব্রাহ্মণী বললেন, "তাহলে ইনি খণ্ড শক্তি অবতার হতে পারেন।" ভৈরবীর এই মন্তব্য পণ্ডিত শশধর সমর্থন করায় অন্যান্য পণ্ডিতগণ মৌন থেকে সম্মতি জানালেন। এইরূপে সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রমাণিত ও প্রচারিত হয়। পরে ভক্তবীর রামচন্দ্র দত্ত ষ্টার থিয়েটারে সমাহুত ধর্ম-সভায় কয়েকটি ধারাবাহিক ভাষণ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে ঘোষণা করেন। রামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। গিরিশ ঘোষ প্রমুখ ভক্তবৃন্দও এই মত প্রচারে প্রয়াসী হন। পরে ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, শিবানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ তাঁহাকে অবতার বলে সমগ্র ভারতে ও বিদেশে প্রচার করেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ খণ্ডাবতার কি পূর্ণাবতার সেই শাস্ত্রীয় বিচার ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে অদ্যাপি স্থান পায় নাই। তাঁহার অপূর্ব সাধন জীবনের ইতিহাস পাওয়া যায় বলে তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ অবতারবরিষ্ঠ ও সর্বদেবদেবীস্বরূপ বলেছেন। তিনি নির্বিকল্প সমাধি লাভের পর পারমহংস্য সাধনায় সিদ্ধ হয়ে

পরমহংস আখ্যা পান। তাই পরমানন্দগিরি পরমহংস, শিবনারায়ণ পরমহংস, নিগমানন্দ পরমহংস প্রভৃতি তৎকালীন মহাপুরুষগণ অপেক্ষা তাঁহার অধিক সুখ্যাতি হয়েছিল। সেই জন্য ভক্তবৃন্দ তাঁকে অবতার বলে স্বীকার ও প্রচার করেছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামপুকুরে চিকিৎসার্থ অবস্থানকালে কালীপূজা রাত্রিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীভাবে সমাবিষ্ট হন। তখন গিরিশ ঘোষ ও রামদত্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাঁকে জীবন্ত কালীপ্রতিমাজ্ঞানে পূজা করেন। প্রত্যেক সাধক বা সাধিকা চরম সিদ্ধাবস্থায় স্বকীয় ইষ্টদেবতার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হন, এবং তৎশরীরে ইষ্টদেবতার চিহ্নাদি ফুটিয়া উঠে। শোনা যায়, সিদ্ধ ঋষি অরবিন্দের দেহেও একাধিক বিষ্ণুচিহ্ন প্রকটিত হয়েছিল। মাকড়দহের সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ যখন শিবভাবে সমাহিত, ভৈরবস্বরূপে সমারূঢ় হলেন, তখন তাঁর শুদ্ধ শরীরে শিবচিহ্নসমূহ ফুটে উঠেছিল—দুই হাতের কব্জিতে, বাহুতে রুদ্রাক্ষ ধারণের দাগ, কপালে অর্ধচন্দ্র, গলদেশে সর্পচিহ্ন প্রভৃতি সিদ্ধিলাভের পরেও স্থায়ী হয়েছিল। আমি ও মহাগৌরী প্রভৃতি অনেকে ইহা স্বচক্ষে দেখেছি। আমরা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি, সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী শিব, কৃষ্ণ, গৌরী চণ্ডী, বগলা, ছিন্নমস্তা, সরস্বতী, লক্ষ্মীকালী প্রভৃতি অনেক দেবতার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েছেন। এই অর্থেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক দেবতার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং এই জন্যই তাঁকে সর্বদেবদেবীস্বরূপ বলা চলে; কিন্তু তাঁহার সারদার আলেখ্যে বা মূর্তিতে কালী, বিষ্ণু আদি দেবতার পূজা শাস্ত্রসঙ্গত নহে। গুরুপূজা বা আত্মজ্ঞ অর্চনা ব্যতীত তাঁকে ইষ্টজ্ঞানে পূজা করা যায় না। যদি কোন ভক্ত ভক্তির আতিশয্যে

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতীকে কোন দেবতার পূজা করেন, উদ্দিষ্ট দেবতার কাছে সেই পূজা পৌঁছায় না। ইষ্টদেবতা ও সিদ্ধসাধক অভিন্ন হলেও সিদ্ধসাধককে ইষ্টদেবতার আসন প্রদান অনুচিত, অবিহিত। স্বরূপতঃ গুরু ও ইষ্ট অভিন্ন হলেও গুরুকে ইষ্টজ্ঞানে পূজা ও ধ্যান করা যায় না। গুরুকে ইষ্টজ্ঞানে ধ্যান করলে গুরুর ব্যাধি ও পাপাদি ধ্যাতার দেহ-মনে সঞ্চারিত হয়। এ্যাসিসি-নিবাসী খ্রীষ্টান সাধক ফ্র্যান্সিস জীশু খ্রীষ্টকে ইষ্টজ্ঞানে ধ্যানের ফলে জীশুখ্রীষ্টবৎ স্বদেহে ক্রুশবিদ্ধ চিহ্নসমূহ প্রাপ্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের ভক্তবৃন্দকে এই প্রলোভন দেখান হয় যে, দীক্ষিত নরনারীগণ অনায়াসে দেহান্তে রামকৃষ্ণ লোক প্রাপ্ত হবেন। লোকতত্ত্ববিৎ ভৈরবানন্দ যোগদৃষ্টিতে মন্তব্য করেন, রামকৃষ্ণ লোক নামে কোন ঊর্দ্ধ লোক নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের কোন কোন শিষ্যও ইহা স্বীকার করিতেন। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ বলে এক অর্থে বিষ্ণুলোককেই রামকৃষ্ণলোক বলা চলে। যদি রাম বা কৃষ্ণ বা চৈতন্যের নামে কোন লোক না থাকে, তবে রামকৃষ্ণের নামে কোন লোক থাকা সম্ভব নহে। অধুনা আর একটি সম্প্রদায় রামকৃষ্ণ নামাংকিত হয়েও দীক্ষিতগণকে গুরুকৃপায় অনায়াসে গুরুলোকপ্রাপ্তির প্রলোভন দেখান; কিন্তু শাস্ত্রালোকে জানা যায়, গুরুলোক নামে কোন লোকই নাই। এই সকল মিথ্যা প্রলোভন সম্বন্ধে সাবধান হইবার জন্য আমরা সরল বিশ্বাসী দীক্ষিত নরনারীগণকে ঐকান্তিক অনুরোধ করিতেছি।

কলিযুগে মন্ত্রযোগই সুপ্রশস্ত। পূর্ব তিন যুগে অধম হইলেও এই যুগে ইহা উত্তম সাধনমার্গ। জন্মগত সংস্কার অনুসারে

ইষ্টমন্ত্র ও ইষ্টদেব নির্বাচন মন্ত্রযোগের সারমর্ম। প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ ও মন্ত্রচৈতন্য ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি ও ক্রমমুক্তি লাভ হয় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদবৃন্দ ও তদীয় শিষ্যপ্রশিষ্যগণ কর্তৃক এই সাধন বিজ্ঞান উপেক্ষিত, অবহেলিত হয়েছে। ইহার ফলে শত শত সাধু ও লক্ষ লক্ষ ভক্ত রামকৃষ্ণ মন্ত্র বা সারদামন্ত্র নিষ্ঠাভরে বহু বর্ষ জপ করেও আশানুরূপ ফললাভ করেন নাই। 'দিব্যদৃষ্টি' পুস্তকের 'মোক্ষযজ্ঞ' শীর্ষক অধ্যায় পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণ অত্যন্ত বিস্মিত হবেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের শতাধিক সাধু মৃত্যুর পর প্রেত হয়ে বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে দীর্ঘকাল বাসান্তে বেলুড় ধর্মচক্রের মন্দিরে সাধন করে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েছেন। যদি রামকৃষ্ণমন্ত্র ও সারদা মন্ত্র মোক্ষপ্রদ হইত, তাহলে ঐ সকল সাধু আত্মশ্রাদ্ধ ও বিরজাহোম অনুষ্ঠানপূর্বক বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইতেন না। গৃহস্থ সজ্জনও স্বর্গবাসী হন।

—দুই—

আমার কোন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা কয়েক বৎসর পূর্বে দেহরক্ষা করেছেন। তিনি বহু বৎসর পূর্বে বেলুড়মঠ ছেড়ে শ্রীরামপুর সমীপে একটি আশ্রম ও বিদ্যালয় স্থাপন করে পরলোকগত হন। তিন চার মাস পূর্বে স্বামী ভৈরবানন্দ ও সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী সমভি-ব্যাহারে তদীয় আশ্রমে গিয়ে তাঁর সুসজ্জিত স্মৃতিকক্ষে বসে আমরা তাঁকে আহ্বান করলাম। তিনি পিতৃলোক থেকে নেমে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন ও কাঁদতে লাগলেন! তখন স্বামী ভৈরবানন্দ

তাঁকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে বললেন, "মহাপুরুষজীর সন্ন্যাসী শিষ্য পিতৃলোক বাসী হয়েছেন! তখন মহাপুরুষজী আবির্ভূত হলেন ও স্বপক্ষ সমর্থন করলেন। বলা বাহুল্য, আমিও তখন মহাপুরুষজীকে প্রত্যক্ষ দর্শন ও সভক্তি প্রণাম করলাম। শ্রীমা সারদার মন্ত্রশিষ্য একটি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ হাওড়া জেলার অন্তঃপাতী কোন গ্রামে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ইনিও মৃত্যুর পরে পিতৃলোকবাসী হয়েছেন এবং কয়েক বৎসর পরে মর্ত্যলোকে ফিরবেন। বেলুড়মঠের অন্যতম অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কোন মন্ত্রশিষ্য গৃহীভক্ত ভদ্রকালীতে স্বীয় গৃহ নির্মাণ করেছেন। যখন তিনি জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ ছিল এবং তাঁর বাড়ীতেও আমি বহুবার গিয়েছি। সেদিন আমিও মহাগৌরী তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম, তিনিও মৃত্যুর পরে পিতৃলোকবাসী হয়েছেন।

১৯৬০ সালে ডিসেম্বর মাসে আমরা আসানসোল সমীপে গোপালপুর গ্রামে গিয়াছিলাম। সেখানে ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী একতলার ছাদে দাঁড়িয়ে ভূতলস্থ একটি কুকুরকে তাঁদের দিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ চীৎকার করতে দেখলেন। ভৈরবানন্দ অলৌকিক যোগবলে জানিলেন, ঐ কুকুর পূর্বজন্মে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন ও আসানসোলে থাকিতেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমরা ঝাড়গ্রামে গিয়াছিলাম। ওখানে পুরাতন রাজবাড়ীর সম্মুখে একটি সোণালী সুপুষ্ট কুকুর এসে যোগিবর ভৈরবানন্দের পায়ে বারবার লুটিয়ে পড়ল। ত্রিকালজ্ঞ ভৈরবানন্দ যোগদৃষ্টিতে জানিলেন, ইনি পূর্বজন্মে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য কৃপানন্দ নামে অভিহিত ছিলেন। স্বামী কৃপানন্দ ওরফে বৈকুণ্ঠ সান্যাল সন্ন্যাস

গ্রহণান্তে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কিছুকাল তীর্থভ্রমণ ও তপস্যাদি করার পর গৃহে ফিরে আসেন এবং বিবাহাদি করে পুত্রকন্যার পিতা হন। বৈদিক সন্ন্যাস আশ্রম থেকে অধঃপতনের ফলে তিনি কুকুরযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন। সাধু বা ভক্তের পক্ষে ইহাপেক্ষা শোচনীয় দুরবস্থা, ক্লেশকর অধোগতি, মর্মভেদী পরিণাম আর কি হতে পারে? বৈকুণ্ঠ সান্ন্যাল প্রণীত 'রামকৃষ্ণলীলামৃত' বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী অদ্বৈতানন্দ ওরফে বুড়ো গোপাল অধুনা স্বর্গবাসী! স্বামী অদ্বৈতানন্দকে আমি স্বচক্ষে গত ডিসেম্বর মাসে কোন উৎসব দিবসে ধর্মচক্রের মন্দির-সংলগ্ন মাধবীকুঞ্জের উপরে সূক্ষ্মদেহে বসে থাকতে দেখেছি। নৈষ্ঠিক গৃহস্থও স্বর্গবাসী হয়ে থাকেন। আর বৈদিক সন্ন্যাসীর পক্ষে স্বর্গবাস শোচনীয় নহে কি? মোক্ষধর্ম সাধনপূর্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভই বৈদিক সন্ন্যাসের চরম উদ্দেশ্য। স্বামী ভৈরবানন্দ আরও জেনেছেন—স্বামী বিবেকানন্দ, অঘোরমণি দেবী, স্বামী অদ্ভুতানন্দ ও দুর্গাচরণ নাগ—শুধু এই চারজনই স্থূলদেহে ব্রহ্মজ্ঞান বা জীবন্মুক্তি লাভ করেছেন; অন্য কেহ নহে। শ্রীরামকৃষ্ণের অবশিষ্ট আট দশজন পার্ষদ দেহান্তে সূক্ষ্মশরীরে সাধনপূর্ব্বক গুরুকৃপায় বিদেহ মুক্তি লাভ করেছেন। স্বামী শিবানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অভেদানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, অখণ্ডানন্দ ও বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি পার্ষদবৃন্দ বিদেহমুক্ত হয়েছেন। বিদেহমুক্ত গুরুগণ স্বীয় শিষ্যবৃন্দকে মোক্ষমার্গে পরিচালনে অসমর্থ। আর গিরিশ ঘোষ, মহেন্দ্র দত্ত ও রাম দত্ত, সুরেশ দত্ত প্রভৃতি গৃহী ভক্তবৃন্দ এখনো স্বর্গবাসী আছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে একমাত্র স্বামী আত্মানন্দ ও শ্রীমার সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দের মধ্যে একমাত্র স্বামী জগদানন্দ বিদেহ মুক্তিলাভ করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে বিদেহমুক্ত দিব্যদেহী স্বামী জগদানন্দকে আমি ধর্মচক্রে একাধিকবার দর্শন ও প্রণাম করেছি। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী প্রমুখ আমরা নিঃসংশয়ে যোগদৃষ্টিতে জেনেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রমণি, ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয়রাম, ভিক্ষামাতা ধনি কামারনী, নিকট আত্মীয় হলধারী ও তৎপত্নী, চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার, ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীমণি, ভক্ত সুরেশ মিত্র, শিষ্যাদ্বয় গোলাপসুন্দরী ও যোগীন্দ্রমোহিনী, মাড়োয়ারী ভক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ, গুরুভ্রাতৃদ্বয় চন্দ্র ও গিরিজা, শ্রীমার ডাকাতবাবা ও তৎপত্নী, স্বামিজীর শিষ্যা নিবেদিতা প্রভৃতি অনেকেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সকলকেই আমরা দেখেছি ও জেনেছি। ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ খণ্ডশক্তি অবতার কিনা তাহাও সন্দেহ-সংকুল! যদি তিনি পূর্ণশক্তি অবতার হইতেন, তাহলে স্বমাতা, স্বজন ও স্বভক্তগণকে নিশ্চয়ই মুক্তি দিতেন; তাঁহাদিগকে পুনরায় দেহধারণ করিতে হইত না। পূর্ণশক্তি অবতারদ্বয় শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ হনুমান ও সুবলাদি সকলকেই মুক্ত করেছেন। খণ্ডশক্তি অবতারকে ইষ্টজ্ঞানে চিন্তা করিলে চিত্তশুদ্ধি ও ভক্তিলাভ অবশ্যই হইবে, কিন্তু মোক্ষলাভ হইবে না। ইহা সুনিশ্চিত ও শাস্ত্রসঙ্গত। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদা, শ্রীচৈতন্য, নানক, রামানুজ, মাধ্ব, বল্লভ, কবীর, দাদূ, শংকরদেব, পরশুরাম, বুদ্ধদেব প্রভৃতি ভারতীয় মহাপুরুষগণ এবং যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, মোজেস, জরাথুষ্ট্র, লাউৎজে প্রভৃতি বিদেশীয় ধর্মাচার্য্যগণ ইষ্টরূপে

ধ্যেয় ও পূজ্য হইতে পারেন না। তাঁহারা সকলেই জগদ্গুরু বা ধর্মাচার্য্য পদবাচ্য।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কোন উচ্চপদস্থ বয়োবৃদ্ধ অফিসার গত বৎসর আমার কাছে আসেন ও তাঁর গুরুদত্ত বীজমন্ত্রের অর্থ জানিয়া লন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ সারদানন্দ স্বামিজীর মন্ত্রশিষ্য। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী তাঁকে দেখেও তাঁর কথা শুনে তৎসমীপে মন্তব্য করলেন—আপনার প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্র নির্বাচিত না হওয়ায় আপনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ইষ্টমন্ত্র জপ করেও কোন ফল পান নি! গত অক্টোবর মাসে মেদিনীপুর থেকে আমার একটি পুরাণো কুমার সুহৃদ্ এলেন। তিনি বেলুড়মঠের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট অখণ্ডানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ও রেঙ্গুণ ইউনিভার্সিটি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী তাঁকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে আমাকে গোপনে বললেন, এঁরও ইষ্টমন্ত্র নির্বাচন সংস্কারসঙ্গত না হওয়ায় ইনিও চোরারালি থেকে ওঠার ন্যায় বৃথা জপ করছেন ও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে ভাবছেন, আমি উন্নত হয়েছি। প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা নিলে কিরূপ আশু ফল হয়, তাহার কয়েকটি যথার্থ দৃষ্টান্ত দিতেছি। কলিকাতা, উলুবেড়িয়া, বালি, মোনবেড়, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থান থেকে কয়েকটি বিশ্বাসী তরুণ দীক্ষার্থী আমার কাছে আসিল। দীক্ষাকালে আমি ও মহাগৌরী তাঁহাদের প্রকৃতিগত ইষ্টদেব নির্বাচন করা সত্ত্বেও আন্তরিক অনুরাগে তারা শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রেই দীক্ষা লইল। কয়েক মাস নিষ্ঠাভরে উক্ত মন্ত্র জপ করার পর তারা স্বতঃই বুঝিল, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের ইষ্টদেব নহেন এবং আমাদের নির্বাচনই যথার্থ। যখন তারা স্বেচ্ছায়

পুনরায় প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা লইল, তখন তাহাদের পূর্বজন্মের গুরুদেব সূক্ষ্মদেহে এসে দীক্ষাকালে তাদের পশ্চাতে দাঁড়ালেন ও তাহাদিগকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করিলেন। ইহা অপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য উদাহরণ আর কি হইতে পারে? কিছুকাল নবমন্ত্র জপ করার পরই, তাদের জপ ধ্যানে পরিণত হইল ও তাঁরা স্ব স্ব ইষ্টদর্শন করিল। অন্ততঃ ছয় জন্ম একই ইষ্টমন্ত্র জপ ও একই ইষ্টমূর্তি ধ্যান করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। মন্ত্র ও ইষ্ট জন্মে জন্মে পরিবর্তিত হলে ইষ্টসিদ্ধি লাভ করতে বহু জন্ম লাগে। আর যে জন্মে ইষ্ট সিদ্ধি হবে, সেই জন্মে প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা নিতেই হবে। ইহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমার জননী স্থূলদেহে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নেন; কিন্তু কৃষ্ণমন্ত্র তাঁহার ইষ্টমন্ত্র ছিল না। স্থূল দেহ ত্যাগের পর আমি ও মহাগৌরী দেখিলাম, তিনি সূক্ষ্ম দেহে কোন সূক্ষ্মদেহী সিদ্ধ সাধক কর্তৃক কালীমন্ত্রে দীক্ষিতা হয়েছেন। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, ধর্মচক্রের উত্তর পার্শ্বস্থ রাস্তায় কয়েকটী দণ্ডায়মান প্রেতাত্মাকে বেলুড়ের বিদেহী তান্ত্রিক ব্রহ্মজ্ঞ শর্বানন্দ ঘোষাল ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং সূক্ষ্মদেহেও ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ বা দীক্ষাদান চলে। স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণ ও স্বার্থরক্ষার জন্য আধুনিক ধর্মগুরুগণ দীক্ষার্থীগণকে পূর্বোক্ত ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করছেন। আজ্ঞা-চক্রের উপরে মন না উঠিলে কোন গুরুই দীক্ষার্থীর ইষ্টমন্ত্র নির্ধারণে ও মন্ত্রচৈতন্যকরণে সমর্থ হন না। আবার যে দেবতার মন্ত্রে দীক্ষা দিতে হয়, সেই দেবতার স্বরূপে আরূঢ় হয়ে দীক্ষা দিলে মন্ত্রচৈতন্য হয়, নচেৎ নহে। এখন জিজ্ঞাস্য, আধুনিক দীক্ষাদাতা গুরুগণের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে কি?

তাহা না হইলে দীক্ষার্থীকে অযথার্থ ইষ্টমন্ত্র দিয়ে ভ্রান্ত পথে চালিত না করাই উচিত। এই সকল অজ্ঞানান্ধ ধর্মগুরুদের সম্বন্ধে কঠোপনিষদ (১।২।৫ শ্লোকে) বলেছেন—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

অবিদ্যা বা অজ্ঞান অন্ধকারে পতিত মূঢ় গুরু বৃথা অভিমান করে, আমি শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞ। সেই সকল অন্ধ গুরু দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্ধ শিষ্য অন্ধকার পরলোক প্রাপ্ত হয়।

'গুরু গীতা'য় সদ্‌গুরুর লক্ষণসমূহ বর্ণিত আছে। মৎপ্রণীত 'হিন্দুধর্ম' গ্রন্থে 'গুরুতত্ত্ব' শীর্ষক অধ্যায়ে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা প্রদত্ত। তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, যিনি সবিকল্প সমাধি লাভ করেছেন, তিনিই উত্তম গুরু। যিনি সপ্তম ভূমিতে সাধন করছেন, তিনি মধ্যম গুরু; আর যিনি বিন্দুপীঠে সাধন করছেন, তিনি অধম গুরু। যিনি নির্বিকল্প সমাধি লাভান্তে তত্ত্বজ্ঞান ও পারমহংস্য সাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন, তিনিই সর্বোত্তম জ্ঞানীগুরু। অধুনা অনেকে পরমহংস আখ্যা নিয়েছেন সরকারী উপাধির মত; কিন্তু কেহই নির্বিকল্প সমাধি-লাভ করেন নাই, পারমহংস্য সাধনায় সিদ্ধ হওয়া ত দূরের কথা। পরলোকগত যোগানন্দ পরমহংস ও চট্টগ্রামের তারাচরণ পরমহংস এবং অদ্যাপি জীবিত পুনকীর স্বরূপানন্দ পরমহংস ও বাঁকুড়ার প্রণবানন্দ পরমহংস ও কাশীর কালিকানন্দ পরমহংস প্রভৃতির কথাই বলিতেছি।

পূর্বোক্ত প্রকার অনেক অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ আমরা দিতে পারি। এখন নিজ জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রজপের ব্যর্থতা ও

বৈফল্য নিঃসংকোচে প্রকাশপূর্বক নিরপেক্ষ উদারচেতা ধর্মপিপাসু নরনারীগণকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। বেলুড় মঠের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ মহাপুরুষ শিবানন্দজী আমাকে মন্ত্রদীক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর উক্ত মন্ত্র নিষ্ঠাভরে জপ ও ইষ্টমূর্তি ধ্যান করা সত্ত্বেও আমার মন আশানুরূপ ঊর্ধগামী হয় নাই। আমার গুরুদেব মহাপুরুষজীও দীক্ষাদানকালে বলে দেন নাই, আমার মূল ইষ্ট কি? অথচ বাল্যকাল থেকেই আমি কালীভক্ত ছিলাম ও স্বকক্ষে কালীর ছবি রাখিতাম। কালীরাত্রিতে কালীপূজা ও শিবরাত্রিতে শিবপূজা করিয়া আমি সারারাত্রি কাটাইতাম; আমি মাতৃসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইতাম ও প্রেমাশ্রুতে আমার গণ্ডদেশ বিপ্লাবিত হইত। স্বামী ভৈরবানন্দ সমাধিলাভের পর আমাকে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ইংগিত করিলেও আমি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করি নাই আমার পূর্বজন্মের গুরুদেব পরমানন্দগিরি পরমহংস দেড় বৎসর পূর্ব থেকে ধর্মচক্রের মন্দিরে এসে বিরাজ করছেন। তাঁর দিব্য সান্নিধ্য লাভের পর আমার জীবনে অপূর্ব যুগান্তর, অদ্ভুত রূপান্তর ঘটিল। তিনি আমাকে নানা উপায়ে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিলেন, আমার প্রকৃতিগত ইষ্টদেবতা সর্বপ্রথমা মহাবিদ্যা, শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীসারদা নহে। মাত্র এক বৎসর নূতন ইষ্টমন্ত্র জপ ও নূতন ইষ্টমূর্তি ধ্যান করে যে সুফল পেয়েছি, তাহা পূর্বতন ইষ্টমন্ত্র চল্লিশ বৎসর জপ করেও পাইনি। ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া বাংলার দীক্ষিত সমাজকে জানাইতেছি যে, ভক্তিভরে প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্রজপ ও ইষ্টমূর্তি ধ্যান করিলে আশুফল অনিবার্য্য, যেমন প্রধান লক্ষণ অনুসারে হোমিও ঔষধ

নির্বাচনপূর্বক যথাবিধি সেবন করলে নরদেহে, এমন কি পশুদেহেও সুফল পাওয়া যায়, রোগ সারিয়া যায়। আর পূর্বোক্ত প্রকারে ঔষধ নির্বাচিত না হলে ঔষধসেবন যেমন মরুভূমিতে জলসেচনবৎ ব্যর্থ হয়, তদ্রুপ প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্রচৈতন্য না করে জপ করলে মন আদৌ উর্ধ্বগামী হয় না। এই যথাসাধ্য বিষয়ে সচেতন হওয়া ও ভারতীয় ধর্মসমাজে যে অনাচার ও ধর্মগ্লানি ঢুকেছে, তাহা প্রাণপণে নিবারণ করার জন্য ঠাকুর সীতরামদাস ওঁকারনাথ, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, শ্রীমন্মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, শিউড়ীর স্বামী সত্যানন্দজী, বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ, শ্রীমা আনন্দময়ী, সন্ন্যাসিনী দুর্গাপুরী, শ্রীমৎ বালক ব্রহ্মচারী, হালিসহরের স্বামী সত্যানন্দজী, ব্রহ্মচারী নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বর্তমান ধর্মগুরুগণকে করজোড়ে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি। আধুনিক ধর্মগুরুগণ পূর্বোক্ত দুর্নীতি বর্জন না করলে দীক্ষিত সমাজের এই দুরবস্থা অপসারিত ও ধর্মগ্লানি বিদূরিত হবে না। এই ধর্মগ্লানির জন্য ভারত সমাজের সর্বোত্তম তরুণ-তরুণীরা ধর্মবিমুখ হয়েছেন এবং সমাজের যারা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত নরনারী, তাঁরাই মঠে, আশ্রমে ও সংঘে যোগ দিয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠ নরনারীগণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা, আইন, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতি অপরা বিদ্যা অর্জনে আত্মনিয়োগ করেছেন। আর নিকৃষ্ট মানুষেরা ধর্মপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করায় অধুনা পরাবিদ্যা বা যোগবিদ্যা বা মোক্ষবিদ্যার যথার্থ উন্নতি অনুশীলনাভাবে হচ্ছে না। অপর পক্ষে সারা দেশে অপরা বিদ্যার সমধিক উন্নতি ও প্রগতি দেখা যাচ্ছে। ধর্মগ্লানি দূরীভূত হলে, আবার সর্বশ্রেষ্ঠ নরনারীগণ ধর্মসাধনে আত্মোৎসর্গ করলে প্রাচীন কালের ন্যায় বর্তমান কালেও যোগবিদ্যার

অপূর্ব বিকাশ হবে। ইহার ফলে প্রত্যেক প্রদেশে মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি দেখা যাবে। এই পুঞ্জীভূত ধর্মগ্লানি দূরীকরণার্থ ভগবান কল্কিদেব শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণবৎ পূর্ণশক্তি নিয়ে ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে, বঙ্গীয় ১৩৯২ সালের বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে মথুরায় অবতীর্ণ হবেন এবং বিশ বর্ষ বয়স থেকে পুরা এক শত বর্ষ যাবৎ অধর্ম-বিনাশ ও সদ্ধর্ম স্থাপন পূর্বক বিভক্ত ভারতকে অখণ্ড ভারতে পরিণত ও সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবেন। ভারতীয় মোক্ষধর্ম বৌদ্ধযুগে প্রাচ্য জগতে ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যুগে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রচারিত হয়েছে। আর কল্কিযুগে ইহা সমগ্র পৃথিবীতে সংস্থাপিত হবে। আমরা ঐ অনাগত অবতারের আকুল প্রতীক্ষায় বাকী তেইশ বৎসর ধীরভাবে থাকিব। গত দেড় বর্ষ যাবৎ ভগবান কল্কিদেব বেলুড় ধর্মচক্রের মন্দিরে দিব্যদেহে অবতরণ ও অবস্থানপূর্বক সূক্ষ্মলীলা করছেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর থেকে তিনি স্বয়ং এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বর্ণময় সিংহাসনে বসেছেন। সেদিন থেকে এই মন্দিরে নিত্য কল্কিপূজা হয়, তৎপূর্বে উৎসব দিবসসমূহে কল্কিপূজা হইত। আরও প্রায় তেইশ বৎসর, মথুরায় নরদেহে অবতীর্ণ হবার পূর্ব পর্য্যন্ত এই মন্দিরে শিব, কালী, দুর্গা, গৌরী, গণেশ, কার্তিকাদি দেবপুঞ্জ পরিবেষ্টিত হয়ে কল্কিদেব বিরাজ করবেন, এবং তাঁর ভাবীগুরুর সঙ্গে গুপ্তলীলা ও সূক্ষ্ম জগতে দিব্যকর্ম করবেন। প্রত্যেক পূর্ণশক্তি অবতার স্থূলদেহ ধারণের পূর্বে সূক্ষ্ম-দেহে উক্তরূপ দিব্যলীলা করে থাকেন। শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় কল্কির ইষ্টদেবী মহামায়া। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ

একটি খুব সত্য কথা বলেছেন, "বাদশাহী আমলের টাকা এই যুগে চলে না। তাই রামশক্তি বা কৃষ্ণশক্তি দ্বারা কলিমল সম্যক্ বিনষ্ট হবে না, এবং অভূতপূর্ব কল্কিশক্তি দ্বারাই কলিমল সমূলে বিধ্বস্ত হবে।" কল্কিদেবের উপস্থিতিতে আমাদের নগণ্য মন্দির বিষ্ণুলোকে, কল্কিলোকে পরিণত হয়েছে। হে কলিহত মানব, ইহা বিশ্বাস ও প্রত্যক্ষ কর এবং নবীন জীবনপ্রাপ্ত হও।

এখন আমরা পূর্বপ্রসঙ্গের অনুসরণ করিতেছি। আমার সাধন-জীবনে যে অপূর্ব সুফল ফলিয়াছে, তাহার আরও বর্ণনা না দিলে পাঠকপাঠিকা আমার বর্তমান মনোভাব ষোলআনা বুঝিতে পারিবেন না। কয়েক মাস প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্র জপ ও ইষ্টমূর্তি ধ্যানের ফলে আমার জ্ঞান-চক্ষু আংশিকভাবে খুলিল, দিব্যদৃষ্টি কিয়ৎপরিমাণে লাভ হইল। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি ইষ্টদেবীর সন্দর্শন প্রত্যহ বহু বার পাইতেছি। আমি শাস্ত্রোক্ত দেবতাসমূহ এবং সিদ্ধ ঋষিগণকে অস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। ইষ্টদেবী আসিয়া আমাকে ব্রহ্মমার্গের সাধন-শিক্ষা দিলেন এবং ব্রহ্মর্ষিগণ আসিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। আমাদের মন্দিরে দেড় বর্ষ যাবৎ যে অভূতপূর্ব গোপাললীলা চলিতেছিল, তাহা আমি দেখিতে পাইলাম। শ্রীভগবান গোপালমূর্তিতে কখনো আমার কোলে, কখনো কাঁধে, কখনো বা মাথায় বসিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত চণ্ডিকার অষ্টশক্তির অন্যতমা দেবী কৌমারী কন্যারূপে আমার সঙ্গে সর্বদা বিচরণ করিতে লাগিলেন। আমি কৌমারীকে স্থূলমূর্তিবৎ স্পষ্টভাবে বহুবার দেখেছি। আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের পিতা, প্রপিতা, মাতা, পত্নী, প্রপিতামহী প্রভৃতি

আসিয়া দেখা দিলেন, আমার পঞ্চ পূর্ব জন্মের স্মৃতি মানসপটে উদিত হইল। আমি নিঃসংশয়ে অবগত হয়েছি—ইহ জন্ম বাদ দিলে আমার দশটি পূর্বজন্ম হয়েছিল। তন্মধ্যে পঞ্চ পূর্ব জন্মের চার পিতা আমাকে দেখা দিয়েছেন। আমার আদি পিতা মহর্ষি আরুণি ও তৎপত্নী মানসীমায়া দেবী আমার আদি মাতা। আরুণি ত্রেতাযুগের উপনিষৎকার ছিলেন ও তৎপিতা লোমশ আমার আদি প্রপিতা। দ্বাপর যুগে পরীক্ষিৎপুত্র মহারাজা জনমেজয় ও তৎপত্নী বপুষ্টোমা আমার পিতামাতা ছিলেন। মাতৃদেবী বপুষ্টোমা স্নেহবসে বহুবার তাঁরমুমুক্ষু সন্তানকে দেখতে মর্ত্যে এসেছেন। প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ রচয়িতা বৈয়াকরণ পাণিনি শর্মা ও তৎপত্নী কস্তুরী দেবী কোন জন্মে আমার পিতামাতা ছিলেন। সন ১৩৬৮ সালে ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি সময়ে ব্রহ্মজ্ঞ পিতা পাণিনির পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ভৈরবানন্দ কর্তৃক ব্যাখ্যাত নিগূঢ় শিবলিঙ্গতত্ত্ব এই কৈফিয়তের শেষাংশে দিয়াছি। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতেক আমি জন্মেছিলাম রাজস্থানের সিদ্ধাসাধিকা মীরাবাঈএর কুলগুরু গদাধর পণ্ডিতরূপে। পূর্বজন্মে আমি ছিলাম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক শশধর তর্কচূড়ামণি। আশা করি, অবশিষ্ট পঞ্চ পূর্ব জন্মের স্মৃতি অদূর ভবিষ্যতে আমার মানস পটে সমুদিত হইবে। শুধু তাহাই নহে, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথম দিবস হইতেই প্রতিদিন বহুবার ইষ্টদেবীর পুণ্যদর্শন লাভে আমি ধন্য হইলাম। আমার ত্রিতাপদগ্ধ অনুর্বর জীবনমরুতে যে সুমধুর ইষ্টলীলা ঘটিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ কোথাও কোথাও লিখিয়াছি। ইহজীবনে সাধন শেষ করিয়া 'দিব্যদৃষ্টি' গ্রন্থের মোক্ষজ্ঞান' লাভের জন্য ইষ্টদেবী ব্যতীত

নিম্নোক্ত চল্লিশ মহর্ষি আসিয়া আমাকে দর্শন ও প্রেরণা দিয়াছেন— পরমানন্দগিরি পরমহংস, ব্যাসদেব, শুকদেব, আরুণি, লোমশ, রাজর্ষি জন্মেজয়, বৈয়াকরণ পাণিনি শর্মা, ভাগুরি, ক্রৌঞ্চ, নরঋষি, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, কর্দম, দধীচি, অগ্নিবাহু, মেধাতিথি, অষ্টাবক্র, অরিষ্টনেমি, পুত্র, জহ্নু, বিভাণ্ডক, তোতাপুরী, বিশ্ববসু, যাজ্ঞবল্ক্য, মৈত্রেয়ী, অম্ভৃণ ঋষিকন্যা ব্রহ্মবিদূষী বাক্, মহাভারতোক্ত মার্কেণ্ডেয়, সূর্য্যোপসক বিভাবসু, কৃষ্ণভক্ত বিশ্ববান্, চ্যবনমুনি ও তৎপত্নী সুকন্যা, হিমালয়, তত্ত্বদর্শী, রামায়ণোক্ত মহর্ষি মাতঙ্গ, লক্ষ্মীভক্ত নন্দীশ্বর, কাত্যায়ন, ভাগবতোক্ত বালখিল্য, মীরাবাঈ ও তৎগুরু রুইদাস, বিশ্বামিত্র এবং ইহজন্মের গুরু মহাপুরুষ শিবানন্দ মহারাজ। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে, অবধূত জ্ঞান সাধন কালে চব্বিশ গুরুর সন্দর্শন ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। আর কল্কিকৃপায় আমি চল্লিশ গুরুর দর্শন ও আশীষ লাভে ধন্য হয়েছি। এই সকল সিদ্ধ ঋষি কিরূপে আমাকে দর্শন দিলেন, তাহার বিশদ বর্ণনা 'দিব্যদৃষ্টি' গ্রন্থের যথাস্থানে প্রদত্ত। এতদ্ব্যতীত আমি আরও অনেক ঋষি ও দেবতার দর্শন লাভ করেছি। শুধু তাহাই নহে, ইহজন্মের মাতাপিতা সূক্ষ্মদেহে ধর্মচক্রের মন্দিরে সাধন করে আমাকে মোক্ষমার্গে উৎসাহিত করেছেন। মদীয় পিতৃদেব ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টীয় অব্দদ্বয় কঠোর সাধন পূর্বক বিদেহ মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন। প্রায় তিন বৎসর মহাগোরী মৎসমীপে যে সকল দিব্যদর্শন লাভ করেছেন, তৎসমুদায় ও অন্ততঃ আংশিক অস্পষ্টভাবে আমি স্বয়ং সন্দর্শন করেছি। 'দিব্যদৃষ্টি' গ্রন্থের সর্বত্র ঐ অপূর্ব বিবৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই জন্যই বর্তমান কৈফিয়তে ধমজগতের সর্বত্র এই বজ্রবৎ বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ প্রচার করিতেছি। বলা বাহুল্য,

স্বামী ভৈরবানন্দ পরমহংস ও সন্ন্যাসিনী মহাগৌরীর সহিত ষোলআনা একমত হয়েই এ্যাটম বম্ববৎ এই কৈফিয়ৎ লিখিয়াছি।

আমাদের শাস্ত্রমতে ওঁকার ব্রহ্মবাচক মোক্ষমন্ত্র। ব্রহ্মলাভই বৈদিক সাধনার চরম লক্ষ্য। উক্ত মর্মে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (২।৮) আছে—ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি। ইহার অর্থ—মুমুক্ষু সাধক ব্রহ্মনাদ প্রণবরূপ উড়ুপ বা ভেলা সহায়ে সর্ববিধ ভয়াবহ সংসারস্রোত উত্তীর্ণ হয়। অতএব ওঁকারই ব্রহ্মের উড়ুপ, ব্রহ্মবীজ। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, ও সৌর ভক্তগণ সকলেই সাধনশেষে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কামনা করেন। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত চরম মোক্ষলাভ হয় না। সাকার ও সগুণ সাধনান্তে মুমুক্ষু সাধক-সাধিকা নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মসাধনে ব্রতী হন। সেইজন্য প্রত্যেক ইষ্টমন্ত্র ওঁকারসংযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ওঁকারবিহীন ইষ্টমন্ত্র বা দেবমন্ত্র শক্তিহীন, অর্থহীন। অধুনা অনেক ধর্মগুরু ওঁকারবিহীন ইষ্টমন্ত্রে নারী ও শূদ্রাদিকে দীক্ষা দেন, কিন্তু ঐরূপ মন্ত্র শাস্ত্রসঙ্গত বা ফলপ্রদ নহে। সুতরাং অব্রাহ্মণ নরনারীগণকেও ওঁকারসংযুক্ত ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষাদান কর্তব্য। শিবপূজা, লক্ষ্মীপূজা, গঙ্গাপূজা, ইষ্টপূজা, শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণেতর নরনারীগণকেও প্রণবসংযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার দেওয়া উচিত। মনে রাখিতে হইবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণগীতায় সকল স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রাদি পাপজন্মগণকেও পরাগতি লাভের অধিকার দিয়াছেন। আবার কোন কোন ধর্মগুরু প্রণব ও ইষ্টনাম ব্যতীত শুধু ইষ্টবীজে দীক্ষা দেন। ইহাও অশাস্ত্রীয় ও অনিষ্টকর। শুধু বীজমন্ত্র জপ করার জন্য শুভ-সংস্কার সকল গৃহী বা ত্যাগী ভক্তের নাই। মোক্ষমার্গের উত্তমাধিকারীবৃন্দই বীজমন্ত্রজপে

অধিকারী। শুধু বীজমন্ত্র জপ কিরূপ নিষ্ফল হয়, তাহার এ৭টী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিতেছি। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কোন বয়োবৃদ্ধ রাষ্ট্রমন্ত্রী বিশবর্ষ পূর্বে কলিকাতার কোন জ্যোতিষ-সম্রাটের নিকট দীক্ষা গ্রহণ সময়ে শুধু বীজমন্ত্র প্রাপ্ত হন। ঐ বীজমন্ত্র বিশবর্ষ জপ করেও তিনি সুফল পান নাই। আমরা উক্ত বীজমন্ত্রের সহিত প্রণব ও ইষ্ট নাম সংযোগ ও মন্ত্রচৈতন্য করিয়া দিবার পর তিনি অবিলম্বে জপমগ্ন হইলেন এবং তাঁহার পূর্বজন্মের গুরুদেব সূক্ষ্মদেহে আসিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। উল্লিখিত রাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করেন, "দীর্ঘ বিশ বর্ষ শুধু বীজ জপে যে ফল পাই নি, প্রণব ও ইষ্টনাম সংযোগপূর্বক পূর্ণ ইষ্টমন্ত্র জপে তদপেক্ষা শত গুণে অধিক ফল অল্প সময়ে পেয়েছি। এখন আমার জপ শীঘ্র ধ্যানে পরিণত হয় ও ধ্যানে ক্ষণ কালের জন্যও ইষ্টদর্শন পাই। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সুবৃদ্ধ সাধকের এই সরল স্বীকৃতি কি স্মরণীয় নহে ? অনেক বৈষ্ণব সাধক দীক্ষাকালে প্রণবরহিত ও বীজবর্জিত শুধু ইষ্টনাম দিয়া থাকেন ও বলেন, কলিযুগে নামই মন্ত্র। ইহা এক অর্থে সত্য হইলেও শুধু ইষ্টনাম জপ করিলে মোক্ষলাভ হইবে না। ইষ্টনাম ইষ্টবীজে লয় হয়, ইষ্টবীজ প্রণবে লয় হয় ও প্রণব ব্রহ্মে লয় হয়। ইহাই শাস্ত্রসম্মত লয়ক্রম। সর্বশেষে ওঁকার সাধন ব্যতীত ব্রহ্মপ্রাপ্তি অসম্ভব। শাস্ত্রবিধি উল্লংঘন করিলে ধর্মলাভ হয় না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

অনুবাদ—যিনি শাস্ত্রবিধি লংঘনপূর্বক যথেচ্ছাচারী হইয়া শুভ কর্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি পুরুষার্থযোগ্যতা লাভ করেন না। অথবা

ইহলোকে সুখলাভ ও পরলোকে প্রকৃষ্টগতি বা মোক্ষপ্রাপ্ত হন না। ইহার কারণ, আমাদের কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্রই শাশ্বত প্রমাণ।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব সাধকবৃন্দকে নামজপ ব্যতিরিক্ত অন্যান্য সাধনেরও নিম্নোক্ত নির্দেশ দিয়াছেন—

সৎসঙ্গ সাধুসেবা ভাগবত নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥

ভক্তিলাভের এই পঞ্চ সাধন নিশ্চয়ই সাধারণের অতিশয় উপযোগী। শ্রীচৈতন্য তৎকালীন অহিন্দুগণকে হিন্দু সমাজভুক্ত করিবার জন্য হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং হরিনাম ইষ্টমন্ত্র বা মোক্ষমন্ত্র রূপে জপনীয় নহে, দলবদ্ধভাবে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তনীয়। পাঁচ শত বর্ষ পূর্বে যখন বৌদ্ধগণ দলে দলে হিন্দু সমাজে যোগ দিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে সংঘবদ্ধভাবে এই সংকীর্তন করিতে বলিলেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

কলিযুগে নামমাহাত্ম্য সর্বাধিক হলেও হরিনাম জপনীয় ইষ্টমন্ত্র নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভুকে নিম্নোক্ত মহামন্ত্র প্রচার করিতে বলেন—ওঁ হরি নারায়ণ ব্রহ্ম। সম্ভবতঃ নারদ পঞ্চরাত্রে বা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এই মুক্তিমন্ত্র উল্লিখিত। অধুনা এই মন্ত্র লুক্কায়িত ও লুপ্তপ্রায়। বৈষ্ণব সমাজে সাধন-বিজ্ঞান উপেক্ষিত ও যৌগিক সাধন রহস্য অবহেলিত। শিখ সমাজে, ব্রাহ্ম সমাজে ও আর্য্য সমাজে যৌগিক সাধন নির্বাসিত হওয়ায় ঐ সকল সমাজে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ

অত্যন্ত বিরল দেখা যায়। যদি শুধু নামজপ করিলে মুক্তিলাভ হইত, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণব বিমুক্ত হইতেন। বহু বর্ষ নাম জপ করার পরেও জাপকগণ সাধনাভাবে প্রাকৃত জীবনের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বেও উঠিতে অক্ষম হয়, স্বেচ্ছায় পাশব প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেয়। ইহাদের লক্ষ্য করেই সন্তবর তুলসীদাস বলেছেন—

মালা ফেরত যুগ গয়া পায় ন মনকা ফের।
মনকা ফরকা ছাড়িকে মনকা মনকা ফের॥

জপমালা ফেরাতে ফেরাতে দীর্ঘ যুগ কাটিয়া গেল, অথচ মনের চাঞ্চল্য কমিল না। মনের গাঁটগুলি খুলে মনে মনে ইষ্টস্মরণ কর, মালা ফেলে দাও। অধুনা আর একটি নিন্দনীয় ধর্মপ্রথা প্রবর্তিত হয়েছে। ইহা অনেক আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক সমর্থিত ও আচরিত। আমি mass initiation বা দলবদ্ধ ভক্তবৃন্দকে যুগপৎ দীক্ষাদানের কথাই বলিতেছি। যেমন mass education বা জনশিক্ষা অর্থহীন, তেমনি mass initiationও বাণিজ্যিক ধর্মপ্রথা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহা দ্বারা সম্প্রদায়ের পুষ্টিসাধন ও অর্থাগম হয় বটে; কিন্তু ধর্মপিপাসু নরনারীগণের সর্বনাশ ঘটে। সুতরাং একসঙ্গে ভক্তদলকে দীক্ষাদান অশাস্ত্রীয় নিন্দনীয় ধর্মপ্রথা। অবিলম্বে সর্বত্র ইহার সমূল উচ্ছেদ প্রয়োজন। যেমন জার দণ্ডিত রুশদেশে খৃষ্টান পাদ্রী ভণ্ডবর রাসপুটীন লাঞ্ছিত ও শাসিত হয়েছিলেন, তদ্রূপ উল্লিখিত ধর্মপ্রথার সমর্থক ও প্রচারকগণকে ex-communicated বা সমাজচ্যুত করাই কর্তব্য। বহু বর্ষ পূর্বে নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু বিরচিত 'বিবাহ বিভ্রাট' শীর্ষক নাটক কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় ও

আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেইরূপ ধর্মসমাজে এই বিভ্রান্তি ও দুর্নীতি পরিহারার্থ দীক্ষা বিভ্রাট সম্বন্ধে একটী নাটক সুরচিত ও অভিনীত হইলে এই দুর্নীতি দমনার্থ সকলে সচেষ্ট হইবেন।

তখন আমরা চৈতন্যমন্ত্রের বিশ্লেষণ ও চৈতন্যদেবের পূর্বজন্মকথা আলোচনা করিব। সাধারণতঃ এই চৈতন্যমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া বা পূজাদি করা হয়—ওঁ ক্লীং ভগবতে শ্রীচৈতন্যদেবায় নমঃ। একাগ্র অন্তরে এই মন্ত্র জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু হৃদয়ে ঘুরিয়া মণিপুরে নামিয়া যায়। আর 'শ্রীচৈতন্যদেবায়' পরিবর্তে 'শ্রীকৃষ্ণায়' জপ করিলে, ওঁ ক্লীং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ—এই ইষ্টমন্ত্র জপিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু বিশুদ্ধ পদ্মে উঠিয়া যায়। মন্ত্রদ্রষ্টা ভৈরবানন্দ এই দুই ইষ্টমন্ত্রের শক্তি শতবার যোগবলে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া উল্লিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং চৈতন্যমন্ত্র জপিলেও মন নিম্নমুখী হয়, রজোগুণ থেকে তমোগুণে নেমে যায়। যাহারা আজন্ম প্রকৃতি অনুসারে সত্ত্বগুণে, বা রজোগুণে অবস্থিত, তাহারা এই মন্ত্র জপিলে জন্মগত সংস্কার থেকে বিচ্যুত হইয়া পশুবৎ আচরণ করিবে। আর যাহারা জন্মগত তমোগুণে বিদ্যমান, তাহারা ত সারা জীবন ঐ মন্ত্র জপিয়া রজোগুণে বা সত্ত্বগুণে উঠিতে পারিবেন না। আবার কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্য নারী, বৈশ্য ও শূদ্রকে উক্ত মন্ত্র মধ্যে ওঁ এর বদলে নমঃ দিয়া থাকেন। ওঁকারবর্জিত চৈতন্যমন্ত্র বা কৃষ্ণমন্ত্র অফলপ্রদ ও অনিষ্টকর। এই সকল অমন্ত্র শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ নরনারী জপ করার ফলে এই ধর্মভূমি অধর্মালয়ে পরিণত হয়েছে, হিন্দু জাতির সর্বনাশ হয়েছে। সারা দেশে

ধর্মগ্লানি লেলিহান সর্পজিহ্বা বিস্তার করেছে। এই সকল কুৎসিৎ প্রথার আশু উচ্ছেদ ব্যতীত হিন্দু সমাজের নৈতিক উন্নতি অসম্ভব।

—তিন—

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তিন যুগে শূদ্রদের ধর্মাধিকার ছিল না। রামায়ণে আছে, ত্রেতাযুগে শূদ্র শম্বুক বিন্ধ্যপাদদেশে তপস্যারত ছিলেন। তিনি চৌর্য্যাদি কোন অসৎ কর্ম করেন নি; তথাপি শ্রীরামচন্দ্র স্বহস্তে তার শিরশ্ছেদ করেছিলেন। দ্বাপর যুগের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ শূদ্র ও নারীকে ধর্মকর্মে অধিকার দিলেন। শূদ্রোদ্ধারার্থ তিনি ক্ষাত্রবংশে অবতীর্ণ হয়েও দ্বাদশ বৎসর শূদ্রগৃহে, নন্দালয়ে বাস ও বাল্যলীলা করলেন। তিনি শিশুকালে কণ্বমুনিকে প্রভাবিত করে সমাজচ্যুত শূদ্রদের গুরুপদে অভিষিক্ত করিলেন। দ্বাপরের শেষভাগ থেকে কলিযুগের শেষভাগ পর্য্যন্ত পুরা এক যুগ শূদ্রগণ কৃষ্ণদত্ত অধিকার উপভোগ করেন। উক্ত মর্মে ভগবান্ স্বয়ং গীতামুখে (৯।৩২—৩৫) বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা॥

আমাকে আশ্রয় করিলে পাপজন্মা নারী, শূদ্র, বৈশ্যগণও পরাগতির অধিকারী হতে পারে। পুণ্যজন্মা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণও যে পরাগতি প্রাপ্ত হবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? দ্বাপরের শেষাংশে

পূর্ণশক্তি অবতার যাঁহাদিগকে মোক্ষলাভের অধিকারী করলেন, কলিশেষে তাঁহাদিগকে স্বার্থান্ধ গৃহীগুরু ও সাধুগুরুগণ প্রণবোচ্চারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন কেন? এই পাপাচারের ফলে দেশব্যাপী ধর্মগ্লানি উপস্থিত হয়েছে। এই ধর্মগ্লানি বিনাশার্থ পূর্ণশক্তি অবতার কল্কিদেব তেইশ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরায় ১৩৯২ সালে অবতীর্ণ হবেন।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সত্ত্বাদি গুণ ও শমাদি কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি করেছি। ইহার গূঢ়ার্থ এই যে, কলিযুগে শাস্ত্রসম্মত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নাই; ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব সাধনবলে অর্জন করতে হবে। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বিশ্বামিত্র। তিনি ক্ষত্রিয় হয়ে তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেন। কলিযুগে এক অর্থে সকলেই বৈশ্য ও শূদ্র; কারণ কলিশেষে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রকর্মে বা বৈশ্যকর্মে জীবিকা অর্জন করে। অধুনা শাস্ত্রজ্ঞ সাত্ত্বিক শূদ্রও প্রণবোচ্চারণে অধিকারী নয়, অথচ নরাধম দুরাচার ধর্মহীন ব্রাহ্মণও প্রণব উচ্চারণ করে; আর কুলীন ব্রাহ্মণীও প্রণবোচ্চারণ করে না। অধুনা ব্রাহ্মণীও ধর্মাধিকারে শূদ্রাণীতুল্য। এই সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্র কি বলেন শুনুন।

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

১৩৬৫ সালে মাকড়দহবাসী কতকগুলি সৎশূদ্র সূক্ষ্মদেহী ঊর্দ্ধগতির আশায় আমার আশ্রম প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। আমি তাহাদিগকে দেখিয়া ভৈরবানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করি, উহারা কাহারা? তিনি উহাদের পরিচয় দিয়া আমাকে বলিলেন, "উহারা

সংস্কৃতিবান ও যথাসাধ্য সাধনভজন করিয়াছে। ইহাদের অনেকের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধক্রিয়া ও হইয়াছে। পরে আমি সাধনশক্তি দ্বারা জানিতে পারিলাম, উহাদিগকে স্বার্থদুষ্ট দীক্ষাগুরু প্রণব সহযোগে ইষ্টমন্ত্র দেন নাই। সেই জন্য ইহারা নিষ্ঠাভরে দীর্ঘকাল ইষ্টমন্ত্র জপ করেও কোন ফল পান নাই। আমাদের শ্রাদ্ধবিধি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ—বেদত্রয়বিহিত ; কিন্তু অজ্ঞ পুরোহিতগণ যজমানগণকে শ্রাদ্ধকালেও প্রণবহীন মন্ত্রোচ্চারণ করিয়েছেন। এই হেতু তাহারা শ্রাদ্ধফল থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন। প্রণবই চতুর্বেদের মূলমন্ত্র। তাই শূদ্রেরা দানসাগর শ্রাদ্ধ করিলেও ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধশেষে বলেন, ন বেদঃ, ন বিধি, ব্রাহ্মণবচনাৎ। ইহার অর্থ, প্রণবহীন মন্ত্রোচ্চারণ বেদবিহিত বা বিধিসম্মত নহে— ব্রাহ্মণবাক্যই বিশ্বাসযোগ্য। এই জন্যই আধুনিক শ্রাদ্ধ ক্রিয়া দ্বারা প্রেতাত্মার প্রেতত্বমোচন হয় না। তাই জগতের কল্যাণার্থ ও সংমানুষের অববোধার্থ আমি এই সৎশূদ্রদের নাম মৎপ্রণীত 'দিব্য দৃষ্টি' গ্রন্থের 'মোক্ষ যজ্ঞ' শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি।

এখন পূর্ব প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। ব্রজবাসী গোপশূদ্রগণ ইন্দ্রপূজা করিতেন ও পূজাকালে নরবলি দিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা বন্ধ করিয়া অবতারের আরাধনা প্রবর্তন করিলেন। উক্ত কালে তৎকর্তৃক মন্ত্রযোগ প্রবর্তিত হয়। তিনি মন্ত্রযোগ সাধন দ্বারা অসংখ্য শূদ্র-শূদ্রাণীকে ইষ্টসিদ্ধি, বিদেহমুক্তি ও জ্ঞানসিদ্ধি প্রাপ্ত করান এবং মুক্ত শূদ্রদের স্থূল শরীর প্রারব্ধভোগার্থ মর্ত্যে রেখে তাদের সূক্ষ্মদেহ বৈকুণ্ঠধামে পাঠাইয়াছিলেন। এই কলিযুগেও জীবিকা অর্জনের সময় বাদে বাকী সময়টুকু যথার্থ শাস্ত্রসম্মত উপায়ে

সাধন করিলে বার বৎসরেই অধিকারীভেদে ইষ্টসিদ্ধি বা জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করা যায়। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষযোগ বর্ণনকালে ভগবান বলিতেছেন, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নিজ নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম পালন দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠাক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানে পরানিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তিরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়। বর্তমান যুগে শূদ্রশক্তি ভারত সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত—এই মহাদেশের অর্থশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি, রাষ্ট্রশক্তি, শূদ্রজাতির করতলগত হয়েছে। সুতরাং বৈশ্য ও শূদ্রকে ধর্মাধিকার না দিলে উচ্চবর্ণের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। মনুসংহিতাও বলেন, ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামেতি, শূদ্রো ব্রাহ্মণতাম্। ইহার অর্থ, ধর্মবলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব অর্জনে সমর্থ, আর ধর্মাভাবে ব্রাহ্মণও শূদ্র হইয়া পড়ে।

১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ রবিবার আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী শ্রীরামপুর মহাপ্রভু মন্দিরে গিয়াছিলাম। ইহা প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দির এবং ইহাতে জগন্নাথ, চৈতন্য ও নিতাইয়ের মূর্তিত্রয় অবস্থিত। আমরা গিয়ে প্রণামান্তে দাঁড়াতেই জগন্নাথ ও চৈতন্য মন্দিরে আবির্ভূত হলেন। আমাদের দীর্ঘকালস্থায়ী অনুসন্ধিৎসা ছিল, শ্রীচৈতন্য পূর্বজন্মে কে ছিলেন তাহা যোগদৃষ্টিতে জানা। যোগিবর ভৈরবানন্দ শ্রীচৈতন্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ইষ্টরূপী ভগবান্? তিনি সহাস্যে বললেন, না। তখন ভৈরবানন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তবে আপনি পূর্বজন্মে কে ছিলেন তাহা দেখান। ইহাতে তিনি ইসারায় জগন্নাথদেবকে তাঁর পূর্বজন্মের মূর্তি দেখিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। তৎক্ষণেই শ্রীচৈতন্যের পশ্চাতে সমুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ পক্বকেশ দীর্ঘজটা সমন্বিত পাকা দাড়িযুক্ত গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষমালা শোভিত বল্কলপরিহিত সূক্ষ্মমূর্তি একটী প্রকটিত

হলো। ঐ সূক্ষ্মমূর্তিকে ভৈরবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে ছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি সন্দীপনী মুনিপুত্র কৃষ্ণাজিন মুনি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হোল, যাঁকে জলদৈত্য পঞ্চজন দ্বারকায় বধ করেছিলেন ও যাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমালয় থেকে এনে গুরু দক্ষিণাস্বরূপ সন্দীপনীকে সমর্পণ করেছিলেন, আপনি কি সেই মুনি? তিনি সহাস্যে বললেন, হাঁ। তিনি আরও বললেন, আমি পূর্ণশক্তি অবতার শ্রীকৃষ্ণের কাছে মুক্তিবর চেয়েছিলাম ও শ্রীকৃষ্ণ আমাকে এই বর দিয়েছিলেন, কলিযুগে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে তুমি মুক্তিলাভ করবে। সুতরাং শ্রীচৈতন্য খণ্ডাবতার নহেন ও শ্রীচৈতন্য সাহিত্যে বহু মিথ্যা প্রচারিত হয়েছে পাঁচ শত বর্ষ যাবৎ। শ্রীচৈতন্য প্রভাবে বাংলাদেশ মেরুদণ্ডহীন ভাবপ্রবণ কাপুরুষ জাতিতে পরিণত হয়েছে।

যোগিরাজ ভৈরবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে ইষ্টদেবী ব্রহ্মময়ীর নিকট যাহা জেনেছেন, তাহাও আমরা উৎসুক পাঠকবৃন্দকে উপহার দিব। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ ডিসেম্বর রবিবার ভৈরবানন্দ ঝাড়গ্রাম থেকে মাকড়দহে স্বকক্ষে ফিরে দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা এতকাল থাকার পর না বলে চলে গেছেন। ইহার কারণ, পূর্বদিন শনিবার রামকৃষ্ণানন্দের সূর্যমণ্ডল চিরতরে ভগ্ন হওয়ায় ঠাকুর ও শ্রীমা উভয়েই ক্ষুব্ধরুষ্ট হয়েছেন। তখন ভৈরবানন্দ জগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রামকৃষ্ণ কি সত্যই খণ্ডাবতার, না অন্য কেউ? তখন মহামায়া প্রকাশ করলেন, "রামকৃষ্ণ ও সারদা রামাবতারে গুহক চণ্ডাল ও কুমারী শবরী ছিলেন। মৃত্যুর পরে উভয়ে স্বর্গলোকের সত্ত্বস্তরবাসী হন। তাঁরা রামের নিকট মুক্তি প্রার্থনা

করেন। তখন রাম বলেন, জন্মান্তরে তোমরা মুক্তি পাবে।" তাই শ্রীরামকৃষ্ণ রামভক্ত ক্ষুদিরামের গৃহে জন্মগ্রহণপূর্বক প্রথমে হনুমান সাধন ও রামসাধন করেন। ইহা তাঁর পূর্বজন্মের সংস্কারপ্রভাবে ঘটেছিল। পরে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁকে শাক্ত সাধনায় নিযুক্ত করেন। গুহক ও শবরী পরস্পর পরিচিত ও প্রীতিযুক্ত ছিলেন বলে ইহজন্মে উভয়ের মিলন ও মোক্ষ সাধন হল। 'কল্কিগীতা'য় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে যে, ভৈরবানন্দ রামকৃষ্ণ ও সারদার পূর্বজন্ম যোগবলে জানতে না পেরে তাঁহাদিগকে খণ্ডাবতার বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। পরে তিনি জানালেন, রামকৃষ্ণ ও সারদা তাঁদের পশ্চাতে ব্রহ্মজ্যোতিঃ দেখিয়েছেন বলে ভৈরবানন্দ তাঁদের পূর্বজন্ম জানতে পারেন নি। তাই জগন্মাতা সিদ্ধ ভক্তের নিকট যথার্থ ঘটনা প্রকাশ করলেন।

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত "রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে" আছে, যে রাম যে কৃষ্ণ একাধারে তিনিই রামকৃষ্ণ। ইহা রামকৃষ্ণের উক্তিরূপে প্রচারিত। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামী ভৈরবানন্দ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহা অস্বীকার করে বলেন, ইহা কল্পিত। যথার্থ ঘটনা নিম্নোক্ত প্রকার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তিম সময়ে নরেন্দ্রনাথকে দীক্ষারহস্য উপদেশ দিচ্ছেন—দশ মহাবিদ্যা, দ্বাদশ শিব, পূর্ণশক্তি অবতার, জগদ্ধাত্রী, কালী প্রভৃতি ইষ্টদেবতা হতে পারেন। নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, অবতার সবই কি এক? তখন ঠাকুর বলেন, সব অবতারের মূল সত্ত্বা এক বিষ্ণু, যিনি বিশ্বপালক। ক্রিয়াভেদে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও শক্তি—যেমন রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি।" সুতরাং রামকৃষ্ণ একাধারে রাম ও কৃষ্ণ—ইহা সর্বৈব কল্পিত। ভৈরবানন্দ পরমহংস বিবেকানন্দ স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কি

শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতারবরিষ্ঠ বলেছিলেন ? তদুত্তরে স্বামিজী বললেন, আমি তাঁকে মহাপুরুষবরিষ্ঠ বলেছিলাম, কিন্তু আমার গুরুভাইরা তাঁকে অবতারবরিষ্ঠ বলে প্রচার করেছে। যদি শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার হতেন, তাহলে নিজস্ব বীজমন্ত্র প্রিয়শিষ্য নরেন্দ্রনাথের নিকট নিশ্চয়ই প্রকাশ করতেন। তিনি যে খণ্ডাবতারও নহেন, কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী পরমহংস, তাহার আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছি। ১৯৬১ খৃস্টাব্দে ডিসেম্বরে মহামায়ায় দুর্লংঘ্য নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ ধর্মচক্র ছেড়ে, বেলুড় গ্রাম ত্যাগ করে জয়রামবাটীস্থ সারদামন্দিরে পার্ষদবৃন্দ সহ বিরাজ করছেন এবং বেলুড়মঠ পাঁচ শতাধিক যমকিংকর কর্তৃক অধ্যুষিত হয়েছে। অদ্যাবধি প্রায় তিন মাস তাঁরা বা কোন দেবতা বেলুড় মঠে নাই। যদি শ্রীরামকৃষ্ণ অন্ততঃ অংশাবতার হতেন, তাহলে তিনি ভাগবত শক্তিবলে যমদূতগণকে সরিয়ে তথায় ইষ্টদেবী সহ প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন ; কিন্তু তিনি তাহা পারেন নাই। যাঁর জ্ঞানচক্ষু খুলেছে, দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়েছে, তিনিই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করবেন. অন্যে নহে। ঠাকুর তদীয় এগারজন পার্ষদকে স্ব স্ব প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং স্বামিজীও আত্মানন্দ ও সেভিয়ার দম্পতীকে স্ব স্ব সংস্কারসম্মত ইষ্টমন্ত্রদান করেন। তৎপরে বেলুড়মঠে উক্ত প্রথা উপেক্ষিত হয়েছে। এই প্রবাদ রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ে প্রচলিত ও রামকৃষ্ণ সাহিত্যে প্রচারিত আছে যে, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ ও নিরঞ্জনানন্দ নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটী। জীবকোটী ও ঈশ্বরকোটী শব্দদ্বয় বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যবহৃত। ব্রহ্মবাদী রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ে ইহার বহুল প্রচার কেন হইল ? স্বামী

ভৈরবানন্দ যোগবলে অবগত হয়ে মন্তব্য করেন,"বিবেকানন্দ স্বামিজী পূর্বজন্মে সিদ্ধ শৈব সাধক ছিলেন, আজ্ঞাচক্রের উপরে নাদপীঠ পর্য্যন্ত তাঁর সাধন ছিল। ইহজন্মে কঠোর সাধন করে তিনি নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী বা পরমহংস হন নাই। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব ও বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী পঞ্চকের ঈশ্বরকোটিত্ব অকাট্য যুক্তিবলে অপ্রমাণিত হইল! নিরঞ্জনানন্দ স্বর্গবাসী ও পুনর্জন্ম নেবেন। বেলুড় মঠের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট স্বামী শুদ্ধানন্দ দেহান্তে পিতৃলোকবাসান্তে চন্দ্রলোকে গিয়ে মর্ত্যলোকে প্রত্যাগত হয়েছেন। সারদাদেবীর প্রিয় শিষ্য যোগানন্দ স্বামী ঋষিলোকবাসী হয়েছেন। বেলুড় মঠের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ পিতৃলোকের সত্ত্বস্তরবাসী। বেলুড়মঠের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রেসিডেন্ট যথাক্রমে ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, অখণ্ডানন্দ ও বিজ্ঞানানন্দ এবং প্রেমানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ ও রামকৃষ্ণানন্দ বিদেহমুক্ত। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তত্ত্বজ্ঞানী নহেন। তাই "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" এ তত্ত্বজ্ঞানের কথা পাওয়া যায় না। কলিযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ গীতা। তার সম্বন্ধে ঠাকুর বললেন, গীতা গীতা কয়েক বার বললে যাহা হয়, তাহাই অর্থাৎ ত্যাগই গীতার মূল শিক্ষা। যদি তিনি অবতার হতেন, শ্রীকৃষ্ণের মর্মবাণীকে এই বলে উড়িয়ে দিতেন না। গীতার আঠার অধ্যায়ে আঠার প্রকার যৌগিক সাধন উল্লিখিত। তিনি সে কথা কোথাও বলেন নাই। তত্ত্বজ্ঞানী না হলে পরমহংসও যুগসঞ্চিত ধর্মগ্লানি অবধারণে ও অপসারণে অসমর্থ হন। শ্রীরামকৃষ্ণ কলিযুগের ধর্মগ্লানি উদ্ঘাটন করেননি।"

এখন আমরা আধুনিক ধর্মগুরুদের সম্বন্ধে সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী ও স্বামী ভৈরবানন্দের যোগদৃষ্টিলব্ধ মন্তব্যাবলী পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি। বেলুড়মঠের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট স্বামী শংকরানন্দ দেহরক্ষার দুই দিন পরে ধর্মচক্রের উত্তর পার্শ্বস্থ রাস্তায় এসে শূন্যে মন্দিরাভিমুখে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন বৈকাল তিনটায়। বলা বাহুল্য, আমিই তাঁকে প্রথমে দেখলাম ও মহাগৌরীকে ডেকে বললাম। সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী দোতলা থেকে তাঁকে দেখে আমাকে বললেন, "ইনি প্রেতলোকবাসী হয়েছেন; স্বর্গবাসীও হন নি! স্বামী শংকরানন্দ বেলুড মঠের প্রেসিডেন্ট ও প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু হয়েও প্রেতযোনিপ্রাপ্ত হইলেন কেন? ইহার উত্তরে স্বামী ভৈরবানন্দ মহামায়ার মুখে অবগত হয়ে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে মাকড়দহ থেকে লিখেছিলেন, "স্বামী শংকরানন্দ ও মৈথিল্যানন্দ অন্য দুটী বাবা প্রেত সহ প্রায়ই ধর্মচক্রের পশ্চাতে আসেন। কি কারণে শংকরানন্দ প্রেতলোকবাসী হয়েছেন তাহা সাক্ষাতে বলবো। সে কথা আপনি শুনলে চমৎকৃত হবেন।" মহাভারতে আছে, রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে মৃত্যুর পরে প্রেত হয়েছিলেন। যখন স্বামী শংকরানন্দ দেহত্যাগ করেন, তখন বেলুড মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীসারদা বা ঠাকুরের কোন বিমুক্ত পার্ষদ বা কোন দেবতাই ছিলেন না। তখন এবং এখনও বেলুড় মঠে যমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত, পাঁচ শতাধিক যমদূত বেলুড় মঠকে যমপুরীতে পরিণত করেছেন।

গত ডিসেম্বর মাসে আমরা চন্দননগর প্রবর্তক সংঘে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমরা তিনজনে দেখলাম, সংঘগুরু

মতিলাল ও তৎপত্নী রাধারাণী উভয়ে পিতৃলোকবাসী হয়েছেন, এবং নিজেকে ভগবান বলে প্রচার করায় মতিলাল রায়কেও নরকভোগ করতে হয়েছিল। চন্দননগর কন্যাকুমারী আশ্রমের মন্দিরে বসে যখন আমরা ভজন শুনছিলাম, তখন ভবানীপুরের স্বর্গগত জীতেন ঠাকুর তথায় সূক্ষ্মদেহে এলেন। ইহার কারণ, উক্ত আশ্রম তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও তৎশিষ্যাগণ তথায় বাস করেন। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী তাঁকে দেখে বললেন, জীতেন ঠাকুর স্বর্গবাসী হয়েছেন। হাওড়ার প্রসিদ্ধ দীক্ষাগুরু ৺বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কোন বৃদ্ধ শিষ্য গত বৎসর ধর্মচক্রে এসেছিলেন। উক্ত শিষ্যের সঙ্গে তদীয় গুরু সূক্ষ্মদেহে আসেন। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী উভয়ে তাঁকে দেখে বুঝলেন, বিজয়কৃষ্ণ পিতৃলোকবাসী। পিতৃলোকবাসী নরনারীগণ মর্ত্যলোকে স্থূলদেহ ধারণার্থ কর্মবশে নামিতে বাধ্য হন।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় স্বর্গলোকের রজোস্তরবাসী ও বিষ্ণুভক্ত এবং শ্রীরাধাই তাঁর ইষ্টদেবী। শিখগুরু নানক স্থূলদেহেই ব্রহ্মবিৎ হন এবং ১৯৬২ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে মাকড়দহে তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দের কাছে কয়েক বার এসেছিলেন ও পাঞ্জাবে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। সন্ত কবীর বিদেহমুক্ত। সাধক কমলাকান্ত দেবীলোকবাসী এবং সাধক রামপ্রসাদ বিদেহ-মুক্ত। কাশীধামের ত্রৈলঙ্গ স্বামী তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংস এবং পৃথ্বীতত্ত্ব ও জলতত্ত্বে সিদ্ধিলাভ করেন। ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সাধনবলে শিবলোকে শিবসান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়েছেন, মুক্তি নেননি। আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী ইষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত সাধক ও তাঁর ইষ্টদেবী ছিলেন সরস্বতী। আদি ব্রাহ্ম সমাজের মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঋষিলোকবাসী ও নিরাকারবাদী। নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের সংস্থাপক কেশবচন্দ্র সেন চরম ইষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্ত ও স্বর্গের সত্ত্বস্তরবাসী শক্তিসাধক। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শাক্ত ভাব শিক্ষা করেন। পাঞ্জাবের স্বামী রামতীর্থ স্বর্গবাসী ও বিষ্ণুভক্ত। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ দীর্ঘকাল প্রেতযোনি ভোগান্তে পিতৃলোকবাসী হয়েছেন। তিনি তাঁর মাতাপিতাকে প্রণাম করাইতে বাধ্য করায় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। মহানির্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যগোপাল স্বর্গের তমোস্তরে আছেন ও জন্মাবেন। আমেরিকার স্বামী যোগানন্দ পরমহংস প্রাণায়াম সাধন করতেন ও মধ্যম ইষ্টসিদ্ধিলাভান্তে স্বর্গের রজোস্তরে আছেন। কাশীধামের কৃষ্ণানন্দ স্বামী স্বর্গবাসী ও হরিদ্বারের ভোলানন্দ গিরি ঋষিলোকবাসী। কাশীধামের যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী ঋষিলোকবাসী। তৎশিষ্যবর শ্রীরামপুরের যুক্তেশ্বর গিরি চরম ইষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত ও স্বর্গের সত্ত্বস্তরবাসী। যুক্তেশ্বর গিরির শিষ্য শ্রীরামপুরনিবাসী মতিলাল ঠাকুর স্বর্গবাসী। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ তারক মঠের প্রতিষ্ঠাতা তপানন্দ স্বামী স্বর্গবাসী হয়েছেন। নরওয়েপ্রবাসী আনন্দাচার্য্য চরম ইষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্ত ও স্বর্গের সত্ত্বস্তরবাসী। তাঁর গুরু শিবনারায়ণ পরমহংস বৈষ্ণব সাধক ছিলেন ও বিদেহ মুক্তি লাভ করেছেন। তিনি বেদান্তসম্মত পরমহংস ছিলেন না বলে বাচনিক মন্ত্রদীক্ষা দিতেন। তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, বেদান্তকেশরী শংকরাচার্য্য ও রামানুজাচার্য্য বিদেহ মুক্তিলাভ করেছেন, কিন্তু দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্য স্থূলদেহেই ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিলেন। আড়াই হাজার বৎসরের ভারতীয় ইতিহাস

পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, অত্যল্প সংখ্যক ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এই ধর্মভূমিতে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই জন্য সারাদেশে ধর্মগ্লানি পুঞ্জীভূত এবং ধর্মের স্বরূপ বিকৃত ও বিলুপ্ত হয়েছে এবং মন্ত্রযোগে এত গলদ ঢুকেছে। ইহার আমূল সংস্কার ব্যতীত প্রকৃত ধর্মীয় সংস্কার হইবে না। আচার্য্য শংকর, রামানুজ, মাধ্ব, নানক, চৈতন্য, শংকরদেব, কবীর, দয়ানন্দ, রামমোহন, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যে ধর্মসংস্কার করেছেন, তাহাতে ধর্মগ্লানি বিদূরিত ও উৎপাটিত হয় নাই। সেই জন্য কল্কিদেব ভগবানের পূর্ণশক্তি নিয়ে মথুরায় ১৩৯২ সালে অবতীর্ণ হবেন।

হালিশহর নিগমানন্দ আশ্রমে গিয়ে মহাগৌরী দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছেন, নিগমানন্দ পরমহংস বিদেহমুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন। ভুবনেশ্বর সারদাধামের মহাতাপস নগেন্দ্রনাথ ওরফে পাবনার নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মৃত্যুর পরে মহর্লোকবাসী হয়েছেন এবং ভুবনেশ্বরের কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী শিবলোকে বাস করছেন। ৪ঠা মার্চ ১৯৬২ রবিবার শিবরাত্রি দিবসে পূর্বাহ্নে তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দের অলংঘ্য আহ্বানে কুলদানন্দ ধর্মচক্রে এলেন ও ভৈরবানন্দকে নমস্কারান্তে বললেন, "আপনাদের কলমের খোঁচায় সাধুসন্তরা, ধর্মগুরুরা উঠবে পড়বে। আমার সম্বন্ধে ঠিক কথা লিখবেন।" নোয়াখালীর রাম ঠাকুর স্বর্গবাসী হয়েছেন ও ধর্মচক্রে একাধিক বার এসেছেন। নবদ্বীপের রামদাস বাবাজী চরম ইষ্টসিদ্ধি লাভ করেছেন ও সিদ্ধ-যোগী ভৈরবানন্দের কাছে জ্ঞানলাভার্থ গিয়েছিলেন। তাঁকে ভৈরবানন্দ বলেছেন, আপনার ইষ্ট বিষ্ণু কল্কিরূপে মথুরায় ১৩৯২ বঙ্গাব্দে বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশীতে জন্মগ্রহণ করবেন। সেই সময় আপনি

জন্ম নিয়ে জ্ঞানলাভ করুন।” বেলুড়ের লালবাবা মৃত্যুর পরে বেলুড় ধর্মচক্রের দক্ষিণে একটি উদ্যানে প্রেতদেহে পাপভোগ করছেন। ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধু ঋষিলোকবাসী হয়েছেন এবং কল্কির সময়ে দেহধারণপূর্বক জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করবেন। বৃন্দাবনের সন্তদাস বাবাজী বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত ও গয়াধামের উদাসী সাধু সিদ্ধবাবা স্থূলদেহেই ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছেন। পণ্ডিচেরীর যুগর্ষি অরবিন্দ বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত ও দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের অন্নদা ঠাকুর স্বর্গবাসী। গোরখপুরের গম্ভীরনাথ স্থূলদেহে চতুর্বিংশতি তত্ত্বভূমি পর্য্যন্ত সাধনান্তে দেহত্যাগ করে বিদেহমুক্ত হয়েছেন। দেওঘরের বালানন্দ ব্রহ্মচারী স্থূলদেহে সপ্তমভূমি পর্যান্ত সাধন পূর্বক বিদেহমুক্তিলাভ করেছেন। মহারাষ্ট্রের সাঁইবাবা স্থূলদেহেই ‘বুড়ি ছুয়েছিলেন’, নির্বিকল্প সমাধিলাভ করেছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংস ভৈরবানন্দের অভ্রান্ত যোগদৃষ্টিতে এই সকল সুগুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অধুনা জীবিত ধর্মগুরুদের অধিকাংশই জ্ঞানচক্ষু বা দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন নাই। সেই জন্যই তাঁরা দীক্ষার্থীবৃন্দের প্রকৃতিগত ইষ্টমন্ত্র নির্বাচনে অসমর্থ। ইহার ফলে ধর্মজগতে ধর্মগ্লানি উপস্থিত হয়েছে ও চরম দুর্নীতি প্রশ্রয় পেয়েছে।

আধুনিক ধর্মসম্প্রদায়সমূহে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস দীক্ষা দানের যে প্রথা প্রচলিত, তাহারও আমূল সংস্কার আশু প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ নামাংকিত আশ্রমসমূহে রামকৃষ্ণ হোমানুষ্ঠানপূর্বক গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষাদানান্তে ব্রহ্মচারী করা হয়। মনে হয়, রামকৃষ্ণ হোমের পরিবর্তে গায়ত্রী হোমানুষ্ঠানপূর্বক গায়ত্রী দীক্ষাদানই কর্তব্য। ইহাই প্রাচীন বৈদিক বিধান। ব্রাহ্মণ কুমারগণের ন্যায় ব্রাহ্মণ-

কুমারীগণেরও উপনয়নপ্রথা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে ধর্মচক্রের মন্দিরে মহাগৌরীর কনিষ্ঠ সহোদর-ত্রয়ের উপনয়নে আমি পৌরোহিত্য করেছিলাম। তখন গায়ত্রী দেবী অগ্নিমূর্তি ধরে হোমকুণ্ডে আবির্ভূত হলেন ও মানবকত্রয় কর্তৃক প্রদত্ত আজ্যসিক্ত বিল্বপত্রের আহুতি নিলেন। যখন তিনটি মানবক হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, তখন মহাগৌরী প্রজ্ঞানেত্রে দেখিলেন, বৈদিক যুগের ব্রহ্মচারীবৃন্দ দিব্যদেহে প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তবে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ে ব্রহ্মচর্য্যদীক্ষার সময় যে দ্বাদশ ব্রত লইতে হয়, সেগুলি অতিশয় শিক্ষাপ্রদ ও যুগোপযোগী। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক ঐ সকল ব্রতমন্ত্র বিরচিত। সন্ন্যাস-গ্রহণের পদ্ধতিও লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। অধুনা অনেক সন্ন্যাসী শাস্ত্রীয় বিধান না মানিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ও সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন। ইহার ফলে চতুরাশ্রমের মোক্ষাদর্শ ধূলিসাৎ হইতেছে। মহাভারতের শান্তিপর্বোক্ত মোক্ষধর্ম ও গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়োক্ত মোক্ষযোগ পাঠে জানা যায়, মোক্ষলাভ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিই সনাতন হিন্দুধর্মের মূল লক্ষ্য ও ভিত্তি এবং মোক্ষসাধনা বা ব্রহ্মযোগ সাধনই সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসাদর্শ। সুতরাং চতুর্থ আশ্রম গ্রহণের পদ্ধতি মোক্ষশাস্ত্র অনুসারে বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী কৃত 'যতিধর্মসংগ্রহ' গ্রন্থে বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণের মূলবিধি লিপি-বদ্ধ। আত্মশ্রাদ্ধ ও বিরজাহোম অনুষ্ঠানান্তে বৈদিক সন্ন্যাস লইতে হয়। আত্মশ্রাদ্ধের পদ্ধতি আধুনিক পুরোহিতগণও অবগত নহেন। অধুনা প্রসিদ্ধ পুরোহিতগণও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধান্তে আত্মশ্রাদ্ধের বিধান করেন। অত্রি ও শৌনকাদি ঋষিমতে দৈব-

শ্রাদ্ধ, ঋষিশ্রাদ্ধ, দিব্যশ্রাদ্ধ, মানুষ্য শ্রাদ্ধ, পিতৃশ্রাদ্ধ, ভূতশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ ও আত্মশ্রাদ্ধ এই অষ্টশ্রাদ্ধ নান্দীমুখ বিধানে অনুষ্ঠেয়। দৈব শ্রাদ্ধে অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্যকে শ্রাদ্ধ দিতে হয়। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশ ঋষি আর্য শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধাঞ্জলি পান। হিরণ্যগর্ভ ও বৈরাজপতি দিব্যশ্রাদ্ধের দুই দেবতা। সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুর, বড়ু ও পঞ্চশিখ মনুষ্যশ্রাদ্ধের সপ্ত দেবতা। পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূত ভূতশ্রাদ্ধের দেবতা। কাব্যবাহন, সোম অর্যমা, অগ্নিষ্বাত্তা, বর্হিষদ ও সোমপা—পিতৃ-শ্রাদ্ধের ছয় দেবতা। গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা ও স্বাহা—মাতৃশ্রাদ্ধের দশ দেবতা এবং আত্মশ্রাদ্ধের দেবতা পরমাত্মা। উল্লিখিত অষ্টশ্রাদ্ধ অধুনা শাস্ত্রবিধি অনুসারে কোথাও অনুষ্ঠিত হয় কি? আত্মশ্রাদ্ধে আত্মপিণ্ড ভগবান বিষ্ণুর হাতে দিয়ে প্রার্থনা করতে হয়, "হে ভগবান, তুমি আমার পুত্রতুল্য। আমি নির্জন প্রান্তরে, পাহাড়ে বা জঙ্গলে কোথায় পড়ে মরব জানি না। আমি আত্মপিণ্ড তোমার হাতে জমা দিলাম। আমি মরলে তুমি ঐ পিণ্ড দিও।" যদি শাস্ত্রবিধি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে নিশ্চয় শ্রীবিষ্ণু আত্মপিণ্ড গ্রহণ করেন এবং পুত্রবৎ মুমুক্ষু সন্ন্যাসীর সঙ্গে সর্বদা বিহার করেন। দুই বর্ষ পূর্বে ধর্মচক্রে আমি দ্বিতীয় বার আত্মশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানকালে স্বচক্ষে দেখেছি, শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং শ্রাদ্ধস্থলে এসে দাঁড়ালেন ও আমার আত্মপিণ্ড স্বহস্তে নিলেন। আমি তৎসমক্ষে মাতৃপিণ্ড, পিতৃপিণ্ড প্রদানের ফলে আমার মাতা-পিতা উর্দ্ধগামী হলেন। ১৯৬০ সালে

কালীপূজায় মহাগৌরী আত্মশ্রাদ্ধ ও বিরজাহোম অনুষ্ঠানান্তে ধর্মচক্রে বৈদিক সন্ন্যাস নিলেন। পরদিন দেখা গেল, শ্রীবিষ্ণু গোপাল মূর্তিতে আত্মপিণ্ডটি হাতে নিয়ে মহাগৌরীকে দেখালেন। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত সন্ন্যাসবিধি চতুর্যুগেই যথার্থ ও সর্বদা পালনীয়। বেলুড় মঠে যে বিরজাহোম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে পঞ্চ মেধামন্ত্র, পঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্র ও ত্রিসুপর্ণ মন্ত্র উচ্চারণান্তে বিরজা হোমে একষট্টিটি আজ্যসিক্ত বিল্বপত্র আহুতি দিতে হয়। মনে হয়, সাজ্য বিল্বপত্রাহুতি তান্ত্রিক বিধি, বৈদিক বিধান নয়। ইহার কারণ, মহাগৌরী যখন বিরজা হোমে আহুতি দিলেন, তখন অত্রি, ভৃগু, বিশ্বামিত্রাদি ব্রহ্মর্ষিবৃন্দ দিব্যদেহে আবির্ভূত হয়ে ব্রহ্মাগ্নিতে কাঠের হাতায় শুধু আজ্যাহুতি দিলেন। অতএব, বিল্বপত্রের পরিবর্তে তিল, ধুনা, কর্পূর, গুগ্‌গুলাদি গব্য ঘৃতে মিশিয়ে আহুতি প্রদানই কর্তব্য। আজ্ঞাচক্রের উপরে মন উঠিলে, ব্রহ্মমার্গের সাধন আরম্ভ হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ কর্তব্য। অকালে বৈদিক সন্ন্যাস লইলে পতন নিশ্চিত ও পতিত সন্ন্যাসী অধোগামী হয়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, সন্ন্যাসী কৃপানন্দ চতুর্থ আশ্রম থেকে অধঃপতিত হওয়ায় কুকুরযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন। পতিত সন্ন্যাসী কিরূপে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, তাহার আর একটি যথার্থ দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমার বাল্যবন্ধু স্বামী মৈথিল্যানন্দ বেলুড় মঠের প্রাচীন পণ্ডিত সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি বেলুড় মঠ ত্যাগের পর বারাসতে কিছু কাল বাস করেন এবং সেখান থেকে কাঁথি সহরে গিয়ে স্বগৃহেই দেহরক্ষা করেন। দেহত্যাগের পর তিনি নগ্ন ও কুৎসিৎ প্রেতমূর্তিতে ধর্মচক্রে আসেন একটি নারীপ্রেত সহ এবং পূর্বপরিচিত ভৈরবানন্দের নিকট ঊর্ধ্বগতির

জন্য কাতর প্রার্থনা জানান। স্বামী ভৈরবানন্দ তাঁহাকে তদীয় গুরুস্থানে বেলুড় মঠে যমকিংকর সহায়ে প্রেরণ করেন। মনে রাখিতে হইবে, তান্ত্রিক সন্ন্যাস, বৈষ্ণব সন্ন্যাস, উদাসী সন্ন্যাস, বৌদ্ধ সন্ন্যাস, জৈন সন্ন্যাস, খ্রীষ্টান সন্ন্যাস, মুসলমান সন্ন্যাস, ইহুদি সন্ন্যাস, প্রভৃতি অপেক্ষা বৈদিক সন্ন্যাস প্রাচীনতর ও প্রকৃষ্টতর। তান্ত্রিক সন্ন্যাসের ব্রহ্মমন্ত্র 'ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম' আর বৈদিক সন্ন্যাসের মহাবাক্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই দুই মন্ত্রের অর্থগত পার্থক্য বিপুল। আর বৈদিক সন্ন্যাসের প্রেষমন্ত্র গায়ত্রীমন্ত্রের পরিপূরক। এইজন্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পর গায়ত্রীসিদ্ধিলাভান্তে বৈদিক সন্ন্যাস লইতে হয়। ইহা ব্রহ্মোপাসনার চরম পরিণতি। এই হেতু মন্ত্রদীক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা ও সন্ন্যাস দীক্ষা—এই ত্রিবিধ দীক্ষার আমূল সংস্কার না করিলে আধুনিক ধর্মগ্লানি দূরীভূত হইবে না। আলোচ্য বিষয়ে চিন্তাশীল সাধুবৃন্দ ও ভক্তগণের ঐকান্তিক মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

এই কৈফিয়ৎ লেখার সময় নানা দৈব বিঘ্নে আমি বিপর্য্যস্ত হই। ইহাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে খণ্ডশক্তিরূপে প্রমাণ করায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মৎপ্রতি অতিরুষ্ট হন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ধর্মচক্রে প্রতিমায় কার্তিক-কৌমারী মহাপূজা হয়। তখন সন্ন্যাসিনী শিবপ্রিয়া মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় রাত্রিকালে সুনিদ্রিত ছিলেন। পাশে উত্তর দিকের পর্দা প্যারাপেটের বাহিরে ফেলা ছিল। গভীর রজনী নিস্তব্ধ, নির্বাত, নীরব নীঝুম। হঠাৎ একটা দমকা বায়ু উঠে পূর্বোক্ত পর্দা ঠেলে, প্যারাপেটে হেলান ক্যাম্প খাটকে ধাক্কা মেরে সুনিদ্রিতা শিবপ্রিয়ার সশব্দে উপরে ফেলিল! ইষ্ট দেবীর

ইচ্ছায় শিবপ্রিয়া ক্ষণকাল পূর্বেই পাশ ফিরে শুয়েছিলেন বলে ভারী ক্যাম্প খাট শিবপ্রিয়ার উপরে পড়িল না। ঈষ্টকৃপায় তার প্রাণরক্ষা হইল। যদি ক্যাম্প খাট শিবপ্রিয়ার উপরে পড়িত, তিনি অত্যন্ত আহত বা নিহত হইতেন! একতলায় শায়িত যোগিরাজ ভৈরবানন্দকে এই ঘটনা আমি বলায় তিনি যোগবলে ব্রহ্মময়ীর নিকট জেনে বললেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এই উপদ্রব ও অনিষ্টপাত করছেন। আপনি 'কৈফিয়তে' শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব অপ্রমাণ করার জন্য তিনি রুষ্ট হয়ে আপানার অনিষ্ট সাধনে অগ্রসর হয়েছেন।" পরবর্তী ঘটনাদ্বয় দ্বারা এই ভবিষ্যৎবাণী নিঃসংশয়ে সমর্থিত হয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষার্ধে কোন বৈকালে রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী এসে আমার ডান চক্ষু তীরবিদ্ধ করে আমাকে অন্ধ করতে প্রয়াসী হন, কারণ বহু বর্ষ পূর্বে আমার বাম চক্ষু দৃষ্টিহীন হয়েছিল। ঐ বিপদকালে ইষ্টদেবী কৃপাপূর্বক আমাকে রক্ষা করেন ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের তীক্ষ্ণ তীর দৈববলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় আমার ডান চক্ষুর উপর দিয়া চলিয়া যায়।

—চার—

২২শে ডিসেম্বর শুক্রবার আমি, ভৈরবানন্দ, মহাগৌরী প্রভৃতি বোম্বাই এক্সপ্রেসে ঝাড়গ্রাম যাইতেছিলাম। তখন রামকৃষ্ণানন্দজী আড়ালে ঐ ট্রেনের পশ্চাদনুসরণপূর্ব্বক আমাকে আহত ও নিহত করিতে সচেষ্ট হন। তখন কালভৈরব তাঁহাকে শূলবিদ্ধ করেন ও

তিনি রূপনারায়ণ নদীতীরে কোলাঘাট ব্রীজের দক্ষিণে বিল্ববৃক্ষতলে ভূপতিত হন। নয় দিন যাবৎ তিনি শূলবিদ্ধ অবস্থায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেন। ঝাড়গ্রাম থেকে পাঁচ দিন পরে ২৭শে বুধবার ফিরে আমরা কোলাঘাট হতে নৌকাযোগে রূপনারায়ণ নদীবক্ষে গোপীগঞ্জ যাইতেছিলাম। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শূল-বিদ্ধ হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা আমাদের প্রতি এত রুষ্ট ক্রুদ্ধ হন যে, নদীবক্ষে আমাদের নৌকা জলমগ্ন করিতে প্রাণপণ প্রয়াস করেন। তখন শিব, কালী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি দেবতাগণের অসীম করুণায় ও নিরন্তর সাহচার্য্যে কোনরকমে আমাদের প্রাণরক্ষা হয়। ৩০শে শনিবার বৈকালে আমরা গোপীগঞ্জ থেকে পুনরায় কোলাঘাটে আসি। তখন মহামায়ার অলংঘ্য নির্দেশে কালভৈরব রামকৃষ্ণানন্দকে শূলমুক্ত করেন; কিন্তু শূলাঘাতে তাঁহার দেহস্থিত সূর্য্যমণ্ডল ভাঙ্গিয়া দেন। সূর্য্যমণ্ডল মণিপুর ও অনাহত চক্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী। ইহার ফলে বিদেহমুক্ত রামকৃষ্ণানন্দ মর্ত্যলোকে নামিয়া আর উপদ্রব করিতে পারিবেন না। তিনি স্বর্গলোক পর্য্যন্ত নামিতে পারিবেন; কিন্তু মর্ত্যলোকে তাঁহার অবতরণ চিরতরে নিষিদ্ধ হইল! আর কোন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানচক্ষুষ্মান সাধক বা সাধিকা তাঁহাকে মর্ত্যলোকে পূজাস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদবৃন্দের সঙ্গে দেখিতে পাইবেন না। যদি কাহারও প্রজ্ঞানেত্র খুলিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি এই ঘটনার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পূর্বোক্ত প্রকার অশাস্ত্রীয়, অধর্মীয়, অনুচিত আচরণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় গুরুভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গ ত্যাগ করে সুপ্রাচীন ঋষিসঙ্ঘে পুনরায় যোগদান করেছেন। আর তিনি তদীয় গুরুভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে মর্ত্যলোকের মন্দিরাদিতে, পূজাস্থলে

আসেন না, ঋষিবৃন্দের সঙ্গেই নামেন। অন্ততঃ ইহা আমরা আমাদের ধর্মচক্রে বহু বার প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের ধর্মচক্রকে তৎস্মৃতিপূত করার উদ্দেশ্যে তিন বর্ষ পূর্বে ধর্মচক্রের নবনির্মিত নাটমন্দিরের নাম দিয়েছি 'বিবেকানন্দ নাটমন্দির।' এই কৈফিয়ৎ রচনা ও প্রকাশের জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা তদীয় পার্ষদ-বৃন্দ সহ বিগত ডিসেম্বরে ১৯৬১ মধ্যভাগে বেলুড় ধর্মচক্র ত্যাগ করে চলে গেছেন, কিন্তু যতিরাজ বেদতনু মূর্তমহেশ্বর বিবেকানন্দ তাঁর শততম জন্মতিথির সময় কয়েক দিবস একক আমাদের মন্দিরে এসে পূজাদি নিয়েছেন। আলোচ্য প্রসঙ্গে ইহা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা তদীয় পার্ষদবৃন্দ সহ একবর্ষাধিক কাল ধর্মচক্র ছেড়ে বেলুড় মঠে ছিলেন এবং পরবর্তী বৎসর পুনরায় ধর্মচক্রে আসেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের প্রথমার্ধে এই কৈফিয়তের খসড়া লেখার সময় ভগবান কল্কিদেব ছদ্মবেশে হস্তস্থিত তরোয়াল পিছনে লুকিয়ে রেখে অদূরে বসে আমাকে রক্ষা করতেন এবং অন্য দিকে কালভৈরব পাহারা দিতেন, যাতে কোন দুরভিসন্ধিসম্পন্ন সূক্ষ্মদেহী এসে আমার অনিষ্ট করতে না পারেন। তেসরা এপ্রিল মঙ্গলবার প্রাতে ৭॥ টা থেকে ৯॥টা পর্য্যন্ত আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় বসে এই কৈফিয়তের প্রুফ দেখিতেছিলাম। মহাগৌরী আমার শয্যায় ও আমি একটী টুলে বসেছিলাম। তখন ভগবান কল্কিদেব এসে আমার শয্যায় পূর্ণ মূর্তিতে বিরাজ করলেন। ঐ সময় তাঁর হাতে তলোয়ার বা সঙ্গে অশ্ববাহন ছিল না। আমরা যতক্ষণ প্রুফ দেখিলাম, ততক্ষণ তিনি বিরাজ করলেন। তাই আমরা উভয়ে

এতক্ষণ একমনে প্রুফ দেখিতে পারিলাম। কল্কির করুণা ও প্রেরণা ব্যতীত এই কৈফিয়ৎ রচনা ও প্রকাশ সম্ভব হত না বলে ইহার নাম 'কল্কির কৈফিয়ৎ' রাখিয়াছি। ৫ই মার্চ শুক্রবার পূর্বাহ্নে আমরা যখন এই কৈফিয়তের খসড়া সম্যক্ শোধন করিতেছিলাম, তখন পার্শ্বস্থ টেবিলের উপরে ব্যাসদেব অলক্ষ্যে বসে আমাকে প্রচুর প্রেরণা দিলেন।

এই ক্ষুদ্র কৈফিয়ৎ লিখিতে দীর্ঘ ছয় মাস লাগিয়াছে। আমি ও ভৈরবানন্দ উভয়ে গভীর ভাবে আলোচ্য বিষয় চিন্তা করেছি এবং উহার প্রকাশার্থ জগন্মাতার অনুমতি নিয়েছি। প্রধানতঃ ইহাতে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সমালোচনা থাকায় শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যবৃন্দ উহা প্রকাশ করিতে আপত্তি জানান। পূ: ঘোষ, শম্ভু মল্লিক, মহেন্দ্র গুপ্ত, সুরেশ দত্ত ও বিভা সেন কিরূপে তাঁহাদের আপত্তি জানান, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতেছি। ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি দশটায় আহারান্তে আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিত নয়নে দেখলাম, একটী সূক্ষ্মদেহী এসে আমার বিছানায় বসলেন—বেশ মোটা চেহারা, বড় মাথা ও ছোট গোঁফ, গায় সাদা জামা-কাপড়। ইনি স্বর্গবাসী শম্ভু মল্লিক, ঠাকুর রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় রসদ্দার। ইনি আমাকে বলতে এসেছিলেন, "তুমি ঠাকুরকে এত কাল ভক্তিশ্রদ্ধা করে এখন এত হেয় প্রতিপন্ন করছ কেন? তোমার গুরুরা যাঁকে ভগবান বলে প্রচার করেছেন, তাঁকে তোমার কৈফিয়তে এত ছোট কর না।" ২৭শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সকালে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে চা খেতেছিলাম। তখন একটী গৌরবর্ণ সূক্ষ্মদেহী এসে আমাদের সম্মুখে দাঁড়ালেন—বেশ বুড়ো, মাথায় লম্বা চুল, সাদা

কাপড় পরা, মধ্যম চেহারা। তিনি হাত নেড়ে আমাকে কিছু বললেন ও প্রায় দুই মিনিট থেকে চলে গেলেন। পরে দেখা গেল, মা কালী তাঁর সামনে ছিলেন। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য সুরেশ দত্ত, যাঁকে ঠাকুর দেহরক্ষীর পর গঙ্গা থেকে উঠে দীক্ষা দিয়েছিলেন ও যিনি ঠাকুরের সহস্র উপদেশ সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করেছিলেন। এঁর ইষ্ট-কালী। ইনি বলতে এসেছিলেন, ঠাকুরকে এত ছোট প্রতিপন্ন করো না তোমার কৈফিয়তে। উক্ত দিন মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বেলা একটার সময় আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিত নয়নে দেখলাম, একটী সুক্ষ্মদেহী স্বপত্নী সহ এসে আমার খাটের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। পুরুষটী সাদা কাপড় পরা ও গায় সাদা চাদর, মাথায় লম্বা চুল, মুখে ছোট গোঁফ ও স্বপত্নীর মাথায় ঘোমটা, মুখটী সুন্দর ও সাদা শাড়ী পরা। উভয়ে গৌরবর্ণ সুদর্শন। এঁদের কথা মহাগৌরীকে ডাক দিয়ে বলায় মহাগৌরী ইহাদিগকে ডাকলেন। তখন তাঁরা উত্তর বারান্দায় গিয়ে মহাগৌরীর খাটের কাছে দাঁড়ালেন ও এক মিনিট পরে চলে গেলেন। ইনি 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও তৎপত্নী নিকুঞ্জ। শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত এসে অনুনয়ের সুরে বললেন, "ঠাকুরের এত সম্মান অন্যায়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও তাহা তোমার কৈফিয়তে ধূলিসাৎ করো না। মহেন্দ্রনাথ ও সুরেশ দত্ত উভয়ে স্বর্গবাসী। ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ বুধবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বৈকাল দেড়টায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিত নয়নে আমি দেখলাম, একটী সূক্ষ্মদেহী নারীমূর্তি এসে আমার শয্যায় চেয়ারে বসলেন—সাদা শাড়ী পরা, গায় গরম কাল লম্বা কোট। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষিতা শিষ্যা বিভা সেন, স্বর্গবাসিনী

ও কেশব সেনের সহধর্মিণী। ইনি আমাকে বলতে এসেছিলেন, "আমার গুরুকে এতকাল ইষ্টজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করার পর এখন আপনি তাঁকে আপনার কৈফিয়তে এত অসম্মান করবেন না।"

১লা মার্চ ১৯৬২ বৃহস্পতিবার বেলা বারটায় আমি একতলায় পশ্চিম বারান্দায় খেতে বসেছি। আমার খাওয়া শেষ হয়ে এল। এমন সময় আমার ইষ্টদেবী ডান হাতে এক হাত লম্বা একটী শ্বেত দণ্ড নিয়ে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন ও আমাকে দেখালেন। উহা দুই তিনটী শ্বেত গ্রন্থিযুক্ত। তখন মহাগৌরী তথায় ছিলেন ও ঐ দণ্ড দেখলেন। কয়েক দিবস যাবৎ ঐ অভয় দণ্ড ইষ্টদেবী আমাকে দেখাচ্ছেন। পরেও বহুবার উক্ত দণ্ড দেখেছি। ঐ দণ্ড ইষ্টদেবী হাতে মুঠো করে ধরেছিলেন। উক্ত দণ্ডের দুই দিক ও দুই গ্রন্থি আছে। ইষ্টদেবী আমাকে ঐ অভয় দণ্ড মাকে দেখিয়ে বলছেন, "সূক্ষ্ম জগতে সাড়া পড়েছে। যারা সূক্ষ্ম জগৎ থেকে তোমার কাছে আসছে, তাদের প্রতি বেশী শ্রদ্ধাপ্রীতি দেখিও না। দৃঢ় হও; কারণ এরা কেউ তোমার বন্ধু নয়; দাঁতে কুটো; কিন্তু বগলে ইট লুকিয়ে রেখেছে। তুমি অসাবধান হলেই তোমাকে মারবে। এই স্থূল জগতেও যখন তোমার কৈফিয়ৎ প্রচারিত হবে, তখন স্বার্থান্ধ লোকে ডাণ্ডা নিয়ে তোমাকে মারতে আসবে। আমি তোমার সঙ্গে ছায়ার মত আছি। ভয় নেই; মাভৈঃ।" জগদম্বার অভয় দণ্ড দেখে ও অভয় বাণী শুনে আমিও অভীঃপ্রাপ্ত হয়েছি ও নির্ভয়ে এই কৈফিয়ৎ ও চ্যালেঞ্জ প্রচার করছি।

দেবপিতা মহর্ষি কশ্যপ মন্ত্রোদ্ধার বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার নিকট মন্ত্রদ্রষ্টা ভৈরবানন্দ ঐ বিলুপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষা করেন।

এই কৈফিয়তে যে সকল সিদ্ধমন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায় ভৈরবানন্দ কর্তৃক সমাহিত অবস্থায় আবিষ্কৃত। অষ্টশক্তি বা অষ্টমাতৃকার পূজা শারদীয়া বা বাসন্তী দুর্গাপূজার অঙ্গীভূত। ১৬ই নভেম্বর ১৯৬১ কার্তিক সংক্রান্তির প্রাতঃকালে স্বামী ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রের মন্দিরে বসিয়া নিম্নলিখিত অষ্টশক্তির বীজমন্ত্র আমাকে প্রদান করেন। কৌমারী—ওঁ কীং কৌমারীদেব্যৈ নমঃ। ব্রহ্মাণী—ওঁ বৌং ব্রহ্মাণীদেব্যৈ নমঃ। বৈষ্ণবী—ওঁ বীং বৈষ্ণবীদেব্যৈ নমঃ। বারাহী—ওঁ বাং বারাহীদেব্যৈ নমঃ। নারসিংহী—ওঁ নাং নারসিংহীদেব্যৈ নমঃ। মাহেশ্বরী—ওঁ মাং মাহেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ। ইন্দ্রাণী—ওঁ ইং ইন্দ্রাণীদেব্যৈ নমঃ। চামুণ্ডা—ওঁ হ্রীং চৌং চামুণ্ডা দেব্যৈ নমঃ। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কামধেনু প্রভৃতি দেবতার পূজা বাৎসরিক মহাপূজায় অবশ্য কর্তব্য। ইন্দ্রের বীজমন্ত্র—ওঁ ইং ইন্দ্রদেবায় নমঃ। ব্রহ্মার বীজমন্ত্র—ওঁ ব্রৌং ব্রহ্মণে নমঃ। কামধেনুর বীজমন্ত্র—ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং কামধেনুদেব্যৈ নমঃ অথবা সবলাদেব্যৈঃ নমঃ। এই মন্ত্রের অর্থ, কামধেনু সর্বসম্পদদায়িনী। বিদ্যাও একটি সম্পদ বলে বিদ্যা-বীজ, ধনবীজ ও কামবীজ এই তিন ভোগবীজ দ্বারা এই মন্ত্র নির্মিত। প্রাত্যহিক শিবপূজায় গৌরীপূজা করিতে হয়। গৌরীদেবীর বীজমন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং গৌরীদেব্যৈ নমঃ। আধুনিক মন্ত্র শাস্ত্র নানা স্থানে বিকৃত ও প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় বিশুদ্ধ বীজমন্ত্র কোথাও পাওয়া যায় না এই সকল অশুদ্ধ মন্ত্র দ্বারা দেবপূজা হয় বলিয়া বিপুল সমারোহ সত্ত্বেও কোথাও কোন পূজায় দেবতা আসেন না বা কোন মন্দিরে দেবতা থাকেন না। সেই জন্য আমরা বিশুদ্ধ বীজমন্ত্র ও সিদ্ধ ইষ্টমন্ত্র উদ্ধারে ও প্রচারে প্রয়াসী হয়েছি।

বর্তমান হিন্দু ভারতে এই বারটী ধর্মগ্লানি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে—(১) অধুনা নারী, বৈশ্য, ও শূদ্র, এমনকি ব্রাহ্মণীকেও প্রণব সহযোগে ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয় না। (২) ইষ্টমন্ত্র নির্বাচন প্রকৃতিগত বা সংস্কারসম্মত হয় না, সম্প্রদায়সম্মত হয়। প্রকৃতিগত ইষ্টমূর্তির আরাধনা ব্যতীত জৈব প্রকৃতি জয় হয় না। (৩) মন্ত্রচৈতন্য করে দীক্ষাদান হয় না। মন্ত্রচৈতন্য ব্যতীত মন্ত্রশক্তি প্রকটিত হয় না, অন্তর্দেবতা জাগ্রত হন না। (৪-৬) রামকৃষ্ণ মন্ত্র, সারদা মন্ত্র ও চৈতন্যমন্ত্রে স্ব স্ব ইষ্টবীজ এবং প্রণব থাকিলেও ঐগুলি মিথ্যা মন্ত্র। (৭) ঠাকুর সীতারাম দাস ও শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলছেন, "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—ইহাই মহামন্ত্র, মোক্ষমন্ত্র; কিন্তু তাহা সত্য নহে। (৮) গৃহস্থ তান্ত্রিক গুরু ইষ্টনাম ও প্রণববিহীন শুধু বীজমন্ত্রে দীক্ষা দেন। ইহাও অকল্যাণকর। হ্রীং তান্ত্রিক প্রণব ও মোক্ষবীজ। উহার সহিত বৈদিক প্রণব ও ইষ্টনাম সংযুক্ত না হলে জপ ব্যর্থ হয়। (৯) শ্রীমৎ বালক ব্রহ্মচারী এই মন্ত্রে দীক্ষা দেন—হরি ওঁ তৎসৎ। ইহা ভ্রষ্ট মন্ত্র। (১০) কোন কোন সম্প্রদায়ে শূদ্র, নারী ও বৈশ্যাদিকে প্রণব পরিবর্তে 'নমো' সহ যে মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হয়, তাহাও অসিদ্ধ। (১১) আবার ব্রাহ্মণ দীক্ষার্থীকে প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ে বা বৈষ্ণব সমাজে দিলেও তাহা নিষ্ফল। ইহার কারণ যে দেবতার যে বীজ তাহা ঐ সব মন্ত্রে তন্নাম সংযুক্ত হয় না। (১২) পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্রে প্রণব পরিবর্তে নমো যোগ করে দীক্ষাদান অবিধেয়। শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে প্রণব উচ্চারণের অধিকার যজমানের না থাকায় ঐ সকল

বিফল হয়। ইহার ফলে প্রতি গৃহ প্রেতপুরীতে পরিণত হয়েছে, প্রতি গৃহে বহু বাস্তু প্রেতস্পর্শে গৃহে গৃহে অসুখ ও অশান্তির আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য পরলোকগত নর-নারীগণের প্রেতত্বমোচন ও নরকমোচন এবং পিতৃলোক-বাসীগণের স্বর্গপ্রাপ্তি। আধুনিক শ্রাদ্ধক্রিয়ার দ্বারা এই উদ্দেশ্য আদৌ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেরও আমূল সংস্কার করিতে হইবে। মাকড়দহ, বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে প্রেতোদ্ধারের সংকল্পপূর্বক চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীহোমাদি দ্বারা আমি অপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছি।

মহারাজা পরীক্ষিতের মৃত্যুর পরে তাঁর শ্রাদ্ধ সময়ে ব্যাসদেব ও রাজা জনমেজয় শূদ্রাদি চারি বর্ণ ও নারীকে সর্বধর্মানুষ্ঠানে ও প্রণবোচ্চারণে অধিকার দেন। ব্যাসদেব ও জনমেজয় তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজকে পরীক্ষিতের প্রেতাত্মার প্রেতত্ব মোচনার্থ শ্রাদ্ধক্রিয়া করতে অনুরোধ জানান, কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা করেন নি। তক্ষক দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হওয়ায় তিনি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হন। তখন ব্যাসদেব ও জনমেজয় উভয়ে নৈমিষারণ্যবাসী রুদ্রনারায়ণের শরণাপন্ন হন। ঋষি রুদ্রনারায়ণ চতুর্বেদ ও সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও বিদেহমুক্তির সাধক ছিলেন। জনমেজয় ও ব্যাসদেবের অনুরোধে রুদ্রনারায়ণ প্রথমে অসম্মত হয়েবলেন, "এই শ্রাদ্ধক্রিয়ায় আমি পৌরোহিত্য করলে আমিত পতিত হবোই, আমার বংশধরগণকেও ব্রাহ্মণ সমাজ পতিত করে রাখবে। তাহলে আমার বংশধরগণের জীবিকা কি করে চলবে?" তখন জনমেজয় রুদ্রনারায়ণের পদধারণ করে বললেন "আপনি আমার পৌরোহিত্য

গ্রহণ করুন। আজ থেকে আমার সাম্রাজ্যে ঘোষণা করিব, আপনি ও আপনার বংশধরগণ ব্যতীত কেহই শ্রাদ্ধাদি ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ করতে পারবে না।" ইহাতে রুদ্রনারায়ণ জনমেজয়ের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন। সেই সময় ব্যাসদেব ও জনমেজয় শূদ্রাদি চারিবর্ণ ও নারীগণকে সর্বধর্মকর্মে ও প্রণবোচ্চারণে অধিকার দেন। কলিযুগের দ্বিতীয় পাদে গৌড়বাসী চৈতন্যচরণ ভট্টশর্মা রাজা ভীমবিক্রমের সাহায্যে পুনরায় শূদ্রাদি নিম্নবর্ণ ও নারীগণকে বংশস্বার্থ রক্ষার্থ প্রণবোচ্চারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন।

শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী প্রণীত 'দশমহাবিদ্যা কে?' নামক পুস্তিকাতে কয়েকটি মহাবিদ্যার ধ্যানও বীজমন্ত্র প্রদত্ত। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, কমলা ও মাতঙ্গী—এই দশ শক্তি ব্রহ্মশক্তির দশ মূর্তি। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি শক্তির যে বীজমন্ত্র তিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলি অসিদ্ধ অশুদ্ধ মন্ত্র। বীজমন্ত্র কাহাকে বলে? যে মন্ত্র জপ করিলে দেবতার দর্শন লাভ হয়, জীবাত্মা বা কুলকুণ্ডলিনী হৃৎপদ্ম থেকে সহস্রদল মহাপদ্মে উঠে, তাহাকে বীজমন্ত্র বলে। আমাদের মানব শরীর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, এই পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে তাহাই আছে। মানব শরীরস্থ সহস্রদল মহাপদ্মের নিম্নে অবস্থিত দ্বাদশদল পদ্মের উপরে জ্যোতিঃ স্থানের উপরে যে ত্রিকোণ যন্ত্র আছে, যাহা কোটী কোটী সূর্য্যজ্যোতিঃসম্পন্ন—তাহাকেই মহামায়ামার্গ বা শক্তিমার্গ বলে। এই শক্তিময়ী দেবীদের বীজমন্ত্রাবলীর জপরূপ ধ্বনি ও বায়ু পূর্বোক্ত ত্রিকোণ যন্ত্র পর্য্যন্ত উঠা দরকার। ইহার কারণ, চণ্ডীপাঠ, মন্ত্র জপাদির উদ্দেশ্য যোগদ্বার বা সুষুম্না নাড়ীর মুখ খোলা ও

সুষুম্নায় প্রাণবায়ুর প্রবেশ। দশবিধ শক্তিমন্ত্র জপফলে সুষুম্নার নিম্নমুখ খুলিয়া যায় ও প্রাণবায়ু উল্লিখিত ত্রিকোণ যন্ত্র পর্য্যন্ত উঠে। মহামায়া কালী প্রভৃতি দশবিধ মহাবিদ্যারূপে বিশ্বপ্রসব ও পালন করছেন। স্থূল মূর্তিতেও মহামায়া মোক্ষদানে অসমর্থা, জ্যোতিঃ-মূর্তিতে তৎসাধনে সমর্থা। যদি সাধক বা সাধিকার কুলকুণ্ডলিনী ঐ জ্যোতিঃস্থানে না উঠে, তাহলে মুক্তি বা জ্ঞান লাভ কিরূপে সম্ভব? পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনই শাক্ত সাধনার উদ্দেশ্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড উভয়ই মোক্ষশাস্ত্র অনুসারে উর্ধমূল ও অধঃশাখ। বৃক্ষমূলে জলসেচন না করিলে কিরূপে ফল-ফুল হইবে? উক্ত মার্গই তন্ত্রোক্ত মূল মার্গ। প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ সাধন সকলকেই করিতে হইবে। মানব শরীরে মূলাধার থেকে অনাহত পদ্মের তলদেশ পর্য্যন্ত তমোগুণের আশ্রয়স্থল। অনাহত পদ্ম থেকে আজ্ঞাচক্রের নিম্ন পর্য্যন্ত রজোগুণের ক্রিয়াভূমি। আজ্ঞাচক্র থেকে সহস্রদল পদ্মের নিম্নে অবস্থিত দ্বাদশদল পদ্মের জ্যোতিঃমার্গ পর্য্যন্ত সত্ত্বগুণের লীলাক্ষেত্র। দশমহাবিদ্যা তত্ত্বাতীতা ও শক্তিময়ী দেবী। তত্ত্বাতীত দেবতাই সাধককে মুক্তিদানে সমর্থ, অন্য দেবতা নহে। মহামায়া মানব দেহে পঞ্চতত্ত্ব ও গুণত্রয়ের পরপারে বিরাজিতা। সাধকের সাধন বায়ু উক্ত ভূমি পর্য্যন্ত উঠিলে সিদ্ধিলাভ হয়। উহাই তন্ত্রোক্ত চতুর্বিংশতি সৃষ্টিমার্গ। মহামায়াই তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যারূপে অভিব্যক্ত। পূর্বোক্ত পুস্তিকার প্রারম্ভে ব্রহ্মচারী নরেন্দ্রনাথ কামনা-সিদ্ধির জন্য দক্ষিণাকালীর এই বীজমন্ত্র দিয়েছেন—ক্রীং ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা। ইহা জপ করিলে দেখা যায়, জপরূপ ধ্বনি ও বায়ু নিম্নগামী হইতেছে, তমোভূমিতে পড়িতেছে। স্বাহা

স্বর্গমন্ত্র বা হোমমন্ত্র। ইহা ইষ্টমন্ত্রের সহিত যুক্ত না হওয়াই উচিত। মন্ত্রযোগসাধনে ভক্তিমার্গই অবলম্বনীয়। ভক্তিমার্গে দাস্যভাব সাধনীয়। সুতরাং মন্ত্রে উক্ত 'স্বাহা'র স্থানে 'নমঃ' হইবে। কোন গুণী ব্যক্তিকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে নমস্কার না করিলে তিনি প্রসন্ন হন না বা আমাদের কামনা পূর্ণ করেন না। প্রকৃত কালীমন্ত্র এইরূপ—ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ নমঃ। ইহা নিষ্ঠাপূর্ব্বক জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু অনাহত পদ্ম থেকে উর্দ্ধগামী হইতেছে, শক্তিমার্গে উঠিতেছে। যাহাদের সুষুম্নার দ্বার খুলিয়াছে, তাহারা উক্ত মন্ত্র জপ করিলে দেখিবেন, জপজাত ধ্বনি ও বায়ু চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ভূমিতে যাইতেছে। যাহাদের সুষুম্নাদ্বার খুলে নাই, তাহাদের জপজাত ধ্বনি ও বায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া বিশুদ্ধ পদ্মে ধাক্কা দিতেছে। ইহাই জপযজ্ঞের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান। যাহারা প্রবৃত্তিপথে বা ভোগমার্গে তান্ত্রিক সাধন করিতে চান, তাঁহারা ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্র জপ করিবেন। আর যাঁহারা নিবৃত্তি-মার্গে বা সত্ত্বগুণপথে সাধনে ইচ্ছুক, তাঁহারা ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ নমঃ মন্ত্রজপ করিবেন। হ্রীং মায়াবীজ, মোক্ষবীজ ও তান্ত্রিক প্রণব। এই দুই মন্ত্র চৈতন্য করিয়া না জপিলে আন্তর দেবতা জাগ্রত হন না।

পূর্বোক্ত পুস্তিকায় এই তারামন্ত্র প্রদত্ত—হ্রীং স্ত্রীং হুং। স্ত্রীং হুং। স্ত্রীং কোন তন্ত্রোক্ত দেবতার বীজ নহে। আসল তারা মন্ত্র এইরূপ—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং তারায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্র ভক্তিভরে জপিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু উর্দ্ধগামী হইতেছে। দশবিধ মহাবিদ্যার সাধন সাধকের প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে হয়। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সাধকের হৃদয়ে তদীয় দেবতা ও দেবতার বক্ষে ইষ্টমন্ত্র দেখা যায়।

উক্ত গ্রন্থে ষোড়শীধ্যানের কিয়দংশ দিলেও বীজমন্ত্র দেন নাই। ষোড়শীর বীজমন্ত্র এইরূপ।—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্রৌং ক্লীং ষোড়শীদেব্যৈ নমঃ। এই মন্ত্র জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু উর্দ্ধগামী হয়। ব্রহ্মচারী মহাশয় ভৈরবীর ধ্যান দিয়েছেন, কিন্তু বীজমন্ত্র দেন নাই। ভৈরবীর বীজমন্ত্র এইরূপ—ওঁ ভৌং ভৈরবীদেব্যৈ নমঃ। তিনি ছিন্নমস্তার ধ্যান ও এই মন্ত্র দিয়েছেন—ঐং শ্রীং ক্লীং হ্রীং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা। ইহাও অশুদ্ধ অসিদ্ধ মন্ত্র, কারণ ইহা জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু নিম্নগামী হয়। ছিন্নমস্তার আসল বীজমন্ত্র—ওঁ ছৌং ছিন্নমস্তাদেব্যৈ নমঃ। উক্ত গ্রন্থে ধূমাবতীর এই মন্ত্র উল্লিখিত—ধূঁ ধূঁ ধুমাবতী স্বাহা। ইহাও অশুদ্ধ ও অসিদ্ধমন্ত্র। ইহা জপিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু নিম্নগামী হইতেছে। ধুমাবতীর আসল বীজমন্ত্র এইরূপ—ওঁ ধৌং ধূমাবতী দেব্যৈ নমঃ। ইহা জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু উর্দ্ধগামী হইতেছে। উক্ত গ্রন্থে এই বগলামন্ত্র উল্লিখিত—ওঁ হ্রীং বগলামুখী সর্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয়, বুদ্ধিং নাশয় নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা। ইহা বগলাদেবীর অভিচার মন্ত্র, গ্রন্থকার ইহা বীজমন্ত্ররূপে চালিয়ে দিয়েছেন। বগলাদেবীর বীজমন্ত্র এইরূপ—ওঁ বৌং বগলাদেব্যৈ নমঃ। শ্যামাচরণ কবিরত্ন প্রণীত 'আহ্নিককৃত্য' গ্রন্থে উল্লিখিত হ্লীং বগলাদেবীর সন্ধ্যামন্ত্র, মোক্ষমন্ত্র নহে। এই সন্ধ্যামন্ত্র জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু রজোগুণের ক্রিয়াভূমি হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করে। যাঁহারা সত্ত্বগুণী, তাঁহারা প্রকৃতি দেবীর রজোগুণকে জয় করার জন্য সন্ধ্যামন্ত্র সাধন করেন। আর যাঁহারা ভোগবাদী, তাঁহারাও প্রকৃতি থেকে

রজোগুণরূপ ভোগাদি কামনা করেন। এই দুই উদ্দেশ্যপূরণে সন্ধ্যামন্ত্রের সাধন হয়। উক্ত গ্রন্থে মাতঙ্গীর যে মন্ত্র উল্লিখিত, তাহাও অশুদ্ধ। তিনি এই মাতঙ্গীমন্ত্র দিয়াছেন—ওঁ হ্রীং ক্লীং হুং মাতঙ্গ্যৈ স্বাহা। ইহা জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু নিম্নগামী হইতেছে। আসল মাতঙ্গীমন্ত্র এইরূপ—ওঁ মৌং মাতঙ্গী দেব্যৈ নমঃ। ইহা জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু ঊর্দ্ধগামী হয়। উক্ত গ্রন্থে এই কমলামন্ত্র উল্লিখিত—ওঁ শ্রীং কমলায়ৈ স্বাহা। ইহা জপ করিলে জপজাতধ্বনি ও বায়ু নিম্নগামী হয় ও তমোগুণে নামে। কমলার আসল বীজমন্ত্র এইরূপ—ওঁ শ্রীং কমলাদেব্যৈ নমঃ। উক্ত গ্রন্থে ভুবনেশ্বরীর বীজমন্ত্র অনুল্লিখিত। ভুবনেশ্বরীর বীজমন্ত্র এইরূপ—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং ভুবনেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ। ইহা জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু শক্তিমার্গে পৌঁছিয়া যায়। এই দশবিধ শক্তিমন্ত্রের মার্গ ও গতি চতুর্বিংশতি সৃষ্টি ভূমি পর্য্যন্ত। চতুর্বিংশতি তত্ত্বভূমি শক্তিমার্গের পূর্ণ স্থান। এই স্তরে না উঠিলে শক্তিমার্গে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। মন্ত্রাদি না জপিয়া ব্যাকুল ভাবে মা মা বলে ডাকিলে জগদম্বা অবশ্যই দর্শন দেন; কিন্তু কলিক্লিষ্ট জীবকুলের সেরূপ বৈরাগ্য হয় না বলেই ইষ্টমন্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই সকল অযোগ্য অসিদ্ধ সাধক দ্বারা মন্ত্রবিদ্যা বিকৃত ও সাধনবিজ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে। মন্ত্রবিদ্যার পুনরুদ্ধার ব্যতীত ধর্মগ্লানি বিদূরিত হবে না। মন্ত্রোদ্ধার না করিলে সদ্ধর্ম সাধন সম্ভব হবে না। হিন্দুধর্মোক্ত জপধ্যানাদি সনাতন অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত। পূর্বোক্ত প্রকারে সাধন বিজ্ঞান বিকৃত হওয়ায় দেশব্যাপী ধর্মগ্লানি সমুপস্থিত। শিব, বিষ্ণু, গণেশ, ব্রহ্মা ও

সূর্য্যাদির ন্যায় কালী আদি দশ দেবীশক্তি যজ্ঞসূত্রধারিণী। শ্যামাচরণ কবিরত্ন প্রণীত 'আহ্নিককৃত্য' এবং অন্য গ্রন্থকারের 'পুরোহিত দর্পণ' প্রভৃতি প্রচলিত পূজাগ্রন্থে জগদ্ধাত্রীর এই মূল মন্ত্র লিখিত— হূং দূং স্বাহা। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, ইহা অভিচার মন্ত্র। আর জগদ্ধাত্রীর বীজমন্ত্র—ওঁ ঐং জগদ্ধাত্রীদেব্যৈ নমঃ এবং দুর্গার বীজমন্ত্র—ওঁ হ্রীং দুর্গাদেব্যৈ নমঃ। জগদ্ধাত্রী শিবের ইষ্টদেবী। স্বাহা মন্ত্রে হোম হয়, কিন্তু পূজা বা জপ হয় না। উদাসী সম্প্রদায়ে পাঞ্জাবী মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্ম সমাজ বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে বাংলা মন্ত্র প্রচলনের বৃথা চেষ্টা করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষাই দেবভাষা। সুতরাং দেবমন্ত্র সংস্কৃতে হওয়াই শাস্ত্রীয় বিধান। পাঞ্জাবী ও বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাষায় মন্ত্ররচনা অনুচিত।

পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন প্রণীত 'আহ্নিক কৃত্য' গ্রন্থে নবগ্রহের ইষ্টদেবতা ও বীজমন্ত্রাদি উল্লিখিত। অত্যন্ত দুঃখের সহিত লিখিতেছি যে, ঐ গ্রন্থোক্ত নবগ্রহমন্ত্র অশুদ্ধ। সুপণ্ডিত শ্যামাচরণ বলেন মাতঙ্গী সূর্য্যের ইষ্টদেবী, কিন্তু তাহা সত্য নহে। বস্তুতঃ মাতঙ্গী সূর্য্যের কুলদেবী ও বিষ্ণুই সূর্য্যের ইষ্টদেব। বিষ্ণুর পালনী-শক্তি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণনেত্রকে সূর্য্য বলা হয়। বিশ্বপালক বিষ্ণুদেবের নির্দেশে গ্রহরাজ সূর্য্য সর্বকর্ম করেন। আবার সূর্য্যগ্রহের সৃষ্টিকর্তাও বিষ্ণু। সেইজন্য বিষ্ণুই সূর্য্যের ইষ্ট। এই নবগ্রহ প্রারব্ধবশে মানবের দেহাঙ্গীভূত হলে তাঁহাদিগকে তৎতৎ বীজমন্ত্র দ্বারা আরাধনা করিতে হয়, নচেৎ তাঁহারা তুষ্ট হন না। আর তাঁদের ইষ্টবীজ জপ করলেও তাঁরা প্রসন্ন হন। তাহলে প্রারব্ধভোগাধীন মানুষকে দ্বিগুণ খাটিতে হয়—গ্রহতুষ্টি

ও গ্রহেষ্ট তুষ্টি তুই কর্ম সাধককে করিতে হয়। আবার শুধু গ্রহমন্ত্র জপ করিলেও রুষ্ট গ্রহ তুষ্ট হন। মণিপুর সর্বমন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র। মানব শরীরের যে যে স্থানে যে যে দেবতা অধিষ্ঠিত, তৎতৎ বীজমন্ত্র মণিপুর হইতে অনাহতে সাধিত হইয়া জপজাত ধ্বনি ও বায়ু সেই সেই স্থানে দেবতার সমীপে উঠিলে সেই দেবতা সন্তুষ্ট হন ও কাম্য ফল পাওয়া যায়। গ্রহতুষ্টির নিমিত্ত শরীরস্থ গ্রহস্থান সর্বাগ্রে জ্ঞাতব্য। গ্রহরাজ রবি হৃৎপদ্ম ও মণিপুর পদ্মের মধ্যবর্তী সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত। রবির নীচে সোম ও সোমের নীচে মঙ্গল অবস্থিত। সোমের বামে বৃহস্পতি, বৃহস্পতির নীচে শুক্র ও শুক্রের নীচে রাহু গ্রহ বিদ্যমান। সোমের দক্ষিণে শনি, শনির নীচে কেতু ও কেতুর নীচে বুধগ্রহ বিদ্যমান। সোমের ইষ্ট সত্ত্বগুণী শিব, মঙ্গলের ইষ্ট বগলা, বুধের ইষ্ট বিষ্ণু, শুক্র ও বৃহস্পতির ইষ্ট শিব, শনির ইষ্ট দক্ষিণা কালী, রাহুর ইষ্ট ছিন্নমস্তা ও কেতুর ইষ্ট কালী। এখন নবগ্রহের বীজমন্ত্র উল্লিখিত হইল। রবিমন্ত্র—ওঁ রৌং রবিগ্রহায় নমঃ। সোমমন্ত্র—ও সৌং সোমগ্রহায় নমঃ। মঙ্গলমন্ত্র—ওঁ মং মঙ্গল গ্রহায় নমঃ। বুধমন্ত্র—ওঁ বৌং বুধগ্রহায় নমঃ। বৃহস্পতিমন্ত্র—ওঁ বাং বৃহস্পতিগ্রহায় নমঃ। শুক্রমন্ত্র—ওঁ শৌং শুক্রগ্রহায় নম। শনিমন্ত্র—ওঁ সাং শনিগ্রহায় নমঃ। রাহুমন্ত্র—ওঁ রাং রাহুগ্রহায় নমঃ। কেতুমন্ত্র—ওঁ কোং কেতুগ্রহায় নমঃ। ১৮ই এপ্রিল বুধবার পূর্বাহ্ণে ১৯৬২ খ্রীঃ ধর্মচক্রের একতলায় বসে সমাধিযোগে এই নবগ্রহ মন্ত্র মন্ত্রদ্রষ্টা ভৈরবানন্দ কর্তৃক আবিষ্কৃত। উক্ত দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে আমি যখন স্বীয় শয্যায় বিশ্রাম করিতেছিলাম, তখন প্রথমে গ্রহরাজ সূর্য্যদেব এবং তৎপরে দেবগুরু বৃহস্পতি কৃপাপূর্বক

মৎসমীপে আসিলেন। সূর্য্যদেব বলিলেন, এই নবগ্রহ মন্ত্র ঠিক ঠিক আবিষ্কৃত হয়েছে। এইগুলি তুমি সযত্নে প্রকাশ করলে ভারতের তথা জগতের প্রভূত মঙ্গল হবে। আর ঋষিগুরু বৃহস্পতি বললেন, "আর দুই সপ্তাহ পরে এই বৈশাখের শেষে তোমার কাছে আমি আসব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

বৈষ্ণব সাধন মার্গে সপ্ত স্তর অবস্থিত। এই সপ্তস্তরে সপ্ত ইষ্টমন্ত্র ও সপ্ত ইষ্টনাম সাধনা করিতে হয়—মাধব, কেশব, বাসুদেব, নারায়ণ, বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও কৃষ্ণ। এই সপ্ত ইষ্ট সপ্ত চক্রে অবস্থিত—মাধব মূলাধারে, কেশব স্বাধিষ্ঠানে, বাসুদেব মণিপুরে, হৃদয়ে নারায়ণ, বিশুদ্ধে বিষ্ণু, আজ্ঞাচক্রে মহাবিষ্ণু, সহস্রদল শুভ্রপদ্মের নিম্নে অবস্থিত দ্বাদশদল পদ্মে কৃষ্ণ। এই সপ্ত ইষ্টমূর্তি বৈষ্ণব প্রকৃতি সম্পন্ন সাধকদের হৃদয়ে দেখা যায়। যার হৃদয়ে মাধব দেখা যায়, তার সাধন মূলাধার চক্র থেকে আরম্ভ হবে, তার পূর্ব জন্মের সাধন নেই বলে প্রথম চক্র থেকে আরম্ভ হবে। যার হৃদয়ে কেশব দৃষ্ট হয়, তার সাধন এই জন্মে স্বাধিষ্ঠান থেকে আরম্ভ হবে ও পূর্ব জন্মে মূলাধার সাধন করা আছে। যার হৃদয়ে বাসুদেব দেখা যায়, এই জন্মে মণিপুর থেকে তার সাধন আরম্ভ হবে ও পূর্বজন্মে স্বাধিষ্ঠান পর্য্যন্ত সাধন করা আছে। যার হৃদয়ে নারায়ণ দেখা যায়, তার সাধন এই জন্মে অনাহত থেকে আরম্ভ হবে ও পূর্বজন্মে মণিপুর পর্য্যন্ত করা আছে। যার হৃদয়ে শংখচক্র গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দেখা যায়, তার সাধন ইহজন্মে বিশুদ্ধ থেকে আরম্ভ হবে ও পূর্বজন্মে অনাহত পর্য্যন্ত সাধন করা আছে। যার হৃদয়ে মহাবিষ্ণু দেখা যায়, তার সাধন ইহজন্মে

আজ্ঞাচক্র থেকে আরম্ভ হবে ও পূর্বজন্মে বিশুদ্ধ পর্য্যন্ত করা আছে। আর যার হৃদয়ে দ্বিভুজ কৃষ্ণমূর্তি দেখা যায়, তার সাধন ইহজন্মে সপ্তম ভূমি থেকে আরম্ভ হবে ও ষষ্ঠ ভূমি পর্য্যন্ত সাধন পূর্বজন্মে করা আছে। সাধনশেষে এই সপ্তমূর্তি কৃষ্ণে লয় হয়। এই অর্থে ভক্তকবি জয়দেব বলেছেন, কৃষ্ণই মৎস্যাদি দশাবতাররূপে অবতীর্ণ হন। বৈষ্ণব সাধন মার্গ মূলাধার থেকে সহস্রদল শুভ্র পদ্মের দ্বাদশদল পদ্ম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দ্বাদশদল পদ্মকেই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিষ্ণুপদ বা বৈকুণ্ঠ বলেন ও এই ভূমিতেই সাধন শেষ করেন, তদূর্দ্ধে যান না। এই বৈষ্ণব মার্গে গুপ্তচক্র চতুষ্টয় বিদ্যমান। বৈষ্ণবাচার্য্য কর্তৃক এইগুলি স্বীকৃত নয় বলে আমি ইহাদের উল্লেখ করিলাম না। সাধারণতঃ বাসুদেব, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও বিষ্ণু—এই চারি ইষ্টনামে কামবীজ যুক্ত করে দীক্ষাদান প্রচলিত। উল্লিখিত সপ্ত ইষ্টের মধ্যে যেটী যে দীক্ষার্থীর হৃদয়ে দেখা যাবে, সেই ইষ্ট তদ্বীজ ও প্রণব সহযোগে দীক্ষা দিলে শাস্ত্রসম্মত হবে ও সুফল ফলিবে। উক্ত সপ্ত ইষ্টমন্ত্র মন্ত্রদ্রষ্টা ভৈরবানন্দ কর্তৃক যোগবলে আবিষ্কৃত ও উল্লিখিত হইল। মাধব—ওঁ মং মাধবায় নমঃ। কেশব—ওঁ কং কেশবায় নমঃ। বাসুদেব—ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। ইহা ভাগবতে প্রদত্ত। ইহার সহিত 'ভগবতে' যুক্ত থাকিলে ইহা শক্তিযুক্ত হয় ও উহা জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু ঊর্ধ্বগামী হবে। নারায়ণ—ওঁ নং নারায়ণায় নমঃ। বিষ্ণু—ওঁ বং নমো ভগবতে বিষ্ণুদেবায় নমঃ। মহাবিষ্ণু—ওঁ মাং মহাবিষ্ণুদেবতায়ৈ নমঃ। কৃষ্ণ—ওঁ ক্লীং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। দীক্ষাদানকালে মন্ত্রচৈতন্য না করিলে মন্ত্রজপ ব্যর্থ হয়। আর সিদ্ধগুরু ব্যতীত অন্য কেহ মন্ত্রচৈতন্য করিতে

পারেন না। বেলুড় মঠের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট স্বামী বিরজানন্দ রামকৃষ্ণ নামের সহিত প্রণব ও কামবীজ যুক্ত করে এই মন্ত্রে দীক্ষা দিতেন —ওঁ ক্লীং ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ। এই মন্ত্র ওঁ ক্লীং ভগবতে শ্রীচৈতন্যদেবায় নমঃ মন্ত্রতুল্য অশুদ্ধ, অসিদ্ধ। কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্য নামের সহিত কামবীজ সংযুক্ত হইতে পারে না। এই দুই ভ্রষ্ট মন্ত্র জপ করা অনুচিত।

ব্যাসদেবের পূর্বে পূর্ণশক্তি অবতার শ্রীকৃষ্ণই শূদ্র, বৈশ্য ও নারীকে প্রণবোচ্চারণের অধিকার দেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ং ও তাঁর দীক্ষাগুরু কণ্বমুনি দ্বারা দ্বাপরে এই দিব্যকর্ম করেন। তৎপরে ব্যাসদেবস্বয়ং শাস্ত্র রচনাপূর্বক উক্ত যুগবিধি ভারত সমাজে প্রচার করেন।

—পাঁচ—

অবতারবাদ বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভিত্তি। গভীর বৈষ্ণব প্রভাব পাঁচ শত বর্ষ যাবৎ বাংলাদেশের উপর নিরন্তর পতিত হওয়ায় বিংশ শতকেও বাঙ্গালী বৈষ্ণব যে কোন সিদ্ধ সাধককে অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। সেইজন্য চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, অনুকূল ঠাকুর, সীতারাম দাস, জীতেন ঠাকুর, নিত্যগোপাল, বিজয়কৃষ্ণ, পাগল হরনাথ প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষগণকে বাঙ্গালী অবতার বলে স্বীকার করেছেন। ইহাই অবতারবাদের চরম কুফল। এই সকল সিদ্ধপুরুষকে গুরুরূপে গ্রহণ করা চলে, কিন্তু ইষ্টরূপে ধ্যান করা চলে না।

এখন আমরা শৈব সাধনার দ্বাদশ স্তর, উপাখ্যান ও লিঙ্গতত্ত্ব আলোচনা করিব। শৈব পুরাণে দেখা যায়, জগৎগুরু সদাশিব

উলঙ্গ অবস্থায় গলদেশে, মস্তকে ও লিঙ্গে পুষ্পমাল্যে শোভিত হয়ে মুনিগণের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন এবং তাঁকে দেখে মুনিপত্নীগণ কামার্ত হয়ে শিবকে আলিঙ্গনান্তে তাঁদের সহিত শৃঙ্গারক্রিয়া করার জন্য শিবকে নানা ভাবে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মুনিগণ কুপিত হইয়া যোগশক্তি দ্বারা শিবলিঙ্গ খসাইয়া দেন। শিবলিঙ্গ খসামাত্র ভীষণ গর্জন করে পৃথিবীর তলদেশে, ও উর্দ্ধ দেশে উঠিতে লাগিলেন। শিবলিঙ্গের মহাশব্দে চতুর্দশ ভুবন প্রকম্পিত হইল। তখন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ও পালনকর্তা বিষ্ণু মুনিদের আশ্রম সমীপে এসে উপস্থিত হন এবং জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গ দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করেন, ইহা তোমাদের আশ্রমে কিরূপে আসিল ? মুনিগণ উক্ত ঘটনা বিবৃত করার পর পালন কর্তা বিষ্ণু সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে বলিলেন, "তুমি হংসবাহনে উর্দ্ধদিকে গিয়ে উহার উর্দ্ধমূল অনুসন্ধান কর। আমি গরুড়বাহনে উহার নিম্নমূল অনুসন্ধান করিতে যাইব।" ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বহু সহস্র বৎসর উর্দ্ধে ও নীম্নে গিয়ে শিবলিঙ্গের আদি বা অন্ত পাইলেন না। অনন্তর ব্রহ্মা একটী অন্যায় কাজ করিলেন। তিনি উর্দ্ধে বিদেহ মুক্তিমার্গ পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পর আর যাইতে পারিলেন না, তখন চিন্তা করিতেছেন, সেই সময় একটী কেতকীপুষ্প নিম্নে নামিতেছে দেখিলেন। তিনি ঐ কেতকী কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ? তখন কেতকী পুষ্প বলিল, "আমি এই জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গের মস্তকে ছিলাম। এখন সেই স্থান থেকে নেমে এসেছি। ইহাতে ব্রহ্মা কেতকীকে বলিলেন, "আমার একটী কাজ তোমাকে করতে হবে। তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে যে, আমি শিবলিঙ্গের

শিরোদেশ পর্য্যন্ত গেছি ও উহার নিদর্শনস্বরূপ তোমাকে ওখান থেকে এনেছি। তুমি এই কাজ করিলে তোমাকে জগতে দেবতার ন্যায় সম্মান পাওয়াইয়া দিব।” ব্রহ্মার প্রস্তাবে কেতকী রাজী হওয়ায় উভয়ে নিম্নে নেমে এলেন ও দেখিলেন, বিষ্ণু অগ্র হইতে তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি শিবলিঙ্গের তলদেশ দেখতে পেয়েছেন? বিষ্ণু উত্তর দিলেন, না। তখন ব্রহ্মা মিথ্যা উক্তি করিলেন, আমি শিবলিঙ্গের শিরোদেশ দেখে এসেছি ও নিদর্শনস্বরূপ এই কেতকী এনেছি। আপনি কেতকীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। বিষ্ণু কেতকীকে জিজ্ঞাসা করায় কেতকী ব্রহ্মার বাক্য সমর্থন করিলেন। তখন দৈববাণী হইল, “ব্রহ্মা ও কেতকী উভয়ে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। ব্রহ্মা বিদেহ মুক্তিমার্গের উপরে আসিতে পারেন নাই। কেতকী শিবলিঙ্গের বিক্রম সহিতে না পারিয়া মস্তকচ্যুত হয়েছে। ব্রহ্মা তাহাকে লোভ দেখাইয়া মিথ্যা কথা বলাইয়াছে। আমি অভিসম্পাত দিতেছি—আজ হতে কেতকী পুষ্প কোন দেবপূজায় লাগিবে না। যিনি এই পুষ্পে দেবপূজা করিবেন, তিনি নরকস্থ হইবেন। আর এই মিথ্যা কথা বলার জন্য ব্রহ্মাকেও কেহ ইষ্টজ্ঞানে পূজা করিবে না এবং ব্রহ্মা জগতেও পূজা পাইবে না।” সেইজন্য ব্রহ্মা আজও ইষ্টজ্ঞানে পূজিত হন না। ইহা শুনিয়া ব্রহ্মা শিবলিঙ্গকে, দৈববাণীকর্তাকে স্তবস্তুতি দ্বারা অর্চনাপূর্বক বলেন, আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে এত বড় শাস্তি দিবেন না। তখন দৈববাণীকর্তা শিব সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, চৈত্র মাসে কেবল মেলাকারীরা তোমাকে পূজা করিবে; আর তুমি সাধন মার্গচ্যুত হয়ে পৃথ্বীতত্ত্বে অবস্থান করিবে।” সেইজন্য পৃথ্বীতত্ত্বের ভূমি

মূলাধারচক্রে ব্রহ্মাকে দেখা যায়। ব্রহ্মার নিজস্ব মার্গ আজ্ঞাচক্রের মধ্যস্থল ও গতি বিদেহ মুক্তির স্তর পর্য্যন্ত। ইহার উর্দ্ধে ইনি যাইতে পারেন না, আর যাইতে হইলে তাঁহার সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইতে হয়। বিষ্ণু শিবলিঙ্গের তলদেশ অনুসন্ধানে পৃথিবীর জলতত্ত্ব পর্য্যন্ত নামিয়াছিলেন। সেইজন্য মানব শরীরে জলতত্ত্বের ভূমি স্বাধিষ্ঠান পদ্মে বিষ্ণুকে দেখা যায়। বিষ্ণুর স্থূল গতি বিদেহমুক্তিমার্গ পর্য্যন্ত, কিন্তু জ্যোতিমূর্তিতে তিনি পরমাত্মাধাম বা ব্রহ্মধাম পর্য্যন্ত যাইতে পারেন। ভারতে ও অন্যান্য দেশে লিঙ্গতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত। অজ্ঞ ভ্রান্ত লোকে বলে, জগৎগুরু শিব এরূপ অশ্লীল আচরণ করিলেন কেন? এই লিঙ্গতত্ত্বে শৈব পথের যোনিমুদ্রার সাধন কথিত। সাধকের সাধন পরীক্ষার জন্য পূর্বোক্ত রূপক প্রচারিত। আমাদের ধর্মগ্রন্থে আসল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত নাই। শিব পুরাণে আছে, সদাশিব মুনিদের আশ্রমে এসেছিলেন। ইহার গূঢ়ার্থ কি? মুনি কাহাকে বলে? আধ্যাত্মিক বাকরূপ সাধন লয়ান্তে মন দ্বারা যাঁদের সাধন চলে, তাঁহাদিগকে মুনি বলে। এই মুনিদের মনন দ্বারা সাধনমার্গ সহস্রদল পদ্মের দ্বাদশদল পদ্মের মধ্যে নিরঞ্জন মার্গের উপর পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহাই বিদেহমুক্তির স্থান। এইস্থানে প্রত্যেক সাধকের ইষ্টকে স্বর্ণপালংকে দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় সর্বাঙ্গে পুষ্পমাল্য ভূষিত ও চন্দন-চর্চিত করিয়া বসাইয়া তাহার জীবাত্মাকে ইষ্টের প্রিয়া পত্নীজ্ঞানে মূলাধার হইতে প্রত্যেক চক্রের মধ্য দিয়া উক্ত স্থানে আনিয়া মানুষের শৃঙ্গাররসরূপ ক্রিয়া দ্বারা ইষ্টদেবতার সহিত মিলিত করা হয়। ইহারই নাম যোনিমুদ্রা সাধন। ইহাতে মুনি সাধক লিপ্ত হন না। তিনি উক্ত সাধন সমাপনান্তে আরও উর্দ্ধে উঠে

যান। শিবলিঙ্গচ্ছেদ করার অর্থ, যোনিমুদ্রা বর্জনপূর্বক উর্দ্ধগামী হওয়া ও পুনঃ স্বভূমিতে ফিরে আসা। শৈব সাধক মূলাধার থেকে পরম শিব পর্য্যন্ত যে দ্বাদশ স্তর আছে, তাহার প্রত্যেক স্তরে এক একটী লিঙ্গমূর্তিধ্যান ও সাধন দ্বারা পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হন। শিবলিঙ্গে গৌরীপট্টরূপ যে যোনি যোজনা করা আছে, তাহা স্থূল যোনিমুদ্রার প্রতীক। উল্লিখিত দ্বাদশ স্তরে দ্বাদশ শিবের নাম ও বীজমন্ত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।—পরম শিব—ওঁ শিবায় নমঃ। আশুতোষ—ওঁ অং আশুতোষায় নমঃ। পশুপতি—ওঁ পং পশুপতয়ে নমঃ। জলেশ্বর—ওঁ জং জলেশ্বরায় নমঃ। নাগেশ্বর—ওঁ নং নাগেশ্বরায় নমঃ। পরমেশ্বর—ওঁ পিং পরমেশ্বরায় নমঃ। ঈশান—ওঁ ঈং ঈশানায় নমঃ। অঘোর—ওঁ আং অঘোরায় নমঃ। ভৈরব—ওঁ হৌং ভৈরবায় মমঃ। কাল ভৈরব—ওঁ কাং কালভৈরবায় নমঃ। জগদীশ্বর—ওঁ জোং জগদীশ্বরায় নমঃ। নির্জলেশ্বর—ওঁ নীং নির্জলেশ্বরায় নমঃ। এই স্তরক্রম উর্দ্ধাধঃ ব্যাখ্যাত। যোগশাস্ত্রোক্ত শিবলিঙ্গসমূহ মধ্যে ছয় চক্র গুপ্ত। তাই এখানে চক্রোল্লেখ না করিয়া দ্বাদশ স্তরের ইষ্টবীজ উল্লিখিত হইল। বামদেব ও সদ্যজাত নামদ্বয় পূর্বোক্ত দ্বাদশ নামের অন্তর্ভূক্ত নহে। এই দ্বাদশ শিবমন্ত্র ভক্তিভরে জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু হৃৎপদ্ম থেকে উর্দ্ধগামী হইয়া পরমাত্মায় লয় পাইবে। যে মন্ত্র জপিলে জপজাত বায়ু ও ধ্বনি নিম্নগামী হয়, তাহা ইষ্টমন্ত্র হইতে পারে না। 'আহ্নিক কৃত্য'ও 'পুরোহিত দর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থে মহাকাল ভৈরবের এই বীজমন্ত্র প্রদত্ত—হুং ক্ষ্রোং যাং রাং লাং বাং ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং ফট স্বাহা। ইহা অভিচার মন্ত্র, কিন্তু পূজামন্ত্র নহে। স্বামী ভৈরবানন্দ

বলেন, মহাকালভৈরবের মূলমন্ত্র—ওঁ হুং মহাকালভৈরবায় নমঃ। ত্রেতাযুগের দ্বিতীয় পাদের শেষভাগে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মর্তলোকে শৈব সাধন প্রচার করেন। ইহার অর্থ, তখন হইতে মর্ত্যবাসীরা শিবকে ইষ্টজ্ঞানে সাধন করে আসছে। শুক্রাচার্য্যপ্রবর্তিত শৈব সাধনে সর্বপ্রথম কুবের সিদ্ধিলাভ করেন। সেইজন্য অনেকে কুবেরকেই শৈবসাধনার প্রবর্তক বলেন। যজুর্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়োক্ত রুদ্র সৃষ্টির পরিচালক একাদশ রুদ্রের অন্যতম ও শিবসৃষ্ট। এই কথা দেবী ভাগবতে উল্লিখিত। তারকেশ্বর মহাদেব একাদশ রুদ্রের অন্যতম ও কাশীশ্বর বিশ্বনাথ উক্ত এগার রুদ্রের মধ্যে সত্ত্বগুণীরুদ্র। এঁরা সাধকের কামনা পূর্ণ করতে পারেন, সাধককে সাধনপথে অগ্রগামী করাতে পারেন; কিন্তু সাধককে মুক্তিদানে অসমর্থ। একমাত্র সত্ত্বগুণী নকুলেশ্বর মুমুক্ষুকে মুক্তিদানে সমর্থ। নকুল শব্দের অর্থ, যাঁর কোন কুল বা সীমা নাই, যিনি বিরাট, বিভূ। ১৪ই এপ্রিল শনিবার আমাদের মন্দিরে শ্রীরামপুর নিবাসিনী নারীভক্তের মন্ত্রসংস্কারকালে বলিগুরু শুক্রাচার্য্য এসে আমাদের ডান দিকে বসলেন—বৃদ্ধ, স্থূল, বিদ্যুদ্বর্ণ, নাভি পর্য্যন্ত শুভ্র পাকা দাড়ি ঝুলছে, মাথায় শুভ্র জটা, নিম্ন ও উপর হস্তে রুদ্রাক্ষ বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক ও ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত। আমিও মহাগৌরী মন্দিরে বসে তাঁকে স্পষ্টভাবে দেখলাম এবং ভৈরবানন্দ একতলায় থেকে দিব্যদৃষ্টিতে তাঁকে দেখলেন। এই শুক্রচার্য্যই গাণপত্য সাধন মর্ত্যে প্রচার করেন।

গণেশ সাধনার মূলমন্ত্র—ওঁ গং সর্বসিদ্ধিদাতাগণপতিদেবাতায়ৈ নমঃ। গণেশ সাধনার আঠার চক্র ও মন্ত্র নিম্নে দেওয়া হলো।

(১) ওঁ গং পৃথ্বীতত্ত্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে অবস্থিত পীতবর্ণ পৃথ্বীতত্ত্ব ধ্যানপূর্বক এই মন্ত্রজপ বিধেয়। (২) ওঁ গং জলতত্ত্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। স্বাধিষ্ঠানে অবস্থিত শ্বেতবর্ণ জলতত্ত্ব ধ্যানান্তে এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। (৩) ওঁ গং অগ্নিতত্ত্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। মণিপুর পদ্মে অগ্নিবর্ণ অগ্নিতত্ত্ব ধ্যানান্তে এই মন্ত্র জপ করিবে। (৪) ওঁ গং বায়ুতত্ত্ব সিদ্ধিদাতাগণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। দ্বাদশদল হৃৎপদ্মে গাঢ় নীলবর্ণ বায়ুতত্ত্ব ধ্যানান্তে এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। (৫) ওঁ গং আকাশ তত্ত্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। ষোড়শদল বিশুদ্ধ পদ্মে শ্বেত কৃষ্ণ নীলাদি নানাবর্ণ আকাশতত্ত্ব ধ্যানান্তে এই মন্ত্র জপ করিবে। (৬) ওঁ গং ললনাচক্রসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। ললনাচক্র গুপ্তপদ্ম। ইহা পরমাত্মার পৃথ্বীতত্ত্বস্থান। ইহার প্রয়োগবিধি পৃথ্বীতত্ত্ব তুল্য হইবে। ইহাই ঋষিলোক বা সপ্তর্ষি মণ্ডল। এই পদ্ম থেকে পরমাত্মা বা ব্রহ্মসাধন আরম্ভ হয়। এই চক্রে জীবাত্মা বা কুলকুণ্ডলিনীকে তুলে ব্রহ্মসাধন আরম্ভ করতে হয়। ঋষিত্বলাভ না হলে ব্রহ্মসাধনের অধিকার জন্মে না। (৭) ওঁ গং আজ্ঞাচক্রসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। আজ্ঞাচক্রে জ্যোতির্ময় প্রণবধ্যান সহযোগে এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। (৮) ওঁ গং নাদসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে অষ্টদল পদ্মে নাদপীঠে বিশ্বধ্বনি স্মরণ পূর্বক এই মন্ত্র জপ করিবে। (৯) ওঁ গং বিন্দুসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। নাদপীঠের উপরে দশদল পদ্মে জ্যোতির্বিন্দু ধ্যানান্তে এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। (১০) ওঁ গং সর্বশক্তিসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। শক্তিপীঠে

জ্যোতির্ময় দশদল পদ্মে ইষ্টমূর্তি বা গণেশমূর্তিকে সর্বশক্তির আধাররূপে ধ্যানপূর্বক এই মন্ত্রজপ করিবে। (১১) ওঁ গং সত্ত্বগুণসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। সহস্রদল পদ্মের নিম্নে দ্বাদশদল পদ্মে ত্রিকোণ যন্ত্রমধ্যে জ্যোতির্ময় প্রণবের উপরিভাগে বিন্দুধ্যানান্তে এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। (১২) ওঁ গং নিরঞ্জন সিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। সহস্রারস্থ সত্ত্বগুণী প্রণবের মধ্যস্থলে হংসরূপ নিরঞ্জন ধ্যানান্তে এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। (১৩) ওঁ গং সর্বইষ্টপাদপদ্মসিদ্ধিদাতা বা সর্বইষ্ট সিদ্ধিদাতা গণপতি দেবতায়ৈ নমঃ। হংসরূপ নিরঞ্জনের উপরিভাগে ইষ্টপাদপদ্মে বা পূর্ণ ইষ্টমূর্তি বা গণপতিমূর্তি ধ্যানান্তে এই মন্ত্রজপ বিধেয়। সবল সাধক পূর্ণ ইষ্টমূর্তি ধ্যানে সমর্থ। তুর্বল সাধক কেবল ইষ্টপাদপদ্ম ধ্যানে সমর্থ। (১৪) ওঁ গং জ্যোতিঃসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। ইষ্টপাদপদ্মের উপরে জ্যোতির্মণ্ডল ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। (১৫) ওঁ গং চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সিদ্ধিদাতা গণপতি দেবতায়ৈ নমঃ। উল্লিখিত জ্যোতির্মণ্ডলের উপরে ত্রিকোণ যন্ত্রমধ্যে মহাজ্যোতিঃ ধ্যানান্তে (তান্ত্রিক সাধক ইষ্টদেবী ধ্যানপূর্বক) এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। (১৬) ওঁ গং মহাকুণ্ডলিনী সিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। ত্রিকোণ যন্ত্রের ঊর্দ্ধে জ্যোতির্ময় অর্ধচন্দ্রাকৃতি ধ্যানান্তে এই মন্ত্রজপ করিবে। (১৭) ওঁ গং পরম শিবতত্ত্বসিদ্ধি দাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। মহাজ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গ ধ্যান পূর্বক এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। (১৮) ওঁ গং নির্বাণসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। ত্রিকোণ যন্ত্রমধ্যে মহাজ্যোতিঃসমুদ্র ধ্যানান্তে এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। আর মূলমন্ত্রে বিসর্গশক্তির ধ্যান করিলে

পরমাত্মা দর্শন হয়। তত্ত্ববর্ণ অনুসারে গণেশ দেবতার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হয়। নাদপীঠে নাদমূর্তি ও বিন্দুপীঠে বিন্দুমূর্তি গণেশ ধারণ করেন ও সর্বশেষে পরমাত্মায় লীন হন। গুপ্ত পদ্ম বাদ না দিলে মোট গণেশ সাধনে আঠার স্তর হবে।

৯ ডিসেম্বর ১৯৬১ শনিবার পূর্বাহ্নে মন্ত্রদ্রষ্টা ভৈরবানন্দ বেলুড় ধর্মচক্রের মন্দিরে বসে এই গণেশ মন্ত্র প্রয়োগ বিধি আমার কাছে প্রকাশ করেন। তখন গণেশ ঠাকুর এসে বলেন, "ত্রেতাযুগের দ্বিতীয় পাদে যখন শুক্রাচার্য্য মর্ত্যে আমার প্রথম পূজা করেন, তখন আমি শুক্রাচার্য্যকে ইহা বলেছিলাম। শুক্রাচার্য্য ব্যতীত অন্য কেহ আজ পর্য্যন্ত এই মন্ত্রের প্রয়োগ বিধি জানিত না ; কিন্তু শুক্রাচার্য্য মূলমন্ত্র ব্যতীত অন্য সব মন্ত্র গুপ্ত রাখেন। দুই যুগপরে এই কলিযুগের শেষভাগে তুমি তত্ত্বজ্ঞানবলে গণেশ সাধন জেনে ইহা সর্বপ্রথম মর্ত্যে প্রকাশ করিলে। শুক্রাচার্য্য ও তুমি ব্যতীত আমার আঠার মূর্তি কেহই জানে না।"

—ছয়—

এই কৈফিয়ৎ প্রচার দ্বারা আমরা তুমুল ধর্ম যুদ্ধ বা অপূর্ব ক্রুসেড ঘোষণা করিলাম। এই কল্কি বোমা ইন্দ্রবজ্রতুল্য যেখানে পড়িবে, সেখানেই ধর্মগ্লানি বা কলিমল বিধ্বস্ত হইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাতলে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতে ঘোর কলি পলায়ন করিলেন। তেইশ বৎসর পরে যখন কল্কিদেব মর্তলোকে অবতীর্ণ হবেন, তখনই কলি মর্ত্যত্যাগ করিবেন। কল্কিদেবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত কলির প্রভাব চরম সীমায় উপনীত হইবে। তাই মহাভারতের বন পর্বে ১৬১তম অধ্যায়ে

৮০-১১২ শ্লোকে কলিযুগে ধর্মগ্লানির বিস্তৃত বর্ণনা ব্যাসদেব দিয়াছেন এবং কল্কিদেবের আবির্ভাব নিম্নোক্ত প্রকারে উল্লেখ করিয়াছেন।—

কল্কি বিষ্ণুযশা নাম দ্বিজঃ কাল-প্রচোদিতঃ ॥৯২
উৎপৎস্যতে মহাবীর্য্যো মহাবুদ্ধি পরাক্রমঃ।
সম্ভূতঃ সম্ভল গ্রামে ব্রাহ্মণাবসথে শুভে ॥৯৩
মনসা তস্য সর্বাণি বাহনান্যায়ুধানি চ।
উপস্থাস্যন্তি যোধাশ্চ শস্ত্রাণি কবচানি চ ॥৯৪
স ধর্মবিজয়ী রাজা চক্রবর্তী ভবিষ্যতি।
স চেমং সংকুলং লোকং প্রসাদমুপনেষ্যতি ॥৯৫
উত্থিতো ব্রাহ্মণোদীপ্তিঃ ক্ষয়ান্তকৃৎ উদারধীঃ।
সংক্ষেপবেগ হি সর্বস্য যুগস্য পরিবর্তকঃ ॥৯৬
স সর্বত্রগতান্ ক্ষুদ্রান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ।
উৎসাদয়িস্যতি তদা সর্বম্লেচ্ছগণান্ দ্বিজঃ ॥৯৭
ততশ্চৌরক্ষয়ং কৃত্বা দ্বিজেভ্যঃ পৃথিবীমিমাম্।
বাজিমেধে মহাযজ্ঞে বিধিবৎ কল্পয়িষ্যতি ॥৯৮
স্থাপয়িত্বা চ মর্য্যাদা স্বয়ম্ভুঃবিহিতাঃ শুভাঃ।
বনং পুণ্যযশঃকর্মা রমণীয়ং প্রবেক্ষ্যতি ॥৯৯
তচ্ছীলমনুবৎস্যন্তি মনুষ্যাঃ লোকবাসিনঃ।
বিপ্রৈশ্চৌরক্ষয়ে চৈব কৃতে ক্ষেমঃ ভবিষ্যতি ॥১০০
কৃষ্ণাজিনানি শক্তীশ্চ ত্রিশূলান্যায়ুধানি চ।
স্থাপয়ন্ দ্বিজ-শার্দ্দুলো দেশেষু বিজিতেষু চ ॥১০১
সংস্তূয়মানো বিপ্রেন্দ্রৈর্মানয়ানো দ্বিজোত্তমান্।
কল্কিশ্চরিষ্যতি মহীং সদা দস্যুবধে রতঃ ॥১০২

উল্লিখিত শ্লোকাবলীর সারার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—ভগবান কল্কিদেব দ্বিজবর বিষ্ণুযশার পুত্র রূপে সম্ভল গ্রামে অবতীর্ণ হবেন। কল্কিদেব মহাবীর বুদ্ধিমান ও বিক্রমশালী হবেন এবং তাঁহার সংকল্প মাত্রেই শ্বেতাশ্ব বাহন, বিবিধ আয়ুধ ও কবচ ও অসংখ্য মহাযোদ্ধা আসিবেন। তিনি ধর্মরাজ ও ধর্মস্থাপক রূপে ভারতে ও পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিবেন। তিনি কলিযুগের পরিবর্তক, সত্যযুগের সংস্থাপক, উদারচেতা জগদ্‌গুরু হবেন এবং সমস্ত ম্লেচ্ছকে বা বিধর্মীকে দৈববলে উৎসাদিত করিবেন। তিনি অধর্ম বিনাশ ও সদ্ধর্ম স্থাপনপূর্বক মোক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠানান্তে বনে গমন করিবেন। তৎকর্তৃক প্রবর্তিত সনাতন মোক্ষধর্ম অবশিষ্ট কলিযুগে প্রবল থাকিবে। পুরুষসিংহ পুরুষোত্তম কল্কিদেব শতাধিক বর্ষ মহীতলে বিচরণপূর্বক বিজিত দেশসমূহে মোক্ষধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবেন। দেবীভাগবতে নবম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে ৫৩-৫৬ পর্য্যন্ত শ্লোকাবলীতে কল্কির আবির্ভাব এইরূপে উল্লিখিত—

এবং কলৌ সম্প্রবৃত্তে সর্বং ম্লেচ্ছময়ং ভবেৎ।
বিপ্রস্য বিষ্ণুযশসঃ পুত্রঃ কল্কির্ভবিষ্যতি।
নারায়ণকলাংশশ্চ ভগবান বলিনাং বরঃ॥
দীর্ঘেণ করবালেন দীর্ঘঘোটকবাহনঃ।
ম্লেচ্ছশূন্যাঞ্চ পৃথিবীং ত্রিরাত্রেণ করিষ্যতি॥
নির্ম্লেচ্ছাং বসুধাং কৃত্বা চান্তর্ধানং করিষ্যতি।

এইরূপে ঘোরকলি প্রভাব বিস্তার করিলে সমগ্র পৃথিবী ম্লেচ্ছপূর্ণ হইবে। তখন বলীপ্রবর ভগবান নারায়ণ পূর্ণ অংশে ধর্মিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। তৎপরে তিনি করে করবাল

ধারণপূর্বক সুদীর্ঘ শ্বেতাশ্বে চড়িয়া ত্রিরাত্র মধ্যে পৃথিবী ম্লেচ্ছশূন্য করিবেন। পৃথিবী ম্লেচ্ছশূন্য ও ধর্মপূর্ণ হইলে তিনি অন্তর্হিত হইবেন। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থে কল্কির আবির্ভাব সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, তাহা ইতঃপূর্বেই 'কল্কিগীতা'য় উদ্ধৃত হয়েছে।

সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে চারি ঋষি শাণ্ডিল্য, কংকপত্র, কণ্ব ও উতংক মর্ত্যলোকে নেমেছেন এবং কল্কির সহচর হবেন। উতংকের কাহিনী মহাভারতে ও কণ্বমুনির উপাখ্যান ভাগবতে পাওয়া যায়। কল্কির নেতৃত্বে এই সিদ্ধ ঋষি চতুষ্টয় ধর্মজগতে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিবেন। কল্কিকৃত ধর্মযুদ্ধে ভাগবত যোগশক্তি দ্বারা বৈজ্ঞানিক জড়-শক্তি ধুলিস্মাৎ হইবে। শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণবৎ শ্রীকল্কি কিরূপে বাল্যকাল হতেই অলৌকিক কর্ম করিবেন, তৎসম্বন্ধে ঋষিবর বিশ্বামিত্র সম্প্রতি আমাকে যাহা বলেছিলেন, তাহা নিম্নে লিখিতেছি। ১৮ই মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় ডানকুনির অদূরে মোনবেড় গ্রামের কালীতলায় কল্কিদেবের আসন্ন আবির্ভাব সম্বন্ধে আমি বিশদ ভাষণ দিয়েছিলাম। সভাস্থলে আমার ভাষণ সময়ে কল্কিদেব অশ্বারোহণে তলোয়ার হস্তে দক্ষিণে ও ব্যাসদেব সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। পূর্বদিন শনিবার রাত্রি দশটায় ধর্মচক্রের মন্দিরের বারান্দায় স্বীয় শয্যায় আমি শুয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছি। এমন সময় একটি স্বর্ণবর্ণ সূক্ষ্মদেহী এসে আমার শিয়রে বসে আমাকে সস্নেহে বললেন, "কাল যখন তুমি সভায় কল্কি সম্বন্ধে ভাষণ দিবে, তখন অবশ্যই উল্লেখ করবে, যেমন ভগবান রামচন্দ্র বাল্যকালেই মারীচ, তাড়কা, খর ও দূষণাদি রাক্ষস বধ করেছিলেন এবং যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালেই পূতনাবধ, গোবর্দ্ধন ধারণ ও কালীয় দমনাদি অলৌকিক কর্ম করেছিলেন, তেমনি ভগবান কল্কিদেব

বাল্যকালেই অদ্ভুত বিভূতি দেখাবেন ও অসাধ্য সাধন করবেন।" প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, হয়ত ইনি কোন স্বর্গবাসী সূক্ষ্মদেহী। আমার মনোভাব বুঝতে পেরে ঐ সূক্ষ্মদেহী তন্মুহূর্তে দিব্যমূর্তি ধারণ করলেন—স্বর্ণবর্ণ অঙ্গকান্তি ও মস্তকে জ্যোতির্মণ্ডল বা ব্রহ্মবিদ্যুৎ ঝলসিত হচ্ছে। অবিলম্বে আমি ভৈরবানন্দকে এই স্বর্ণবর্ণ সূক্ষ্মদেহীর কথা জানালাম। ভৈরবানন্দ একতলায় থেকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখে বললেন, ইনি রামায়ণোক্ত বিশ্বামিত্র, যিনি দশরথের কাছ থেকে রামলক্ষণকে স্বীয় আশ্রমে নিয়ে গিয়ে তাড়কা ও মারীচাদি রাক্ষস নিধন করিয়ে তাঁহাদিগকে স্বীয় অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন।

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, "রাম ও কৃষ্ণতুল্য কল্কি বাল্য থেকেই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবেন। কল্কি প্রথমে কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুচি, মেথর, পেরিয়া প্রভৃতি অনুন্নত নিম্নবর্ণভুক্ত জনগণের মধ্যে স্বীয় বিভূতি দেখিয়ে তাহাদিগকে নিয়ে স্বসৈন্যদল গঠন করবেন। প্রথমে নীচ শ্রেণীর লোকেরাই কল্কিকে চিনবে, মানবে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণাবির্ভাব পর্য্যন্ত বৈশ্য, শূদ্র ও নারী ধর্মাধিকার পায় নাই। কল্কি তাঁহাদিগকে ধর্মাধিকার দিবেন ও তাহাদিগের উন্নয়নে প্রাণপাত করিবেন।" এই সম্বন্ধে সম্প্রতি আমার যে অদ্ভুত দর্শন হয়েছে, তাহাই এখন লিখিতেছি। ২৮শে এপ্রিল সোমবার মধ্যাহ্ন আহারান্তে বেলা সাড়ে বারটায় আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিত নয়নে দেখছি, একটী সূক্ষ্মদেহী নারীমূর্তি এসে আমার শয্যায় বসলেন। বেশী পান খেলে যেমন দাঁতে লাল দাগ পড়ে, তাঁর সম্মুখস্থ দাঁতগুলিতে তেমনি লাল দাগ ছিল, সাদা শাড়ী পরা, মাথায় ঘোমটা। তিনি

সলজ্জ সশ্রদ্ধ বদনে আমার দিকে তাকালেন। তৎপার্শ্বে একটী পুরুষ সূক্ষ্মদেহী খাটের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। ৯ই মে বুধবার পূর্বাহ্নে সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রের মন্দিরে বসে ঐ দুই সূক্ষ্মদেহীকে আহ্বান করে জানালেন—এঁরা স্বর্গবাসী ভাই-বোন সঁওতাল পুরুষ ও রমণী, কল্কিদেবের প্রথম ভক্ত। প্রথমে এঁদের সহিত কল্কির সৌহার্দ্য বা সখ্য হবে। পুরুষের নাম ভুটু সাউ ও রমণীর নাম বীরাণী। এঁরা ইন্দ্র ও শচীর কলাংশে জন্মাবে।

সন ১৩৬৭ সালে চৈত্র মাসে বাসন্তী বিজয়া দশমী পূজাকালে ভৈরবানন্দ বাহিরে বসেছিলেন। তখন মহামায়া বাসন্তী দেবী তাঁকে পূজামণ্ডপে ডাকলেন ও একটী বীজমন্ত্র স্পষ্ট বড় বঙ্গাক্ষরে লিখে দিয়ে বললেন, ইহাই অনাগত অবতার কল্কির বীজমন্ত্র। বিষ্ণু-পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত উভয়ে বলেন, কল্কি অষ্ট শক্তি বা সিদ্ধি বা ঋদ্ধি নিয়ে জন্মাবেন ও প্রয়োগ করবেন; আর রাম ও কৃষ্ণ অষ্ট সিদ্ধি থাকা সত্ত্বেও প্রয়োগ করেন নি। দত্তাত্রেয় বিরচিত 'যোগ রহস্য' গ্রন্থে অষ্ট সিদ্ধি নিম্নোক্ত প্রকারে উল্লিখিত।—

অণিমা লঘিমা চৈব মহিমা প্রাপ্তিরেব চ।
প্রাকাম্যঞ্চ তথেশিত্বং বশিত্বং চ তথাপরম্॥
যত্র কামাবসায়িত্বং গুণানেতাং তথৈশ্বরান্।
প্রাপ্নোত্যষ্টৌ নরব্যাঘ্র পরং নির্বাণসূচকম্॥

পুরুষ ব্যাঘ্র অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব এই অষ্টবিধ যোগসিদ্ধি লাভ করেন। অষ্টবিধ যোগৈশ্বর্য্য পাতঞ্জল যোগসূত্রের বিভূতি পাদে ৪৫ সূত্রে আছে, "ততোঽণিমাদি প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ।"

ইহার অর্থ, পঞ্চভূত জয় হইলে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য ও রূপলাবণ্যাদি কায়সম্পৎ উপজাত হয় এবং ভূতগণ যোগীদেহের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। উক্ত সূত্রের ব্যাসভাষ্য এইরূপ—"তত্রাণিমা ভবত্যণুঃ, লঘিমা লঘুর্ভবতি ; মহিমা মহান্ ভবতি ; প্রাপ্তিঃ অঙ্গুল্যগ্রেণাপি স্পৃশতি চন্দ্রমসং ; প্রাকাম্যং ইচ্ছানভিঘাতঃ, ভূমাবুন্মজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে ; বশিত্বং ভূতভৌতিকেষু বশী ভবতি অবশ্যশ্চান্যেষাম্ ; ঈশিত্বং তেষাং প্রভবাপ্যয়ব্যুহানামীষ্টে ; যত্র কামাবসায়িত্বং সত্যসংকল্পস্তা, যথাসংকল্পস্তথা ভূতপ্রকৃতীনামবস্থানম্ ; ন চ শক্তোঽপি পদার্থবিপর্যাসং করোতি ; তস্মাৎ অন্যস্য যত্র কামাবসায়িনঃ পূর্বসিদ্ধস্য তথাভূতেষু সংকল্পাদিতি। এতান্যষ্টাবৈশ্বর্যাণি।"

উদ্ধৃত ভাষ্যানুবাদ এইরূপ—অনুবৎ সূক্ষ্ম হওয়াকে অনিমা, লঘু হওয়াকে লঘিমা বলে। মহৎরূপ ধারণ করাকে মহিমা বলে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চন্দ্রস্পর্শ করিতে পারে। এইরূপ শক্তিমত্তাকে প্রাপ্তি বলে। অপ্রতিহত ইচ্ছাকে প্রাকাম্য বলে। জলের ন্যায় স্থলেও যোগিগণ উক্ত সিদ্ধিবলে উন্মজ্জন, নিমজ্জন করিতে পারে। পঞ্চভূত ও ভৌতিক সমস্ত পদার্থকে বশীভূত করা এবং অন্য কাহারো দ্বারা বশীভূত না হওয়াকে বশী বলে। সর্বভূত ও ভৌতিক পদার্থের উৎপত্তি, বিনাশ ও সংস্থান যদৃচ্ছাক্রমে করিতে পারাকে ঈশিত্ব বলে। কামনার নিশ্চিতত্ব অর্থাৎ সত্যসংকল্পতাকে যত্রকামাবসায়িত্ব বলে। তাহাতে সিদ্ধযোগী যেরূপ সংকল্প করেন, ভৌতিক প্রকৃতি তদ্রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; পরন্তু তদ্রূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও সিদ্ধযোগী পদার্থসমূহে বিপর্য্যয় উৎপাদন করেন না।

ইহার কারণ, পূর্বসিদ্ধ যত্রকামাবসায়িত্ববিশিষ্ট পরমেশ্বরের সংকল্প হেতু ভূত সকলের বর্তমান অবস্থা হয়েছে। অষ্টবিধ যোগৈশ্বর্য্য ব্যাখ্যাত হইল।

বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামীও এই অষ্টবিধ যোগ শক্তির উল্লেখ করেছেন ও বলেছেন, ভগবান কল্কিদেব এই অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রয়োগ করবেন। রাম ও কৃষ্ণ অবতারদ্বয় অণিমা ঐশ্বর্য্য প্রয়োগ করেন নি; কিন্তু কল্কি উহা প্রয়োগ করিবেন। যখন রামাবতারে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মহাকাশে অদৃশ্য হয়ে রামের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন রামচন্দ্র অণিমারূপ ঐশ্বর্য্য প্রয়োগ করেন নাই। ইহার ফলে রাম ও লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবাদি নাগপাশে বদ্ধ হন এবং গরুড় এসে তাঁহাদিগকে পাশমুক্ত করেন। কৃষ্ণাবতারে দেখা যায়, জরাসন্ধের সহিত কৃষ্ণ আঠার বার যুদ্ধ করেন, কিন্তু আঠার বার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন, তথাপি অণিমা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন নাই। আর কল্কিদেব অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রয়োগ করিবেন।

ভগবান কল্কিদেব শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় একশত পঁচিশবর্ষ পরমায়ু পাইবেন। তিনি রাম ও কৃষ্ণবৎ গৃহী থাকিবেন এবং তাঁহার সপ্তপত্নী, শত পুত্র ও একমাত্র কন্যা হইবে। কল্কির সপ্তপত্নী হইবেন, মথুরার পদ্মা, বৃন্দাবনের লক্ষ্মী, গুজরাটের নারায়ণী, পাঞ্জাবের কমলা, বিহারের সাবিত্রী, উড়িষ্যার সুভদ্রা ও বাঙলার বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁর দুই ভাইর নাম লক্ষ্মণ ও রামকৃষ্ণ এবং দুই ভগিনীর নাম সুভদ্রা ও সুপর্ণা। অর্জুনের ভগিনী সুভদ্রা ও জরাসন্ধের কন্যা অত্রি কল্কির দুই ভগিনীরূপে জন্মিবেন। বিভীষণের স্ত্রী সরমা কল্কিকন্যা শ্যামাঙ্গিনীরূপে পুনর্জন্ম 'লইবেন। ভাগবতোক্ত দেবপ্রিয় মহীপাল

মান্ধাতাপুত্র মুচুকুন্দ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার সহিত কল্কিকন্যা শ্যামাঙ্গিনীর পরিণয় হইবে। কল্কিযুগ রামযুগ বা কৃষ্ণযুগ অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী ও সুব্যাপক হইবে। কল্কিরাজ্য রামরাজ্য বা কৃষ্ণরাজ্য অপেক্ষা প্রসারিত হইবে। জয় ভগবান কল্কিদেবকি জয়।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের মধ্যভাগ হইতে কল্কিদেব আমাদের মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ইহার পর আমরা মন্দিরে সকালে ও সন্ধ্যায় পূর্ববৎ যখনই রামকৃষ্ণ নামকীর্তন করিতাম, তখনই মহর্ষি কশ্যপ আমাদিগকে ঐ কীর্তন করিতে নিষেধ করিতেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী সোমবার আমার আদি পিতা উপনিষৎকার ব্রহ্মজ্ঞ আরুণি এসে আমাকে বললেন, আজ থেকে এই নামকীর্তন তোমার মন্দিরে দুই বেলা করবে। ইহাতে চারি যুগের ইষ্টনাম সংযোজিত। উক্ত দিন হইতেই আমাদের মন্দিরে এই নামকীর্তন দুইবেলা চলিতেছে। এই কীর্তন গাহিয়াই আমরা সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ সমাপ্ত করিলাম।—

শিব কালী কল্কি কৃষ্ণ রাম।
কল্কি কৃষ্ণ রাধা সীতা রাম॥

বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী
কল্কিজন্মতিথি, ১৩৬৮

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
বেলুড়

পরিশিষ্ট

'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' অনুসারে কল্কিদেবের আবির্ভাব তিথি অগ্রহায়ণের শুক্লা তৃতীয়া। কিন্তু ইহা কল্কি পুরাণসম্মত নহে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের সৌর গণনা কৃষ্ণ বরাহ কল্প ও শ্বেত বরাহ কল্প অনুসারে নির্দিষ্ট করা হয়। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ভৃগুমুনি। তিনি সত্যযুগের শেষপাদে আবির্ভূত। ভৃগু সংহিতায় উক্ত কল্পদ্বয় উল্লিখিত। আধুনিক জ্যোতিষীগণ জানেন না, কখন উক্ত কল্পদ্বয়ের আরম্ভ ও সমাপ্তি হয়। এই হেতু বর্তমান জ্যোতিষ গণনায় ভ্রম দৃষ্ট হয়। ভৃগু সংহিতা অনুসারে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—চারি যুগের প্রথমার্ধে শ্বেতবরাহকল্প ও শেষার্ধে কৃষ্ণবরাহকল্প চলে। প্রত্যেক যুগের প্রথমার্ধে ধর্ম, শিক্ষাদি সর্ব বিষয়ে মানুষের উন্নতি দেখা যায় এবং শেষার্ধে এই সমস্ত বিষয়ের অবনতি ও ধ্বংস ঘটে। ভৃগু মতে কৃষ্ণবরাহ কল্পে মানুষের জীবনে যাবতীয় অসদ্‌গুণের আবির্ভাব ঘটে ও শ্বেতবরাহ কল্পে প্রত্যেক যুগের প্রথমার্ধে মানুষ সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী হয়। তাই প্রত্যেক যুগের শেষার্ধে মানুষ পশুবৎ আচরণ করে ও ধর্মগ্লানি উপস্থিত হয়। এইরূপ ব্যাপক অধর্মের প্রতিকার কোন মানুষ করিতে পারে না। তাই সেই সময় ভগবানের অবতার মর্ত্যে নেমে আসেন অধর্মের বিনাশ ও সদ্ধর্ম স্থাপনার্থ। সেইজন্য সত্যযুগের শেষার্ধে পরশুরাম, ত্রেতাযুগের শেষার্ধে রাম ও দ্বাপরের শেষার্ধে শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন এবং কলির শেষভাগে কল্কি আসবেন। কলিযুগের মাত্র এক অষ্টমাংশ বা ৩৪২৩০ মানুষী বৎসর অবশিষ্ট আছে, কারণ শাস্ত্র মতে কলিযুগের

পরিমাণ চার লক্ষ বত্রিশ হাজার মানুষী বৎসর। ইহার অর্থ, কলিযুগের কৃষ্ণবরাহ কল্পের অর্দ্ধাংশের অধিক অতীত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান জ্যোতিষীরা বলেন, এখনও শ্বেতবরাহ কল্প চলিতেছে। এই ত আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রের অবস্থা।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার সৌর গণনা শাস্ত্রোক্ত চতুর্যুগ ও ভারতীয় চন্দ্রসূর্য্য ধরিয়া পুরাণাদি অবলম্বনে করা হয়। আর 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' পাশ্চাত্য জ্যোতিষ বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমন্বয়ে বা সমীকরণে বা সংমিশ্রণে রচিত হয়েছে। এই জন্য ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার সহিত সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণনায় নানা বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। সূর্য্যোদয়, সুর্য্যাস্ত বা তিথি, সংক্রান্তি প্রভৃতি দুই পঞ্জিকায় পৃথক হয়। যখন ভারতে সূর্য্যাস্ত হয়, তখন আমেরিকায় সূর্য্যোদয় হয়। আর যখন ভারতে বেলা দশটা হয়, তখন ইংলণ্ডে সূর্য্যোদয় হয়। ভারতীয় সূর্য্যোদয়ের সহিত আমেরিকা ও ইংলণ্ডের পার্থক্য যথাক্রমে ১২ ঘণ্টা ও ৫ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। সেইজন্য আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সূর্য্য ধরিয়া ভারতীয় তিথি বা সূর্য্যোদয়াদির গণনা অনুচিত। হিন্দু শাস্ত্রে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্যচন্দ্রাদি নির্দেশিত। 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' পূর্বোক্ত প্রকার গণনা করায় ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার সহিত ইহার পার্থক্য সৃষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় পঞ্জিকা ভারতীয় সূর্য্যচন্দ্রাদি ধরিয়া করলে উক্ত ভেদ অপসৃত হইবে।

সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র কপিলের কোপে ধ্বংস হবার পর সগরের বংশধর কপিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে উহাদের উদ্ধার হইবে? কপিল উত্তর দিলেন, স্বর্গ থেকে গঙ্গা নামিয়ে এনে

সাগরে সঙ্গত করিলে উহারা উদ্ধার পাইবে। সত্যযুগের শেষ পাদের প্রথম ভাগে উক্ত দুর্ঘটনা ঘটে। তৎপরে সগরের বংশধরগণ কপিলাদেশ অনুসারে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারার্থ স্বর্গ থেকে মর্ত্যে গঙ্গা আনিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। ত্রেতাযুগের দিব্য দেড় হাজার বৎসর থাকিতে চন্দ্রবংশীয় মহারাজা ভগীরথ গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামিয়ে আনেন। তৎপূর্বে গঙ্গা বিরজা কর্তৃক শাপগ্রস্তা হয়েছিলেন মর্ত্যলোকে অবতরণার্থ। যখন গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে মর্ত্যে অবতরণার্থ বিদায় নেন, তখন তিনি বিষ্ণুকে সাশ্রু নয়নে জিজ্ঞাসা করেন, প্রভো, কতদিনে আবার আপনার পাদপদ্মে ফিরে আসবো ? তখন বিষ্ণু গঙ্গাকে বলেন, তুমি পাঁচ হাজার বৎসর মর্ত্যবাসান্তে আমার নিকট ফিরিবে। তখন মর্ত্যে তোমার গঙ্গাদেহ শুষ্কপ্রায় হইবে। বিষ্ণুকথিত মর্ত্যে গঙ্গার অবস্থানকাল দিব্য পাঁচ হাজার বৎসর। ইতিমধ্যে উক্ত কাল অতীত হয়েছে ও গঙ্গা মর্ত্য ছেড়ে স্বর্গে ফিরে গেছেন। তাই অধুনা মর্ত্যগঙ্গা নানাস্থানে শুষ্কপ্রায়। গঙ্গার মর্ত্যআয়ুষ্কাল ত্রেতার ১৫০০ দিব্য বৎসর, দ্বাপরের ২৪০০ দিব্য বৎসর ও কলির ১১০০ দিব্য বৎসর = মোট পাঁচ হাজার দিব্যবর্ষ গত হয়েছে। অথচ জ্যোতিষ শাস্ত্র এই পাঁচ হাজার বৎসরকে মানুষী বৎসর ধরিয়া হিসাব করেন। অধুনা কলিযুগের শেষার্ধে কৃষ্ণবরাহ কল্প চলিতেছে—এইরূপ গণনা ধরিলে উক্ত ভ্রম হইত না। অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও উক্ত ভ্রমে পড়ে গীতার কাল নির্ণয়ে অসমর্থ। উক্ত দিব্য পাঁচ হাজার বর্ষের মানুষী বৎসর হিসাবে ৫০০০ × ৩৬০ = ১৮০০০০০ বা আঠার লক্ষ মানুষী বৎসর মর্ত্যগঙ্গার আয়ুষ্কাল। যেখানে আঠার লক্ষ বর্ষ হবে,

সেখানে ভ্রান্ত অজ্ঞ পণ্ডিতগণ মাত্র পাঁচ হাজার বৎসর ধরেছেন। এই প্রত্যক্ষ প্রাকৃত প্রমাণও জ্যোতিষীরা স্বীকার করেন না। কলিযুগের ৯৫॥০ দিব্য বৎসর বাকী আছে। আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে কলিযুগের দীর্ঘকাল অবশিষ্ট আছে। সত্যযুগের প্রথমার্ধে যখন কারণ সলিল থেকে ভগবান বরাহমূর্তি ধরে পৃথিবীকে উত্তোলন করেন, তখন মহামুনি ভৃগু পৃথিবীর জন্মকাল স্থির রাখার জন্য বরাহকল্প নাম দিলেন। আবার পৃথিবীর চারি যুগের কর্মধারা নির্দ্দেশার্থ কৃষ্ণবরাহ কল্প ও শ্বেতবরাহ কল্পে প্রত্যেক যুগ বিভক্ত করিলেন। বরাহ শ্বেত ও কৃষ্ণ দ্বিবিধ দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত বরাহ শ্বেত ও কৃষ্ণই দেখা যায়, অন্য বর্ণের বরাহ দেখা যায় না। ৭ই মে সোমবার সন্ধ্যার পরে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে ধর্মচক্রের ট্রাস্ট বোর্ডের ত্রিংশ অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন স্বামী ভৈরবানন্দ। তখন তিনি আমাদিগকে শ্বেত ও কৃষ্ণ বরাহ কল্পদ্বয় সম্বন্ধে ব্যাসকথিত যুগতত্ত্ব বলিতেছিলেন। তৎকালে শ্বেত ও কৃষ্ণ বরাহযুগল দিব্যদেহে এসে তাঁর পার্শ্বে আবির্ভূত হলেন এবং মৎসমীপে উপবিষ্টা মহাগৌরী ঐ বরাহ যুগলকে স্থূল বরাহবৎ স্পষ্ট পূর্ণমূর্তিতে দেখিলেন। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, শ্বেত ও কৃষ্ণ দিব্য বরাহদ্বয় অবশ্যই বর্তমান।

এই বরাহ কল্পের গণনা ভ্রান্ত থাকায় কল্কিদেবের জন্মতিথি সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে অগ্রহায়ণের শুক্লা তৃতীয়া হইয়াছে। কল্কিপুরাণে আছে, দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মাধবে মাসি মাধবঃ। ইহার অর্থ, মধুমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে কল্কিদেব অবতীর্ণ হবেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগ দৃষ্টিতে জানিয়া বলেন, বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশীই কল্কি জন্ম তিথি।

শতাধিক মন্ত্রমালা

যে দেবতার যে বীজমন্ত্র তাহা তন্নামপার্শ্বে উল্লিখিত হইল।

১। অপরাজিতা—ওঁ অং অপরাজিতাদেব্যৈ নমঃ।

২। গণেশ—ওঁ গং সর্বসিদ্ধিদাতা-গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ।

৩। কার্তিক—ওঁ কং দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ায় নমঃ।

৪। কৌমারী—ওঁ কীং কৌমারীদেব্যৈ নমঃ।

৫। সূর্য্য—ওঁ গৌং গগনদেবায় নমঃ।

৬। কল্কি—ওঁ কৌং কল্কিদেবায় নমঃ।

৭। ব্রহ্মাণী—ওঁ বৌং ব্রহ্মাণীদেব্যৈ নমঃ।

৮। বৈষ্ণবী—ওঁ বীং বৈষ্ণবীদেব্যৈ নমঃ।

৯। বারাহী—ওঁ বাং বারাহীদেব্যৈ নমঃ।

১০। নারসিংহী—ওঁ নাং নারসিংহীদেব্যৈ নমঃ।

১১। মাহেশ্বরী—ওঁ মাং মাহেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ।

১২। ইন্দ্রাণী—ওঁ ইং ইন্দ্রাণীদেব্যৈ নমঃ।

১৩। চামুণ্ডা—ওঁ হ্রীং চৌং চামুণ্ডাদেব্যৈ নমঃ।

১৪। নরসিংহ—ওঁ নং নরসিংহদেবায় নমঃ।

১৫। রামচন্দ্র—ওঁ শ্রীরামচন্দ্রদেবায় নমঃ।

১৬। উত্তরবাহিনী—ওঁ শ্রীশ্রীউত্তরবাহিন্যৈ নমঃ।

১৭। শংখিনী—ওঁ শ্রীং শংখিনীদেব্যৈ নমঃ।

১৮। কামধেনু—ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং কামধেনু (বা সবলা) দেব্যৈ নমঃ।

১৯। গৌরী—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং গৌরীদেব্যৈ নমঃ।

২০। শূলধারিণী—ওঁ শৌং শূলধারিণ্যৈ দেব্যৈ নমঃ।

২১। বামন—ওঁ বং বামনদেবায় নমঃ।

২২। কৃষ্ণ—ওঁ ক্লীং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

২৩। শিব—ওঁ শিবায় নমঃ।

২৪। দুর্গা—ওঁ হ্রীং দুর্গাদেব্যৈ নমঃ।

২৫। বিষ্ণু—ওঁ বং নমো ভগবতে বিষ্ণুদেবায় নমঃ।

২৬। গঙ্গা—ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ

২৭। জগদ্ধাত্রী—ওঁ ঐঁ জগদ্ধাত্রীদেব্যৈ নমঃ।

২৮। কালী—ওঁ ক্রীং বা হ্রীং কালিকায়ৈ নমঃ।

২৯। লক্ষ্মী—ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।

৩০। সরস্বতী—ওঁ ঐং শ্রীং সরস্বতীদেব্যৈ নমঃ।

৩১। ব্রহ্মা—ওঁ ব্রৌং ব্রহ্মণে নমঃ।

৩২। মাতঙ্গী—ওঁ মৌং মাতঙ্গীদেব্যৈ নমঃ।

৩১। বগলা—ওঁ বৌং বগলাদেব্যৈ নমঃ।

৩২। শীতলা—ওঁ রিং শীং শীতলাদেব্যৈ নমঃ।

৩৩। ষষ্ঠী—ওঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ

৩৪। বায়ু—যং বায়বে বা বায়ুদেবায় নমঃ।

৩৫। অগ্নি—ওঁ রং অগ্নিদেবায় নমঃ।

৩৬। ইন্দ্র—ওঁ ঈং ইন্দ্রদেবায় নমঃ।

৩৭। তারা—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং তারায়ৈ নমঃ।

৩৮। ভুবনেশ্বরী—ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ভুবনেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ।

৩৯। ষোড়শী—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্রীং ক্লীং ষোড়শীদেব্যৈ নমঃ।

৪০। ছিন্নমস্তা—ওঁ ছোং ছিন্নমস্তাদেব্যৈ নমঃ।

৪১। ভৈরবী—ওঁ ভোং ভৈরবীদেব্যৈ নমঃ।

৪২। ধূমাবতী—ওঁ ধোং ধূমাবতীদেব্যৈ নমঃ।

৪৩। ক্ষিপ্তেশ্বরী—ওঁ খোং ক্ষিপ্তেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ।

৪৪। রম্ভা—ওঁ রৌং রম্ভাদেব্যৈ নমঃ।

৪৫। দক্ষিণা—ওঁ শ্রীং ক্লীং হ্রীং দক্ষিণাদেব্যৈ নমঃ।

৪৬। মহাসরস্বতী—ওঁ হ্রীং শ্রীং মহাসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ।

৪৭। কমলা—ওঁ শ্রীং কমলাদেব্যৈ নমঃ।

৪৮। মাধব—ওঁ মং মাধবায় নমঃ।

৪৯। কেশব—ওঁ কং কেশবায় নমঃ।

৫০। বাসুদেব—ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ।

৫১। নারায়ণ—ওঁ নং নারায়ণায় নমঃ।

৫২। মহাবিষ্ণু—ওঁ মাং মহাবিষ্ণুদেবতায়ৈ নমঃ।

৫৩। রবিগ্রহ—ওঁ রৌং রবিগ্রহায় নমঃ।

৫৪। সোমগ্রহ—ওঁ সৌং সোমগ্রহায় নমঃ।

৫৫। মঙ্গলগ্রহ—ওঁ মং মঙ্গলগ্রহায় নমঃ।

৫৬। বুধগ্রহ—ওঁ বৌং বুধগ্রহায় নমঃ।

৫৭। বৃহস্পতিগ্রহ—ওঁ বাং বৃহস্পতিগ্রহায় নমঃ।

৫৮। শুক্রগ্রহ—ওঁ শৌং শুক্রগ্রহায় নমঃ।

৫৯। শনিগ্রহ—ওঁ সাং শনিগ্রহায় নমঃ।

৬০। রাহুগ্রহ—ওঁ রাং রাহুগ্রহায় নমঃ।

৬১। কেতুগ্রহ—ওঁ কোং কেতুগ্রহায় নমঃ।

৬২। আশুতোষ—ওঁ অং আশুতোষায় নমঃ।

৬৩। পশুপতি—ওঁ পং পশুপতয়ে নমঃ।

৬৪। জলেশ্বর—ওঁ জং জলেশ্বরায় নমঃ।

৬৫। নাগেশ্বর—ওঁ নং নাগেশ্বরায় নমঃ।

৬৬। পরমেশ্বর—ওঁ পিং পরমেশ্বরায় নমঃ।

৬৭। ঈশান—ওঁ ঈং ঈশানায় নমঃ।
৬৮। অঘোর—ওঁ আং অঘোরায় নমঃ।
৬৯। ভৈরব—ওঁ হৌং ভৈরবায় নমঃ।
৭০। কালভৈরব—ওঁ কাং কালভৈরবায় নমঃ।
৭১। জগদীশ্বর—ওঁ জোং জগদীশ্বরায় নমঃ।
৭২। নির্জলেশ্বর—ওঁ নীং নির্জলেশ্বরায় নমঃ।
৭৩। অন্নপূর্ণা—ওঁ আং হ্রীং অন্নপূর্ণাদেব্যৈ নমঃ
৭৪। মনসা—ওঁ মিং মনসাদেব্যৈ নমঃ
৭৫। মহাকাল—ওঁ হুং মহাকালভৈরবায় নমঃ
৭৬। রাধিকা—ওঁ শ্রীং শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ
৭৭। সীতা—ওঁ সীতায়ৈ নমঃ।
৭৮। সাবিত্রী—ওঁ সৌং সাবিত্রীদেব্যৈ নমঃ
৭৯। গায়ত্রী—ওঁ গায়ত্রীদেব্যৈ নমঃ
৮০। বাণলিঙ্গ—ওঁ বাণেশ্বরায় বাণলিঙ্গায় নমঃ
৮১। বিশ্বকর্মা—ওঁ বীং বিশ্বকর্মণে নমঃ
৮২। যমুনা—ওঁ ঔং যমুনায়ৈ নমঃ
৮৩। গোদাবরী—ওঁ গোদাবরীদেব্যৈ নমঃ
৮৪। নর্মদা—ওঁ নর্মদাদেব্যৈ নমঃ
৮৫। সিন্ধু—ওঁ সিন্ধুদেব্যৈ নমঃ
৮৬। কাবেরী—ওঁ কাবেরীদেব্যৈ নমঃ
৮৭। বাসুকী—ওঁ বং বাসুকীদেবায় নমঃ
৮৮। বাস্তুদেবতা—ওঁ বং বাস্তুদেবায় নমঃ
৮৯। অনন্ত—ওঁ অনন্তায় নমঃ
৯০। কূর্ম—ওঁ কূর্মায় নমঃ
৯১। বরাহ—ওঁ বরাহদেবায় নমঃ
৯২। হংস—ওঁ হং হংসায় নমঃ।

৯৩। মৎস্য—ওঁ মুং মৎস্যায় নমঃ
৯৪। মহামায়া—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং মহামায়াদেব্যৈ নমঃ
৯৫। মহালক্ষ্মী—ওঁ ঐঁ শ্রীং মহালক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ
৯৬। মহাকালী—ওঁ ঐঁং হ্রীং মহাকালীদেব্যৈ নমঃ
৯৭। প্রকৃতি—ওঁ প্রকৃতিদেব্যৈ নমঃ
৯৮। পৃথিবী—ওঁ ঐং হ্রীং ক্রৌং পৃথিবীদেব্যৈ নমঃ।
১০০। আধার শক্তি—ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে নমঃ
১০১। গন্ধেশ্বরী—ওঁ ঐঁ গন্ধেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ
১০২। খড়্গাধারিণী—ওঁ খূং খড়্গাধারিণীদেব্যৈ নমঃ
১০৩ মৃগবাহিণী—ওঁ যং মৃগবাহিনীদেব্যৈ মমঃ
১০৪। কৌবেরী—ওঁ কূং কৌবেরীদেব্যৈ নমঃ
১০৫। মাকড়চণ্ডী—ওঁ হ্রীং মাকড়চণ্ডীদেব্যৈ নমঃ
১০৬। মহিষাসুর—ওঁ মুং মহাভক্তায় মহিষাসুরায় নমঃ
১০৭। সিদ্ধকালী—ওঁ ক্রীং সিদ্ধকালী দৈব্যৈ নমঃ

বর্তমান বঙ্গদেশের কোন কোন ধর্মগুরু ওঁ ভগবতে মহম্মদায় নমঃ মন্ত্রে মুসলমান ভক্তবৃন্দকে এবং ওঁ ভগবতে জীশুখ্রীষ্টায় নমঃ মন্ত্রে খ্রীষ্টানগণকে দীক্ষা দিয়া থাকেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, "এই দুই মন্ত্র অসিদ্ধ ও অশুদ্ধ" তিনি ব্যাসদেবের নিকট জেনে ১৬ই মে বুধবার পূর্বাহ্নে ১৯৬২ খ্রীঃ বেলুড় ধর্মচক্রে আমার নিকট বলেন, "মুসলমান ভক্তবৃন্দের ইষ্টমন্ত্র—ইআল্লা মহম্মদ বিসমিল্লা এবং খ্রীষ্টান ভক্তবৃন্দের ইষ্টমন্ত্র—O my God our Christ, এই মন্ত্রদ্বয় জপ করিলে জপজাত ধ্বনি ও বায়ু বিষ্ণুপদ (যেখানে সুষুম্না নাড়ী শেষ প্রান্ত) পর্য্যন্ত উঠে। এই দুই সিদ্ধমন্ত্র জপ করিলে ইষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে।" পূর্বোক্ত তারিখে মন্ত্রদ্রষ্টা ভৈরবানন্দ মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় চেয়ারে বসে উল্লিখিত মন্ত্রমালার প্রায় সব দেবতাকে ডেকে স্ব স্ব মন্ত্র জানিয়া আমাকে বলেন ও আমি প্রত্যেক মন্ত্র সংশোধন করিয়া লই।

দি ব্য দৃ ষ্টি

এক

দিব্যদৃষ্টি

দেবপূজার সময় মূলমন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্য বিঘ্নের নাশ বিহিত। মহাভারতে আছে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্যাসদেব অন্ধরাজকে মহাযুদ্ধ দর্শনার্থ দিব্যচক্ষু দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহা লইতে সম্মত হন নাই; কারণ স্বচক্ষে আত্মীয় স্বজনের বিনাশ দর্শনে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। সেইজন্য ব্যাসদেব কুরুরাজের অভিজ্ঞ অমাত্য সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু প্রদান করেন। সঞ্জয় ইন্দ্রপ্রস্থে বসিয়াই দিব্যদৃষ্টিতে কুরুক্ষেত্রে মহারণ দর্শনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বিবৃত করেন। গীতার একাদশ অধ্যায়ে আছে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের অভিলাষী হইলে ভগবান তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দান করেন। সেই দিব্যচক্ষু সহায়ে অর্জ্জুন ভাগবত বিশ্বরূপ দর্শনে সমর্থ হন।

কেবল দিব্যচক্ষুতে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়, চর্ম্মচক্ষুতে নহে। টেলিস্কোপ সহায়ে সুদূর আকাশে গ্রহতারকাদি জ্যোতিষ্ক দেখা যায়। টেলিভিশনে কলিকাতায় বসিয়া লণ্ডন বা মস্কো বা ওয়াশিংটনের সিনেমা বা জনসভা দর্শন সম্ভব। এই সকল সুপ্রসারিত স্থূলদৃষ্টি চর্ম্মচক্ষুরই কার্য্য, দিব্যচক্ষুর নহে। তবে দিব্যচক্ষু কি? আর দিব্যদৃষ্টি কিরূপ? যোগশাস্ত্রে দিব্যচক্ষু ও দিব্যদৃষ্টির সংজ্ঞা এইরূপ দেখা যায়। যখন ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত দ্বিদল আজ্ঞাচক্রে মন উঠে, তখন এই দিব্যচক্ষু লাভ হয়। দিব্যচক্ষুকে প্রজ্ঞানেত্র বা জ্ঞানচক্ষুও বলে। সর্ব্বশাস্ত্রে এই জ্ঞানচক্ষু উল্লিখিত। জ্ঞানচক্ষু বা প্রজ্ঞানেত্র অর্থে জ্ঞানই চক্ষু বা প্রজ্ঞাই নেত্র। এই অপ্রাকৃত চক্ষু দ্বারা

পৃথিবীতে থাকিয়াই স্বর্গলোক বা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সপ্তস্বর্গ বা সর্ব উর্দ্ধলোকের বাহ্যাভ্যন্তর স্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। যোগবলে নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেই এই চক্ষুলাভের অধিকারী হন। গীতায় জ্ঞানচক্ষু দুইবার (১৩।৩৫ ও ১৫।১০) এবং দিব্য চক্ষু একবার (১১।৮) ব্যবহৃত। প্রথম দুই স্থানে ভগবান বলেন, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে দেহ ও দেহীর প্রভেদ এবং জীবাত্মার স্বরূপ বোঝা যায়। দিব্য দৃষ্টি দ্বারা আমাদের জীবনে যে সকল অদ্ভুত দর্শন ঘটিয়াছে, তাহাদের আংশিক বিবরণ এই পুস্তকে প্রকাশিত হইতেছে।

সন ১৩৬৫ সালের ১০ই আশ্বিন (১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর) সোমবার বৈকাল ৪টায় বেলুড় ধর্ম্মচক্র হইতে স্বামী ভৈরবানন্দ ও বিশ্বরূপানন্দকে সঙ্গে লইয়া বেলুড় মঠের কাছে ৺গঙ্গা পার হইয়া গঙ্গাতীরস্থ কাশীপুর মহাশ্মশানে উপস্থিত হইলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা পাঁচটা হইবে। আমরা দেখিলাম, শ্মশানের দক্ষিণ প্রান্তে দুই চুল্লীতে চিতার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে এবং দুটি শব সদ্য চিতায় চড়ান হইয়াছে। দুই চিতার ৫।৬ হাত দূরে দুই শবের সূক্ষ্ম দেহ বা প্রেতাত্মা স্ব স্ব স্থূল দেহের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া দণ্ডায়মান! তাহাদের পশ্চাতে ভীষণাকৃতি কৃষ্ণকায় এক এক জটাধারী যমদূত অবস্থিত !! ঐ দুই যম দূতের বড় বড় দুই চোখ ও হাতে সুদীর্ঘ ত্রিশূল। আমরা তিন সাধু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধিপীঠের সমীপে জপধ্যানে বসিলাম। যখন আমাদের জপধ্যান অত্যন্ত গভীর হইল, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ "দিব্যদেহে আসিয়া সমাধিপীঠের উপর দাঁড়াইলেন। আমাদের কাতর প্রার্থনায় শ্রীমা সারদাও আকাশমার্গে আসিয়া ঠাকুরের বামপার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন। অনন্তর উভয়ের মধ্যে করালবদনা শ্মশানকালীকে দেখা গেল। আমাদের জপধ্যান সমাপনান্তে আমরা প্রেমভরে নিম্নলিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ নামকীর্ত্তন করিলাম।—

(জয় জয়) রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রাম॥

তখন আমার বাম দিকে ৫।৬ হাত দূরে পূর্ব্বদৃষ্ট প্রেতদ্বয় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে উল্লিখিত যমদূতদ্বয়ও আসিলেন।

আমাদের প্রথম কীর্ত্তন সমাপ্ত হইতেই দুই প্রেত কিঞ্চিৎ জ্যোতির্ম্ময় দেহে উর্দ্ধগামী হইলেন। যখন দ্বিতীয় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, তখন দুই যমদূত আমার দিকে ক্রুদ্ধ ও রক্ত চক্ষুতে ত্রিশূল তুলিলেন। অবিলম্বে ভৈরবানন্দ সর্ব্বশক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক হাত তুলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতেই তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন। তিনবার নাম কীর্ত্তনান্তে অচিরে ৺গঙ্গাদর্শন এবং শ্মশানস্থ অভেদানন্দজী, শ্রীমা ও গৌরীমার সমাধিত্রয়ে প্রণাম করিয়া আমরা বরাহনগরস্থ রামকৃষ্ণ সেবায়তনে উপনীত হইলাম। সেদিন তথায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর বেদান্তকেশরী অভেদানন্দ স্বামীজীর ৯৩ তম জন্মোৎসব হইতেছিল। তথায় উক্ত মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দজীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলাম। তাঁহার সঙ্গে বহু পুণ্য স্মৃতি আলোচিত হইল। যে রাত্রে স্বামী অভেদানন্দের স্থূলদেহ পূর্ব্বোক্ত শ্মশানে ভস্মীভূত হয়, সেই রাত্রে আমরা উভয়ে তথায় উপস্থিত ছিলাম। অনন্তর সান্ধ্য সভায় আমি পূজ্যপাদ অভেদানন্দ মহারাজ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদানান্তে বেলুড় ধর্মচক্রে ফিরিয়া আসিলাম।

কাশীপুর মহাশ্মশানে যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল, তাহা অতিশয় অর্থপূর্ণ। রামকৃষ্ণ নাম এই যুগের মহামন্ত্র। ইহা শ্রবণমঙ্গল ও পাপনাশক। উল্লিখিত নামকীর্ত্তন বেলুড় ধর্মচক্রে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সমস্বরে গীত হয়। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ১৩৬১ সালে এই কীর্ত্তন দৈব প্রেরণায় আবিষ্কৃত হয়। ধর্মচক্র ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল রবিবার প্রতিষ্ঠিত হয়। তথায় সকালে ও সন্ধ্যায় জপকালে আমি ভাবিতাম, কৃষ্ণভক্ত প্রেমভরে গাহিয়া থাকেন—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥

আবার রামভক্তও ভক্তিভরে প্রত্যহ কীর্ত্তন করেন—

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।
পতিতপাবন সীতারাম॥

আর রামকৃষ্ণভক্ত হাততালি দিয়া বা করতাল বাজাইয়া কোন্ নাম কীর্ত্তন করিবে? অথচ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ মুখে সকালে ও সন্ধ্যায় হাততালি দিয়া নামকীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। কিছুকাল এই চিন্তা চলিবার পর পূর্বোক্ত কীর্ত্তন আমার মানস নয়নে ভাসিয়া উঠে ও তাহাতে আমি সুর-যোজনা করি। ইহাই প্রত্যহ করতাল বাজাইয়া আমরা কীর্ত্তন করি। এই কীর্ত্তন কলিকাতায় ও সারা বাংলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মদীয় গুরুদেব মহাপুরুষজীও বলিতেন, "এই যুগে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ নামেই সুপ্রসন্ন হন। এই মহানামই নবযুগের সিদ্ধমন্ত্র। ইহাকে বীজযুক্ত না করিলেও চলে। এই নাম জপে পাপক্ষয় ও ভক্তিলাভ হয়।" গুরুবাক্যের সত্যতা পূর্বোক্ত ঘটনায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত। উক্ত নামের মহাশক্তি প্রমাণার্থ এই অধ্যায়ে আরও দুইটি ঘটনা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইতেছে। উক্ত নাম শ্রবণে জীবিত ব্যক্তির ত কথাই নাই, 'প্রেতগণের' পাপক্ষয় ও উর্দ্ধগতি হয়। যখন বেলুড় ধর্মচক্রের দ্বিতলস্থ মন্দিরে সকালে ও সন্ধ্যায় উক্ত নাম কীর্ত্তন করি, তখন আমরা দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাই, মন্দিরের চারি পাশে বহু প্রেত করযোড়ে দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে উহা শুনিতেছেন।

সন ১৩৬৫ সালের ২৬ অগ্রহায়ণ (১২ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) শুক্রবার মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য উত্তরপাড়ায় কোন তরুণ বন্ধুর বাসাবাড়ীতে আমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। উক্ত উদ্দেশ্যে সকাল ৯টায় আমি ও স্বামী ভৈরবানন্দ উভয়ে ধর্মচক্র হইতে বাসে চড়িয়া বালি খালে নামিলাম। তথায় উক্ত বন্ধু আসিয়া আমাদের সঙ্গী হইলেন। আমরা তিনজন

বিবেকানন্দ মহাসেতু পার হইয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ফটকে পৌঁছিলাম ও তীর্থরেণু মাথায় লইলাম। ফটকের উপরে মহাকাল ভৈরবকে দেখা গেল। সেই রুদ্রমূর্ত্তি চতুর্ভুজ, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত এবং শূল, খড়্গ, ডমরু ও পরশু চারি অস্ত্র চারি হাতে শোভিত, রক্তাভ বিদ্যুৎবর্ণ, মাথায় উর্দ্ধ জটা জাল পাঁচ হাত লম্বা ও বেশ মোটা বৃহৎ সর্প এবং গলায় সাপ, নরমুণ্ড ও হাড়ের মালা। অনন্তর স্থানীয় দোকানে ফুল, মিষ্টি ও মালা কিনিয়া আমরা মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ঢুকিলাম ও প্রথমে কালী মন্দিরে গেলাম। উক্ত মন্দিরের দরজার সম্মুখে দণ্ডায়মান নরনারীগণের পশ্চাতে আমরা নীরবে রহিলাম ও দেখিলাম, মন্দিরমধ্যস্থ বেদীতে মা কালী বিদ্যুৎবর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্তিতে বিরাজমানা ও তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই যোগিনী অবস্থিতা। আমাদের তরুণ সঙ্গী পূজারীকে পূজোপকরণ ও দক্ষিণাদি দিলেন। আমি মন্দিরদ্বারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে জপে বসিলাম ও ভৈরবানন্দ আমার পাশে ধ্যানমগ্ন হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। যখন আমি কালীমন্ত্র জপে ও কালীমূর্ত্তি ধ্যানে মগ্ন হইলাম, তখন আমার সম্মুখে মা ভবতারিণী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে আসিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া কৃপাপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখনও তাঁহার দুই পাশে পূর্ব্বোক্ত যোগিনীযুগল ছিলেন। যোগিনীদ্বয় রক্তাভ, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ও ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানা, তাঁহাদের মুখের দুই কোন দিয়া টাট্‌কা রক্ত ঝরিতেছিল, গাত্রে কোন বস্ত্র বা অলঙ্কার ছিল না। তাঁহারা এলোকেশী, সিঁতিতে সিঁদুর, স্তনদ্বয় দোদুল্যমান, নরবৎ উচ্চাকার, দ্বিনয়না ও হাতে রক্তলিপ্ত খড়্গ। তৎপরে জগন্মাতা ভবতারিণী সিদ্ধভক্ত ভৈরবানন্দকে আশীর্ব্বাদ ও স্নেহাদর করিলেন। সেই সুশুভ সময়ে কোন অজ্ঞ পূজারী আমার সম্মুখে হঠাৎ আসায় মহাদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। দীক্ষিত তরুণ সঙ্গী মন্ত্রজপে তন্ময় হইয়া ভৈরবানন্দের পাশে দাঁড়াইয়া ঢুলিতেছিল। অনন্তর আমরা কালীমন্দির তিনবার মন্ত্রজপ সহকারে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে গেলাম। তথা হইতে বিষ্ণুমন্দিরে

যাইয়া আমরা ভক্তিভরে দেবতাকে প্রণাম করিলাম। উক্ত মন্দির মধ্যে শ্রীরাধার বিশেষ প্রকাশ ও শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ অনুভব করিলাম। মন্দিরদ্বারের সম্মুখে বসিয়া অনেকে জপধ্যান করিতেছিলেন। উহার উত্তর পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র কক্ষে ভগ্নপদ গোবিন্দজী বিরাজিত আছেন। তথায় প্রণামান্তে গোবিন্দজীর বিশেষ প্রকাশ দর্শনে আমরা বিস্মিত হইলাম। এই মূর্তিই শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক পূজিত। বিষ্ণু মন্দির প্রদক্ষিণকালে ভোগবাড়ীতে সূক্ষ্ম শরীরে কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাত্রী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণিকে দেখা গেল। পূর্ববৎ ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি ভোগরান্নার সুব্যবস্থা করিতেছেন। স্থূলদেহে যেরূপ করিতেন, সূক্ষ্মদেহেও তদ্রূপই করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, রাণী রাসমণি মা কালীর অষ্ট নায়িকার একজন। তৎপরে আমরা দ্বাদশ শিবমন্দির দর্শনে গেলাম ও দক্ষিণ দিক হইতে ছয় শিব লিঙ্গকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলাম। তখন দেখা গেল, প্রত্যেক শিবলিঙ্গের মধ্যে ধ্যানমগ্ন দ্বিভুজ শিবের জীবন্ত প্রকাশ। অনন্তর চাঁদনীর উত্তরে ছয় শিব দর্শনে চলিলাম। প্রথম তিন মন্দিরে উক্ত ভাবে শিবের প্রকাশ উপলব্ধ হইল। নকুলেশ্বর শিবমন্দিরে দেখা গেল, রক্তবর্ণ রুদ্রমূর্তি মহাদেব, যিনি মণিপুর চক্রে থাকেন। নাগেশ্বর মন্দিরেও শিবের বিশেষ প্রকাশ সংদৃষ্ট হইল। নাগেশ্বর জ্যোতির্ময় দশভুজ পঞ্চানন মহাদেব বিশুদ্ধচক্রে বিরাজ করেন। অবশেষে নির্জলেশ্বর মন্দিরে যাইয়া আমরা বিদ্যুদ্বর্ণ জ্যোতিঃ-প্রকাশ মহাদেব দর্শন করিলাম। ইনি সহস্রারে ব্রহ্মরন্ধ্রে অধিষ্ঠিত থাকেন। স্বামী ভৈরবানন্দ উক্ত শিবলিঙ্গে স্বীয় মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্র ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। তখন সেই বৃহৎ লিঙ্গ চুম্বকবৎ তাঁহার মস্তক আকর্ষণ করিলেন। উক্তকালে সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দের শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তৎপরে আমরা উত্তর ফটক দিয়া বাহিরে আসিলাম ও পশ্চিম দ্বার দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুত কক্ষে ঢুকিলাম ও দেখিলাম, বড় তক্তাপোষের উপরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা পাশা পাশি বসিয়া আছেন। ভক্তিমান তরুণ সঙ্গী

ফুলের মালা ও নৈবেদ্য ঠাকুরের খাটের সম্মুখে রাখিলেন। সেই সময়ই পূজারী হাত-মুখ ধুইতে গেলেন। তখন ঠাকুর স্বয়ং তক্তাপোষ হইতে নামিয়া ছোট খাটে বসিলেন ও স্বহস্তে ভক্তদত্ত পুষ্পমাল্য তুলিয়া গলায় পরিলেন। আমরা তৎক্ষণাৎ মনে মনে ঠাকুরকে নৈবেদ্য নিবেদন করিলাম! ধর্মান্ধ অর্বাচীন পূজারী আসিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর তাহা গ্রহণ ও ভক্ষণ করিলেন। তৎপরে আমরা যেখানে ধ্যানস্থ ছিলাম, তথায় জ্যোতির্ম্ময় মূর্তিতে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তক্তাপোষে বসিলেন। সেই সময় পূজারী আসিয়া নিবেদিত নৈবেদ্য পুনরায় নিবেদন করিলেন! অধুনা সমস্ত মন্দিরেই এইরূপ অবস্থা চলিতেছে!! আমরা পশ্চিম দ্বার দিয়া গোল বারন্দায় যাইয়া ঠাকুরকে জ্যোতির্ম্ময় মূর্তিতে পুনরায় দেখিলাম। সেখান হইতে চাঁদনীর ঘাটে যাইয়া গঙ্গাস্পর্শান্তে আমরা উত্তর নহবতে গেলাম। সেখানে নমস্কারান্তে দেখিলাম, তথায় শ্রীমার প্রকাশ কিছুই নাই। তৎপরে রাণী রাসমণির মর্ম্মর মূর্তিতে প্রসাদী পুষ্প দিলাম। তথা হইতে পঞ্চবটীর পার্শ্বস্থ সমাধি কুটীরে যাইয়া প্রণামান্তে দর্শন করিলাম তোতাপুরী, শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাধক ভৈরবকে। উক্ত ভৈরব চতুর্ভুজ ও অস্ত্রহীন। সেখান হইতে আমরা পঞ্চবটীতে গেলাম। তথায় প্রণামান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে পূর্ব্বমুখী হইয়া ধ্যানমগ্ন দেখা গেল। মূল পঞ্চবটীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে তোতাপুরী দিব্যদেহে স্বীয় সিদ্ধাসনে অদ্যাপি বিদ্যমান। আমরা তথায় ভূমিষ্ঠ হইয়া পূতরজঃ মাথায় লইলাম। তোতাপুরী কর্তৃক দষ্ট ব্রহ্মদৈত্যকে পঞ্চবটীতে দেখা গেল না। সর্ব্বশেষে আমরা বেলতলায় গেলাম ও তথায় শ্রীরামকৃষ্ণকে উত্তরমুখী হইয়া ধ্যানমগ্ন দেখিলাম। ইহা দ্বারা প্রত্যয় জন্মে, লীলাস্থলে অবতার পুরুষ লীলাদেহে চিরকাল বিরাজ করেন। আমরা ৺মা কালীর প্রসাদ কণিকা মুখে দিয়া কালীবাড়ী হইতে বিদায় লইলাম ও পূর্ব্ববৎ স্বস্থানে ফিরিলাম।

সন ১৩৬০ সালে হাওড়া সহরের কিঞ্চিৎ দূরে মাকড়দহ গ্রামের

কয়েকটি নরনারী দীক্ষাগ্রহণ করে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় তাহার দীক্ষা হয় নাই। সেই রাত্রে সে স্বপ্নে দেখিল, তাহাদের প্রেতপুরুষগণ আসিয়া তাহাকে বলিতেছেন, "তোরা ঠাকুরের নাম নিয়ে উদ্ধার হয়ে গেলি। আর আমাদের গতি কি হবে?" সে সাগ্রহে উত্তর দিল, আপনারাও ঠাকুরের নাম করুন। তখন সে ও প্রেতগণ প্রেমভরে রামকৃষ্ণ নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। সুষুপ্ত তরুণ উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। বাড়ীর লোক এই শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং প্রথমে পাখার হাওয়া করিয়া ও পরে তাহার মুখে চোখে ও মাথায় জল ছিটা দিয়া তাহাকে জাগ্রত ও সুস্থ করিলেন। নিদ্রাভঙ্গে সে স্বপ্ন-কাহিনী গুরুজনের নিকট ব্যক্ত করিল। তদনুযায়ী স্থির হইল, ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ সাল (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৮) রবিবার আমি তাঁহাদের পিতৃপুরুষদের উর্দ্ধগতির সংকল্পপূর্ব্বক পূজা-হোম করিব। উক্ত দিন পূর্ব্বাহ্নে আমি যথাবিধি ঠাকুরের পূজা ও হোম এবং সন্ধ্যায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" ব্যাখ্যা করিলাম। যতদূর মনে পড়ে, এরূপ অদ্ভুত কথামৃত ব্যাখ্যা কোথাও করি নাই। সেদিন ঠাকুরের প্রতি বাক্যের গভীর তাৎপর্য্য পাইলাম। সত্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, ঠাকুরের এক একটী কথা লইয়া এক একটী গ্রন্থ লেখা চলে। যে পাঠক আলোচ্য বিষয়ের দেবতাকে পাঠস্থলে ভক্তিবলে নামাইতে পারেন, তাঁহার পাঠ বা ব্যাখ্যা অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী হয় ও শ্রোতার ধর্ম্মপিপাসা দূর করে। অবশ্য, ইহা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। পূজাস্থলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদামণির ছবি রাখা হয়েছিল; কিন্তু পূজারম্ভে দেখা গেল, গৃহকর্ত্রীর ইষ্টদেবী দশভুজা দুর্গা আবির্ভূত হইলেন। আমার নির্দ্দেশে অবিলম্বে দুর্গাদেবীর ছবি পূজাস্থলে স্থাপিত হইল। পূজাকালে ঠাকুর ও শ্রীমা দুর্গাদেবীর পদতলে বসিয়া আমাদের পূজাদি লইলেন। পূজান্তে রামকৃষ্ণ হোম করিলাম। হোমকালে ভগবান

শ্রীরামকৃষ্ণ অগ্নিমূর্তি ধরিয়া হোমাগ্নিতে বিরাজ করিলেন। যখন হোমের সংকল্প করিলাম, "এই বাড়ীর প্রেতগণ উর্দ্ধলোকে গমন করুন; এই গৃহের শান্তি ও কল্যাণ হউক" তখন পূজাঘরের বাহিরে দুই জানালার পাশে ৩০।৩২ জন ব্রাহ্মণ প্রেতাত্মা আসিয়া দাঁড়াইলেন। হোমশেষে পূর্ণাহুতির সময় তন্মধ্যে তিনজন উর্দ্ধগামী হইলেন। বৈকাল পাঁচটায় 'কথামৃত' ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলাম। পাঠের প্রারম্ভে ঠাকুর, শ্রীমা, দুর্গাদেবী ও ঠাকুরের দ্বাদশ পার্ষদ আসিয়া আমার সম্মুখে বসিলেন। আমার পেছনে জানলার বাহিরে যে প্রেতগণ উর্দ্ধগত হন নাই, তাঁহারা আসিয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন। পাঠের মধ্যে একবার ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতৃবৃন্দ কর্তৃক ভক্তিভরে সমস্বরে রামকৃষ্ণ নামকীর্ত্তন হইল। অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, দণ্ডায়মান প্রেতদলও রামকৃষ্ণ নামকীর্ত্তনে যোগ দিলেন। যখন কীর্ত্তন অর্দ্ধেক হইল, তখন তাঁহারা কীর্ত্তন করিতে করিতে পূর্ব্ব কাল মূর্তির পরিবর্তে অগ্নিময় মূর্তি ধারণপূর্ব্বক উর্দ্ধগামী হইলেন এবং চন্দ্রলোকে গেলেন। পাঠের পূর্ব্বে আমার পশ্চাতে এক শিবমূর্ত্তি শূলহস্তে অবস্থিত ছিলেন এবং পাঠারম্ভে তিনি আমার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেদিন রাত্রে বেলুড় ধর্ম্মচক্রে অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় আমি তাঁহাকে আমার শয্যার পার্শ্বে দেখিয়াছিলাম। তিনি আমার গুরুশক্তি ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। স্বামী ভৈরবানন্দও বলিলেন যে, আমার গুরুশক্তি প্রায় আড়াই মাস ধরিয়া আমার সাথেই রহিয়াছেন। যেদিন হইতে কাল ভৈরব ও কাল ভৈরবী আমাদের মন্দিরের রক্ষকরূপে উত্তর বারন্দায় বিরাজ করিলেন, সেদিন হইতেই অর্থাৎ ১৯৫৮ খ্রীঃ শারদীয়া দুর্গাপূজার পর হইতেই আমার গুরুশক্তিকে আমার সঙ্গে শূলপাণি শিবরূপে স্পষ্টভাবে দেখিয়াছি। ইহার কারণ, মদীয় গুরুদেব মহাপুরুষ শিবানন্দজীকে আমি সাক্ষাৎ শিবরূপে ধ্যান করিতেছি বিগত চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসর যাবৎ।

সেদিন মাকড়দহে যে অলৌকিক অনুভূতি হইল, তাহা অপ্রত্যাশিত

ও অভূতপূর্ব্ব। প্রত্যেক গৃহে বহু প্রেত বাস করেন। এই জন্য প্রেতদৃষ্টি পড়ায় গৃহবাসী নরনারীগণের অসুখ, অশান্তি ও অমঙ্গল ঘটে। অধুনা কোথাও চণ্ডীপাঠ, চণ্ডীহোম বা শ্রাদ্ধতর্পণাদি যথাবিধি যোগ্যব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া যথাকালে বাস্তু প্রেতগণের উর্দ্ধগতি হয় না। এইজন্য স্মার্ত্তাচার্য্য রঘুনন্দন কৃত 'শ্রাদ্ধতত্ত্ব' উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা প্রয়োজন।

বালিতে অনুরূপ একটী ঘটনা বর্ণনান্তে এই নিবন্ধের উপসংহার করিব। সন ১৩৬৫ সালের ৫ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) রবিবার বালির কোন দীক্ষিত ভক্তের বাসগৃহে অখণ্ড চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীহোম করিলাম। গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রী উভয়েই অনুরক্ত কালীভক্ত। সকাল সওয়া আটটায় আমি চণ্ডীপূজায় বসিলাম এবং সওয়া নয়টায় তিনজন সাধুভক্ত আমার সঙ্গে সমস্বরে অখণ্ড চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ বেলা দশটার পরে মাকড়দহ হইতে তথায় উপনীত হইলেন। পুরা দুই ঘণ্টায় চণ্ডীপাঠ শেষ হইল। সওয়া এগারটায় চণ্ডীহোম আরম্ভ করিলাম। উক্ত গৃহের বাস্তুপ্রেতগণের উর্দ্ধগতি কামনায় চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীহোমের সংকল্প হইয়াছিল। চণ্ডীহোমের সময় দেখা গেল, পূজা-ঘরের বাহিরে দুই দক্ষিণ জানালার পাশে সপ্ত প্রেত দণ্ডায়মান। তন্মধ্যে চারিজন পুরুষ ও তিনজন নারী। এক নারী গৃহকর্ত্তার পিতামহী ও পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেওয়াল চাপা পড়িয়া মারা যান। সমাগত সপ্ত প্রেতই কালীভক্ত ছিলেন। অনন্তর কালীহোম আরম্ভ হইল এবং মা কালী হোমাগ্নিরূপে আবির্ভূত হইলেন; উক্ত সপ্ত প্রেতের মধ্যে ছয়জনই হোমকালে উর্দ্ধগামী হইলেন। হোমশেষে পূর্ণাহুতির পর আজ্যসিক্ত পাকা কলা পুড়িবার সময় যখন আমি দাঁড়াইয়া প্রেমাবেশে রামকৃষ্ণ নামকীর্ত্তন করিলাম, তখন অবশিষ্ট অপমৃত প্রেতগণ উর্দ্ধলোকে চলিয়া গেলেন। হোমান্তে আরাধ্য দেবতাকে অন্নভোগ নিবেদিত হইল। রামকৃষ্ণ নামকীর্ত্তন

কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বাদশ পার্ষদ সহ উপস্থিত হইলেন। সব্যঞ্জন অন্নভোগ নিবেদিত হইলে তাঁহারা সকলে সানন্দে উহা গ্রহণ করিলেন এবং মা কালী তদীয় ভক্ত সপ্ত প্রেতকে অন্নপ্রসাদ দিলেন। সপ্ত প্রেত বাহিরে দাঁড়াইয়া জানলার ভিতর দিয়া হাত বাড়াইয়া প্রসন্ন বদনে পীযূষ প্রসাদ লইয়া খাইলেন ও চন্দ্রলোকে চলিয়া গেলেন। অনন্তর আমরা প্রসাদ গ্রহণ ও বিশ্রামান্তে বৈকালে ধর্ম্মচক্রে ফিরিলাম। অন্নভোগ নিবেদনান্তে দেখা গেল, সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণাদি দেবগণও অন্নভোগ গ্রহণ করিলেন। সাধারণ ভক্তগৃহে এইরূপে দেবগণের আবির্ভাব আশ্চর্য্যজনক মনে হইল।

১৯৫৫ খ্রীঃ ৩০শে এপ্রিল রবিবার ধর্ম্মচক্রের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন ও ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হন। উক্ত রাত্রে আমি ও কোন ভক্ত স্বপ্নে দেখিলাম, ঠাকুর সহাস্য বদনে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছেন। তখন একতলায় একটী বৃহৎ কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এক ছোট জলচৌকির উপর ঠাকুরের একটী মুদ্রিত আলেখ্য রাখিয়া পূজা করা হয়। কয়েক মাস পরে পূজার জন্য ঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামিজীর ফটোত্রয় সংগৃহীত হইল। তথায় দুই বৎসর ঠাকুর পূজা চলিবার পর দ্বিতলস্থ মন্দির নির্মিত হয়। পূর্ব্ববৎ দোতলার মন্দিরে ফটোতে ঠাকুরের পূজা চলিল। ১৯৫৮ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে উক্ত মন্দিরে ঠাকুরের মর্ম্মর প্রতিমা স্থাপিত ও উহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত দিন উপস্থিত বহু সাধু ও বহু ভক্ত প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিলেন, মর্ম্মর প্রতিমা সচেতন, প্রাণবন্ত। কলিযুগে আমাদের অবিশ্বাস মজ্জাগত। ১৯৫৮ খ্রীঃ ১৯শে নভেম্বর বুধবার ধর্ম্মচক্রে প্রতিমার তৃতীয় বার্ষিক জগদ্ধাত্রী পূজা যথোচিত সমারোহে সম্পন্ন হইল। পরদিন মধ্যরাত্রে এই স্বপ্ন দেখিলাম। — আমি আমাদের মন্দিরস্থ মর্ম্মর মূর্তির দাড়ি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, "ঠাকুর, তুমি কি সত্যই এখানে আছ?" ঠাকুর অত্যন্ত চটিয়া যাইয়া আমাকে এক চড় মারিলেন ও বলিলেন, শালা,

আমাকে রোজ দেখছিস্। তার সত্ত্বেও আবার সন্দেহ করছিস্?" এই যুগে আমাদের ঠাকুর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ দেবতা। আমরা ভক্তিভরে তাঁহাকে যেখানে প্রতিষ্ঠা করিব, তিনি কৃপাপূর্ব্বক তথায় বিরাজ করিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত মঠাশ্রমসমূহে তদীয় ভাবধারার অনুশীলন ও আরাধনা যথাযথ হওয়াই বর্তমান প্রয়োজন। ঠাকুর সর্ব্বদেবদেবীস্বরূপ হইলেও সর্ব্বদেবতার আরাধনা দ্বারা তাঁহার আরাধনা হয় না। অনাদি কাল হইতে অসংখ্য দেবতার আরাধনা ভারতে প্রচলিত। তাহা হইলে তাঁহার আবির্ভাবের প্রয়োজন কি? শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে কথামৃতকার মহেন্দ্র গুপ্তকে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর পঞ্চবটীতলায় স্বীয় দেহ অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "মা কালী বলছেন, একে চিন্তা করলেই সব হবে, অন্য সাধনার প্রয়োজন নাই। যদি কারও অন্য সাধনা দরকার হয়, জগন্মাতা যথাসময়ে করিয়ে নেবেন।" সুতরাং ঠাকুরকে চিন্তা ও পূজা, নামকীর্ত্তন এবং তাঁহার ভাবধারায় অবগাহনই মোক্ষপ্রদ যুগধর্ম্ম। যুগদেবতাকে আশ্রয় করিলে ভক্ত-হৃদয়ে ইষ্টদেবতা স্বতঃ প্রকটিত হন। যদি অনুরাগ আন্তরিক হয়, তাহা হইলে স্বতঃই কালী, কৃষ্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট আবির্ভূত হন। কয়েকটী দীক্ষিত তরুণের জীবনে দেখিয়াছি, রামকৃষ্ণ-চিন্তার ফলে কিছুকাল পরে ধ্যানকালে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট দর্শন হইল এবং তদনুযায়ী তাঁহারা পৃথক ইষ্টমন্ত্র লইলেন। এইরূপে রামকৃষ্ণময় হইলেই আমাদের হৃদয়-মন্দিরে তিনি আবির্ভূত হইবেন। ভক্তিভরে বাহ্যপূজা করিলেও তিনি পূজাস্থলে উপস্থিত হন। যখন আমাদের মন্দিরে বসিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় করতাল বাজাইয়া আমরা রামকৃষ্ণ নামকীর্ত্তন করি, তখন দিব্যচক্ষুতে স্পষ্ট দেখি, সর্ব্বপ্রথমে শ্রীসারদা ও পার্ষদবৃন্দ এই মধুর কীর্ত্তন ধরিলেন। অনন্তর পৃথিবীর নানা দেশে অবস্থিত রামকৃষ্ণ ভক্তগণ ইহাতে যোগ দিলেন। যখন সমগ্র পৃথিবী রামকৃষ্ণ নামে মুখরিত হয়, তখন পৃথিবীস্থ সমস্ত নরনারী ও সমস্ত পশুপক্ষী এই কীর্ত্তন আরম্ভ করেন।

তৎপরে প্রেতলোক, স্বর্গলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক ও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধলোকসমূহের অধিবাসীবৃন্দ এবং সপ্ত নিম্নলোকের প্রাণিগণও এই মধুর কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। তখন শ্রবণমঙ্গল রামকৃষ্ণ নামমন্ত্রে চৌদ্দ ভুবন প্রতিধ্বনিত ও প্রকম্পিত হয়। উপসংহারে স্বামী প্রেমেশানন্দ রচিত একটী সঙ্গীতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা ললিত—ত্রিতাল (প্রভাতী) সুরে গীত হয়।—

জয় জয় রামকৃষ্ণ ভুবনমঙ্গল
জয় মাতা শ্যামাসুতা অতিনিরমল।
রামকৃষ্ণ নাম জয় শ্রবণমঙ্গল
ভকত-বাঞ্ছিত জয় চরণ-কমল॥

এইজন্য ভক্ত-কবি প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আন্তরিকতা সহকারে গাহিয়াছেন—

প্রেমভরে মনরে গাহ রামকৃষ্ণ নাম।
গাহ রামকৃষ্ণ নাম, জপ রামকৃষ্ণ নাম॥
নামসুধা পানে রহো মত্ত অবিরাম॥

———

দুই

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর পুণ্যস্মৃতি*

সন ১৩৬৫ সালের মাঘ মাসে কৃষ্ণনগরে গিয়াছিলাম তত্রস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের আমন্ত্রণে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১০৬তম জন্মোৎসবে পৌরোহিত্য করিতে। বঙ্গীয় ৩ মাঘ শনিবার তথায় পৌছিলাম ও পরদিন রবিবার সারাদিন উল্লিখিত জন্মোৎসব যথোচিত সমারোহে অনুষ্ঠিত হইল কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গগত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহপার্শ্বস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। এই উপলক্ষে পূর্বাহ্নে ষোড়শ উপচারে শ্রীশ্রী মার পূজা ও সার্বজনীন হোম করিলাম। উক্ত হোমে শতাধিক নরনারী মহানন্দে সাজ্য বিল্বপত্র আহুতি দিলেন। সান্ধ্য সভায় শ্রীমা সারদার জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে পুরা এক ঘণ্টাকাল সভক্তি ভাষণ দিলাম। প্রায় পাঁচ শত নরনারী উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণমঙ্গল সারদা-চরিত শুনিলেন। পরবর্ত্তী কয়েক দিবস স্থানীয় টাউনহল, আনন্দময়ী কালিবাড়ী ও রায়বাড়ীর দুর্গা মণ্ডপাদি স্থানে গীতা, চণ্ডী, মীরাবাঈ প্রভৃতি বিষয়ে সভজন কথকতা করিলাম। আমার গীতাব্যাখ্যা শুনিতে কৃষ্ণনগর কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপ্যাল শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অনুগ্রহপূর্ব্বক উপস্থিত হইলেন এবং উক্ত সহরে সাময়িক আধ্যাত্মিক আলোড়ন সৃষ্টির জন্য আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন। ফিরিবার পূর্বদিন কৃষ্ণনগর ওয়াটার ওয়ার্কসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাসায় স্বর্গীয় নিশিকান্ত মজুমদারের ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী সন্তোষবালার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ধর্ম্মপ্রাণ নিশিকান্ত ও তৎপত্নী সন্তোষবালা উভয়েই সারদাদেবীর অনুরক্ত মন্ত্রশিষ্য। শ্রীমতী সন্তোষবালার নিকট সংগৃহীত সারদাদেবীর স্মৃতিকথাই সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে লিখিত হইল।

মাতৃভক্ত নিশিকান্ত রাঁচি একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল অফিসে কর্ম

---

* 'ভাবমুখে' মাসিকে ১৩৬৬ সালে আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যাদ্বয়ে প্রকাশিত।

করিতেন। ১৯১০ খ্রীঃ তিনি প্রথম বেলুড় মঠ দর্শনপূর্বক তথায় দীক্ষা লইতে সঙ্কল্প করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্গীয় ১৩২০ সালের প্রারম্ভে তিনি দীক্ষা গ্রহণার্থ ব্যাকুল হন এবং উক্ত সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বেলুড় মঠের প্রথম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া পত্র লেখেন। উত্তরের প্রতীক্ষায় তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল; কিন্তু আকাংক্ষিত উত্তর আসিল না। ইতিমধ্যে শ্রীমার দীক্ষিত সন্তান ও রাঁচি-প্রবাসী ইন্দুভূষণ সেন নিশিকান্তকে শ্রীমার নিকট দীক্ষা ভিক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। তখন নিশিকান্ত ২৪।২৫ বৎসরের যুবক মাত্র। আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে দীক্ষালাভের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা চরম আকার ধারণ করিল। ঐ সময়ে এক গভীর রজনীতে তিনি দিব্য স্বপ্ন দেখেন! তাঁহার শয়ন কক্ষ সুস্নিগ্ধ স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইল; আর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্রী অসীম করুণায় কলিকাতাস্থ কালিঘাটের মহাকালীরূপে চারি হস্তে আর্ত ভক্তকে স্বীয় কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "ভয় কি বাবা! আমি ত রয়েছি।" এই কথা বলিতে বলিতে জগন্মাতা একটি স্নেহময়ী নারী-মূর্ত্তিতে রূপান্তরিতা হইলেন। উক্ত নারীর পরনে লালচুল পেড়ে কাপড়, হাতে বালা। তিনি ক্রোড়ে স্থিত ভক্তকে একটী মন্ত্র সহ ইষ্ট নাম দিলেন এবং উহা নিত্য ১০৮ বার জপ করিতে আদেশ প্রদানান্তে বলিলেন, "তুমি ইহাই করিয়া যাও। আর যাহা করিতে হয়, তাহা আমিই করিব।" হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে কৃপাপ্রাপ্ত নিশিকান্ত 'মা মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং বাকী রাতটুকু স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্ত্রজপে আনন্দে বিভোর রহিলেন। স্বপ্ন-দৃষ্ট নারীমূর্তিকে তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই। এই অভাবনীয় সুঘটনা তিনি কাহারো নিকট প্রকাশ করিলেন না; এমন কি, অগ্রজ প্রতিম ইন্দুসেনকেও বলিলেন না। শুধু এই চিন্তাই সদা তাঁহার মনকে আলোড়িত করিল, কিরূপে বা কোথায় স্বপ্নদৃষ্ট কৃপাময়ী মাতৃমূর্ত্তির সন্দর্শন পাইব? আকাংক্ষা প্রবল হইলে অধিক দিবস অপূর্ণ থাকে না।

তখন রাঁচিতে রামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও ভজন-কীর্ত্তন হইত। ইহাতে নিশিকান্ত নিয়মিত যোগদান করিতেন। কিছুদিন পরে উক্ত পাঠ ও কীর্ত্তনে সুরেন্দ্রনাথ সরকার আসিলেন। তিনি শ্রীমার বিশিষ্ট সন্তান ছিলেন ও রাঁচিতে চাকুরী করিতেন। তিনি ছুটিতে অন্যত্র গিয়াছিলেন ও তথা হইতে ফিরিবার পথে জয়রামবাটীতে শ্রীমার দর্শন করিয়া আসিলেন। তাঁহার নিকট শ্রীমার কথা শুনিয়া নিশিকান্তের চিত্ত আনন্দে নাচিতে লাগিল ও মনে প্রশ্ন উঠিল, "এই মা কি আমার সেই স্বপ্নদৃষ্ট মা? একবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে হইবে। উক্ত উদ্দেশ্যে তিনি সুরেন্দ্রনাথের নিকট জয়রামবাটী যাইবার রাস্তাটি জানিয়া লইলেন। অল্প কাল পরেই সংকল্পিত তীর্থযাত্রার অপূর্ব সুযোগ আসিল; ২৮শে আষাঢ় যাত্রার দিন স্থির হইল। পূর্বদিন মাতৃ-শিষ্য শ্রীশচন্দ্র ঘটক তাঁহাকে বলিলেন, "শ্রীমার জন্য একখানি চুল পেড়ে কাপড় ও কিছু মিছরি নিয়ে যাবে। ঠাকুর মিছরীর সরবৎ খাইতে ভালবাসিতেন। তাই শ্রীমা ঠাকুরকে রোজ মিছরীর সরবৎ করিয়া দেন। আর কোয়ালপাড়ার মঠে স্বামী কেশবানন্দজীর নিকট একখানি চিঠি লিখে দিব। তাহা হইলে তথায় তোমার কোন অসুবিধা হইবে না।" ইহাতে নিশিকান্ত অতিশয় উৎসাহিত ও উল্লসিত হইলেন এবং তদনুসারে একটি কাপড় ও আড়াই সের মিছরি কিনিলেন। ২৮শে আষাঢ় শনিবার বৈকালে রাঁচি হইতে ট্রেণে উঠিয়া তিনি অনেক রাত্রে বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে নামিলেন। তথা হইতে ভোর রাত্রে গরুর গাড়ীতে চড়িয়া তিনি রওনা হইলেন ও পরদিন ২৯শে আষাঢ় অধিক বেলায় তিনি কোতলপুর পৌছিলেন। ট্রেনে তাঁহার মনে কিছু আম কেনার ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে বা অন্যত্র আম পান নাই। অপ্রত্যাশিত ভাবে কোতুলপুরে তিনি কিছু ভাল আম পাইয়া সানন্দে কিনিলেন ও পুনরায় উক্ত গরুর গাড়ীতে চড়িয়া বেলা প্রায় একটার

সময় কোয়ালপাড়া মঠে উপস্থিত হইলেন। উক্ত মঠে তিনি কেশবানন্দজীকে শ্রীশচন্দ্রের পত্র দিলেন ও আহারাদি করিলেন। তথায় আহারান্তে কেশবানন্দজীর মুখে শ্রীমার কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন এবং বৈকালে জয়রামবাটীতে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। রবিবার সন্ধ্যার পূর্বেই তিনি নিরাপদে মাতৃতীর্থে উপস্থিত হইলেন। কোয়ালপাড়া হইতে যে ছেলেটি তাঁহার জিনিষপত্রাদি বহিয়া আনিয়াছিল, সে সোজাসুজি শ্রীমার বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল ও শ্রীমাকে খবর দিল, একটি ভক্ত আসিয়াছেন। নিশিকান্ত প্রসন্ন মামার ডোবা পুকুরের ঘাটে পা হাত মুখ ধুইয়া শ্রীমার বাটীর সদর দরজা পার হইয়া উঠানে যাইয়া দেখিলেন, "একটী মহিলা বসিয়া আছেন। আর একজন বঁটিতে তরকারী কুটিতেছেন।" নবাগতকে দেখিয়াই ঐ মহিলা আড়ালে সরিয়া গেলেন। যিনি তরকারী কুটিতেছিলেন, তিনি সেই কাজেই নিযুক্ত রহিলেন। অনন্তর যখন ভক্তটী উঠানের মধ্যস্থলে গেলেন, তখন দেখিলেন, উক্ত নারী তাঁহার দিকে স্নেহভরে চাহিয়া আছেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ও অপার আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "একি! একি! এইত আমার সেই মা! সেই মূর্তি, সেই চাহনি, সেই ভাব, সব সেইরূপ।" মুহূর্তমধ্যে তাঁহার সমস্ত ওলট পালট হইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, "জগজ্জননী বিশ্বেশ্বরীই সম্মুখস্থ মাতৃরূপে অবতীর্ণা। আর পরমেশ্বরই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণরূপে লোককল্যাণার্থ আবির্ভূত।" তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, নির্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া জড়বৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন শ্রীমা বঁটিখানি কাত করিয়া রাখিয়া উঠিলেন, এবং দরজার শিকল খুলিয়া নিজ ঘরে ঢুকিয়া হাত নাড়িয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। ইহাতে নিশিকান্ত মন্ত্রমুগ্ধ সর্পবৎ ঘরে যাইয়া শ্রীমার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। সমস্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁগা, আমাকে কি করে চিনলে?" শ্রীমার

মুখনিঃসৃত এই প্রথম মিষ্ট বাক্য শুনিয়া ভক্ত ধন্য হইলেন। মাতা ও পুত্রের সুশুভ মিলন ঘটিল। সাশ্রু নয়নে রুদ্ধ কণ্ঠে ভক্ত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মা তোমায় চিনিবার শক্তি আমার কি আছে? তবে কৃপা করে যতটুকু চিনিয়েছ, ঠিক ততটুকুই চিনেছি।" তখন শ্রীমা এক অলৌকিক অট্টহাসি হাসিলেন। সেই হাসিতে ভক্তের জড়ত্ব বিনষ্ট হইল। তিনি অচিরে প্রকৃতিস্থ হইলেন ও শ্রীমার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। অমনি শ্রীমা স্নেহভরে প্রণত সন্তানকে স্বীয় হস্তে তুলিয়া চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন ও বারান্দায় আনিয়া একটি আসনে বসাইলেন। অনন্তর ঘরে যাইয়া এক গ্লাস ঠাকুরের প্রসাদী মিছরির সরবৎ আনিলেন ও উহা হইতে কিঞ্চিৎ নিজে খাইয়া অবশিষ্ট মহাপ্রসাদ প্রিয় ভক্তকে খাইতে দিলেন। ভক্ত মহানন্দে প্রসাদী সরবৎ পানান্তে গ্লাসটী রাখিতেই, শ্রীমা উহা তুলিয়া ধুইয়া রাখিলেন ও পুনরায় বঁটি দিয়া তরকারি কুটিতে বসিলেন ও নব ভক্তের সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি রাঁচি হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া তথায় তাঁহার সন্তানগণ কে কেমন আছেন, শ্রীমা কাহারো কাহারো নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। নিশিকান্তও যাঁহার সম্বন্ধে যতটুকু জানিতেন, তাহা বলিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীমা একজনকে জানাইলেন, 'ছেলে রাত্রে রুটি খাবে' এবং নিশিকান্তকে বলিলেন, 'এবার তুমি একটু ফাঁকায় যাও।' নিশিকান্ত শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক আনন্দে ভরপুর হইয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিতেই রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দ) এঁর সহিত তাঁহার দেখা হইল। অরূপানন্দজী কালী মামার বৈঠকখানা ঘরে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে শ্রীমা সম্বন্ধে বহু কথা বলিলেন। তখন শ্রীমার সন্তান মুকুন্দবিহারী সাহা ওখানে গিয়াছিলেন। মুকুন্দবিহারী রামপুরহাট হাই স্কুলের প্রসিদ্ধ রেক্টর ও চিরকুমার শিক্ষাব্রতী ছিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তারাপীঠ যাইবার পথে

রামপুরহাটে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ও শ্রীমা সম্বন্ধে অনেক প্রসঙ্গ হয়। সন্ধ্যার পর, নিশিকান্ত ও মুকুন্দবিহারী উভয়ে শ্রীমাকে প্রণাম করিতে গেলেন। রাত্রিতে ভোজনের সময় হইলে তাঁহারা বারান্দায় খাইতে বসিলেন। শ্রীমা স্বয়ং তাঁহাদিগকে আহার্য্য পরিবেশন করিলেন এবং নানা গল্প বলিতে লাগিলেন। আহার কালে নিশিকান্ত পরদিন কামারপুকুর যাইবার কথা জানাইলে শ্রীমা যেন একটু ভাবিত হইয়া বলিলেন, "তাইত, তুমি কখনও যাওনি। একা কি করে যাবে?" শ্রীমার কথা শুনিয়া নিশিকান্তও একটু চিন্তিত হইলেন। তখন রাসবিহারী মহারাজ বলিলেন, "মা তুমি এত ভাবছ কেন? আমি ওকে রাস্তা বলে দিব। ও ঠিক চলে যাবে।" ইহা শুনিয়া শ্রীমা আশ্বস্ত হইলেন ও বলিলেন, 'তাই হবে'।

নিশিকান্ত পরদিন ৩০শে আষাঢ় সোমবার প্রাতে স্নানান্তে শ্রীমাকে প্রণাম করিতে গেলেন। অনন্তর দীক্ষার প্রার্থনা জানাইবার উদ্দেশ্যে তিনি নজ মাথার পিছনে ডান হাতখানা রাখিয়া সসংকোচে বলিলেন, মা। অমনি শ্রীমা প্রিয় ভক্তের মনোভাব বুঝিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওর জন্য ভাবনা নেই, ওর জন্য ভাবনা নেই। তুমি ঘুরে এস। আজই চলে এস, ওখানে থেকো না।" ভক্ত শ্রীমাকে প্রণামান্তে অরূপানন্দজীর নিকট রাস্তার বিবরণ জানিয়া যুগতীর্থ কামারপুকুর যাত্রা করিলেন। পথে ভূতির খাল, আমবাগান ও শ্মশানাদি দর্শনান্তে তিনি যুগীদের শিব মন্দিরে উপনীত ইলেন। তথায় শিব ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্বর্গতুল্য জন্মস্থানে পৌছিলেন। ঐ পূত স্থল তখন একটি শিলাখণ্ড দিয়া ঢাকা ছিল। তথায় সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক তিনি রঘুবীরকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। তখন ওখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীর দূর সম্পর্কীয়া এক বোন থাকিতেন ও রঘুবীরাদির সেবা পূজা করিতেন। তাঁহাকে সকলে ভক্তিভরে মাসীমা বলিয়া ডাকিতেন।

১৩৩৩ সালে আমি গড়বেতা রামকৃষ্ণ আশ্রমে ছিলাম। তখন গড়বেতা হইতে স্বামী বিশ্বদেবানন্দ ওরফে রজনী মহারাজ প্রভৃতি সঙ্গে জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে তীর্থযাত্রায় গিয়াছিলাম। জয়রামবাটী দর্শনান্তে আমরা কামারপুকুরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পিত্রালয়ে এক রাত্রি কাটাইয়াছিলাম। তখনও উক্ত মাসীমাকে আমরা দেখিয়াছি ও তাঁহার স্নেহাদর পাইয়াছি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঘরে থাকিতেন, আমরা তিনজনও সেই ঘরেই রাত্রিযাপন করিয়াছিলাম। সারারাত্রি একবারও আমরা চোখ বুজিতে পারি নাই! তখন ঘরের চাল বাঁশ-খড়ে তৈয়ারী ছিল। আমরা তিন জনেই সভয়ে লক্ষ্য করিলাম, কে যেন ঘরের চালে মড়মড় করিয়া চলিতেছে! শুধু তাহাই নহে, ঘরের বারান্দায় ও উঠানে কাহারা যেন ঘোরাফেরা করিতেছিল! সেই রাত্রেই চিরতরে বুঝিলাম, দেবস্থানে রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ কেন।

সে যাহাই হোক, আমরা এখন পূর্ব প্রসঙ্গের অনুসরণ করিব। মাতৃভক্ত নিশিকান্তকে পূর্বোক্ত মাসীমা খুব স্নেহযত্ন করিলেন। নিশিকান্ত স্থানীয় বাজার হইতে দুই হাঁড়ি জিলিপি কিনিয়া আনিলেন। তন্মধ্যে এক হাঁড়ি ঠাকুর ও রঘুবীরকে ভোগ দিবার জন্য মাসীমাকে দিলেন এবং অন্য হাঁড়ি জয়রামবাটি লইয়া যাইবার জন্য আলাদা রাখিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জিলিপি খাইতে ভালবাসিতেন ও সহাস্যে বলিতেন, 'এটী লাট সাহেবের গাড়ী তুল্য। যেমন লাট সাহেবের গাড়ী এলে সব গাড়ী শশব্যস্ত হয়ে পথ ছেড়ে দেয়, তেমনি পেট ভরে খাওয়ার পরেও জিলিপি খাওয়া চলে!' অনন্তর ঠাকুরের ভিক্ষামাতা ধনী কামারণীর ভিটাবাড়ী, চিনু শাঁখারীর বাড়ী, লাহাবাবুদের বাড়ী, পাইনদের বাড়ী, হালদার পুকুর প্রভৃতি কামারপুকুরের দর্শনীয় স্থানগুলি নিশিকান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আগ্রহভরে দেখিলেন এবং অন্তরে অনির্বচনীয় প্রেমানন্দ অনুভব করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলার পুণ্যভূমি এখন বিশ্বতীর্থে পরিণত। নিশিকান্ত

কামারপুকুরের-কোন বাড়ীতে একটি পুরাণ মাধবীলতার গাছ দেখিলেন এবং লোকমুখে শুনিলেন, 'এই গাছটি ধরিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাহিতেন, 'মাধবী, আমার মাধব এনে দে।' নিশিকান্ত উক্ত পূতলতা সংস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিলেন। ইহা দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের পূতস্পর্শে দিব্য বৃক্ষে পরিণত। অনন্তর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিয়া রঘুবীরের অন্নপ্রসাদ গ্রহণান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন ও তৎপরে মাসীমার সঙ্গে আলাপ করিয়া রঘুবীরকে প্রণামান্তে জিলিপির অন্য হাঁড়িটি কাঁধে লইয়া জয়রামবাটি রওনা হইলেন। ভক্ত-কবি প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সত্যই গাহিয়াছেন—

"জয়রামবাটীর মাটী চন্দন সমান।
(আমার) মা জননীর জন্মভূমি মহাতীর্থস্থান॥"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিশিকান্ত শ্রীমার বাটীতে ফিরিতেই, শ্রীমা তাঁহার কাঁধ হইতে জিলিপির হাঁড়িটী নামাইয়া লইলেন। পরে শ্রীমাকে প্রণামান্তে নিশিকান্ত বারান্দায় বসিলেন। অবিলম্বে শ্রীমা ঠাকুরের প্রসাদী সরবৎ এক গ্লাস আনিলেন ও উহা হইতে নিজে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া প্রিয় ভক্তকে অবশিষ্ট মহাপ্রসাদ দিলেন। ভক্ত উহা পান করিয়া গ্লাসটী রাখিতেই শ্রীমা ঐ দিনও উহা ধুইয়া তুলিয়া রাখিলেন। অনন্তর মাতা-পুত্রের মধ্যে শ্রীধাম কামারপুকুর সম্বন্ধে নানা কথা হইল। পরে স্নেহময়ী শ্রীমা ভক্তকে বলিলেন, কাল তোমার দীক্ষা হবে। এই শুভ সংবাদ শ্রবণে তিনি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া শ্রীমাকে প্রণামপূর্বক প্রফুল্ল হৃদয়ে ফাঁকায় আসিলেন। স্বামী অরূপানন্দ দীক্ষার্থী ভক্তকে দীক্ষার সম্বন্ধে আবশ্যকীয় উপদেশ দিলেন। সন্ধ্যার পর আবার ভক্তগণ শ্রীমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া আসিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সারদা-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াই নিশিকান্ত সারদামণিকে সাক্ষাৎ 'সারদা' জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। নৈশ ভোজনকালে শ্রীমা স্বয়ং পূর্ব রাত্রিবৎ ভক্তবৃন্দকে আহার্য্য পরিবেশন

করিলেন এবং নানা স্থানের নানা গল্প বলিয়া ভক্তবৃন্দকে জননীবৎ অপার আনন্দ দিতে লাগিলেন।

পরদিন মঙ্গলবার উক্ত সালের ৩১শে আষাঢ়, অথবা ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই দ্বাদশী তিথি। উক্ত দিন প্রাতঃকালে বাঁড়ুজ্যে পুকুরে স্নানান্তে অন্য পুকুর হইতে দীক্ষার্থী অনেক শ্বেতপদ্ম তুলিয়া আনিয়া শ্রীমার কাছে আসিলেন। শ্রীমা ঐ সকল পদ্ম হইতে সিংহবাহিনী, ভানুপিসী ও নিজ পূজার জন্য কিছু কিছু আলাদা রাখিয়া বাকী পদ্ম ভক্তের জন্য রাখিলেন। অনন্তর শ্রীমা তাঁহাকে বলিলেন, "এখন একটু ফাঁকায় যাও। আমি সময়মত তোমায় ডেকে পাঠাব।" তিনি শ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন। কিঞ্চিৎ পরে শ্রীমা ভাগ্যবান দীক্ষাপ্রার্থীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভক্ত ঘরে যাইয়া দেখিলেন, একটী ছোট পিত্তলময় সিংহাসনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত। উহার সম্মুখে ৪।৫টী জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ঘট। দুইখানি আসন পাতা আছে ও শ্রীমা দাঁড়িয়ে আছেন। ভক্ত ঘরে যাইতেই শ্রীমা বলিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম কর। ভক্ত ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। পরে শ্রীমা উল্লিখিত ঘটগুলি হইতে অল্প অল্প জল লইয়া ভক্তের মাথায় ও সর্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিলেন এবং পুনরায় ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আদেশ দিলেন। আবার ভক্ত ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। অনন্তর শ্রীমা দীক্ষার্থীর মাথায়, বুকে ও পিঠে তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন, "এখন মনে মনে ভাব, তোমার জন্মজন্মান্তরের সব পাপ ভস্মীভূত হয়ে গেল এবং তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা হলে।" এই কথা শুনিয়া ও ভাবিয়া ভক্তের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। শ্রীমা আবার তাঁহাকে ঠাকুর প্রণাম করিতে বলিয়া আসনে বসিলেন। ভক্ত শ্রীমার আদেশ পালনান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন শ্রীমা বলিলেন, "তোমার ত দীক্ষা হয়েই গেছে। ঐ (স্বপ্নে প্রাপ্ত) মন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে। আর তোমাকে কিছুই করতে হবে না। বাকী সব আমিই করবো।"

তখন কৃপাধন্য ভক্তবর সজল নয়নে ও কম্পিত কলেবরে বলিলেন, "মা, তোমার শ্রীমুখে ঐ মন্ত্র শুনিতে চাই।" তখন শ্রীমা সন্তানকে স্বপ্নে দত্ত মন্ত্র শোনাইলেন ও জপপ্রণালী দেখাইলেন ও ঠাকুরের প্রতিকৃতি দেখাইয়া বলিলেন, "ঠাকুরই সব। ঠাকুরই গুরু, ঠাকুরই ইষ্ট, ঠাকুরই ইহকাল, ঠাকুরই পরকাল। তুমি ঠাকুরের, ঠাকুর তোমার। আমাকে ও ঠাকুরকে অভিন্ন ভাবিবে।" কৃতার্থ হইয়া নিশিকান্ত আসন হইতে উঠিলেন ও শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। শ্রীমাও আসন হইতে উঠিয়া রাঙ্গা পা দুটি ঝুলাইয়া তক্তপোষের উপর বসিলেন। তখন মাতৃভক্ত তজ্জন্য রক্ষিত পদ্মফুলগুলি হইতে কয়েকটী লইয়া একটী ছোট পদ্মবেদী সাজাইয়া তদুপরি শ্রীমার পদদ্বয় রাখিলেন ও অবশিষ্ট পদ্মফুল দিয়া মাতৃদত্ত মহামন্ত্রে তিনবার মাতৃপদে পদ্মাঞ্জলি দিয়া বলিলেন, "মা, তুমিই আমার সব। তুমিই ইষ্ট, তুমিই গুরু, তুমিই আমার সর্বস্ব। দেখো, যেন আমি কখনও তোমার চরণ-ছাড়া না হই।" তখন শ্রীমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবা, কত জন্মজন্মান্তর ঘুরেছ। ঘুরতে ঘুরতে এত দিনে ঘরের ছেলে ঘরে এসে পৌঁছেছ। আর ভাবনা কি?" অনন্তর শ্রীমা সন্তানের চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিলেন। তখন ভক্ত শ্রীমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে বাহিরে আসিলেন। নিশিকান্তের নবজন্ম লাভ হইল। শ্রীমা ঠাকুরের পূজা শেস করিয়া নবদীক্ষিতকে অমৃত প্রসাদ দিলেন। দ্বিপ্রহরের আহারকালেও তিনি ভক্তকে দুধ-মাখন অন্ন প্রসাদ দিলেন। উক্ত দিন ভোর রাত্রেই মুকুন্দবিহারী সাহার সহিত নিশিকান্ত বিষ্ণুপুর ষ্টেশন পর্যন্ত হাঁটিয়া আসেন ও তথায় ট্রেণে উঠিয়া রাঁচি ফিরিয়া যান।

বর্ষাধিক পরে সন ১৩২৩ সালের ২৩শে আশ্বিন শ্রীমা কলিকাতায় বাগবাজারস্থ উদ্বোধন মঠে নিশিকান্তের সহধর্মিণী সন্তোষবালাকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। তখন তাঁহাদের কন্যা বীণার বয়স আড়াই বৎসর হয়ে ছিল এবং বীণার মাথা নেড়া ছিল। শ্রীমা বীণার মাথায় ও গায়ে তাঁহার পদ্মহস্ত

বুলাইতে বুলাইতে আদর করিয়া বলিয়াছিলেন, "ও আমার নেড়ি, নেড়ি, নেড়ি।" বীণা পাশের ঘরে প্রস্রাব করিয়া ফেলিলে, শ্রীমা নিজেই উহা পরিষ্কার করিলেন, বীণার মাকে পরিষ্কার করিতে দিলেন না; আর স্নেহভরে বলিলেন, ও কি আমার পর? স্নেহশীলা সারদামণি তদাশ্রিত নরনারীগণকে জননীবৎ স্নেহযত্ন করিতেন। মনে হয়, জগদম্বার সন্তান-বাৎসল্য প্রকটিত করিবার জন্যই শ্রীমার আবির্ভাব ও স্নেহলীলা। শ্রীমা ভক্তবীর গিরিশ ঘোষকে বলিযাছিলেন, "আমি গুরুপত্নী মা নই, পাতান মা নই, সত্যিকাবের মা।" তিনি শরণাগত সন্তানের প্রতি ইহকালে যেমন স্নেহময়ী ছিলেন, পরকালেও তদ্রূপ স্নেহময়ী থাকিবেন। একবাব শ্রীমা ভক্তবাঞ্ছা পূরণার্থ নিশিকান্তের বক্ষঃস্থলে স্বীয় পাদপদ্মদ্বয় স্থাপন ও শ্রীহস্তে সন্তানেব মাথায় করজপ করিয়া দিয়াছিলেন। একবার নিশিকান্ত শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "মা, শুনতে পাই, অনেকে ঠাকুরকে চোখ বুজে, আবাব অনেকে চোখ চেয়ে দেখতে পান। আমার ভাগ্যে তা কখনও ঘটে নি। সেই সৌভাগ্য কি আমার হবে না?" ইহার উত্তরে শ্রীমা জিজ্ঞাসু সন্তানকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "বাবা, স্থানটী যদি পবিত্র হয়, মনটী যদি শুদ্ধ হয, তবেত ঠাকুবের দর্শন পাওয়া যায়।" ঐ দিন শ্রীমা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "একদিন কোয়ালপাড়ায় ঠাকুরঘরে ঠাকুরকে প্রণাম করে আমার শোবার ঘরে গিয়ে দেখি, "ঠাকুর দিব্যদেহে মেজেতে শুয়ে আছেন। তখন আমি তাঁকে বললুম, "সে কি গো, তুমি এমনি করে মেজেতে শুযেছ কেন?" ঠাকুর বললেন, আমার বড় ভাল লাগে।" এই ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া শ্রীমা ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন; আর কথা বলিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে শ্রীমা ভাবাবেশ সংবরণ করিয়া নিশিকান্তকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও বলিলেন; "আমি বলছি, ঠাকুর তোমার সামনে না দাঁড়ালে তোমার দেহ যাবে না। এবার তোমার শেষ জন্ম।" একদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসঙ্গিনী সারদা

দেবীকে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বলিয়াছিলেন, "তুমি যাদের আশ্রয় দেবে, আমি তাদের নিশ্চয়ই গ্রহণ করবো। শেষের দিনে আমি স্বয়ং এসে তোমার সন্তানগণকে রামকৃষ্ণ-লোকে নিয়ে যাবো।" শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা জীবোদ্ধারিণী যুগশক্তির ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি মাত্র। যেমন রাম-সীতা ও কৃষ্ণ-রাধা, তেমনি রামকৃষ্ণ-সারদা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার অন্তরঙ্গ গুরু-ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন, শ্রীমা জ্যান্ত দুর্গা।

একবার নিশিকান্ত জয়রামবাটী হইতে শ্রীমার পত্র লইয়া ভাই ভূপতির শিষ্য সুরেন্দ্র কুণ্ডুর সহিত বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দজীর নিকট যান। প্রেমানন্দ মহারাজ শ্রীমার চিঠি পাইয়া বার বার স্বীয় মাথায় ঠেকাইলেন ও তৎপরে উহা সযত্নে পড়িলেন। অনন্তর সমাগত ভক্তদ্বয়ের সঙ্গে ঠাকুর ও শ্রীমা সম্বন্ধে নানা কথার পরে বলিলেন, "তোমরা এখানে প্রসাদ পাবে, প্রসাদ না পেয়ে যেও না।" সুরেন্দ্র প্রেমানন্দজীকে ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। তখন নিত্যসিদ্ধ প্রেমানন্দ উত্তেজিত হইয়া সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জয়রামবাটী গিয়াছিলে? সুরেন্দ্র উত্তর দিলেন, আজ্ঞে হাঁ। প্রেমানন্দজী—তুমি মাকে দেখেছ? মাকে প্রণাম করেছ? সুরেন্দ্র—আজ্ঞে হাঁ। প্রেমানন্দজী—মা তোমার দিকে ফিরে চেয়েছিলেন? সুরেন্দ্র—আজ্ঞে হাঁ। তখন প্রেমানন্দজী মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "তবে আর কি? তুমি ত ডঙ্কা মেরে এসেছ? আর আশীর্বাদের প্রয়োজন কি? ঈশ্বরকোটী প্রেমানন্দই কোন ভক্তকে লিখিয়াছিলেন, রাধারাণী, বিষ্ণুপ্রিয়া ও সীতাদেবী প্রভৃতি অপেক্ষা বহু উর্দ্ধে শ্রীমা অবস্থিত। ভক্তবীর নাগ মহাশয়ও মন্তব্য করিয়াছিলেন, বাপের [ঠাকুরের] চেয়ে মা দয়াল। একদা নিশিকান্ত শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় মহাষ্টমী দিবসে বেলুড় মঠে আসেন। পূজা মণ্ডপে যাইয়া তিনি প্রতিমাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইয়া শ্রীমাকে স্মরণ করিতেছেন, এমন সময়

শুনিলেন, শ্রীমা এসেছেন ও পার্শ্ববর্তী উত্তরদিকস্থ বাগানবাটীতে আছেন। এই শুভ সংবাদ শুনিয়া ভক্ত আর প্রতিমাকে প্রণাম করিতে পারিলেন না; জ্যান্ত দুর্গাকে দর্শন করিবার জন্য আকুল হইয়া ছুটিলেন। তিনি যাইয়া দেখিলেন, শ্রীমা গোলাপ মা ও যোগীন মাকে দুই পাশে লইয়া বসিয়া আছেন। প্রিয় ভক্ত তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেই শ্রীমা বলিলেন, "বাবা, পূজা দেখতে এসেছ? দেখ দেখ কেমন জয়া-বিজয়া নিয়ে বসে আছি। শ্রীমা জয়রামবাটীতে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, জয়া ও বিজয়া সহিত ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রীকে। তবে কি তিনি জগদ্ধাত্রীর নারীমূর্ত্তি? সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী মন্তব্য করেন, শ্রীমা স্বীয় ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রীর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভক্তগণ বলেন, শ্রীমা দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বগলার অংশে অবতীর্ণা।

যখন জয়রামবাটিতে শ্রীমা বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ ডাক্তার বৈকুণ্ঠ মিত্রকে (ওরফে স্বামী মহেশ্বরানন্দকে) সন্ন্যাস দেন শারদীয়া মহাষ্টমী দিবসে, তখন নিশিকান্ত ওখানে উপস্থিত ছিলেন ও শ্রীমার নিকট বায়না ধরিলেন, "মা আমাকেও সন্ন্যাস দিতে হবে।" কারণ স্বামিজী (বিবেকানন্দ) বলেছেন, সন্ন্যাস না নিলে মুক্তি হয় না। তখন শ্রীমা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এ ত সত্যি কথা। তবে কি জান বাবা, সন্ন্যাস নিলেই হয় না। চাই আন্তর সন্ন্যাস। আন্তর সন্ন্যাস না হলে কিছুই হবে না। বাহ্য সন্ন্যাস আন্তর সন্ন্যাসের সহায়তা করে। তাই যাকে দেওয়া দরকার তাকে দিই। তোমার দরকার নাই, তোমার আন্তর সন্ন্যাস হবে।" অনন্তর তিনি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে যাইয়া ঠাকুরের প্রসাদী সরবৎ এক গ্লাস আনিয়া ভক্তের সামনে কিছু খাইয়া অবশিষ্ট মহাপ্রসাদ তাঁহাকে খাইতে দিলেন। তখন উঠানে শ্রীমাব একখানা পরিধেয় বস্ত্র শুকাইতেছিল। শ্রীমা সেই কাপড়খানি আনিয়া ভক্তকে দিয়া বলিলেন, এইখানা তুমি নাও।' প্রিয় ভক্ত দুই হাত পাতিয়া সেই কাপড় লইলেন ও মাথায় স্পর্শ

করিলেন। সারা জীবন সেই পবিত্র কাপড়খানিকে তিনি স্বর্গীয় গৈরিকরূপে দেখিতেন ও যখনই মাথায় ঠেকাইতেন, তখন শ্রীমার পাদস্পর্শসুখ অনুভব করিতেন। একবার শ্রীমা তাঁহাকে উপদেশদানচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি যে সংসারে আছ, তাহা ঠাকুরের সংসার জানবে। যাঁরা ঠাকুরের সংসারে আছে, তাদের সেবার জন্য সদা কাজ করবে। যা কিছু কর, মনে করবে, সবই ঠাকুরের কাজ।" শ্রীমার শিষ্য মুকুন্দবিহারী সাহা একবার যখন জয়রামবাটীতে শ্রীমার নিকটে ছিলেন, তখন হঠাৎ কলিকাতা যাওয়ার জন্য একটী জরুরী টেলিগ্রাম পাইলেন। গরুগাড়ীর ব্যবস্থা না হওয়ায় শ্রীমা নিশিকান্তকে বিষ্ণুপুর ষ্টেশন পর্যন্ত প্রায় আঠাইশ মাইল পথ মুকুন্দ সাহার সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতে আদেশ দেন। তখন উভয় সন্তানকে উৎসাহদানার্থ তিনি বলিয়াছিলেন, 'কতবার আমি পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত গেছি। আমি যখন এত রাস্তা পায়ে হেঁটে যেতে পেরেছি, তখন তোমারও এই পথটুকু হেঁটে যেতে পারবে।" উভয়ে পরদিন প্রাতে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নিশিকান্তের মনে এই সাধ ছিল, মা খেতে খেতে আমার হাতে প্রসাদ দিবেন, আর আমি আনন্দে তা গ্রহণ করবো।" এই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকায় ভক্তের মনে আপশোষ হইল। যখন ভোর রাত্রে উভয়ে যাত্রার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখনও তাঁহার মনে সেই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পুনঃপুনঃ উঠিতেছিল। অন্তর্যামিনী মাতৃদেবী তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া বিদায় সময়ে তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা একটু দাঁড়াও।' এই কথা বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে গেলেন ও একটি ছোট ডালায় কিছু মুড়ি আনিয়া ভক্তের সামনে দুই মুঠো খাইলেন ও বাকী মুড়ি ভক্তকে দিয়া বলিলেন, বাবা এবার তো হয়েছে ?

বাগবাজারস্থ নিবেদিতা বিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রধানা শিক্ষিকা সুধীরা বসু একবার শ্রীমার কাছে জয়রামবাটীতে ছিলেন। তখন শ্রীশচন্দ্র ঘটক, নিশিকান্ত মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজন দীক্ষিত সন্তানও শ্রীমাকে দর্শন

করিতে ওখানে যান। ফিরিবার সময় সকলেই বিষ্ণুপুর ষ্টেশন পর্যন্ত একসঙ্গে আসিলেন। যাত্রাকালে গোযানে উঠিবার সময় নিশিকান্ত শিশুর মত 'মা' 'মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন শান্তিময়ী সারদামণি নিশিকান্তের চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিলেন ও বলিলেন, 'আমার কাঁদুনে গোপাল, অমন করে কি কাঁদতে আছে? শ্রীমার স্নেহস্পর্শে সন্তান শান্ত হইলেন। একবার নিশিকান্তের ইচ্ছা হইল, শ্রীমার ঠাকুরপূজা দেখিতে। শ্রীমাকে এই প্রার্থনা জানাইলে তিনি বলিলেন, আমার পূজা আর কি দেখবে? একদিন ভক্ত কালী মামার বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন। তখন শুনিলেন, মা অনেকক্ষণ পূজায় বসেছেন। অমনি ভক্ত তথায় ছুটিয়া গেলেন ও দেখিলেন, শ্রীমা একটি পুষ্প হস্তে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ঠাকুরের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁহার দেহ প্রস্তরবৎ স্পন্দনহীন। পূর্বোক্ত সুধীরা বসু শ্রীমাকে হাওয়া করিতেছিলেন। পাখা সহ তাঁহার হাতখানাই শুধু নড়িতেছিল; কিন্তু তিনিও ধ্যানমগ্না। পরমানন্দে নিশিকান্ত শ্রীমার ঠাকুরপূজা দেখিলেন। পূজান্তে শ্রীমা ভক্তকে বলিলেন, কি বাবা, পূজা দেখা হলো? সুধীরা বসু শ্রীমার দীক্ষিতা শিষ্যা ও 'ভারতের সাধনা' গ্রন্থের রচয়িতা স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সহোদরা। জয়রামবাটীতে শ্রীমার বাড়ীতে ভক্তগণের জন্য সকাল বেলা সাধারণতঃ জলখাওয়ার ব্যবস্থা হইত মুড়ি ও গুড়। কোন দিনই নিশিকান্ত মুড়ি খাইতে ভালবাসিতেন না। অথচ এই কথা তিনি কখনও শ্রীমার নিকট ব্যক্ত করেন নাই। শ্রীমা ভক্তের অন্তর বুঝিয়া মুড়ির পরিবর্তে কোন দিন হালুয়া, আর কোন দিন রুটি বা দিতেন। একদিন মাতৃসেবক জ্ঞান মহারাজ বারবার বলিলেন, আমরা সব মুড়ি খাই, এও মুড়ি খাবে।' আর শ্রীমা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, 'না, না, ও মুড়ি খাবে না।' শ্রীমা ভক্তদের মনোভাব অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন।

একবার রাঁচি হইতে শ্রীশচন্দ্র ঘটক প্রভৃতি কয়েকজন মাতৃভক্ত

জয়রামবাটী যাইতেছিলেন। নিশিকান্ত তাঁহাদের সঙ্গী হইবার জন্য অফিসে ছুটি চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও ছুটি পান নাই। তিনি গুরুভ্রাতৃবৃন্দকে ট্রেণে তুলিয়া দিবার জন্য ষ্টেশনে আসিলেন। তথায় তিনি মাতৃদর্শনের অদম্য আগ্রহে অফিসে কি হইবে না হইবে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ট্রেণে উঠিলেন; কিন্তু শ্রীমার কৃপায় অফিসের বিপদ হইতে আশ্চর্যভাবে মুক্ত হইলেন। সেবার জয়রামবাটী যাওয়ার পথে তাঁহারা ঝড়বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া রাত্রিতে তথায় উপস্থিত হন। তখন শ্রীমার শরীর সুস্থ ছিল না। পরদিন ভক্তবৃন্দ শ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে যাইলে তিনি বলিলেন,"কাল আমার দেহটা ভাল ছিল না। তাই তোমরা এসেছ শুনেও তোমাদের খোঁজ নিতে পারিনি।" কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর শ্রীমা পুনরায় স্নেহভরে বলিলেন, "অমন গোঁ করে কি আসতে আছে? রাস্তায় কত কিছু হনহনিয়ে চলে। ঠাকুর রক্ষা করেছেন। ঠাকুর তোমাদের রক্ষা করেছেন।" নিশিকান্ত ভক্তিভরে বলিলেন, 'মা আমরা তো ঠাকুরকে দেখি নাই, তুমিই আমাদের ঠাকুর।' ইহা শুনিয়া শ্রীমা মৃদু হাস্যে বলিলেন, "হাঁ, আমিই তোমাদের ঠাকুর। সব সময় মনে রাখিও, ঠাকুর তোমাদের পেছনে আছেন।" সেবার নিশিকান্ত শ্রীমার পদপ্রান্তে তিনদিন মহানন্দে কাটাইলেন এবং ভানু পিসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিলেন। ভানু পিসী পান সাজিয়া ভক্তদের মুখে গুঁজিয়া দিয়া বলিতেন, 'ঠাকুরকে পান খাওয়াচ্ছি।'

নিশিকান্তের একমাত্র সন্তান বীণার কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরে কন্যা ও জামাইয়ের কাছে নিশিকান্ত থাকিতেন, এবং তথায় তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। শ্রীমা প্রত্যেক সন্তানের সহিত কিরূপ স্নেহময় আচরণ করিতেন, তাহা এই বিবরণ হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায়। বেলুড় মঠের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ মহাপুরুষ শিবানন্দজী বলিতেন, "শ্রীমার পূজা মা কালীর ধ্যানেই করবে। শ্রীমা ছিলেন দশমহাবিদ্যার

অন্যতমা। আমাদের মা যে সে মেয়ে নন, স্বয়ং জগজ্জননী লীলাদেহ ধারণ করে এসেছিলেন। এ মা জগতের মা, জগদ্ধাত্রী। ঠাকুর বলতেন, ঐ মন্দিরের মা আর এই নহবতের মা এক, অভেদ।" দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর শ্রীমার জিহ্বায় একটি সিদ্ধ মন্ত্র লিখিয়া দেন, দীক্ষা দেন; অন্যান্য সিদ্ধ মন্ত্রও তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুর স্বয়ং যে সকল দেবদেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই দেবদেবীগণের মন্ত্রসমূহও শ্রীমাকে শিখাইয়া দেন। শ্রীমা ঐ সকল মন্ত্রের সাধনাও করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি পূর্ণানন্দ নামক সন্ন্যাসীর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমা বলিতেন, যেমন চন্দন ঘসতে ঘসতে সুগন্ধ বাহির হয় ও ফুল নাড়াচাড়া করলে সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।" যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে মহাসমাধিমগ্ন হন, তখন শ্রীমা তাঁহার পূতদেহ জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার মা কালী, কোথায় গেলে গো?'

১৮৭৩ খ্রীঃ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালিপূজার রাত্রে তৃতীয়া মহাবিদ্যা ষোড়শী জ্ঞানে যথাবিধি মহাপূজা করেন। তখন পূজক ও পূজিতা উভয়ে সমাধিস্থ হন ও সারদা-স্বরূপ প্রকটিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ অক্ষয়কুমার সেন 'রামকৃষ্ণ পুঁথি'তে লিখিয়াছেন—

এই পূজা পূজার ইতি আর দেবদেবী মূর্তি
কভু না পূজিলা পরমেশ।
যেন পূজা শ্রীশ্রীমার পরম চরম সার
পরিণাম সকলের শেষ॥

ইহাই ঠাকুরের শেষ পূজা। ইহার ফলে হইল, দোঁহে ইষ্ট দোঁহাকার।" ঠাকুর জগদ্ধিতায় মনকে নির্বিকল্প সমাধি হইতে নামাইবার জন্য শ্রীমাকে

ইষ্টজ্ঞানে দেখিলেন, আর শ্রীমা স্বীয় স্বরূপ উপলব্ধির জন্য ঠাকুরকে ইষ্টরূপে লইলেন। প্রাকৃত ভক্তের অশুদ্ধ অন্তরে ঠাকুরের বিমল স্বরূপ পূর্ণভাবে প্রকটিত হয় না; একমাত্র সারদার বিশুদ্ধ হৃদয়ে উহার সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে। রামকৃষ্ণ-শক্তিই সারদার মধ্যে লোককল্যাণার্থ প্রবাহিত। সেই রামকৃষ্ণময়ী সারদাদেবীকে বাদ দিয়া রামকৃষ্ণ সাধন অসম্ভব। ইহাই সারদাতত্ত্বের মূলসূত্র। ঠাকুরের অদর্শনের পর শ্রীমা ঠাকুরের নির্দেশেই স্বামী যোগানন্দ ও ত্রিগুণাতীতকে দীক্ষা দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা অভিন্ন দেবতা। একদা কোন ভক্ত শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, ঠাকুর বলিয়াছেন যে, তাঁর কাছে যাঁরা আসবেন, তাঁদের শেষ জন্ম। আপনার কাছে যারা আসবে, তাদের কি হবে?" শ্রীমা সহাস্যে উত্তর দিলেন, "কি আর হবে, বাবা। এখানেও তাই হবে।"

যেমন ঠাকুরের লীলাস্থল কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ও কাশীপুর বাগানবাটী, তদ্রূপ শ্রীমার লীলা-ক্ষেত্র জয়রামবাটী, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ও বাগবাজারস্থ উদ্বোধন মঠ। শ্রীমার পার্থিব জীবনের শেষ নয় বর্ষ উক্ত মঠে অতিবাহিত হয় ও তথায় তিনি স্থূল দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার দিব্যদেহ অদ্যাপি বিদ্যমান। তাঁহাকে চর্মচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছি। সেই দুর্লভ দর্শনের কথাই উপসংহারে সংক্ষেপে লিখিতেছি। প্রায় এক বর্ষ পূর্ব্বে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর শনিবার বৈকালে স্বামী ভৈরবানন্দকে লইয়া আমি বেলুড় ধর্মচক্র হইতে বাসে চড়িয়া হাওড়া ষ্টেশনে যাই। তথায় মাকড়দহের কোন ভক্ত অফিস ফেরৎ আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হয়। আমরা তিন জন কলিকাতার সিমলা পল্লীতে গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীটে ৺স্বামিজীর পুণ্য জন্মস্থান দর্শনান্তে শ্যামবাজার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে যাই। তথা হইতে বাগবাজার উদ্বোধন মঠে উপস্থিত হই। তখন ঠাকুর-ঘরের দরজা খোলা হইয়াছে।

আমরা তিনজন প্রণামান্তে দরজার সম্মুখে জপধ্যানে বসিলাম। আমি জানালার পাশেই উপবিষ্ট ছিলাম। আমার অটল বিশ্বাস, উক্ত কক্ষে ভাগবতী তনুতে শ্রীমা এখনও আছেন। আমাদের জপধ্যান অচিরে খুব জমিয়া গেল। চোখের জলে আমার গণ্ডদেশ সম্যক্ প্লাবিত হইল। আমি মর্মব্যথায় অভিভূত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "স্নেহময়ী সংঘ-জননী, তুমি আমাকে সংঘচ্যুত করেছ, কিন্তু চরণচ্যুত করো না।" তখন দেখা গেল, শ্রীমা সারদা খাটের উপর হইতে দিব্যদেহে আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ও ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমার মাথায় ও মুখে হাত বুলাইয়া চুমু খেলেন। অনন্তর তিনি দরজার বাহিরে আসিলেন ও ভৈরবানন্দের মাথায় দুই হাত দিয়া চুম্বন করিলেন। তৎপরে অন্য ভক্তের নিকটে যাইয়া তাহার মাথার উপর দুই হাত উচ্চে ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় খাটে যাইয়া বসিলেন ও আমাদের দিকে সস্নেহে চাহিয়া রহিলেন। আমরা তিন জন অপূর্ব্ব আনন্দে বিভোর ও ধ্যানস্থ রহিলাম। অনন্তর চরণামৃত পানান্তে পার্শ্বস্থ সারদানন্দজীর বাসকক্ষে যাইয়া আমরা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলাম। সেখানে দেখা গেল, সারদাময় সারদানন্দ স্বীয় খাটে দিব্যদেহে বসিয়া আছেন। মাতৃতীর্থ দর্শনান্তে আমি বহুবাজারস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বোধচক্রে কালীতত্ত্ব সম্বন্ধে কথকতা করিতে গেলাম। সেদিন উক্ত সভায় প্রায় এক শত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমার কথকতাও অতিশয় ভাবগম্ভীর হইয়াছিল। স্বামী সারদানন্দ কর্ত্তৃক রচিত মন্ত্রে প্রণামান্তে এই সুদীর্ঘ নিবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

যথাগ্নের্দাহিকা শক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্॥

তিন

মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ *

বিগত শতকের শেষার্ধে যে সকল ধর্মগুরুর আবির্ভাবে বাংলা দেশে সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটে, মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ তন্মধ্যে অন্যতম। স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী কৃষ্ণানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্যামাচরণ লাহিড়ী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অমর পুরুষগণের ন্যায় তিনি হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় সুদীর্ঘ কুমার জীবন উৎসর্গ করেন। কলিকাতায় রামমোহন রায় রোডে তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্মপ্রচারিণী সভা অদ্যাপি বিদ্যমান। উক্ত সভা হইতে মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের বিস্তৃত জীবনী স্নোৎস্নাময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত ভাবগম্ভীর ভজনসমূহ উক্ত সভা (বা মঠ) হইতে 'পরমার্থ সঙ্গীতাবলী' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত। এই প্রসঙ্গে তৎকৃত ক্ষুদ্র পুস্তিকা 'প্রতিজ্ঞা শতক'ও উল্লেখযোগ্য।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত পায়রাটুঙ্গী গ্রামে মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ ১২৫৩ সালে অগ্রহায়ণ মাসে শারদীয়া শুক্লা চতুর্থী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পার্বতীচরণ ভাদুড়ী ও মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী ধর্মিষ্ঠা ব্রাহ্মণ দম্পতী ছিলেন। নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপালচন্দ্র শ্রীরামপুরে বাস করিতেন। গোপালচন্দ্রের দ্বিতীয় ভ্রাতার নাম ছিল নেপাল ও নগেন্দ্রনাথের ডাক নাম ছিল আপাল। শৈশবে নগেন্দ্রনাথ পূর্ণচন্দ্র দেখিতে ও হরিনাম শুনিতে ভালবাসিতেন। পঞ্চম বৎসর বয়সে তিনি স্বগ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন। কিছুকাল পরে তিনি

---

* ১৯৫৮ খ্রীঃ ৮ই নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা নগেন্দ্র মঠে মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের ৬৩ তম স্মৃতিসভায় কলিকাতার মেয়র ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডক্টর শ্রীত্রিগুণাচরণ সেন মহাশয়ের পৌরোহিত্যে প্রধান অতিথিরূপে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ। এই প্রবন্ধ 'ভাবমুখে' মাসিকে ১৩৬৫ সালে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত।

পার্শ্ববর্তী বালুহাটী গ্রামস্থ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং যথাসময়ে কলিকাতায় যাইয়া মিশনারী কলেজে সিনিয়র ক্লাশে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। উক্ত কলেজের পাঠ সমাপনান্তে স্বগ্রামে আসিয়া তিনি একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক উহার প্রধান শিক্ষক হন। গোপাল, নেপাল ও আপাল তিন ভ্রাতা উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। বাল্যকালে নগেন্দ্রনাথের বিদ্যানুরাগ অসাধারণ ছিল। তিনি একদণ্ডও পুস্তক ছাড়িয়া থাকিতেন না। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার অদম্য আগ্রহে তিনি সুবৃহৎ ওয়েবষ্টার ডিক্সনারী প্রায় সমস্তই মুখস্থ করিয়াছিলেন। পায়রাটুঙ্গী বিদ্যালয় ছাড়িবার কিছুকাল পরে জনাই গ্রামের বিদ্যালয়ে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। যোগ্যতা সহকারে দুই বৎসর উক্ত পদে কর্ম করিয়া তিনি স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। ছাত্র-জীবনেই তাঁহার ধর্মসাধনা আরম্ভ হয় ও তিনি যোগসাধনায় নিযুক্ত হন। তখন ছয় মাস যোগসাধনের ফলে তিনি শূন্যে স্থিতি লাভ করেন। তিনি স্বীয় কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাকী প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেন। একদা জননী ত্রিপুরাসুন্দরী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রুদ্ধ দ্বারের ছিদ্র দিয়া বিস্মিত নয়নে দেখেন, তাঁহার তৃতীয় পুত্র নগেন্দ্র ওরফে আপাল পদ্মাসনে উর্ধ নেত্রে শূন্যে উপবিষ্ট! বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালন ও প্রাণায়াম সাধন দ্বারা নগেন্দ্রনাথ যৌবনেই অলৌকিক যোগসিদ্ধির অধিকারী হন।

পায়রাটুঙ্গীর অল্পদূরে বালুহাটী গ্রামে একটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল। তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নায়কত্বে আদি ব্রাহ্মসমাজ বাংলা দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বালুহাটী গ্রামের ব্রাহ্ম সমাজে আচার্য্যপদে আরূঢ় হন ও কিছুকাল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎকালে তিনি যে সকল ব্রাহ্ম সঙ্গীত রচনা করেন, তন্মধ্যে একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই সংগীত কেদারা রাগিণীতে ও একতালে গীত হয়।—

নমামি দেব পূর্ণ ব্রহ্ম জগজ্জন-মনোহারী।
তুমি অনাদি তুমি অনন্ত প্রাণমোহনকারী ॥
ঘোর দুঃখভার করিয়ে মোচন
নাথ তুমি কর পাপ বিনাশন
ধন্য ধন্য তুমি ওহে নিরঞ্জন, ধন্য মহিমা তোমারি ॥
সন্তাপ অনলে দগ্ধ হলে প্রাণ
শান্তির সলিলে করহে নির্বাণ
তাই যে তোমারে সন্তাপ-হরণ বলে ডাকে নরনারী ॥
তোমার আশ্রয় লয় যেই জন
নাহি ডরে সেই শমনে কখন
তাই নাম তব শমন-দমন, ওহে দয়াময় হরি ॥
বিপদ-সাগরে মানবে উদ্ধারি
ধরেছ গো নাম বিপদ-কাণ্ডারী,
জয় জয় জয়, জয় হে তোমারি ত্রিতাপ-ভার-হারী ॥

নগেন্দ্রনাথ চিরকুমার ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ ছিলেন। কিরূপে তিনি বিবাহ সম্বন্ধ ভঙ্গ করেন, তাহা বিস্ময়কর। গর্ভধারিণী ত্রিপুরাসুন্দরী আত্মহত্যার ভয় দেখাইলে মাতৃভক্ত নগেন্দ্রনাথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে সম্মত হন। বরাহনগরে মাতুলালয়ের নিকট একটী সুকন্যা স্থির হইল। নগেন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই কন্যা দেখিতে জনৈক বিশ্বস্ত বান্ধব সহ গেলেন। উক্ত কন্যার হস্তরেখা তিনি মনোযোগ সহকারে পরীক্ষান্তে মন্তব্য করিলেন, "ইহার হাতে বৈধব্য-চিহ্ন স্পষ্ট রূপে দেখা যাইতেছে; আর আমার আয়ুরেখা সুদীর্ঘ। আমার সহিত ইহার বিবাহ হইবে না।" স্বগৃহে ফিরিয়া মাতার নিকট এই কথা বলিতেই উক্ত বিবাহ স্বতঃই বন্ধ হইয়া গেল। নগেন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইল। যথাকালে অন্য বরের সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ হইবার কয়েক বৎসরের পরেই তিনি

বিধবা হইলেন এবং নগেন্দ্রনাথের নিকট আসিয়া আত্মপরিচয় দিয়া মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহা অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার। কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সংস্কৃত পত্রিকায় জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কর্ত্তৃক নগেন্দ্রনাথের সংস্কৃত জীবনী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার নাম 'যোগীভক্ত-চরিতম্'। ইহা অদূর ভবিষ্যতে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে। এই সংস্কৃত জীবনীতে বাংলা জীবনী অপেক্ষা অনেক নূতন ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

উল্লিখিত ঘটনার পর নগেন্দ্রনাথ জন্মগ্রাম পায়রাটুঙ্গী ছাড়িয়া বালি হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। বালিতে ও নিজ গৃহে তিনি সন্ধ্যাকালে ধর্মসভার আয়োজন করিতেন এবং প্রাণের আবেগে সমবেত নরনারীগণকে ধর্মপ্রসঙ্গ ও ধর্মসঙ্গীত শুনাইতেন। উত্তরপাড়া, বেলুড়, কলাছড়া, বেলঘরিয়া প্রভৃতি নানা স্থান হইতে ধর্মপিপাসুগণ আসিয়া তাঁহার মুখে হরিকথা শুনিতেন। বালি হাই স্কুল গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত এবং পূর্ব তীরে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী। তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উক্ত কালীবাড়ীতে থাকিতেন। একদিন নগেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সন্দর্শনে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেদিন রামকৃষ্ণদেব বহু ভক্ত পরিবেষ্টিত হইয়া ভাবসমাধিমগ্ন ছিলেন। সমবেত ভক্তবৃন্দ এই নরদেবতার সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডলের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। সমবেত ভক্তবৃন্দ নীরব, নিস্তব্ধ। এমন সময় নগেন্দ্রনাথ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং পূর্ব পরিচিত পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক বসিতে বলিলেন। অনন্তর উভয়ের মধ্যে ধর্মালাপ আরম্ভ হইল। সমাগত ভক্তগণ একাগ্র অন্তরে সেই ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অহৈতুকী ভক্তি কিরূপ!" নগেন্দ্রনাথ

তাঁহার নিকট ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একটির পর একটি প্রশ্ন করিলেন; আর নগেন্দ্রনাথও ঐগুলির যথার্থ উত্তর দিলেন। অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণ নগেন্দ্রনাথকে ভজন গাহিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুযায়ী নগেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক সুধাকণ্ঠে নিম্নোক্ত তিনটী স্বরচিত ভজন গাহিলেন। তন্মধ্যে প্রথমটি বাউল সুরে গীত হয়। এই ভজনত্রয় 'পরমার্থ সঙ্গীতাবলী' গ্রন্থে প্রকাশিত।—

এক

অগাধ জলের মীন তুমি হরে।
তোমায় ধরতে কেবা পারে নাথ, বিনা নিপুণ ধীবরে॥
গভীর জ্ঞান-সূত্র দিয়ে, ভক্তি-বঁড়িশ তায় বাঁধিয়ে
প্রেমের চার ছড়াইয়ে যদি ভুলাতে পারে॥
তবে তার প্রেমের টানে, আসবে তার সন্নিধানে
নতুবা সে কেমনে ধর্‌বে বল তোমারে॥
শোন কাঙ্গালের কথা ঘুচাও আমার মনোব্যথা
ভজন সাধন সকল বৃথা জেনেছি এবারে।
যদি কৃপা কর মোরে, তবে কাঙ্গাল পায় তোমারে
বলছি তোমায় সকাতরে একবার হের আমারে॥

দুই

মনের মত নয় যে রে মন।
সে যে জানিয়ে শুনিয়ে কুপথে করে গমন॥
যে জন নিদ্রায় থাকে, জাগাতে পারি তাকে।
কিন্তু যে জন জাগিয়ে ঘুমায়, তাঁরে জাগান কঠিন॥

তিন

সেই ত সুদিন তারা।
ভাবিতে ভাবিতে যবে হব আত্মহারা।
ভুলিব ভব-ভাবনা, চাব না চরণ বিনা
ঘুচিবে সব যন্ত্রণা ওমা দুঃখ-হরা ॥
পরিহরি অভিমানে মত্ত হয়ে তব গানে
বহিবে দুনয়নে যবে প্রেমাশ্রুধারা ॥
তন মন ধন জন, সব করি সমর্পণ
সার করে ও চরণ হব আত্মহারা ॥
করে তব পদাশ্রয়, ঘোর মরণের ভয়
করব যবে পরাজয় ওমা সারাৎসারা ॥
অসার বাসনা সবে, আমা হস্তে দূরে যাবে,
মাত্র এই মন বলিবে, "জয় দুঃখহরা ॥"
বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করে, ভয়-ভাবনা ফেলে দূরে
তোমারি নাম-সাগরে ডুবাও দুঃখের সরা ॥

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া নগেন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন, "ডুব, ডু··ব, ডু···ব"। অনন্তর অত্যন্ত বিভোর হইয়া নিম্নোক্ত ভজন গাহিলেন।—

ডুব ডুব ডুব রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম-রত্নধন ॥
ডুব ডুঁব ডুব ডুবলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি, জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন জন।
কুবীর বলে, শোন্ শোন্ শোন্, ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের গান শেষ হইলে নগেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট আবশ্যকীয়

আধ্যাত্মিক গুহ্যকথা শ্রবণান্তে বিদায় গ্রহণ করেন। কিছু কাল পরে শ্রীরামপুরে তাঁহার জননী অন্তিম অসুখে শয্যাগত হইলে মাতৃভক্ত নগেন্দ্রনাথ প্রাণপণে মাতৃসেবা করিয়া ধন্য হন। মাতৃ-বিয়োগের পর তিনি রাণীগঞ্জ যাত্রা করেন এবং তত্রস্থ ভক্তবৃন্দকে ধর্মপথে উৎসাহিত করেন। তিনি পত্র লিখিলে শিরোনামায় লিখিতেন, ওঁ নমো ধর্মায়। তিনি সত্যই ধর্মনিষ্ঠ সদাচারসম্পন্ন সদ্‌ব্রাহ্মণ ছিলেন। যিনি তাঁহার পূতসঙ্গে আসিতেন, তিনিই ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইতেন। তাঁহাকে ও তৎ-শিষ্য স্বর্গত ধ্যানপ্রকাশজীকে দর্শনের সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছি। ব্রহ্মচারী ধ্যানপ্রকাশজী স্বীয় গুরুর নিকট ব্রহ্মচর্য্য সাধন সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হন, সেইগুলি তৎপ্রণীত 'ব্রহ্মচর্য্য ও শরীর পালন' শীর্ষক পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিই সনাতন ধর্মপ্রচারিণী সভাকে নগেন্দ্র মঠে পরিণত ও উহার যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন। তৎশিষ্য ব্রহ্মচারীই বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ। দেওঘরের বালানন্দ আশ্রমের সাধুবৃন্দের ন্যায় ইহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রতী ও গেরুয়াধারী ব্রহ্মচারী; কিন্তু বৈদিক সন্ন্যাসী নহেন। শংকরাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই উহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। সন্ন্যাস আশ্রমকে অস্বীকার করিয়া ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য্য সমাজ ভারত সমাজে চিরজীবী হইতে পারিল না।

নগেন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসগ্রহণ না করিলেও আদর্শ সন্ন্যাসীর মতই বেদান্তোক্ত শম-দমাদি ষট্‌সম্পদের একনিষ্ঠ অধিকারী ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে দীর্ঘশ্মশ্রুযুক্ত ঋষিতুল্য মহাপুরুষ মনে হইত। সনাতন ধর্মের সাধন ও প্রচারে তিনি সুদীর্ঘ নির্মল জীবন অতিবাহিত করেন। হিন্দু সমাজে যতই এরূপ শাস্ত্রজ্ঞ সাধক ব্রাহ্মণের আবির্ভাব ঘটিবে, ততই আমরা 'আশিষ্ঠ বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ' হইব। অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে মহাশক্তি প্রবাহিত হইবে। ইহাই ধর্ম-জীবনের মূলভিত্তি। ইহাই মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের মর্মবাণী বলিয়াই মনে

হয়। শেষ বয়সে তিনি বিষয়কর্ম হইতে সম্যক্ নিবৃত্ত হইয়া ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। কলিকাতায়, এমন কি সুদূর কাশীধাম পর্য্যন্ত যাইয়াও তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত হন। বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক তিনি যে প্রেমামৃত লাভ করেন, তাহাই তিনি নিজে নিত্য পান করিতেন ও ধর্মপিপাসুগণকে পান করাইতেন। শিক্ষিত ও সম্পন্ন হইয়াও তিনি সংসারে প্রবেশ করিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যই বলিতেন, সংসারের 'সং'ই সার। ভক্তিসাধন সম্বন্ধে উপদেশ দানকালে নগেন্দ্রনাথ নিম্নোক্ত শ্লোকটী আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতেন।—

রত্নাকরস্তব গৃহং গৃহিণী চ পদ্মা
দেয়ং কিমস্তি ভবতে পুরুষোত্তমায়।
আভীর-বামনয়নাহৃত-মানসায়
দত্তং মনো যদুপতে তমিদং গৃহাণ ॥

অনুবাদ—রত্নাকর যাঁহার শয্যা, স্বয়ং কমলা যাঁহার পত্নী, সেই পুরুষোত্তমকে আমাদের কি দেয় আছে! আভীর গোপ-গোপী ও ভক্তবৃন্দ তাঁহার মন চুরি করিয়া লইয়াছে। সেইজন্য তাঁহার মন নাই। তাই আমাদের মন তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে। যদুপতি তাহাই গ্রহণ করিবেন। তিনি ভক্তের নিকট অন্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না।

সিদ্ধমুনি অষ্টাবক্র রাজা জনককে ব্রহ্মজ্ঞান দানের পূর্বে দক্ষিণা চাহিলেন। রাজা জনক রাজ্য-সম্পদ্ দিতে চাহিলে অষ্টাবক্র তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন ও শিষ্যের মন দক্ষিণারূপে চাহিলেন। মন অর্পণ করা মাত্রই শিষ্য জ্ঞানলাভে ধন্য হইলেন। গুরুকে বা ইষ্টকে মন দান করিতে হয়। গুরু ও ইষ্ট মূলতঃ এক।

সন ১৩৩৪ সাল ১৩ই কার্ত্তিক শনিবার দুইটার সময় হঠাৎ মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি শয্যা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ সার্জন মন্মথনাথ

চট্টোপাধ্যায়কে আনিয়া ধাতুময় শলাকা সহায়ে তাঁহার প্রস্রাব করান হইল। সোমবার তিনি সুস্থ ছিলেন, কিন্তু প্রস্রাব হইল না এবং শলাকা সহায়ে প্রস্রাব করাইতে অসম্মতি জানাইলেন। ১৬ই কার্তিক মঙ্গলবার দ্বাদশী তিথির ব্রাহ্ম মুহূর্তে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিযোগে মহর্ষি দেহত্যাগ করিলেন। তিনি প্রায় অশীতিবর্ষ বয়স পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসুখ উপভোগান্তে স্বধামে প্রস্থান করিলেন। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলে তাঁহার শরীর রোগরহিত ও স্বাস্থ্যমণ্ডিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, "দেহের পক্ষে নিশ্বাস, আর মনের পক্ষে বিশ্বাস এবং সংসারযাত্রা সমুদ্রযাত্রা। Faith and Modern scepticism নামক গ্রন্থ তৎকালে প্রচলিত ছিল। তাহা হইতে কোয়েকার খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জন ওয়েসলে সাহেবের জীবনী হইতে ঘটনা উল্লেখ করিয়া তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেন। শেষ জীবনে ইষ্টধ্যানে তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন এবং গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইতেন। সর্বান্তঃকরণে তিনি সর্ব প্রাণীর মঙ্গল কামনা করিতেন। সেইজন্য নিম্নোক্ত সংস্কৃত প্রার্থনা উদ্ধৃত করিয়া এই সংক্ষিপ্ত মহর্ষি চরিতের উপসংহার করিব।—

সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥
নন্দন্তু সর্বভূতানি, নিরাতঙ্কানি সন্তু চ।
প্রীতিরস্তু পরস্পরং, সিদ্ধিরস্তু চ কর্মণাম্॥
স্বস্তি রাজ্ঞোস্তু নিত্যশঃ, শম প্রজাভ্যস্তথৈব চ।
স্বস্ত্যস্তু দ্বিপদে নিত্যং, শান্তিরস্তু চতুষ্পদে॥
শান্তিরস্তু চ দেবস্য, ভূর্ভুবঃ স্বঃ শিবং তথা।
সর্বতো শান্তিরস্তু নঃ, সৌম্যা ভবন্তু ভূতানি॥
ত্বং দেব জগতঃ স্রষ্টা, ধাতা পাতা ত্বমেব হি।
প্রজা পালয় দেবেশ, শান্তিং কুরু জগৎপতে॥

অনুবাদ—সকলের মঙ্গল হউক। সকলে নীরোগ হউক। সকলে শুভ দর্শন করুক। কেহ দুঃখভোগী না হউক। সর্বভূত আনন্দ লাভ করুক ও নিরাতংক হউক। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি স্থাপিত হউক ও সব-কর্মে সিদ্ধিলাভ হউক। নিত্য রাজার কল্যাণ হউক। প্রজাগণের শান্তি হউক। দ্বিপদ প্রাণীগণের নিত্য মঙ্গল হউক ও চতুষ্পদগণের শান্তি হউক। স্বর্গে দেবগণ শান্তিলাভ করুন। ভুবর্লোকে পিতৃগণ এবং মর্ত্য-লোকে মর্ত্যগণ শান্তিতে থাকুন। আমাদের সর্ববিধ শান্তিলাভ হউক ও ভূতগণ সৌম্যভাব প্রাপ্ত হউক। হে মহাদেব, আপনি জগতের স্রষ্টা বিধাতা ও পালক। আপনি প্রজাবৃন্দকে পালন করুন। হে জগৎপতে, আপনি আমাদের সর্বশান্তি বিধান করুন।

চার

ধর্মচক্রে গঙ্গোৎসব

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্রে দ্বিতীয় বার্ষিক গঙ্গোৎসব ১৩৬৭ সালে ২২ জ্যৈষ্ঠ (৫ জুন ১৯৬০) রবিবার দশহারা দিবসে যথোচিত সমারোহে সম্পন্ন হয়। পূর্ব বর্ষের ন্যায় এই বর্ষেও আমাদের গঙ্গাপ্রতিমা নিশ্চিন্দার প্রসিদ্ধ মৃৎশিল্পী শ্রীরাধাচরণ পাল কর্তৃক সযত্নে নির্মিত হয়। প্রথম-বার্ষিক গঙ্গোৎসবের জন্য নির্মিত মৃণ্ময়ী প্রতিমার ফটোগ্রাফ আমাদের মন্দিরে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় বর্ষের গঙ্গাপ্রতিমা অতিশয় সুদর্শন হইয়াছিল। এই সুন্দর প্রতিমা দর্শন করিতে শনিবার ও রবিবার শত শত নরনারী আমাদের নাটমন্দিরে আগমন করেন। ৩রা জুন শুক্রবার পূর্বাহ্নেই

উক্ত প্রতিমা নাটমন্দিরে আনীত ও স্থাপিত হয়। উক্ত দিন বৈকালে ব্রহ্মচারিণী মহাগৌরী আশ্রমে আসিলেন ও দিব্য-দৃষ্টিতে দেখিলেন, মা গঙ্গা নাটমন্দিরে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং আমার স্বর্গগতা গর্ভধারিণী (অধুনা মন্দিরবাসিনী) সূক্ষ্মদেহে আসিয়া প্রতিমার অদূরে বিরাজ করিতেছেন। দুই তিন সপ্তাহ পূর্ব হইতেই প্রাতঃকালে আমাদের মন্দিরে গঙ্গাধ্যান, গঙ্গাসঙ্গীত ও গঙ্গাস্তবাদি সমবেত কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী রবিবার ২৯শে মে সান্ধ্য সভায় আমি গঙ্গাদেবী সম্বন্ধে আলোচনাও করিয়াছি। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই চিন্ময়ী গঙ্গাপ্রতিমা আমাদের মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। সমাহিত অবস্থায় মহাগৌরীও বহুবার গঙ্গাদেবীকে স্পষ্টভাবে দেখিয়াছেন।

৫ঠা জুন শনিবার পূর্বাহ্নে মাকড়দহ হইতে যোগীরাজ ভৈরবানন্দ আসিলেন। তিনিও দিব্য-চক্ষে দেখিলেন, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গাদেবী মন্দিরে বিরাজমানা এবং মৃণ্ময়ী প্রতিমায় প্রবেশ করিতে উদ্যতা। ভৈরবানন্দজী তাঁহাকে করযোড়ে বলিলেন, "মা, তোমাকে এখন প্রতিমায় প্রতিষ্ঠা করলেই পূজা করতে হবে। তাই আজ প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে না।" গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকামতে শনিবারই দশহরা ছিল ও নানা স্থানে গঙ্গাপূজা হইতেছিল। ঐদিন পরলোকগত লালবাবার ভাণ্ডারা বেলুড় গ্রামে তৎপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমে হইতেছিল। পূর্বেই ভৈরবানন্দজী জগন্মাতার নিকট জানিয়াছিলেন, লালাবাবা দুষ্কর্মের ফলে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন ও ধর্মচক্রের দক্ষিণ দিকস্থ উদ্যানের বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছেন। সাধু জীবনে অসাধু কর্ম করার জন্য তাঁহাকে দুই বৎসর রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে থাকিতে হইবে। সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ জ্যোতির্ময়ী গঙ্গাদেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, এত বড় সাধুর এরূপ দুর্গতি হল কেন? গঙ্গামাতা সহাস্যে উত্তর দিলেন, "ও তপস্যা করে ইষ্টসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং অন্নদানাদির জন্য সিদ্ধাই চেয়েছিল। সেই সিদ্ধাই পেয়ে সে অর্থবৃদ্ধির জন্য

উন্মত্ত হয় এবং ব্যবসায়, তেজারতি প্রভৃতি অসৎ উপায়ে ধন-সম্পত্তি লাভ করে তপঃ-শক্তি ক্ষয় পূর্বক। দ্বিতীয়তঃ সে উদাসী সাধু হয়েও দুইটি অসাধুজনোচিত অসৎকর্ম করে। সে বহু পুণ্য করলেও উক্ত পাপকর্মের ফলে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছে। পাপভোগান্তে সে পুণ্যভোগের জন্য স্বর্গে যাবে ও পুণ্য-ক্ষয়ান্তে মর্ত্যে ফিরে আসবে।" মৃত্যুর পর দিন লালবাবা ধর্মচক্রে আসিয়া আমাকে ও মহাগৌরীকে দেখাদেন এবং মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পেপে গাছে কিছুদিন বাস করেন।

শনিবার দ্বিপ্রহরে ১১টার সময় স্বামী ভৈরবানন্দ সূক্ষ্মদেহে লালাবাবার আশ্রমে গিয়া দেখিলেন, "যেখানে লালবাবা থাকিতেন, সেখানে পূজাদি হইতেছে এবং অদূরে হোমকুণ্ডে হোমাগ্নি জ্বলিতেছে। প্রেতযোনি প্রাপ্ত হওয়ায় লালবাবা পূজা বা হোমের কাছে যাইতে পারেন নাই। তিনি তপ্ত রৌদ্রে গঙ্গার ধারে দাঁড়াইয়া নিজের ভাণ্ডারা দেখিতেছেন। বৈকাল তিনটায় যমদূত কর্তৃক তিনি পুনরায় পূর্বোক্ত বাগানে আনীত হন। স্বকীয় আশ্রমে অন্নদান দর্শনার্থ তিনি তথায় আরও কিছুক্ষণ থাকিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু যমদূত তাঁহাকে তথায় থাকিতে দেন নাই। শনিবার বৈকালে মহাগৌরী বালি বাসা হইতে আসিলেন এবং মন্দিরে ঠাকুরকে ফলমিষ্টি নিবেদন করিলেন। নিবেদনান্তে খোলা চোখেই তিনি দেখিলেন, তাঁহার ইষ্টদেব শিব ঠাকুর একাই সারা পৃথিবী জুড়িয়া বিরাজ করিতেছেন। একটু পরে শিব ঠাকুর সরিয়া গেলেন। তখন মহাগৌরী দেখিলেন, একা মা কালীই সারা পৃথিবী ঢাকিয়া বিরাজ করিতেছেন, কোথাও একটু স্থান বাদ নেই। অনন্তর কালীমাতা সরিয়া গেলেন ও গঙ্গাদেবী সম্মুখে আসিলেন। মা গঙ্গার জ্যোতির্ময় শ্বেতচ্ছত্র মহাগৌরীর মস্তকে তৎসঙ্গিগণ ধরিলেন। মা গঙ্গার সঙ্গে ছিলেন কমণ্ডলু হস্তে ব্রহ্মা, বীণাধারী নারদ, জয়া ও বিজয়া, মহারাজ ভগীরথ, অনন্ত বাসুকি ও অসংখ্য গঙ্গাভক্ত। এই দিব্য দর্শনের পরে মহাগৌরী গভীর সমাধিতে

নিমগ্না হইলেন। সন্ধ্যায় আমাদের নাটমন্দিরে গঙ্গা-প্রতিমার সম্মুখে আমি গঙ্গা-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলাম ও মহাগৌরী হারমোনিয়াম বাজাইয়া গঙ্গাস্তোত্র ও গঙ্গাসঙ্গীত গাহিলেন। অনন্তর ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একটি মনোজ্ঞ ধর্মীয় ভাষণ দিলেন। তৎপরে কলিকাতা মহামায়া লীলাকীর্তন সম্মিলনী দুই ঘণ্টা কাল মাতৃসঙ্গীত গাহিলেন। কীর্তনকালে নাটমন্দিরে জ্যোতির্ময়ী গঙ্গাদেবী ও দুর্গাদেবী এবং অনেক সূক্ষ্মদেহী সাধক উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পরে মন্দিরে ঠাকুরকে লুচি-হালুয়া তরকারী নিবেদনকালে মহাগৌরী পূর্বোক্ত দেবতাগণকে দেখিতে পাইলেন।

পরদিন রবিবার বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে দশহরা ছিল। উক্ত দিন আমরা মৃণ্ময়ী প্রতিমায় গঙ্গাদেবীর বাৎসরিক আরাধনা করিলাম। সকাল সওয়া সাতটায় আমরা পূজায় বসিলাম এবং প্রায় সওয়া একটা পর্যন্ত ছয় ঘণ্টা কাল পূজা-হোম ও ভোগারতিতে কাটাইলাম। আমি পূজকের আসনে বসিয়া তন্ত্রধারক বিশ্বরূপানন্দ কর্তৃক পঠিত মন্ত্রোচ্চারণ করিলেও মহাগৌরী গঙ্গাদি দেবতাগণকে গন্ধপুষ্প, ধূপদীপ ও নৈবেদ্যাদি দিতেছিলেন। গঙ্গাদেবীর পূজার সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাপুরুষেশ্বর শিব, ব্রহ্মা, ভাস্কর, জয়া ও বিজয়া, ভগীরথ, হিমালয়, নারায়ণ ও মকরাদির পূজা হইল। স্বামী ভৈরবানন্দ ও ব্রহ্মচারিণী মহাগৌরী মৃণ্ময়ী প্রতিমায় গঙ্গাদেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তদন্তে সমবেত অনেকে অনুভব করিলেন—গঙ্গা, জয়া, বিজয়া, মকর ও ভগীরথের মূর্তিসমূহ সত্যই জাগ্রত, জীবন্ত হইয়া উঠিলেন। সিদ্ধযোগী ও সিদ্ধযোগিনী কর্তৃক বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইলে অবিলম্বে সুফল প্রসূত হয়। জলশুদ্ধিকালে দেখা গেল, গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী—এই সপ্ত নদীর সপ্তধারা কোশাতে আসিয়া পড়িল। উক্ত সপ্ত ধারার সহিত সপ্তনদীর দেবীমূর্তিও ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সপ্ত নদীর সপ্ত দেবীমূর্তির কথা আমরা পূর্বে

পড়িয়াছিলাম, কখনও দর্শন করি নাই। শিবস্নান কালে গঙ্গাদেবী শিব ঠাকুরকে স্নান করাইলেন এবং অন্য ছয় দেবী তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। শিবস্নানের সময় দ্বাদশ শিবের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। শিব-স্নান দর্শন করিতে অসংখ্য দেবতা ও অনেক সূক্ষ্মদেহী মুনিঋষি দিব্যদেহে পূজা মণ্ডপে আসিলেন। শিব ঠাকুরকে নৈবেদ্য নিবেদন করা হইলে পূর্বোক্ত দ্বাদশ শিব উহা গ্রহণ করিলেন। অগ্নিবীজ উচ্চারণপূর্বক পূজা-মণ্ডপের চারি ধারে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিতেই দিব্য অগ্নি প্রাকার সৃষ্ট হইল। যখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে পূজা করিতেন, তখনও এইরূপ ঘটিত। অন্য কোন সাধকের জীবনে এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা ঘটিত কি না, শোনা যায় নাই। জলশংখে বিশেষার্ঘ্য স্থাপিত হইলে দেখা গেল, একটি দিব্য জ্যোতিরশ্মি আসিয়া শংখের উপর পড়িল ও তৎপরে গঙ্গাদেবী শংখে পাদস্পর্শ করিলেন। বিশেষার্ঘ্য দ্বারা গঙ্গাদেবীর বিশেষ আবাহন করা হয়। আবাহন আন্তরিক হইলে দেবতার আবির্ভাব সুনিশ্চিত। প্রতিমা-পূজায় পূজ্য দেবতাকে ষোড়শ উপচারে পূজা করা হয়। গঙ্গাদেবীকে কুশিতে অল্প জল লইয়া স্নানজল নিম্নোক্ত মন্ত্রে নিবেদন করা হইল।—

ওঁ পরমানন্দ-বোধাব্ধি নিমগ্ন নিজমূর্তয়ে।
সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহং দেবি তে॥
ইদং সুশীতলং বারি স্বচ্ছং শুদ্ধং মনোহরং।
স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং প্রতিগৃহ্যতাম্

কোশাস্থ অল্প জল দেখিয়া গঙ্গাদেবী মৃদুহাস্য করিলেন। অনন্তর দেখা গেল, উল্লিখিত সপ্তনদীর সুবিপুল সপ্তস্রোত আসিয়া মা গঙ্গাকে স্নান করাইলেন। কুশিতে পাদ্যজল নিবেদিত হইলে মা গঙ্গা উহাতে পা ডুবাইলেন। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে মধুপর্ক নিবেদিত হইল। মধুপর্ক দেবভোগ্য এবং দধি, ঘৃত, মধু, চিনি ও জল সহযোগে প্রস্তুত হয়।—

ওঁ সর্ব-কল্মষনাশায় পরিপূর্ণ-সুধাত্মকং।
মধুপর্কমিদং দেবি কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥
মধুপর্ক মহাদেবি মধ্বাদ্যৈঃ পরিকল্পিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি॥

মধুপর্ক নিবেদিত হইলে গঙ্গাদেবী প্রতিমা হইতে নামিয়া মধুপর্কের বাটি হাতে ধরিয়া মুখে তুলিলেন ও ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর পুনরাচমনীয়োদক বা হাত ধোবার জল দেওয়া হইলে তিনি হাত ধুইয়া প্রতিমায় প্রবিষ্ট হইলেন। গঙ্গা দেবীর মস্তকে অর্ঘ্য প্রদত্ত হইবার পূর্বে যখন আমার হস্তে ছিল, তখন অর্ঘ্যমন্ত্র উচ্চারণান্তে দেখা গেল, দেবী উহা লইয়া স্বীয় চিন্ময় মস্তকে রাখিলেন। নৈবেদ্য নিবেদিত হইলে দেখা গেল, গঙ্গাদি সপ্তনদী, দুর্গাদেবী, জয়া ও বিজয়া, ভগীরথ প্রভৃতি এবং অসংখ্য সূক্ষ্মদেহী গঙ্গাভক্ত প্রসাদ লইলেন। নারায়ণ পূজা কালে এই ধ্যান সর্বত্র পঠিত হয়।—

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশংখচক্রঃ॥

নারায়ণকে নৈবেদ্য নিবেদিত হইলে চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মী সহ আবির্ভূত হইলেন ও নৈবেদ্য গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের মহাশক্তি। লক্ষ্মীসূক্ত বা শ্রীসূক্ত ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত। উভয়ে একত্র থাকেন বলিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের পূজাই শাস্ত্রবিহিত। সূর্যার্ঘ্য প্রদানকালে দেখা গেল, সূর্যের সহিত তৎপত্নী সংজ্ঞা আসিলেন। পূজাস্থলে যে সকল সূক্ষ্মদেহী মুনিঋষি ও সাধুসন্ত ছিলেন, সূর্যদেব আবির্ভূত হইলে তাঁহাকে তাঁহারা প্রণাম করিলেন। হিমালয় বা হিমবানের পূজাকালে গিরিরাজও তৎপত্নী মেনকা আসিলেন। ভগীরথের পূজাকালে মহারাজ ভগীরথ তপস্বীবেশে শংখ হস্তে আসিয়া পূজা লইলেন। ব্রহ্মার পূজা গঙ্গাপূজার অঙ্গীভূত এবং নিম্নোক্ত ধ্যানে অনুষ্ঠিত হয়—

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিদ্রক্তকমলে হংসারূঢ়ঃকদাচন॥
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুর্বামকরে স্রুবো হস্তে তু দক্ষিণে॥
দক্ষিণাধাস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা স্রুচা।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ॥
সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্যাদেভিশ্চ চিন্তনম্॥

ব্রহ্মার দুই শক্তি—সরস্বতী ও সাবিত্রী। এই দুই দেবী ব্রহ্মার সহিত আসিলেন। পূজান্তে গঙ্গাহোম আরম্ভ হইল। হোমকুণ্ডে হোমাগ্নি প্রজ্জলিত হইলে গঙ্গাদেবী অগ্নিরূপে বিরাজ করিলেন এবং ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্রের আহুতি হইলেন। পূর্ণাহুতি প্রদানকালে অগ্নিরূপা গঙ্গাদেবী দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন ও দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ণাহুতি লইলেন। ব্রহ্মচারিণী মহাগৌরীই অষ্টোত্তর শত আজ্যসিক্ত বিল্বপত্রাহুতিও পূর্ণাহুতি হোমাগ্নিতে প্রদান করিলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ অদূরে স্থূলদেহে থাকিয়াও সূক্ষ্মদেহে হোমাগ্নি সমীপে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। গঙ্গা ব্যতীত অন্য ছয় নদী দেবী এবং জয়া ও বিজয়া প্রভৃতি হোমকুণ্ডের মধ্যে চারি দিকে বিদ্যমান ছিলেন। অন্নভোগ ও পায়সাদি নিবেদিত হইলে উল্লিখিত দেবতাগণ এবং অগণিত সূক্ষ্মদেহী মুনিঋষি ও সাধক-সাধিকা প্রসাদ লইলেন। এই মহাপূজার প্রারম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত আমাদের মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পূজাস্থলে উপবিষ্ট ছিলেন।

অনন্তর ভক্তগণ গঙ্গাপ্রসাদ খাইতে বসিলেন—স্ত্রীভক্তগণ দোতলায় মন্দিরের বারান্দায় ও পুরুষ ভক্তগণ একতলার বারান্দায়। সেই সময় মন্দির মধ্যে খড়দহের কোন বয়স্ক ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লইলেন। দীক্ষা দানার্থ মন্দিরে ঢুকিবার পূর্বে স্বামী ভৈরবানন্দজীকে

আমি বলিয়াছিলাম, বাবা, মন্দিরের ভিতরে একটু নজর রাখবেন। দীক্ষাদান কালে যদিও সমাধিবান্ ভৈরবানন্দ স্থূলদেহে বারান্দায় ভক্তবৃন্দকে খিচুড়ি প্রসাদ পরিবেশনের তদারক করিতেছিলেন, তথাপি তিনি মন্দিরমধ্যে সূক্ষ্মদেহেও বিরাজ করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া আমি মন্দিরের মধ্য হইতে বারান্দাস্থ সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দকে ডাক দিয়া বলিতেই তিনি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "বাবা, আপনার কৃপায় আমি একা এককালে পাঁচটা হতে পারি।" পরমহংস মহাপুরুষ একমাত্র স্থূলদেহে থাকিয়াও বহু সূক্ষ্মদেহ ধারণে সমর্থ। সেইজন্য মুণ্ডক উপনিষদে (৩।১।১০) আছে—

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্
তস্মাৎ আত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েৎ ভূতিকামঃ॥

শুদ্ধচিত্ত সিদ্ধ সাধক যে যে উর্দ্ধ লোক প্রাপ্তির সংকল্প করেন এবং যে যে ভোগ্য বস্তু আকাংক্ষা করেন, সেই সেই লোক ও ভোগ তিনি অনায়াসে প্রাপ্ত হন। সুতরাং বিভূতিকামী ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞ পুরুষের অর্চনা করিবেন।

বৈকালে বিশ্রাম সময়ে মহাগৌরী গভীর সমাধিতে পাঁচটি বৃহৎ রাজহংস দর্শন করেন। উক্ত পঞ্চ রাজহংসের পার্শ্বে পঞ্চ দেবী বিদ্যমানা ছিলেন। সান্ধ্য আরতিও খুব জমিয়াছিল। ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা, শংখ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের শুভধ্বনিতে নাটমন্দির মুখরিত হইয়া উঠিল এবং শত শত নরনারী আনন্দে উৎফুল্ল হইল। মহাগৌরী প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ময়ী গঙ্গাদেবীকে দেখিয়া সমাধিস্থা হইলেন। আমি রামকৃষ্ণ নামকীর্তন করিতে করিতে মহানন্দে নাচিতে লাগিলাম। আমার নৃত্য দর্শনে ভাবিতা হইয়া সূক্ষ্মদেহী মাতাপিতা আমার দুই হাত ধরিয়া বসাইতে চেষ্টা করিলেন। দুপুরে হোমকালেও মাতাপিতা যথাক্রমে আমার

ডান ও বাম দিকে বসিয়াছিলেন। পূর্বাহ্নে পূজারম্ভের সময়ে সূক্ষ্মদেহী মাতৃদেবী আসিয়া প্রতিমার সম্মুখে বসিলেন। তিনি আসা মাত্রই তাঁহার সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল দেখিয়া আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। অনন্তর মহাগৌরী হারমোনিয়ম বাজাইয়া মধুর স্বরে গঙ্গাসঙ্গীত ও গঙ্গাস্তোত্র গাহিলেন। তদন্তে হাওড়া মায়ের মন্দিরের সভ্যবৃন্দ মাইকযোগে চণ্ডীগান আরম্ভ করিলেন। চারি শতাধিক শ্রোতা প্রায় দুই ঘণ্টা বসিয়া তাঁহাদের সুমধুর চণ্ডীগান শুনিলেন। কীর্তনকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, গঙ্গাদেবী, কালীমাতা, দুর্গাদেবী, ব্রহ্মা, নারায়ণ প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ এবং প্রায় পাঁচশত সূক্ষ্মদেহী মুনিঋষি ও সাধক-সাধিকা প্রফুল্ল বদনে চণ্ডীগান শুনিতেছিলেন। যোগজ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে স্থূলদেহী ও সূক্ষ্মদেহী শ্রোতৃবৃন্দের সমাগমে নাটমন্দির জম্‌জম্ করিতেছিল। চণ্ডীগান সমাপ্ত হইলে শ্রোতৃবৃন্দ চলিয়া গেলেন এবং আমাদের গঙ্গোৎসব সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গা প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া হাততালি দিতে দিতে সহাস্য বদনে মাথা নাড়িতে-ছিলেন। কীর্তন সমাপ্ত হইলে কোন তরুণ বন্ধু গায়কগণ ও শ্রোতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে গঙ্গামাহাত্ম্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিলেন এবং প্রত্যেক শ্রোতার হাতে কিঞ্চিৎ লুচি-হালুয়া গঙ্গাপ্রসাদ দেওয়া হইল।

মহাগৌরী আমার অনুরোধে লালবাবার উর্ধ্বগতি কামনা করিয়া গঙ্গা হোমে একটি সাজ্য বিল্বপত্র আহুতি দিয়াছিলেন। পূর্বে এই মন্দিরে প্রেতোদ্ধার করার জন্য ধর্মরাজ আমাদের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। আবার আমরা পাছে লালবাবা প্রমুখ প্রেতাত্মাদের উর্ধ্বগতির জন্য চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীহোমাদি করিয়া বসি, তাই ধর্মরাজ স্বয়ং ও তিনটি যমদূত আসিয়া রাত্রিকালে মহাগৌরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাগৌরী বলিলেন, "ধর্মরাজের মাথায় বড় বড় চুল কাঁধ পর্যন্ত ঝুলিতেছে। কাণে কুণ্ডল, মাথায় মুকুট, ডান কাঁধে স্বর্ণময় ধর্মদণ্ড ও বড় গোঁফ ও ফর্সা চেহারা। তাঁহার পোষাকে বুকের উপরে সোণার জরি, আর তিনটি যমদূতের

মাথায় শিং ও গায়ে কুচকুচে কাল রঙ। যমদূত তিনটি হাত যোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন।" সকাল সওয়া আটটার সময় আমরা বিজয়াকৃত্য সম্পাদনের জন্য আসনে বসিলাম। দুই ঘণ্টার মধ্যেই দশোপচারে গঙ্গাপূজা করিয়া গঙ্গাদেবীকে বিসর্জন দিলাম। যখন সংহার মুদ্রায় পুষ্প লইয়া গঙ্গাধ্যান করিয়া গঙ্গাদেবীকে মৃণ্ময়ী প্রতিমা হইতে পৃথক্ করা হইল, তখন গঙ্গাদেবীর ত্রিভুবনপালিনী কর্মশক্তি যথাস্থানে গেলেন ও ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারিণী কল্যাণী শক্তি মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। বিসর্জন সময়ে দই-কড়মা নিবেদন করা হইল। আমার সূক্ষ্মদেহী মাতৃদেবী দেবতাগণকে দই-কড়মা বিতরণার্থ আনচান করিতে ছিলেন। পার্শ্ববর্তী ভৈরবানন্দজী যোগশক্তি প্রয়োগপূর্বক তাঁহাকে ঈপ্সিত কর্মে নিযুক্ত করিলেন। প্রসাদ গ্রহণার্থ এত দেবদেবী ভিড় করিয়াছেন যে, সূক্ষ্মদেহী বৃদ্ধা মাতা গঙ্গাপ্রসাদ বিতরণ করিতে করিতে হাঁপাইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যায় গঙ্গা-প্রতিমা ঠেলা গাড়ীতে লইয়া গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত করা হইল। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী প্রভৃতি সকলেই প্রতিমার সঙ্গে চলিলেন। কাঁসর, ঘণ্টা, শংখ ও ঢাক ঢোল প্রভৃতি শব্দে পথ ধ্বনিত হইল। মহাগৌরী আমার হাত ধরিয়া প্রতিমার পিছনে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে তিনি আমাকে বলিলেন, "গঙ্গা-প্রতিমার অদূরে গঙ্গাদেবী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। প্রতিমার দুই পার্শ্বে শত শত দেবতা এবং শত শত সূক্ষ্মদেহী সাধক-সাধিকা ও আমার গর্ভধারিণী চলিতেছিলেন। পথের এক স্থানে দুই দিকে অনেকগুলি গৃহস্থের বাড়ী ছিল। তথায় গৃহের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া বহু প্রেত শুভ্রবর্ণা গঙ্গাদেবীকে করজোড়ে প্রণাম করিতেছিল। গঙ্গাপ্রতিমা গঙ্গাঘাটে উপনীত হইলে গঙ্গাবক্ষে দেখা গেল, গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়া ও ঊর্দ্ধলোক হইতে নামিয়া দেববৃন্দ এবং নারদাদি ঋষিগণ ধূপদীপ, নৈবেদ্যাদি দিয়া গঙ্গাদেবীকে পূজারতি ও প্রদক্ষিণ করিলেন। চারি দিকে

গঙ্গাভক্তগণ ও আকাশে দেবগণ যুক্ত করে দাঁড়াইয়া এই দিব্য দৃশ্য দেখিলেন। মৃণ্ময়ী প্রতিমা গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইলে গঙ্গাদেবীর কর্মসত্ত্বা আমাতে প্রবিষ্ট হইলেন ও কারণ সত্ত্বা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মন্দিরে বিরাজ করিলেন। অনন্তর আমরা নাটমন্দিরে পূজাস্থলে বসিলাম এবং বিশ্বরূপানন্দ শান্তি-মন্ত্র পড়িলেন ও মহাগৌরী আমাদের মাথায় শান্তিবারি ছিটাইলেন। এইরূপে আমাদের অলৌকিক গঙ্গোৎসব সমাপ্ত হইল। এইরূপ গঙ্গোৎসব কোথাও দেখা যায় কি?

পাঁচ

সূর্য্যসিদ্ধি*

তেসরা এপ্রিল সোমবার সূর্য্যাস্ত সময়ে আমি ও মহাগৌরী এই অধ্যাত্ম ডায়েরী পড়ছিলাম। পাঠান্তে আমি দেখলাম, স্বর্ণবর্ণ সূর্যদেব মনুষ্যবৎ স্পষ্ট মূর্তিতে বারন্দায় আমার সম্মুখে আবির্ভূত। তাঁর পায়ে বেলপাতার উপরে লাল জবাফুল। তাঁর মাথায় মুকুট ছিল না, কিন্তু অস্তগমনোন্মুখ রশ্মিজাল তাঁর মাথায় পশ্চাৎভাগ আলো করেছিল। আমি ঠাকুর-পূজা করিনি, অন্যে করেছে। পূজান্তে আমার হয়ে মহাগৌরী সূর্য্যপদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন। আমি এই কথা আদৌ জানতাম না। আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, সূর্যদেবের পাদপদ্মে লাল ফুল দেখছি কেন? তখন তিনি উক্ত কথা আমাকে বললেন। আজ সূর্য্যদেব সুপ্রসন্ন ছিলেন ও কিছু দিতে চাইলেন। তা দেখে মহাগৌরী তাঁকে প্রার্থনা জানালেন, "ঠাকুর, আপনি ত জগতের চক্ষু স্বরূপ। আপনি দয়া করে আমার বুড়ো দাদুর দৃষ্টি একটু বাড়িয়ে দিন,

যাতে তিনি স্বচ্ছন্দে লেখাপড়া ও চলাফেরা করতে পারেন।” তখন সূর্য্যদেব একটী মন্ত্র লিখে দিলেন এবং উহার জপপ্রণালী প্রভৃতি বললেন ; কিন্তু মহাগৌরী উক্ত মন্ত্রের প্রথম বর্ণটী পড়তে পারলেন, বাকী অংশ বুঝতে পারলেন না।

পরদিন মঙ্গলবার ভৈরবানন্দকে চিঠি লেখা হলো, আপনি সূর্য্যদত্ত মহামন্ত্র জেনে সত্বর লিখবেন। ৮ই এপ্রিল শনিবার ভৈরবানন্দ পোষ্ট-কার্ডে আমাকে লিখলেন, “আপনি সূর্য্যদত্ত মন্ত্র সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তাহা সূর্য্যকে ডেকে জানলাম। সূর্য্যমন্ত্র পুরা এইরূপ……। একাদশ আদিত্য ও সূর্য্যের পূজা করে একাসনে এই মন্ত্র দশ সহস্র এক বার জপ করে পুরশ্চরণ করতে হবে। ঐ মন্ত্রে তারপর তিনমাস ত্রিসন্ধ্যা একশত আটবার জপ করতে হবে।” ১৬ই এপ্রিল রবিবার স্বামী ভৈরবানন্দ উক্ত মন্ত্রের জপরহস্য আরও বললেন, “ডান চোখে সূর্য্যধ্যান ও বাম চোখে চন্দ্রধ্যান পূর্ব্বক পুরশ্চরণ করবেন, যেন বাম চোখে চন্দ্র ও ডান চোখে সূর্য্য উদয় হয়েছে। চোখ বুজে বা চোখ চেয়ে সূর্য্যমন্ত্র একাসনে দশ হাজার এক বার জপ করবেন একাদশ আদিত্য ও সূর্য্যপূজান্তে। অনন্তর তিনমাস ত্রিসন্ধ্যায় একশত আটবার জপ করলে অন্ধত্ব ঘুচে যায়, অন্ধেরও দৃষ্টিলাভ হয়। চক্ষুস্নায়ু একশত এক হলেও মূলনাড়ী বামচক্ষে গান্ধারী ও ডান চোখে হস্তিজিহ্বা ; অন্যান্য ৯৯ পার্শ্ব নাড়ী।” “বালক ঋষি বিশ্ববসু ত্রেতাযুগে জন্মান্ধ ছিলেন। তিনি চৌদ্দ বৎসর বয়সে ঊর্দ্ধরেতা হয়েছিলেন। তাই সর্বদা তাঁর বালমূর্তি। ঊর্দ্ধরেতা মহাপুরুষের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে বয়সে ঊর্দ্ধরেতত্ব সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, তারপর যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন, তাঁর শরীর ততদিন সেইভাবে থাকে, কোন রূপান্তর হয় না। বিশ্ববসু ঋষিবর আশি বর্ষ বয়সে সূর্য্যের নিকট হতে উক্ত মন্ত্র পান ও পুরশ্চরণ করে দৃষ্টিপ্রাপ্ত হন। ত্রেতাযুগের পর কলিযুগে প্রথম আপনিই এই মন্ত্র সূর্য্যের কাছ থেকে পেলেন। বিশ্ববসু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, বালমূর্তি, পূর্ণ

জ্ঞানী ও পরমহংস। পরমাত্মা লোকে তাঁর স্থায়ী স্থিতি, দিব্যকর্মের জন্য শিবলোকে তাঁর অস্থায়ী স্থিতি।"

সাধুসংকলিনী তন্ত্রে সূর্য্যকবচ পাওয়া যায়। সূর্য্যকবচ অনুসারে সূর্যমন্ত্র —"আং সূর্য্যঃ হৃদয়ং পাতু, ঈং পাতু মস্তকং মুদা, উং শিখাং পাতু মে সূর্য্য, ঐং পাতু দিনকৃন্মম। ওঁং নেত্রে মে সদা পাতু, অঃ সর্বাঙ্গং দিবাকরঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিলে সূর্য্যরিষ্ট প্রণষ্ট হয়। সূর্যদেবের ইষ্টদেবী মাতঙ্গী। সাম্ব পুরাণে একটী সূর্য্যস্তব আছে। উক্ত স্তবে সূর্য্যের নিম্নোক্ত একুশটী নাম উল্লিখিত—

ওঁ বিকর্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ॥
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্তা হর্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ॥
গর্ভস্তিঃহস্তো ব্রহ্মা চ সর্বদেবনমস্কৃতঃ।

সূর্য্যবংশীয় বৃহদ্বল মহারাজ কৃষ্ণপুত্র সাম্ব সহস্র নাম দ্বারা সহস্রাংশু সূর্যদেবকে স্তব করিতে করিতে এরূপ কৃশ হয়েছিলেন যে, তাঁর দেহ শিরাব্যাপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন সূর্য্যদেব সেই কৃষ্ণসুতকে কষ্ট পাইতে দেখিয়া স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, "হে জাম্বুবতীনন্দন সাম্ব, আমার সহস্রনাম উচ্চারণের প্রয়োজন নাই। আমার এই একুশটী গোপনীয়, নাম মঙ্গলদায়ক, পাপনাশক, আরোগ্যজনক, ধনবর্দ্ধক ও যশস্কর। হে মহাবাহো, যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সময়ে প্রণত হইয়া ইহা দ্বারা আমাকে স্তব করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।" সূর্য্যচিন্তা ও সূর্য্যপূজা করিলে দেহমন শুদ্ধ ও সুস্থ থাকে। মহাভারতে বন পর্বের অন্তর্গত আরণ্যক পর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে পুরোহিত ধৌম্য ঋষি যুধিষ্ঠিরকে সূর্য্যদেবের এই অষ্টোত্তর শত নাম বলেছিলেন—সূর্য্য, অর্য্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজআকাশ,

বায়ু, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, শৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈদ্যুতাগ্নি, জাঠরাগ্নি, ঐন্ধনাগ্নি, তেজঃপতি, ধর্মধ্বজ, বেদ, কর্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সংবৎসরক, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, ব্যক্তাব্যক্ত, পুরুষ, শাশ্বত যোগী, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, কামদ, স্রষ্টা, সম্বর্তক, বহ্নি, সর্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, জয়, বিশাল, বরদ, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, দিতিসুত, দ্বাদশাত্মা, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টক, দেহকর্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, মৈত্রেয়, ও স্বয়ংভু। সূর্য্যের সহস্রনাম অন্যত্র গীত হইয়াছে। গীতার দশম অধ্যায়ে একুশ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ। ইহার অর্থ, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু। দ্বাদশ আদিত্যের নাম—ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। অথর্ববেদীয় সূর্য্যোপনিষদে এই সূর্য্য-গায়ত্রী পাওয়া যায়—"আদিত্যায় বিদ্মহে, সহস্রকিরণায় ধীমহি, তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।" সূর্য্য গায়ত্রী জপ করিলে সূর্য্যদ্বার দর্শন। এই সূর্য্যদ্বার দিয়াই ঊর্দ্ধ লোকে যাইতে হয়। মুণ্ডক উপনিষদে আছে, সূর্য্যদ্বারেণতে বিরজাঃ প্রয়ান্তি।

২৩ এপ্রিল ১৯৬১ রবিবার দ্বাদশ আদিত্যের পূজা ও সূর্য্যমন্ত্র পুরশ্চরণের দিন স্থির হইল। ঐদিন সকাল সাত টায় স্নানান্তে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর-পূজান্তে সূর্য্যের ইষ্ট মাতঙ্গী ও সূর্য্যাদি দ্বাদশ আদিত্যের পূজা করিলাম। এই সূর্য্যপূজা ও সূর্য্যমন্ত্রের পুরশ্চরণ সূর্য্যাদেশে সংকল্পিত। পূর্বরাত্রে স্বপ্নে দেখেছি, এক বালঋষি ও সূর্য্যের ইষ্ট মাতঙ্গী মন্দিরে এসেছেন। প্রাতঃকালে এইকথা মহাগৌরীকে বলতেই তিনি

দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলেন, সত্যই ঐ ঋষি ও মাতঙ্গী মন্দিরে বিদ্যমান। মাতঙ্গী কালিকাদি দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা ও তাঁর ধ্যান এইরূপ—

ধ্যায়েয়ং রত্নপীঠে শুককলপঠিতং শৃণ্বতীং শ্যামলাঙ্গীং
নস্তৈকাংঘ্রীং সরোজে শশিসকলধরাং বল্লকীং বাদয়ন্তীম্।
কহ্লারাবদ্ধমালাং নিয়মিতবিলসৎ চূড়িকাং রক্তবস্ত্রাং
মাতঙ্গীং শংখপাত্রাং মধুরমধুমদাং চিত্রকোদ্ভাসিভালাম্॥

যিনি রত্নময় বেদীতে অধিষ্ঠিতা ও শুকপাখীর কলরব শ্রবণে নিমগ্না, যাঁহার একপদ কমলোপরি প্রতিষ্ঠিত, যিনি শশিশেখরা, বীণাবাদিনী ও কহ্লার পুষ্পের মালাধারিণী, যিনি রক্তবস্ত্র পরিহিতা, শংখপাত্রধারিণী ও সুমিষ্ট অমৃতপানে উন্মত্তা, যাঁহার হস্তে চূড়িকা সুষ্ঠুরূপে শোভিতা ও যাঁহার কপাল নানা চিত্রে উদ্ভাসিত, সেই শ্যামলাঙ্গী মাতঙ্গীকে আমরা ধ্যান করি।

পূজাকালে আমি তীব্র দিব্য পুষ্পগন্ধ অনুভব করলাম ও মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের পুষ্পপাত্রে কোন সুগন্ধি ফুল আছে কি? মহাগৌরী পুষ্পপাত্র দেখিয়া বলিলেন, না এবং দেখিলেন, সেই বালঋষি সুগন্ধি পুষ্পপূর্ণ তাম্রপাত্র নিয়ে ধূপদীপ জ্বেলে সূর্য্যপূজা করছেন। তিনি খরমুজা, পেঁপে, কলা, কমলা, শাঁকালু ও খেজুর দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়েছেন। ঐ সকল নৈবেদ্যের মধ্যস্থলে আতপচাল, চালের উপর মিষ্টি ও চারি দিকে ফল সাজান। এইরূপ নৈবেদ্য তেরখানি ছিল—দ্বাদশ আদিত্যের দ্বাদশ নৈবেদ্য ও মাতঙ্গীর একটী নৈবেদ্য। মাতঙ্গীর নৈবেদ্যে চাল দুই ভাগে ছিল। ঠাকুর-পূজান্তে উক্ত ঋষিকে আমি মন্ত্রপূত পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি সহাস্যে আমার ভক্তিপূত অর্ঘ্য নিলেন ও অর্ঘ্যের সাদা ফুলগুলি স্বীয় মাথার ঝুঁটিতে গুঁজলেন। ঐ ঋষির চেহারা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, কিশোর বালক, গলায় পৈতে ও সাদা কাপড় কোঁচা দিয়ে পরা, টানা ভ্রূদ্বয়, স্নিগ্ধ দৃষ্টি। আমাদের পূজার সঙ্গে তিনিও সূর্য্যপূজা এবং মাতঙ্গীপূজা করলেন। যখন আমি সংকল্প করলাম, তখন তিনি একটী

বৃহৎ তাম্র কোশা দুই হাতে করে সংকল্প করলেন। মাতঙ্গী দেবীকে পূজান্তে প্রণাম করতেই তিনি দুই পদ আমার মাথায় রেখে আশীর্বাদ করলেন। মাতঙ্গী দেবী রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা, মুক্তকেশী, ঘোর কালচে নীল শাড়ী পরা, শাড়ীতে তিন ইঞ্চি চওড়া সোণার জরীর পাড়, পায় পাঁয়জোর পরা। তখন মাতঙ্গীকে ও বালঋষিকে আমি মানুষের মত স্পষ্টভাবে দেখেছি। পূজান্তে আমি সূর্য্যদত্ত সূর্য্যমন্ত্র পুরশ্চরণ করিতে বসিলাম। পূজায় দেড় ঘণ্টা ও দশ হাজার মন্ত্রজপে সাড়ে চার ঘণ্টা মোট ছয় ঘণ্টা লাগিল সকাল সাতটা থেকে দুপুর একটা পর্য্যন্ত। বালঋষিও পূজান্তে আমার সামনে দুই হাতে রুদ্রাক্ষ মালা দুইটি নিয়ে পদ্মাসনে বসে জপ করলেন। পূজারম্ভের পূর্বেই মাতঙ্গী পূজাস্থলে এলেন। তখন সূর্য্যদেব পূর্ণমূর্তিতে তাঁর দুই পায় মাথা রেখে প্রণাম করলেন। সূর্য্যের মাথায় সোনার মুকুট ছিল, দুই হাতের উপরে সোনার বাজু, রক্তাভ জ্যোতির্ম্ময় রাজকীয় বেশ। দ্বাদশ আদিত্যকে পূজাকালে মন্দিরে দেখা গেল—জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যপ্রতিমা, সূর্য্য মধ্যস্থলে ও তাঁর দুই পাশে একাদশ আদিত্য, সূর্য্যের জ্যোতিতে এঁরা জ্যোতিষ্মান্। সিকি সংখ্যা মন্ত্রজপের পর সূর্য্য প্রসন্ন হয়ে তদীয় দিব্য রশ্মি আমার দুই চক্ষুতে বর্ষণ করলেন। আমি জপে আবিষ্ট হয়ে উহা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করলাম। সেই সময় হঠাৎ এক ধূসরবর্ণ রুদ্রমূর্তি বিরাট পুরুষ সম্মুখে এসে সূর্য্যকে আড়াল করলেন ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইতে লাগলেন। তাঁর মাথা মন্দিরের ছাদে ঠেকেছে। তাঁর দুই হাত ও দুই পদ। তিনি পুরুষ দেবতা। আমি তাঁকে দেখে মহাগৌরীকে বলায় তিনি উক্ত দেবতাকে দেখেই বলিলেন, "উনি প্রারব্ধ দেবতা। এঁকে পূর্বে দুই তিন বার দেখেছি।" অবিলম্বে সন্ত্রাসে আমরা তাঁকে গন্ধপুষ্প ধূপদীপ ও নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করলাম। আমরা প্রারব্ধ দেবতাকে শুধু একটী মিষ্টি দিলাম। আর বালঋষি তাঁকে এক থালা দানাদার দিলেন। পূর্ব সন্ধ্যায় ঐ দেবতা গেরুয়া-পরা সাধুবেশে

মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন। পূজার পরে তিনি ঈষৎ প্রসন্ন হয়ে পাশে সরে দাঁড়ালেন ও আমার দিকে চাইতে লাগলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বীয়মূর্তি পরিবর্তনপূর্বক শীর্ণকায় পক্বকেশ দীর্ঘদেহ সাধুমূর্তি ধরে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তখন মহাগৌরী তাঁকে কাতর প্রার্থনা ও সভক্তি প্রণাম করলেন। মহাগৌরীর অনুরোধে স্নেহের গোপালজীও তাঁকে গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করলেন। তখন তিনি একটু প্রীত হয়ে সরে দাঁড়ালেন এবং পুরশ্চরণ সমাপ্তির কিয়ৎক্ষণ পূর্বে চলে গেলেন। পুরশ্চরণের মধ্যে ঠাকুর, সূর্য্যও মাতঙ্গীকে পায়স নিবেদন করা হলো। দেবতারা সকলে দয়া করে ঐ পায়স গ্রহণ করলেন। সূর্য্যাদি দ্বাদশ আদিত্য ও নবগ্রহ ও মন্দিরস্থ দেবগণ পায়স নিলেন, কিন্তু জপমগ্ন ঋষিবর উঠিলেন না। মহাগৌরীর অনুরোধে গোপালজী বালঋষিকে পায়স খাইয়ে দিলেন। পুরশ্চরণ শেষ হতে ঋষি, সূর্য্যও মাতঙ্গীকে আমি সভক্তি প্রণাম করলাম। তখন ঋষিবর হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করলেন এবং মাতঙ্গীও সূর্য্য উভয়ে এক সঙ্গে দুই পদ আমার মাথায় দিলেন ও আশীর্বাদ করলেন।

সূর্য্যাস্ত সময়ে মহাগৌরী ভাবিতেছিলেন, বালঋষি কোথা থেকে এসেছিলেন ও কোথায় গেলেন? তখন মহাগৌরী দেখিলেন, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যমণ্ডলে ঐ ঋষি সহাস্য বদনে দাড়িয়ে আছেন। সন্ধ্যাকালে সমাধিবর্তী মহাগৌরী মন্দিরে দ্বাদশ আদিত্য ও মাতঙ্গী ও বালঋষির উদ্দেশ্যে এক একটিমোমবাতি জ্বালিলেন। তখন আমি হোমাগ্নিদগ্ধ ধুনোও গুগগুলের দিব্যগন্ধ আঘ্রাণ করে মহাগৌরীকে বললাম। ইহাতে মহাগৌরী বলিলেন, কর্পূর দানিতে উক্ত ঋষি দিব্য ধূপ-গুগগুল জ্বেলেছেন। নৈশ দুগ্ধ নিবেদন করতে ঋষি, মাতঙ্গীও সূর্য্য এলেন—মাতঙ্গী স্পষ্টমূর্তিতে, কিন্তু ঋষি ও সূর্য্যের অস্পষ্ট আংশিক প্রকাশ হলো। রাত্রিকালে সূর্য্যাদি দেবতার প্রকাশ অল্প হয়। তখন ঋষির দুই হাতে রুদ্রাক্ষের জপমালা (লাল সুতায় গাঁথা) ছিল।

তিন মাস ত্রিসন্ধ্যা বালঋষি এইরূপে মন্দিরে এসে আমার সঙ্গে সূর্য্যমন্ত্র জপ করবেন ও এখন আমার গুরুস্থানীয় হয়েছেন। মহাগৌরী গত তিন দিন যাবৎ সূর্য্যকে পিতা বলে সম্বোধন করেন ও নিজেকে তাঁর কন্যারূপে ভাবেন। এইজন্য সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মহাগৌরীর মন সূর্য্য-চিন্তামগ্ন থাকে এবং সূর্য্য যখন আসেন, তখন তাঁর দিকে প্রীতিভরে দৃষ্টিপাত করেন।

২৪ এপ্রিল সোমবার গভীর রাত্রে মহাগৌরী বালি বাসায়ও আমি ধর্মচক্রে শুয়ে সদ্যপ্রাপ্ত সূর্য্যমন্ত্র জপের ফলে জপাকুসুমসংকাশ সূর্য্যোদয় দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ২৬ এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যার পূর্বে মহাগৌরী মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলেন, ঋষি বিশ্ববসু সূর্য্যমণ্ডল থেকে মন্দিরে হাসতে হাসতে এলেন এবং সূর্য্যমন্ত্র জপ করে চলে গেলেন। আবার আমি যখন সন্ধ্যার পর কুয়াতলায় বাথটবে বসে সূর্য্যমন্ত্র জপ করছি, তখন তিনি এসে আমার জপ শেষ পর্য্যন্ত কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ও জপ শেষ হতেই চলে গেলেন। ২৮ এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যার পূর্বে সূর্য্যাস্ত সময়ে আমি মন্দিরের বারান্দায় চেয়ারে বসে সূর্য্যমন্ত্র জপ করছিলাম। তখন বাল ঋষি এসে আমার সম্মুখে সূর্য্যকে রেখে সূর্য্যমন্ত্র জপ করলেন। ঐ সময় মহাগৌরী উত্তর বারান্দার সূর্য্যধ্যানান্তে একটু জপ করতে একটী অপূর্ব মাতৃমূর্তি দেবী সম্মুখে এলেন। তাঁর চেহারা—মধ্যম, দীর্ঘ, ঈষৎ স্থূল, বয়স্ক, গলায় চন্দন কাঠের মালা, লাল পাড় সাদা শাড়ী পরা, কোন অলংকার নাই ও স্নিগ্ধ সৌর জ্যোতিঃযুক্তা।

পরে বোঝা গেল, ইনি সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা দেবী। ইনি প্রায় আধ ঘণ্টা মহাগৌরীর দিকে স্নেহশীলা জননীবৎ চেয়েছিলেন। সূর্য্যবৎ সংজ্ঞাও মহাগৌরীকে কন্যাজ্ঞানে স্নেহ করে দেখতে এসেছিলেন। পরদিন শনিবার ২৯ এপ্রিল দুপুরে মন্দিরে পূজাকালে তিনি এসে ছিলেন। আমিও তাঁকে স্পষ্ট ভাবে দেখলাম। তখন আমি সূর্য্যার্ঘ্য দানান্তে সূর্য্যমন্ত্রজপমগ্ন ছিলাম

এবং বালঋষিও এসে উক্তমন্ত্র জপ করছিলেন সূর্য্যকে সামনে রেখে। জপে তন্ময় হয়ে আমিও দেখলাম, সূর্য্যদেব থেকে সূর্য্যরশ্মি নিঃসৃত হয়ে আমার দুই চোখে পড়ছে। সংজ্ঞা দেবী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভগবান কল্কিদেবের জন্য নানাবিধ ফলমিষ্টি—ক্ষীর, গজা, পেঁপে প্রভৃতি আনিলেন। চার পাঁচ থালায় চালের নৈবেদ্যে ঐ সব ফলমিষ্টি সাজান ছিল। তিনি ঐ সব দিব্য দ্রব্য ঠাকুর ও কল্কির সম্মুখে রাখলেন। তখন তাঁরা উভয়ে ঐ সব দ্রব্য গ্রহণ করলেন এবং অন্যান্য দেবতাও ঋষিগণকে দিলেন। আমি যে অর্ঘ্য সূর্য্যকে দিয়েছিলাম, জপকালে মহাগৌরী দেখিলেন, উক্ত অর্ঘ্যের জবা ফুলটী সূর্য্যের মাথায় শোভা পাচ্ছে! ৩০ এপ্রিল রবিবার প্রাতে আমি মন্দিরে বসে যখন সূর্য্যধ্যানান্তে সূর্য্যমন্ত্র জপ করছিলাম, তখন সূর্য্যদেব ও সংজ্ঞাদেবী ও বালঋষি এলেন এবং যতক্ষণ জপ করলাম, ততক্ষণ স্পষ্টভাবে রইলেন। আমিও মাতৃমূর্তি শুভ্রবর্ণা সংজ্ঞাদেবীকে স্পষ্টভাবে দেখলাম। দুপুরে পূজাকালেও বালঋষি, সূর্য্যদেব ও সংজ্ঞাদেবী এলেন। আমরা সূর্য্যকে যে অর্ঘ্য দিলাম, সেই অর্ঘ্যের জবাটী তাঁর মাথায় দেখা গেল। যখন আমি সূর্য্যধ্যান করছিলাম, তখন সূর্য্যরশ্মি আশীষস্বরূপ আমার দুই চোখে এসে পড়ছিল। স্নেহের গোপালকে পৃথক্ শ্বেত পাথর বাটীতে পায়স দেওয়া হলো অন্নভোগের সময়। তখন গোপালজী স্বয়ং সূর্য্য, বালঋষি ও সংজ্ঞা-দেবীকে প্রসাদ প্রদানান্তে হাত দিয়ে আমার দিকে ঠেলে দিলেন। আমি উক্ত তিনজনকে স্পষ্ট দেখলাম ও প্রণাম করলাম। তখন মাতৃমূর্তি সংজ্ঞা দেবী স্নেহভরে আমার দুই চোখে হাত বুলিয়ে চলে গেলেন। বালঋষি যাবার পূর্বে আমার দুই গালে গাল দিয়ে শিশুর মত আদর করে চলে গেলেন। আহারান্তে বিশ্রাম কালে আমি শায়িত অবস্থায় দেখলাম, সূর্য্যদেব পূর্ণমূর্তিতে আমার শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁর আরক্ত জ্যোতিঃতে দক্ষিণ বারান্দা আলোকিত।

১ মে সোমবার সন্ধ্যার পূর্বে আমি পশ্চিম বারান্দায় বসে সূর্য্যমন্ত্র জপ

করছিলাম। তখন সংজ্ঞাদেবী ও বালঋষি বিশ্ববসু অন্য এক বালঋষি সহ এলেন। বিশ্ববসু পদ্মাসনে বসে সূর্য্যকে নৈবেদ্যাদি পঞ্চোপচারে পূজা করে নিজ গলা থেকে রুদ্রাক্ষ মালা খুলে জপে বসলেন ও জপান্তে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। অন্য ঋষি শুভ্রবর্ণ শিশু মূর্তিতে প্যারাপেটে বসে পা দোলাচ্ছিলেন। তাঁর চেহারা—কোঁচা দিয়ে সাদা কাপড় পরা, গায় উত্তরীয় ও মাথায় বড় করে চুলের ঝুঁটী বাঁধা। মহাগৌরী তাঁকে প্রথমে গোপালজী ভেবেছিলেন। পরে তিনি বুঝলেন, ইনি তৃতীয় বালঋষি ও বিশ্ববসুর সঙ্গে এসেছেন। ইনি বড় বড় চোখ করে আমার দিকে শিশুবৎ চাইছিলেন। আমিও তাঁকে স্পষ্টভাবে দেখলাম। আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম করতে তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। ইনিও উর্দ্ধরেতা পরমহংস।

৭ মে রবিবার সূর্য্যবার বলে সকাল সাড়ে দশটায় মহাগৌরী মন্দিরে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিয়ে অল্প উষ্ণ দুগ্ধ নিবেদন করলেন। সূর্য্যদেবের আসতে দেরী হওয়ায় তিনি সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞাদেবীকে ডাকলেন। অবিলম্বে সংজ্ঞাদেবী এলেন এবং তৎপরে সূর্য্যদেবও এলেন। সূর্য্যের সঙ্গে এলেন একাদশ আদিত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তিতে, অবশ্য সূর্য্যমূর্তিতে। মহাগৌরী এই দুধটুকু সূর্য্যকে দিয়ে বললেন, "আপনি এই দুধ নিন এবং একাদশ আদিত্য, মন্দিরস্থ দেবগণ ও সংজ্ঞাদেবীকে দিন।" তাঁর কথা শুনে সূর্য্যদেব হাসলেন। তখন সংজ্ঞাদেবী তিনটী বড় বড় পাথরের থালায় প্রচুর পরিমাণে পায়স ও ক্ষীরের দ্রব্য এনে ঐ দুধের কাছে রাখলেন ও সকল দেবতাকে দিলেন এবং দেবগণ এই সব দ্রব্য খেয়ে তৃপ্ত হলেন। মহাগৌরী সমাধি থেকে উঠে দেখলেন, "থালাগুলি খালি হয়ে গেছে। দেবতারা সব দিব্য দ্রব্য খেয়ে ফেলেছেন।" তখন মহাগৌরী সংজ্ঞাদেবীকে বললেন, "মা, আপনি ও বাবা (সূর্য্য) মন্দিরে থাকুন। দাদু এখনি মন্দিরে এসে সূর্য্যমন্ত্র জপ করবেন।" আমি মহাগৌরীর এই প্রার্থনার

কথা জানিতাম না। আমি মন্দিরে এসে দেখলাম, সংজ্ঞাদেবী পূর্ণমূর্তিতে মাতৃবৎ বিরাজ করছেন। তাঁহাদিগকে প্রণাম করে আমি সূর্য্যমন্ত্র ও সূর্য্যগায়ত্রী জপলাম। আমি যতক্ষণ জপলাম, ততক্ষণ তাঁরা আমার সম্মুখে বিরাজ করলেন। সূর্য্যাস্তকালে আমি মন্দিরের বারান্দায় সূর্য্যমন্ত্র জপে বসলাম। তখন পরিচিত বালঋষি ও তৎসঙ্গে আর এক বালঋষি এলেন। উভয় ঋষির শিশুমূর্তিও প্রায় একরূপ। তখন সূর্য্যদেব মেঘাবৃত ছিলেন। তাঁরা আসতেই সূর্য্য আবার দেখা দিলেন ও আমার জপসমাপ্তি পর্য্যন্ত সংজ্ঞাদেবী সহ রইলেন। ৮ মে সোমবার সূর্য্যাস্ত সময়ে ছয়টায় আমি পূর্ব দিনের ন্যায় সূর্য্যমন্ত্র জপে বসিলাম। তখন বালঋষি বিশ্ববসু এলেন; আর দেখা গেল সূর্য্যমণ্ডল থেকে ধর্মচক্র পর্য্যন্ত একটী সরু (দেড় ইঞ্চি) শুভ্র রাস্তা প্রসারিত। সেই রাস্তায় বালঋষি এলেন ও তৎসহ একটী শ্যামল পুরুষ দেবতা—শ্যামবর্ণ, সুদর্শন, কাল কুঞ্চিত কেশ। উভয়ে আমার দিকে চেয়েছিলেন ও আমি প্রণাম করতেই শ্যামল দেবতা আমাকে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। তিনি আসতেই তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ মন্দিরের বারান্দায় এলেন। আমার জপ শেষ হতেই তাঁরা চলে গেলেন, মন্দিরে ঢুকলেন না। এই শ্যামল পুরুষ অর্জুনবৎ ইন্দ্রাংশে জন্মাবেন ও কল্কিদেবের সহচর হবেন।

প্রাচীন ভারতে সূর্য্যপূজা প্রচলিত ছিল। ইহার ঐতিহাসিক নিদর্শন পুরীধামের নিকটবর্তী কোণারকের সূর্য্যমন্দির ও কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দির। কাশ্মীরস্থ মার্তণ্ড মন্দির দর্শনান্তে উহার সচিত্র বিবরণ ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মডার্ণ রিভিউ' ইংরাজি মাসিকে প্রকাশ করেছি। প্রাচীন মিশরেও সূর্য্যপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ভারতীয় সূর্য্যাদি পঞ্চদেবতার উপাসনা পুরাকাল হইতেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাত্যহিক দেবপূজায় সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান বিহিত। সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞাদেবী বিশ্বকর্মার কন্যা। আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমীকে বিবস্বৎ সপ্তমী বলে। ঐ দিনে সূর্য্যপূজা প্রশস্ত। নিম্নোক্ত ধ্যানে সূর্য্যপূজা বিধেয়।—

রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈক সিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গ রুচিংত্রিনেত্রম্॥

রক্তপদ্ম যাঁহার আসন, যিনি সর্বগুণের সাগর ও সমস্ত জগতের অধিপতি, যিনি পদ্মতুল্য চারি হস্তে দুই পদ্ম এবং বর ও অভয় মুদ্রাদ্বয় ধারণ করেন, যাঁহার মুকুটে পদ্মরাগমণি শোভিত ও যাঁহার তিন নেত্র ও যাঁহার দেহ রক্তবর্ণ, সেই সূর্য্যকে আমি ভজনা করি। নিম্নোক্ত মন্ত্রে সূর্য্যকে নিত্য উদয়াস্তকালে প্রণাম করিতে হয়।—

জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

জবাপুষ্পবর্ণ কশ্যপনন্দন দীপ্তিশালী অন্ধকারনাশক সর্বপাপহর সূর্যাদেবকে প্রণাম করি। সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণও নিত্যধেয়। সূর্য্যপুত্র বৈবস্বত যমরাজ। সূর্য্যের দুই পত্নী—সংজ্ঞা ও সবর্ণা। সবর্ণার পুত্র সাবর্ণি অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি ও চতুর্দশ মনুর অন্যতম। দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় সূর্য্যপুত্র ও সংজ্ঞার গর্ভজাত। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন, "আমি এই মোক্ষযোগ বিবস্বান্‌কে" বলিয়াছিলাম, বিবস্বান্ তৎপুত্র মনুকে ও মনু তৎপুত্র ইক্ষাকুকে ইহা বলেন।

৯ মে মঙ্গলবার সূর্য্যাস্ত সময়ে আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসিয়া সূর্য্যমন্ত্র জপ করিতেই বিশ্ববসু আসিলেন ও তৎসহ আর এক বালঋষি। তিনি প্যারাপেটে বসিয়া শিশুবৎ পা দোলাইতেছিলেন ও জপান্তে আমি প্রণাম ও প্রার্থনা করিতেই তিনি তাঁর দুই ক্ষুদ্র শুভ্র পদ আমার দুই চোখে বুলাইয়া দিলেন। প্রায় প্রত্যহ এক এক বালঋষি বিশ্ববসুর সঙ্গে ধর্মচক্রে শুভাগমন করেন।

বরুণ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ও তাঁর পত্নী বারুণী। চৈত্র মাসে বারুণী স্নান পঞ্জিকায় প্রসিদ্ধ। ১১ই এপ্রিল ১৯৬১ মঙ্গলবার মহাগৌরী ধর্মচক্রে ছিলেন না। তাই আমি শিব প্রিয়ার সহায়তায় ঠাকুর-পূজা মন্দিরে

করলাম। পূজাকালে একটী দেবী এলেন। তাঁর মাথায় সোণার মুকুট, লাল পাড় ও লাল আঁচলযুক্ত সাদা শাড়ী পরা, অত্যন্ত সুন্দর। পূজান্তে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা খুলে দেখলাম, আজ বরূথিনী একাদশী। তখন মনে হল, সম্ভবতঃ ইনি বরূথিনী দেবী। আজ সন্ধ্যায় মহাগৌরী এই দেবীকে বালিতে রাস্তায় দেখেছিলেন। গত বর্ষে তিনি বরুণদেবকে পূর্ণমূর্তিতে ধর্মচক্রে দেখেছিলেন। পরদিন বুধবার সন্ধ্যায় মন্দিরে তাঁর নামে মোমবাতি জ্বালা হল। তখন তাঁর আংশিক প্রকাশ দেখা গেল। মৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভৈরবানন্দ যোগবলে জানিয়া ১৬ এপ্রিল রবিবার বলিলেন, "বরুণের পত্নী বারুণীই বরূথিনী নামে অভিহিতা। সত্যযুগে অগ্নি, বায়ু ও বরুণ—এই তিন দেবতার মধ্যে কে বড়, ইহা নির্ণয়ার্থ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। সেই সময় অগ্নি স্বীয় শক্তিতে অগ্নিবর্ষণ করলেন। বরুণ বৃষ্টি ও বায়ু গতি বন্ধ করলেন। এই তিন দেবতার কোপে পড়ে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল দ্বাদশ বৎসর শস্যহীন হলো। এই একাদশীতে বরুণপত্নী বরূথিনী সৃষ্টিরক্ষার্থ গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন। তাঁর পূজার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন ও কৃষ্ণানুরোধে উল্লিখিত দেবতাত্রয় অন্যায় আচরণ ত্যাগ করেন। এই তিন দেবতার পরস্পর সংযোগ ব্যতীত কোন কর্ম হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের এই ভ্রম দেখিয়ে দেবার পর তাঁরা স্বস্ব কর্মে পুনঃ প্রবৃত্ত হনও পৃথিবী শস্যশ্যামলা হয়ে উঠে।" ১০ মে বুধবার সূর্য্যাস্ত সময়ে আমি মন্দিরের পশ্চিমে বারান্দায় বসে সূর্য্যমন্ত্র জপ করলাম। তখন সূর্য্যদেব মেঘাচ্ছন্ন ছিলেন। তা দেখে ঋষি বিশ্ববসু ডান হাতে মালা জপছিলেন ও বাম হাত সূর্য্যের দিকে তুলে ইংগিতে সূর্য্যকে উঠতে বললেন। অচিরে সূর্য্যের প্রকাশ দেখা গেল। সংজ্ঞার হাত ধরে সবর্ণা বা ছায়া এসে উভয়ে আমার সামনে দাঁড়ালেন। সবর্ণার চুল খোলা, পাকা সোণার মত গায়ে রঙ, গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্যে পরিহিত শাড়ীও সেই রঙে রঙীন হয়েছে। পরদিন সান্ধ্য জপের সময় সূর্য্য এসে সংজ্ঞা ও সবর্ণা পত্নীদ্বয়ের মধ্যে আমার সম্মুখে

দাঁড়ালেন। যে আকাশমার্গে বিশ্ববসু এলেন, সেই সরু জ্যোতির্বর্ত্ম সূর্য্য থেকে মর্ত্য পর্য্যন্ত প্রসারিত। উক্ত মার্গের মধ্যে সূর্য্যের সাবক ও সাধিকা অনেক দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের অঙ্গকান্তি সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল। জপশেষে সূর্য্য, সংজ্ঞা, সবর্ণা ও বিশ্ববসু চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম পশ্চিম বারান্দার মধ্যবর্ত্তী পারাপেটে বসে পা দুলাচ্ছেন। তাঁর পোষাক গাঢ় লাল, গাত্রবর্ণ ঈষৎলাল, মাথায় সোণার মুকুট। তিনি শিশুমূর্তিতে বসেছিলেন। আমি ও মহাগৌরী তাঁকে দেখতে পেয়ে প্রণাম করতেই তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন, মন্দিরে ঢুকলেন না। ঋষি বিশ্ববসু এসেই লিখে জানালেন, প্রত্যহ সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান কর্তব্য। তৎক্ষণাৎ মহাগৌরী গোপালকে বললেন, বাবা, একটি লাল ফুল এনে দাও ত? অবিলম্বে গোপালজী গোলাপী রঙের পঞ্চমুখী জবা ফুল একটী এনে দিলেন। সেই তুরীয়বনজাত দিব্যপুষ্পে মহাগৌরী সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিলেন। সবর্ণা বা ছায়া সংজ্ঞার সহোদরা ও বিশ্বকর্মার কন্যা। সূর্য্যদেব সেই অর্ঘ্যপুষ্প নিলেন ও বাম কাণে গুঁজে রাখলেন। বেলুড় ধর্মচক্রে সূর্য্যলীলার বাকী অংশ পরে বাহির হবে।

ছয়

সরস্বতীপূজা

২১ জানুয়ারী শনিবার, ১৯৬১ শ্রীপঞ্চমী তিথিতে ধর্মচক্রে দ্বিতীয় বার প্রতিমায় সরস্বতীপূজা হয়। পূর্বদিন শুক্রবার বৈকালে সরস্বতী প্রতিমা এনে নাটমন্দিরে রাখা হয়েছে। সন্ধ্যায় মহাগৌরী প্রভৃতি প্রতিমার সম্মুখে আলপনা দিলেন। মন্দিরের দেবতারা—সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক,

গোপাল, পদ্মা প্রভৃতি নেমে প্রতিমার কাছে দাঁড়ালেন। আমি ও মহাগৌরী স্নানান্তে সরস্বতীপূজায় বসলাম এবং পূজা, হোম, অন্নভোগাদি শেষ করতে প্রায় চার ঘণ্টা লাগল। পূজান্তে বেলা দেড়টায় আমরা সরস্বতীর প্রসাদ পেলাম। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পূর্বে মা সরস্বতী প্রতিমার বাহিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মহাগৌরী প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার পর তিনি প্রতিমায় প্রবিষ্টা হলেন। তৎপূর্বে ঘটস্থাপন হয়েছিল। তখন সরস্বতী উক্ত ঘটে আবির্ভূত হলেন। প্রতিমায় চক্ষুর্দান করার পর দেখা গেল, সরস্বতী ত্রিনয়না। প্রথমে শিবলিঙ্গে শিবস্নান ও শিবপূজা হল। তখন মহাদেব পূর্ণরূপে প্রকটিত হলেন। জয়া ও বিজয়া, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা, ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দ, ব্যাসদেব, কল্কিদেব, পদ্মাদেবী, কালী, চামুণ্ডা, গোপাল, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক ও দুর্গা, পরমানন্দজী পরমহংস, রামেশ্বর শর্মা, উর্বশী, কালযবন, দুই ঋষি বালক, মুচুকুন্দ, নারদ ইত্যাদি তক্ষকাদি অনেক দেবতা এলেন। মা দুর্গা গণেশকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন। গোপাল দুষ্টুমি করছিলেন বলে শিব ঠাকুর গোপালকে কোলে নিয়ে বসে ছিলেন পূজার প্রথম থেকে শেষ অবধি। অগ্নিবীজ উচ্চারণপূর্বক গঙ্গাবারি ছিটাতেই পূজামণ্ডপের চার দিকে আগ্নেয় প্রাকার বিসৃষ্ট হল। অনেক নাগও এলেন। অনন্ত নাগের বহুফণা প্রসারিত। তন্মধ্যে তিন ফণা থেকে বিষাগ্নি নির্গত হচ্ছিল। রান্নাঘরে দেবীর ভোগ রান্না হচ্ছিল। পাছে কোন প্রেত এসে দৃষ্টি দেয়, তাই বিষ্ণুদূত তথায় ছিলেন। রুদ্র ভৈরব পূজামণ্ডপও রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই দিক রক্ষা করছিলেন। আমরা যখন সরস্বতীকে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম, তখন ঠাকুরের পার্ষদগণ, ব্যাসদেব, পরমানন্দজী পরমহংস, মহাপুরুষজী, স্বামিজী প্রভৃতি এবং অনেক সিদ্ধ ঋষি ও সূক্ষ্মদেহী দেবীপদে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। পূজাকালে আমরা দুটী সরস্বতী সঙ্গীত গাইলাম। তখন আমি সর্বশুক্লা সরস্বতী ও পদ্মাদেবীর স্পষ্টমূর্তি দেখলাম। ব্যাসদেব ও পদ্মাদেবী দেবগণের

সমাদর ও অভ্যর্থনাদি করছিলেন। পদ্মাদেবী আমার কন্যারূপে সমাগত দেবগণকে প্রসাদ বিতরণ করলেন। লক্ষ্মীদেবীকে নৈবেদ্য দানার্থ কোন সূক্ষ্মদেহী লক্ষ্মীভক্ত অনেক মিষ্টান্ন, পিষ্টক, মুড়কির মোয়া এনে লক্ষ্মীকে দিলেন। লক্ষ্মী সেইগুলি স্বয়ং নিলেন ও অন্যান্য দেবতাকে দিলেন। অন্নভোগ নিবেদিত হলে ইন্দ্রাদি দেবগণ, সূর্য্য, বগলা, ব্রহ্মা, মঙ্গল প্রভৃতি অনেক দেবতা ও ঋষি এলেন। সরস্বতী ও পদ্মা সকলকে প্রসাদ দিলেন। রামেশ্বর শর্মা স্বীয় ইষ্ট চামুণ্ডাদেবীর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যখন চামুণ্ডা এলেন, তাঁর পেছনে এক ভক্ত ডালায় দুটি বড় গোটা মাছ নিয়ে এলেন। ইহার অর্থ, চামুণ্ডাকে আমিষ ভোগ দিতে হয়। এইজন্যই দুর্গাপূজার সময় সন্ধিপূজায় চামুণ্ডাকে আমিষ অন্নভোগ দেওয়া হয়। হোমকালে সরস্বতী ও লক্ষ্মী হোমাগ্নিতে অগ্নিমূর্তি ধরে বিরাজ করলেন। সরস্বতীর অগ্নিমূর্তি প্রায় আড়াই হাত উচ্চ হয়ে ছিলেন ও মহাগৌরীর হাত থেকে পূর্ণাহুতি নিলেন। আমি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতে মা সরস্বতী আমার প্রণাম নিলেন না, হাত জোড় করে শ্রদ্ধা জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন। শিবের সঙ্গে নন্দী ও ভৃঙ্গী এসেছিলেন। নন্দী ও ভৃঙ্গী উভয়ে শিবাকৃতি। আমরা মাত্র সাত আট জন পূজাস্থলে ছিলাম। মা সরস্বতী সবাইর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। লিলুয়ার কোন ভক্ত পূজা দেখতে এসেছিলেন। অন্নভোগ নিবেদনান্তে মহাগৌরী দেখলেন, উক্তভক্ত হাত জোড় করে ঠাকুরের পার্ষদদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। ইহার অর্থ, উক্ত ভক্ত পূর্বজন্মের শেষ সময়ে ঠাকুরকে দেখেছিলেন। এই কথা শুনে স্বামী ভৈরবানন্দ যোগদৃষ্টিতে জেনে বললেন, উক্ত ব্যক্তি পূর্বজন্মে ঠাকুরের ভক্ত সুরেশ মিত্র ছিলেন। সান্ধ্য আরতির পর সরস্বতীকে লুচি ও বুঁদে নিবেদন করা হল। অনেক দেবতা, ঋষি ও ঋষি বালক এলেন ও প্রসাদ নিলেন। তখন আমি সরস্বতীর ধ্যান করছিলাম। মা সরস্বতী

এসে নিজ গলা থেকে জ্যোতির্মালা খুলে নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দিলেন ও আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন জ্ঞানদাত্রী মূর্তিতে। অনন্তর একটু দূরে সরে গিয়ে তিনি হাত জোড় ও মাথা নীচু করে আমাকে শ্রদ্ধা জানালেন কন্যা দুর্গার পুত্রীরূপে। মহাগৌরী সন্ধ্যারতি করছিলেন ও একটু ভাবাবিষ্ট হইতেছিলেন। শেষে সরস্বতী দেবী এসে মহাগৌরীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। ইহার ফলে মহাগৌরী সমাধিস্থ হয়ে অনুভব করলেন, তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী হয়েছেন—সরস্বতীর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন। সন্ধ্যায় কাল যবনের মিত্ররাজ জরাসন্ধ এসেছিলেন। নৈশ আহার কালে এক তলার বারান্দায় কালযবন আমার কাছে এসে বসেছিলেন। যতক্ষণ আমার খাওয়া শেষ না হল, ততক্ষণ তিনি রইলেন, আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বলে আন্তরিক সমবেদনা প্রদর্শনার্থ। আমি দুপুরে পূজাকালে কালযবনকে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলাম। স্বর্গীয় অপ্সরা উর্বশী প্রসাদ নিয়ে চলে গেলেন। তিনি নীলাম্বরী পাতলা শাড়ী পরা সুন্দরী অলংকৃতা বালিকা মূর্তি, নর্তকীর বেশ, শুভ্রবর্ণ দিব্যমূর্তি, অনবদ্য অঙ্গসৌষ্ঠব। উর্বশীর একমাত্র খাদ্য ঘৃত। মহাভারতে আছে, উর্বশী প্রমুখ অপ্সরাগণ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা বলে, তাঁরা এত সুন্দরী ও তাঁদের সৌন্দর্য অম্লান থাকে। গত দুই সপ্তাহ প্রত্যহ আমরা মন্দিরে সরস্বতীর ধ্যান, সঙ্গীত ও মন্ত্রজপ করছি। মহাগৌরী বলেন, সরস্বতীর দিব্যমূর্তি কোন প্রতিমায় বা আলেখ্যে ফোটাতে পারে না। যদি শিল্পী সাধক হয় ও দিব্যমূর্তির দেখতে পায়, তাহলে আংশিক ফোটাতে পারে। সরস্বতীর দিব্যমূর্তি বর্ণনা দেওয়া যায় না, ধ্যাননেত্রে অনুভব করা যায়। মাথার চুল, ভ্রূদ্বয় ও চোখের মণি ব্যতীত সরস্বতীর সবই শুভ্র, অলংকারাদি সাদা পাথরের ও মুক্তার। সরস্বতীর ঐশ্বর্য্য জ্ঞান, অন্য ঐশ্বর্য্য নয়। আর লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যমণ্ডিতা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা ও রাজসী। সরস্বতী শুদ্ধসত্ত্বমূর্তি। তাই তাঁর বস্ত্রাদি

সবই শ্বেত। সন্ধ্যাকালে মহাগৌরী নিজেই ঠাকুরদের জন্য লুচি ভাজ ছিলেন রান্নাঘরে। যতক্ষণ তিনি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ততক্ষণ শিব ঠাকুর রান্নাঘরে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

২২ জানুয়ারী রবিবার সকালে আমি একটু সুস্থ বোধ করলাম। পূর্ব রাত্রে আমার খুব জ্বর হয়েছিল। রাত্রি এগারটায় ঘুমুতে গেলাম, কিন্তু রাত্রি দুটো থেকে জেগেছিলাম। মহাগৌরী রাত্রি আড়াইটায় এসে আমার বিছানায় বসলেন ও আমার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তিনি থাকতে থাকতেই শিব ঠাকুর এসে আমার শিয়রে দাঁড়ালেন। মহাগৌরী দুপুরে মন্দিরে পূজাকালে তাঁকে যে গোলাপ ফুল দিয়েছিলেন, সেটি তখন তাঁর মাথায় দেখা গেল। তাঁকে দেখে মহাগৌরী স্বীয় শয্যায় গেলেন। শিব ঠাকুর পূর্ব্ববৎ আমার শিয়রে ভোর ছয়টা পর্য্যন্ত দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে না পারলেও ঘুমিয়ে পড়লাম ও সকালে উঠে সুস্থবোধ করলাম।

রবিবার পূর্ব্বাহ্নে নিরঞ্জনকালে মহাগৌরী দেখিলেন, দেবীঘটে ও সরস্বতীর হাতে পূজার সময় শ্বেতপদ্ম দিতে হয়। ইহাই লুপ্তবিধি। কারণ সরস্বতী নারায়ণী। আজ পূজান্তে সরস্বতী জ্ঞানদাত্রীরূপে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। তখন তাঁর পশ্চাতে দেখা গেল, বিদ্যুৎবর্ণ ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্থির সমুদ্রবৎ বিদ্যমান। শাস্ত্রেও আছে, সরস্বতী ব্রহ্মযোনি-সমুৎপন্না। এঁর কোন বাহন নাই। হংসারূঢ়া সরস্বতী কন্যারূপে আসেন, কিন্তু আমার প্রণাম নেন না; নিজেই আমাকে শ্রদ্ধা জানান। সরস্বতীর এই দুই মূর্তি। নিরঞ্জনান্তে সরস্বতী আমাদের মন্দিরে এলেন। আমাদের সরস্বতীপূজা মোক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়েছিল, কারণ জ্ঞানদাত্রী বা মোক্ষদাত্রী সরস্বতীই এসেছিলেন। যখন সর্বশেষে মহাগৌরী শিব লিঙ্গকে পূজামণ্ডপ থেকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন, তখন শিবঠাকুর মন্দিরে গেলেন। দই-কড়মা নিবেদিত হলে ঐরাবত সহ ইন্দ্রদেব ও অন্যান্য দেবতা এসে প্রসাদ নিলেন।

বেলা বারটায় মহাগৌরী নিজে সুজির পায়স রেঁধে মন্দিরে শিব ঠাকুরকে নিবেদন করলেন। মন্দিরস্থ দেবগণ ও অন্যান্য অনেক দেবতা (অপরিচিত এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ও মূর্তির) এসে প্রসাদ নিলেন। বহু সিদ্ধ মুনি ঋষিও এসেছিলেন। কালযবন উত্তর বারান্দায় ছিলেন ও শিব তাঁকে প্রসাদ দিলেন।

সন্ধ্যায় আমি ও মহাগৌরী অন্য দুটী ভক্ত সহ বেলুড়ে ও লিলুয়ায় নানা স্থানে সরস্বতী প্রতিমা দর্শনে বাহির হলাম এবং প্রায় পনেরখানি সরস্বতী প্রতিমা দেখলাম। দুঃখের বিষয়, সর্বত্র প্রতিমা সুসজ্জিত হলেও কোথাও প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা বা বৈধী পূজা হয় নি! অধুনা সর্বত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে অনাচার ও আড়ম্বর চলছে!! পদ্মাদেবী, গোপালজী ও রুদ্র ভৈরব আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। গোপালজী দয়া করে আমার বাম কাঁধে চড়ে গিয়েছিলেন।

২৩ জানুয়ারী সোমবার দুপুরে স্নানান্তে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর-পূজা করলাম ও অন্নভোগ দিলাম। পূজাকালে মূল শিব পদ্মাসনে শ্বেতমূর্তি ধরে এলেন। তাঁর চার দিকে জ্যোতির্ময় জীবন্ত এগার শিবলিঙ্গ আবির্ভূত হলেন। তখন ভুবনেশ্বরী মহাবিদ্যা এলেন ও মূর্তিধারী মহাদেবকে শ্বেতপুষ্পমালা পরালেন। ভুবনেশ্বরীর বক্ষঃস্থলে স্বর্ণোজ্জ্বল দেবনাগরী হরফে লেখা ছিল—ভুবনেশ্বরী। মহাগৌরী সেই দিব্য লেখা স্পষ্ট পড়লেন। আজ ঠাকুরের গুরু সুফী গোবিন্দ রায় এলেন ও শিবকে প্রণাম করে বসলেন। অন্নভোগ নিবেদিত হতে গঙ্গাদেবী এসে অন্নব্যঞ্জনাদির উপর হাত বুলিয়ে শুদ্ধ করে নিলেন। মহাগৌরীর মনে সংশয় উঠেছিল—আমি ত শিবমন্ত্রে সিদ্ধ হয়েছি। আমি কি কাউকে অন্য মন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারি? তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "মা, তুমি সব মন্ত্রেই দীক্ষা দিতে পার। এমনকি, আল্লামন্ত্রে বা খ্রীষ্টমন্ত্রেও দীক্ষা দানেও তুমি সমর্থ।"

আজ সন্ধ্যায় আমাদের সরস্বতী প্রতিমা গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দেওয়া হলো। বৈকাল সাড়ে চারটায় মহাগৌরী প্রতিমা বরণ করলেন। তখন প্রতিমা জীবন্ত হয়ে উঠলেন, বরণ নিলেন ও সন্দেশ খেলেন। রিক্সাতে প্রতিমা তুলে গঙ্গার দিকে আমরা চলছি। তখন দেখা গেল, ব্রহ্মা, শিব, নারায়ণ (সাদা ফুলের মালা গলায় ও শংখ, চক্রাদি হাতে), লক্ষ্মী, পদ্মা, রুদ্র ভৈরব, নারদ, জয়া, বিজয়া ও নন্দী-ভৃঙ্গী (নাচতে নাচতে) প্রভৃতি সরস্বতী দেবীর সঙ্গে চলেছেন। অনেক সিদ্ধ ঋষি ও সিদ্ধা সাধিকা উল্লিখিত দেবগণের সঙ্গে যোগ দিলেন। রাস্তার দুই পাশে বহু প্রেত ও সূক্ষ্মদেহী সত্বর সরে গেল। সিদ্ধা সাধিকাদের মধ্যে একজন ছিলেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী। তাঁর মাথায় কাপড়, গায়ের শুভ্র জ্যোতিঃ শাড়ী ভেদ করে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাঁর স্বর্গীয় সুষমা ছিল। গঙ্গাঘাটে প্রতিমা নামাতেই গঙ্গাদেবী জ্যোতির্ময় মূর্তিতে বিনা বাহনে আবির্ভূত হলেন। সোণার পিলসুজে সোণার প্রদীপ জ্বেলে ধূপদীপ দিয়ে তিনি সরস্বতীকে আরতি করলেন। তখন স্বর্গ থেকে দেবতারা গঙ্গাতে নামলেন এবং গঙ্গা সরস্বতীকে কোলে তুলে নিলেন। আমরা ধর্মচক্রে ফিরতে মহাগৌরী সারস্বত শান্তিবারি আমাদের মাথায় সিঞ্চন করলেন। অনন্তর তিনি মন্দিরে ঢুকেই দেবী সরস্বতীকে পূর্ণরূপে দেখতে পেলেন।

সাত

ব্রহ্মাপূজা

২ মার্চ ১৯৬১ বৃহস্পতিবার ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ধর্মচক্রে প্রতিমায় ব্রহ্মাপূজা ও মঙ্গলগ্রহপূজা হয়। মঙ্গলগ্রহ ব্রহ্মা সহ গত আগস্টের মধ্যভাগ হতে এই পর্যন্ত সাড়ে ছয় মাস ধর্মচক্রের দক্ষিণে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির দোতলার ছাদে বসেছিলেন আমার প্রতি কুদৃষ্টি দিয়ে। সংকল্পিত পূজাহোমের পর তাঁরা উক্ত স্থান ছেড়ে গেলেন এবং অলক্ষ্যে থেকে আমার প্রতি নজর রাখেন। মৃণ্ময়ী প্রতিমায় হংসবাহন ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণী ও মঙ্গল মেষবাহন সহ মূর্তি নির্মিত ছিল। নিশ্চিন্দার মৃৎশিল্পী রাধাচরণ পাল কর্তৃক আমাদের ব্রহ্মা প্রতিমা নির্মিত হয়। ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণী, মঙ্গল, রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, শিব, গোপাল, বগলা ও কল্কি—এই নয় দেবতাকে নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করা হল। প্রতিমা পূর্বদিন বুধবার বৈকালে বিবেকানন্দ নাট মন্দিরে আনা হল। উহার কিছুক্ষণ পরেই তিন মূর্তিতে তিন দেবতা আবির্ভূত হলেন। আমরা বৃহস্পতিবার সকাল নটার পূজায় বসলাম এবং বৈকাল দেড়টা পর্যন্ত সাড়ে চার ঘণ্টায় পূজা-হোম ও ভোগারতি যথাবিধি করলাম। ঘটস্থাপন হলে ব্রহ্মার আবির্ভাবে মৃৎঘট শ্বেতবর্ণ হয়ে গেল এবং ঘটের জলে সর্বতীর্থ ও সবদেবতার আবির্ভাব হলো। ব্রহ্মাজী ঘটের উপর বসলেন ও অন্যান্য দেবতা ঘটগাত্রে রইলেন। দেবঘট প্রণবের প্রতীক। প্রণব মহাপ্রাণ, মহামন্ত্র। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর থেকে সূর্যাদি সর্বদেবতা ও সর্বজীব প্রণবাধীন। ঘটের নিম্নে মৃত্তিকা পৃথ্বীতত্ত্ব। ঘটস্থ তীর্থসলিল জলতত্ত্ব। প্রধানতঃ পৃথ্বী ও জল দিয়েই সৃষ্টি হচ্ছে। জলস্থ রজতখণ্ড তেজঃতত্ত্ব। ঘটস্থ যব বায়ুতত্ত্বের প্রতীক। ঘটাকাশ আকাশতত্ত্ব। আম্রাদি পঞ্চপল্লব পঞ্চপ্রাণ। ধান্যাদি পঞ্চশস্য শরীরস্থ পঞ্চধাতু। সরার চাল অন্ন। সশিষ ডাব দেবতার মস্তক ও ডাবের তিন চক্ষু দেবতার তিন

নয়ন। মন্ত্রপূত প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরে ব্রহ্মাদি দেবতারা ঘট থেকে প্রতিমায় গেলেন। তখন দেবতার নিরাকার শুদ্ধসত্ত্বা উক্ত ঘটেই রইলেন। আর সাকার পূর্ণ সত্ত্বা প্রতিমায় গেলেন। ব্রহ্মার স্নানকালে ব্রহ্মা একটী রক্ত পদ্মের উপর উপবিষ্ট হলেন এবং গঙ্গাদি সপ্তনদী তাঁকে মহাস্নান করালেন। প্রথমে শিবপূজা ও শিবকে নৈবেদ্য দেওয়া হলো। তখন ব্রহ্মা শিবের সামনে হাত জোড় করে বসেছিলেন। ব্রহ্মার পূজাকালে যখন বস্ত্র ও আভরণাদি নিবেদিত হলো, তখন অন্নপূর্ণাও গৌরী দেবী লাল বেণারসী দিব্য বস্ত্র ব্রহ্মাকে দিলেন ও ব্রহ্মা পরলেন। আমাদের আভরণ নিবেদত হলে দেখা গেল, পঞ্চ থালে পঞ্চ রত্ন—সোণা, প্রবাল, মুক্তা, হীরা ও মাণিক্যে নির্মিত অলংকার অন্নপূর্ণা এনে ব্রহ্মাকে পরালেন। কুবের সর্ববিজয় মুকুট এনে অন্নপূর্ণার হাতে দিলেন, অন্নপূর্ণা সেই মুকুট ব্রহ্মার মাথায় পরালেন। এই ভাবে ব্রহ্মাণী, মঙ্গলগ্রহ প্রভৃতি দেবতাকে অন্নপূর্ণা ও গৌরী দেবী দিব্য দ্রব্যাদি উপহার দিলেন। গোপালের পূর্বে মঙ্গলকে নৈবেদ্য দেওয়া হয়েছিল। তাতে গোপালজী অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তাই মঙ্গল আসনে বসতেই গোপালজী তাঁর মাথার চুল ধরে আসন থেকে সরিয়ে দিলেন ও ব্রহ্মার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করছিলেন। নৈবেদ্যাদি প্রদানের পর হোমারম্ভ হবার আগে আমার অন্তরে ব্রহ্মা একটী লম্বা মোটা স্বর্ণজ্যোতিঃমণ্ডিত কলম প্রবেশ করিয়ে দিলেন। ইহা বিধাতার কলমের এক শক্তি। ঐ কলম আধ হাতের বেশী লম্বা ও কারুকার্য্য খচিত। বগলা দেবীকে পূজান্তে নৈবেদ্য দেওয়া হলে তিনি আনন্দে পূজা ও নৈবেদ্যাদি গ্রহণান্তে তাঁর ভক্ত মঙ্গল দেবতাকে উহার কিয়দংশ দিলেন। অনন্তর বগলা আমাকে, পূজককে প্রবাল নির্মিত স্বর্ণচম্পকের একটী মালা দিলেন। এই সকল দিব্য চাঁপার কোরক থেকে লাল জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। উহার নাম উপশম মাল্য। ইহার অর্থ, আমার গ্রহ-বৈগুণ্য বা দুষ্ট প্রারব্ধ একেবারে খণ্ডাবে না, আংশিক উপশম হবে। যখন

ব্রহ্মাণীকে পূজা করা হল, তখন তিনি পূজা-নৈবেদ্য সানন্দে নিলেন এবং পদ্মমালা (গোলাপী আভাযুক্ত) তিনবার আমার কপালে ঠেকিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। উহা সাধন মাল্য। আমার মোক্ষসাধনে সিদ্ধিলাভার্থ মা ব্রহ্মাণী আমাকে এই দিব্য মাল্য দিলেন। তখন খুব হাওয়া বইছিল বলে প্রতিমার সম্মুখে হোম করা অসম্ভব হয়েছিল। অথচ দেবতারা প্রতিমায় আবির্ভূত। তখন পবনদেবকে স্তিমিত করার জন্য প্রতিমাস্থ দেবগণকে যোগিরাজ ভৈরবানন্দ প্রার্থনা করলেন। এই প্রার্থনার ফলে পবন দেবতা প্রশান্ত হলেন। আমরা এক ঘণ্টা ধরে হোম করলাম ও বায়ুর গতি শান্ত রইল। ব্রহ্মাকে চুয়ান্ন, ব্রহ্মাণীকে চুয়ান্ন, চৈতন্যকে চুয়ান্ন, বগলাকে চুয়ান্ন ও মঙ্গলকে চুয়ান্ন আজ্যসিক্ত বিল্বপত্রাহুতি দেওয়া হলো। হোমাগ্নিতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণী, চৈতন্য, মঙ্গল, বগলা, কালী, শিব, গোপাল, শ্রীরামকৃষ্ণ, কল্কিদেব, কালযবনাদি দেবতারা অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন ও আমাদের আহুতি নিলেন। পূর্ণাহুতির সময় ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে উঠে হাত পেতে মহাগৌরীর হাত থেকে পূর্ণাহুতি নিলেন ও মহাগৌরী গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। অন্নভোগ নিবেদিত হলে ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতা—পূজিত ও অপূজিত অসংখ্য দেবতা—অন্ন-ব্যঞ্জনাদির চারি পাশে বসলেন। ব্রহ্মাণী একটী পৃথক্ পাত্রে অন্নব্যঞ্জনাদি সাজিয়ে মঙ্গলাদি নবগ্রহকে পৃথক্ ভাবে খেতে দিলেন। নবগ্রহ প্রারব্ধ দেবতা বলে মূল দেবতাদের সঙ্গে অন্নগ্রহণ করতে পারলেন না। পূজিত দেবগণকে ব্রহ্মাণী স্ব স্ব প্রতিপত্তি অনুযায়ী অন্নভোগ বিতরণ করলেন। অগণিত অপূজিত দেবতাকে অন্নাদি দিয়া ব্রহ্মাণী স্বয়ং সর্বশেষে অন্নভোগ গ্রহণ করলেন। ব্রহ্মার গলায় পৈতা ও শ্বেতবর্ণ মুক্তা হার ছিল। ইন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শিব, বিষ্ণু, কল্কি প্রভৃতি দেবতার গলায় যজ্ঞসূত্র ছিল। সান্ধ্য আরতির সময় আবার আমরা ব্রহ্মার ধ্যানাদি করলাম। তখন ব্রহ্মা একটী দিব্য পুষ্পমাল্য আমাকে দিলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর, বাবাকে কি মাল্য দিলেন ?

ব্রহ্মাজী উত্তর দিলেন, "ইহা লিপিবিজয় মাস্য। সকালে কলম দিয়েছি। এখন লিপিশক্তি দিলাম।"

সান্ধ্য আরতির পর বেলুড় রাইকমল কীর্তন সমিতি 'নিমাই সন্ন্যাস' পালাগান করলেন। এই কীর্তন শুনিতে তিনশতাধিক নরনারী আমাদের নাটমন্দিরে সমবেত হন। এই মধুর কীর্তন প্রায় আড়াই ঘণ্টা চলিল। যতক্ষণ গান হইল, ততক্ষণ অনেক পূজিত ও অপূজিত দেবতা এবং বহু বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ও শৈব সাধক সূক্ষ্মদেহী নাটমন্দিরে রইলেন। স্থূলদেহী শ্রোতৃবৃন্দ অপেক্ষা সূক্ষ্মদেহী শ্রোতৃবৃন্দ অধিক মনে হল। গর্গ মুনি, ভৃগু মুনি, ব্যাসদেব, চৈতন্য, অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভৃতিও ছিলেন। সায়ংকালে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল প্রায় পৌণে দুই ঘণ্টা কাল। মহাপ্রভুর প্রথম জন্মতিথিতে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল, এত কাল পরে ঠিক সেই পূর্ণিমাতে আবার চন্দ্রগ্রহণ হল। রাত্রি সাড়ে আটটায় আমাদের মন্দিরে লুচি, হালুয়া, তরকারী ও মিষ্টি ঠাকুরকে নিবেদন করতে মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া গেলেন। মহাগৌরী মন্দিরে গিয়ে দেখলেন, একটা নীলাভ বিরাট পুরুষ ফলমিষ্টি, লুচি তরকারী প্রভৃতি প্রচুর স্বর্গীয় আহার্য্য অনেক থালায় স্তরে স্তরে সাজিয়ে হাটু গেড়ে জোড় হাতে দরজার কাছে বসে আছেন। মহাগৌরী তাঁকে দেখে ভয় পেলেন ও ভৈরবানন্দকে ডাকলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ নীচ থেকে উপরে এসে দিব্য চক্ষুতে দেখলেন, ইনি ব্রহ্মার বলে বলীয়ান্ লঙ্কেশ্বর রাবণ। বীর ভক্তের ন্যায় রাবণ মহাগৌরীকে নমস্কার করে শ্রদ্ধা জানালেন এবং তৎকর্তৃক আনীত দিব্য দ্রব্য ব্রহ্মাজীকে নিবেদন করতে বললেন। তদনুযায়ী মহাগৌরী ঐ দিব্য দ্রব্যসমূহ ব্রহ্মাকে নিবেদন করলেন। অনন্তর তিনি রাবণ-পত্নী মন্দোদরীকে দেখতে চাইলেন ও তাঁকে ডাকলেন। তাঁর সপ্রেম আহ্বানে মন্দোদরী অবিলম্বে এলেন। মন্দোদরী উভয়ে ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরীকে প্রণাম করলেন। মন্দোদরী লাল শাড়ী পরা, শাড়ীর জমিতে সোণার বড় বড় ফুল, ঐ ফুলগুলির মধ্যে

তখন রাবণ ও হীরা, মুক্তা, জহর, পান্নাদি বসান, দেবীদের চেয়েও দেখতে সুন্দর, হাঁটু পর্যান্ত মাথার চুল ঝুলছে, পদ্মবৎ দুই সুন্দর চোখ, বিবিধ অলংকারে বিভূষিতা। এইরূপ সুন্দরী রমণী জগতে আবির্ভূত হয়নি বলা চলে। মন্দোদরী সীতাপেক্ষাও সুষমামণ্ডিতা। অনন্তর রাবণের ইষ্টদেবী চামুণ্ডা এলেন এবং রাবণের মাথায় ও মুখে হাত বুলিয়ে আদর করলেন। রাবণ ও মন্দোদরী উভয়ে গোলোকবাসী। রাত্রি দশটায় নাটমন্দিরে স্বর্গবাসী তান্ত্রিক সাধক ব্রহ্মাদর্শনে এসেছিলেন।' তিনি লাল কাঠের কাপড় পরা ছিলেন।

৩ মার্চ শুক্রবার প্রাতে নয়টায় আমরা প্রতিমার সম্মুখে শেষ পূজায় বসলাম ও বিসর্জন দিলাম। পূজান্তে দধি-কড়মা নিবেদন করা হলো। দেবতারা সবাই দধি-কড়মা খেয়ে তৃপ্ত হলেন, কিন্তু গোপালজীকে একটু খানি দেওয়ায় তিনি মুখ ভার করে মেজেতে এক পাশে বসে রইলেন। দক্ষিণান্ত করার পূর্বে ব্রহ্মাজী স্বর্ণময় কমণ্ডলু থেকে ব্রহ্মবারি, শান্তিবারি প্রথমে আমার মাথায় ও শেষে মহাগৌরীর মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। অনন্তর তিনি 'ওঁ ব্রৌং ব্রহ্মণে নমঃ'—এই সিদ্ধমন্ত্র মহাগৌরীকে দিলেন এবং স্নেহশীল পিতামহবৎ হেসে মাথা নাড়তে লাগলেন। তৎপরে তিনি সবাহন বিরাট মূর্তি ধরে উত্তর শিখরে স্বস্থানে গেলেন। তিনি যাচ্ছেন, আবার পেছন ফিরে চেয়ে আমাদিগকে স্নেহভরে দেখছেন। তাঁর বিরাট বাহন হংস নাটমন্দিরে ধরছিল না। উক্ত হংসের উপর রক্তপদ্মে ব্রহ্মা উপবিষ্ট। তাঁর বিরাট শরীর বিশ্ব জুড়ে বিরাজ করল। মঙ্গলগ্রহ বগলা দেবীর সঙ্গে দেবীলোকে গেলেন ও পেছন ফিরে গম্ভীর বদনে আমাদের দিকে চাইলেন। দুপুরে মন্দিরে অন্নভোগ দেওয়া হলে গোপালজী রাগ করে অন্নপ্রসাদ নিলেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁকে তিনবার অন্নভোগ দিলেন, আর গোপাল তিনবার ঐ সব ঠাকুরের গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তখন ভৃগু মুনি ক্ষীর, দই, ছানা, মিষ্টি ও ফলাদি দিব্য দ্রব্য আনিয়ে

গোপালজীকে দিলেন এবং তাঁর পিঠে, মাথায়, গায় হাত বুলাতে লাগলেন। তখন স্নেহের গোপাল ঐ সব দ্রব্য কিঞ্চিৎ নিয়ে ঠাকুরের কাছে গিয়ে শান্তভাবে অন্নভোগ খেলেন।

ব্রহ্মার জন্ম বিষ্ণুর অংশে। তাই তাঁর কপালে তিলক, কিন্তু তাঁর ইষ্ট দেবী মহামায়া। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্রে ব্রহ্মা কর্তৃক মহামায়ার স্তব পাওয়া যায়। মহাগৌরী মহামায়ার স্বরূপে আরূঢ়া হয়ে প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার সময় ব্রহ্মা হাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার করলেন। যখন ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা পিতামহ, তখন তিনি চতুর্মুখ ও চতুর্ভুজ। আর যখন তিনি স্বরূপে আরূঢ় হন, তখন তাঁর এক মুখ ও দুই হাত এবং তৎপরে তিনি নিরাকার। রাক্ষসরাজরূপে রাবণের দশ মুখ ও বিশ হাত; আবার যখন দেবীভক্ত তখন তাঁর এক মুখ ও দুই হাত।

আমাদের ব্রহ্মাপূজা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মদিনেই হয়েছিল এবং তৎসঙ্গে তিনদিন শ্রীচৈতন্যলীলা কীর্তন চলেছিল। তাই ৬ মার্চ সোমবার এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ঐদিন দুপুরে মহাগৌরী সমাধিতে দেখলেন—আহারান্তে শ্রীচৈতন্যের ধর্মপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াও তাঁর সঙ্গে সাত আট জন সুন্দরী গৌরবর্ণা দেবী খোল, করতাল, শিঙ্গাদি নিয়ে হাত তুলে নাচতে নাচতে হরিনাম করছেন এবং বলছেন, "আপনি এবং আপনার দাদু ও বাবা তিনজনকে হরিনাম করতে হবে।" দুপুরে আমরা মন্দিরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে যে সচন্দন জবাফুল দিয়েছিলাম, সেটী তাঁর মাথায় দেখে মহাগৌরী বুঝলেন, ইনি বিষ্ণুপ্রিয়া। মহাগৌরী হরিনাম করতে অসম্মত হওয়ায় তাঁরা বললেন, তবে মাত্র সাত মিনিট করুন। এই সাত মিনিট হরিনাম করার অর্থ, বৈষ্ণব দর্শনে স্বীকৃত বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত সপ্ত ভূমি জয়। কৃষ্ণ, কেশব, মাধবাদি সপ্ত নাম সাধনে এই সপ্ত স্তর লাভ হয়। অনন্তর মহাগৌরী দেখলেন, তাঁর নির্দেশে আমরা তিনজন হরিনাম করছি। তা দেখে বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন, আপনাদের মুখে হরিনাম লোকে

শুনবে ও উদ্ধার হবে। একটু পরে তাঁরা অন্তর্হিত হলেন। এই তত্ত্ব ভাল করে জানার জন্য মহাগৌরী ভৈরবানন্দকে জিজ্ঞাসা করায় যোগিরাজ ভৈরবানন্দ বিষ্ণুপ্রিয়াদি নারী কীর্তনীয়াগণকে আহ্বান করলেন এবং মহাগৌরীকে দেখিয়ে বললেন, "যিনি মাঝখানে আছেন, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি নারীভক্ত বা বৈষ্ণবীদের নিয়ে একটী কীর্তনীয়ার দল গড়েছিলেন। এই কথা বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়।"

সন্ধ্যা পাঁচটায় নাটমন্দিরে ব্রহ্মা প্রতিমাকে মহাগৌরী বরণ করলেন, মহামায়ার স্বরূপে আরূঢ়া হয়ে। তখন ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণী, মঙ্গলগ্রহ, হংস ও মেষ বাহনদ্বয় জীবন্ত হলেন। যখন মহাগৌরী মহামায়া স্বরূপে সংস্থিতা হয়ে ব্রহ্মাকে পুত্রজ্ঞানে আশীর্বাদ করলেন, তখন ব্রহ্মা মাথা পেতে ধানদূর্বা নিলেন ও হাত জোড় করে নমস্কার করে হাসতে লাগলেন। তখন মহাগৌরী দাঁড়িয়ে ছিলেন ও গভীর সমাধিতে নিমগ্না হলেন। অনন্তর মহাগৌরী মঙ্গল গ্রহের মাথায় ও বুকে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন; তাঁর পায় হাত দিতে পারেন নি। ঠেলা গাড়ীতে আমরা ব্রহ্মা প্রতিমা গঙ্গাতীরে নিয়ে গেলাম ঢাক, কাঁসর, ঘণ্টাদি বাদ্য সহ। রাস্তায় দেখা গেল, প্রতিমার চারি পাশে ও উর্ধে দেবদেবী, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, অবতার কল্কি, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি সঙ্গে চলেছেন গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত। যখন প্রতিমাকে গঙ্গাতে বিসর্জন দেওয়া হলো, তখন গঙ্গাবক্ষে গঙ্গা দেবী আবির্ভূত হয়ে ব্রহ্মাকে ধারণ করলেন এবং সব দেবদেবী গঙ্গায় মিশে গেলেন। এই জন্যই শাস্ত্রে বলে, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি ও সর্ব দেবতার স্বরূপ, সর্ব শুভকর্মে গঙ্গাবারি অপরিহার্য্য ও মুমূর্ষুর মুখে গঙ্গাবারি দিতে হয়, শবদাহান্তে অস্থি গঙ্গায় ফেলা হয় ও মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রা করে। গঙ্গাগর্ভে ব্রহ্মাপ্রতিমা বিসর্জন দিয়ে আমরা ফিরে এলাম ও মহাগৌরী আমাদের নাটমন্দিরে সকলের মাথায় শান্তিবারি সিঞ্চন করলেন। স্বামী বিশ্বরূপানন্দ পুঁথি ধরে শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। উক্ত শান্তিমন্ত্রে আছে—দ্যৌঃ শান্তিঃ, অন্তরিক্ষঃ

শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ। তখন দেখা গেল, ব্রহ্মাপুত্র অঙ্গিরা এলেন। অঙ্গিরাই প্রথম মর্ত্যে ব্রহ্মার বিগ্রহপূজা প্রবর্তন করেন। অঙ্গিরার হাতে স্বর্ণবর্ণ কমণ্ডলু ছিল ও কমণ্ডলুর মুখে একটী আম্রপল্লব। যখন আমাদের মন্ত্রপাঠ শেষ হল ও মহাগৌরী শান্তিজল ছিটাতে লাগলেন, তখন অঙ্গিরাও তাঁর কমণ্ডলু থেকে শান্তিবারি সিঞ্চন করলেন। অঙ্গিরার সলিল সিঞ্চনে একটী অদ্ভুত পদ্ধতি দেখা গেল, যাহা মর্ত্যলোকে লুপ্ত হয়েছে। আমরা জলসিঞ্চন করি মানুষদের মাথায়, আর অঙ্গিরা প্রত্যেক বারে শান্তিবারি প্রথমে স্বর্গে দেবতাদের উপরে, তারপর অন্তরীক্ষে অন্তরীক্ষবাসীদের উপর ও শেষে মর্ত্যে মর্ত্যগণের উপর ছিটালেন। অঙ্গিরা প্রত্যেক বার শান্তিবারি ত্রিভুবনে সুসিঞ্চন করলেন ত্রিভুবনে শান্তি স্থাপনার্থ। আমরা অঙ্গিরাকে সভক্তি প্রণাম করতে তিনি স্বস্থানে চলে গেলেন।

আট

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি

১৯৬১ খ্রীঃ ১ জানুয়ারী, ১৬ পৌষ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ রবিবার কল্পতরু দিবসে আমাদের মন্দিরে ঠাকুরের নিত্যপূজা ও অন্নভোগ হল। সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ কল্পতরু হলেন এবং পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে প্রথম কল্পতরু কালে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলে মন্দিরে এলেন। তখন ঠাকুরের যে জীর্ণশীর্ণ দেহ ছিল, তাহাও মহাগৌরী দেখলেন। ঠাকুরের ঐ মূর্তির এক ফটো আমি মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে দেখেছি। ভক্তবর রাম দত্ত এই কল্পতরু উৎসব কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে আরম্ভ করেছিলেন বলে তিনিও উপস্থিত হলেন। ঐ দিন আমি সিউড়ি রামকৃষ্ণ আশ্রমে ছিলাম।

২ জানুয়ারী সোমবার আমি ও স্বামী অসিতানন্দ সিউড়ি থেকে ১০।১২ মাইল দূরে বক্রেশ্বর পীঠস্থান দেখতে গেলাম মোটর বাসে চড়ে। যেখানে বাস থামে, সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল হেঁটে আমরা বক্রেশ্বরে পৌঁছিলাম। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়াতে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৮৬ খ্রীঃ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৯) নিম্নোক্ত মন্তব্য আছে—"Bakeswara or Kana, a small river of Bengal rises in Birbhum District, and with its tributary the Kopais or Kopa or Salmadi drains the Country between the Ajaya and the Mor or Mayuriksha, joining the latter river in Murshidabad district. Course easterly. springs impregnated with sulphuretted hydrogen are found in the bed of the stream, with hot and cold jets within a few feet of each other, about eight miles west Suri. One mile south of Tantifrad village a group of hot sulpher springs named Bhum Bakeswara. Attracts an annual concoure of pilgrims, whose piety has erected a temple city more than three hundred brick shrines to Mahadeva on the river bank."

বীরভূমে পঞ্চপীঠ অবস্থিত—সাঁইথিয়ায় নন্দিকেশ্বরী, লাভপুরে ফুল্লরা, বক্রেশ্বরে মহিষমর্দিনী, বোলপুরে কংকালী ও নলহাটিতে ললাটেশ্বরী। তারাপীঠ পৌরাণিক পীঠস্থান নহে। বক্রেশ্বরে সপ্ত উষ্ণ প্রস্রাবণ বা কুণ্ড আছে। এই সপ্ত কুণ্ডের নাম পাপহরা, যমদ্বার প্রভৃতি। সপ্তকুণ্ডে সপ্তবিধ উষ্ণজল অবস্থিত। আমরা পাপহরা প্রস্রবণে অবগাহন করিলাম। বক্রেশ্বর অষ্টাবক্র মুনির * ইষ্টদেব ও সুপ্রাচীন শিবলিঙ্গ। নিতাই প্রভু ১৪০৭ শকে

* দেবল ঋষি রম্ভার শাপে অষ্টাবক্র মুনিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্ঞানোপদেশ অষ্টাবক্র সংহিতায় লিপিবদ্ধ। মহাভারতে আছে, অষ্টাবক্র গলা অবধি জলে ডুবে তপস্যা করতেন। মেনকা, ঘৃতাচি প্রমুখ অপ্সরাগণ তপোরত অষ্টাবক্রকে স্তবস্তুতি করলেন। তখন তিনি প্রসন্ন হয়ে তাঁদিগকে

তথায় পদার্পণ করেন। উক্ত পীঠস্থানে প্রায় তিন শত পাকা শিবমন্দির আছে। অদূরে একটী ছোট পাহাড়ে অঘোরী বাবা নামে প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তাঁর কথা প্রমোদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন। ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ গাঙ্গুলী মুসলমান হয়ে কালাপাহাড় নামে বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন। তিনি বক্রেশ্বর তীর্থে গিয়ে বহু মন্দির ও মূর্তি বিনষ্ট করেন। একটী বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে আমরা একটী সুন্দর প্রস্তরময় হরগৌরী মূর্তি দেখিলাম। বক্রেশ্বর একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম ও তথায় সতীর ভ্রূদ্বয় পড়েছিল। শারদীয়া দুর্গা পূজার সময় তথায় দেবী মহিষমর্দিনীর পূজারতি ও বলিদান হয়। ওখানে অনেক আশ্রম দেখলাম। সেই সব আশ্রমে তান্ত্রিক সাধুরা সস্ত্রীক থাকেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমি ধর্মচক্রে ফিরিলাম ও মহাগৌরীকে বক্রেশ্বরের কথা বলিলাম। মহাগৌরী বক্রেশ্বর শিবের উদ্দেশ্যে মন্দিরে মোমবাতি জ্বালিলেন ও দিব্যদৃষ্টিতে দেখিলেন, বক্রেশ্বর শিবলিঙ্গ শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত। ঐ দিন বক্রেশ্বর মহাদেব আমাদের মন্দিরে পূজাকালে এলেন ও আমাদের পূজা নিলেন।

১৫ জানুয়ারী শনিবার ১৯৬১, ৩০ পৌষ ১৩৬৭ সাল মকর সংক্রান্তি প্রাতে আমরা মন্দিরে নামকীর্তনান্তে গঙ্গাস্তোত্র ও গঙ্গাসঙ্গীত গাইলাম। তখন

বর দিতে চাইলেন। অপ্সরাগণ বললেন, এই বর দিন, যাতে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পেতে পারি মুনি বলিলেন, তথাস্তু। মুনি জল থেকে উঠতেই অপ্সরাগণ তাঁর দৈহিক বক্রতা দেখে হাসতে লাগলেন। তখন অষ্টাবক্র ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিলেন, "তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পেলেও শ্রীকৃষ্ণ যখন মর্তত্যাগ করবেন, তখন দস্যুরা তোমাদিগকে হরণপূর্বক অধীনে রাখবে।" এই শাপ পেয়ে অপ্সরাগণ আকুলিত হলেন ও ক্রুদ্ধ মুনির পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। ইহাতে জ্ঞানী মুনি তাঁহাদিগকে বর দিলেন, তোমরা দস্যুর অধীন হলেও দেহান্তে স্বর্গে যাবে। দেবী ভাগবতে আছে, দ্বাপরে স্বর্গীয় অপ্সরাগণ শ্রীকৃষ্ণের পত্নীরূপে জন্মেছিলেন।

গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হলেন। আমি ও মহাগৌরী বেলা দশটায় গঙ্গা-স্নানে গেলাম। গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে মহাগৌরী গঙ্গাবক্ষে মকরবাহনা গঙ্গাদেবী ও পুরুষমূর্তি সাগরকে দেখলেন ও আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সাগর কি পুরুষ? আমি উত্তর দিলাম, হাঁ, সগরপুত্র সাগর পুরুষ দেবতা। পূর্বদিন শুক্রবার সকালে আমি ও মহাগৌরী বেলুড় মঠের দক্ষিণ পাশে ইষ্টক-নির্মিত গঙ্গাঘাটে বেড়াতে গিয়েছিলাম; তথায় মহাগৌরী দেখলেন, ঘাটের ধাপে ধাপে অনেক প্রেত বসে আছে। আজ শনিবার গঙ্গাস্নানান্তে মন্দিরে আমরা ঠাকুরপূজায় বসলাম এবং ঠাকুরপূজান্তে গঙ্গাদেবীকে পৃথক্ নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করলাম। মা গঙ্গা পূর্ণমূর্তিতে আবির্ভূত হলেন জয়া-বিজয়া এবং মকর, কপিল, ভগীরথ, জহ্নুমুনি ও বহু ভক্ত সহ। আমাদের ঠাকুর খুসী হয়ে গঙ্গাদেবীর গলায় সাদা ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। আজ আমরা গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা করায় তিনি এত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, আনন্দে ভুলে গিয়ে গঙ্গাদেবীর জন্য মালাটী নিয়ে আমাকে দিতে আসছিলেন। পরে ঐ কথা মনে পড়ায় ফিরে গিয়ে ঐ মালা মা গঙ্গার গলায় দিলেন। জহ্নুমুনির বিরাট তেজস্বী চেহারা, মাথায় লম্বা জটা, লম্বা নাক, বড় বড় জ্বলন্ত চক্ষু, ছয় হাতের অধিক উচ্চ, খাড়া ঘাড়। তিনি ঘাড় নীচু না করে হাত পেতে মা গঙ্গার কাছ থেকে প্রসাদ নিলেন এবং পরে কল্কিকে ও ঠাকুরকে হাত জোড় করে শ্রদ্ধা জানালেন। মহাগৌরী দেখলেন, ঠাকুরের আগ্রহে এখানে ইন্দ্রদেব, ধর্মরাজ প্রমুখ দেবতাও তিন ঋষি গঙ্গাপূজা উপলক্ষে দিব্য হোম করছেন। হোমাগ্নি একটা মানুষের মত উঁচু হয়ে জ্বলেছিল। দিব্যাগ্নি স্বর্ণবর্ণ। গঙ্গাদেবী দিব্যহোমে অগ্নিমূর্তিতে বিদ্যমান ছিলেন। মা গঙ্গার কপালে সোনার চাঁদ ও গাত্রে শুভ্র জ্যোতিঃ। গঙ্গাকে নৈবেদ্য নিবেদনান্তে আমি গঙ্গামন্ত্র জপছিলাম ও তদন্তে গঙ্গাকে সভক্তি প্রণাম করলাম। তখন মা গঙ্গা থেকে দুই হাত লম্বা মোটা শুভ্র জ্যোতিঃস্রোত এসে আমাকে স্পর্শ

করল। শিব ঠাকুর গঙ্গার হাত থেকে প্রসাদ নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের পার্ষদগণ ও ঋষিবৃন্দ গঙ্গাকে প্রণাম করলেন।

পূর্ব সন্ধ্যায় মহাগৌরী মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকস্থ গিরিশ ঘোষ রোডের দিকে তাকাইতে ছিলেন। একটু পরে তিনি আমাকে বললেন, "দাদু, রাস্তায় দেখলাম, বহু স্থূলদেহী নরনারী উত্তর দিকে বেলুড় মঠের দিকে যাচ্ছে। আবার তাদের পাশে পাশে বহু প্রেতাত্মা ও সূক্ষ্মদেহী নরনারী একই দিকে দল বেঁধে চলেছে। তাদের মধ্যে কেউ বাঙ্গালী, কেউ হিন্দুস্থানী, কেউ উড়িয়া, কেউ শিখ, কেউ বা অন্য জাতি। তাদের ধাক্কায় রাস্তায় স্থূলদেহীদের এত দুর্ঘটনা ঘটে।"

৩১ মে বুধবার সকালে নানা কাজ করে ক্লান্ত হয়ে বেলা দশটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় মাদুরে শুয়ে আমি বিশ্রাম করছি এবং ফুরফুরে হাওয়া থাকায় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছি। এমন সময় দেখলাম, একটী দিব্যদেহী ব্রাহ্মণ এলেন ও আমাকে তাঁর নাম লিখে দেখালেন। আমি তাঁর নামের প্রথম অক্ষর 'কু' পড়লাম, বাকী অংশ পড়তে পারলাম না। বিশ্রামান্তে উঠিয়া মহাগৌরীকে বলিলাম, কেউ এসেছিলেন, যাঁর নামের আদি বর্ণ 'কু'। পরদিন বৃহস্পতিবার ১ জুন, ১৯৬১ সকালে মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে আমার ডায়েরী খাতা একটী পড়ছিলেন। তখন তিনি দিব্য চক্ষুতে দেখলেন, একটী ঋষিতুল্য দিব্যদেহী মন্দিরমধ্যে শূন্যে বিদ্যমান ও তাঁর বুকের উপর বাংলায় লেখা—কুমারিল ভট্ট। তিনি জানালেন, আমিই পূর্বদিন এসেছিলাম। তাঁর চেহারা মধ্যমাকৃতি, দাড়ি ও গোঁফ বড় বড়, মাথায় পাগড়ি ও গায় হলদে বেনিয়ান পরা। আজ তিনি মন্দিরে অনেকক্ষণ ছিলেন। সম্প্রতি আমি শংকরাচার্য্যের সমসাময়িক বেদজ্ঞ কুমারিলের কথা সংগ্রহ করছিলাম, আমার বড় গীতার পাদটীকায় দেবার জন্য। বোধ হয়, তাই তিনি এসে দেখা দিলেন। ২ জুন শুক্রবার পূর্বাহ্ণে আমি 'কল্যাণেশ্বরী মোক্ষতীর্থে' শীর্ষক গীতার

পাণ্ডুলিপির প্রুফ দেখছিলাম দক্ষিণ বারান্দায়—মহাগৌরী পাণ্ডুলিপি পড়ছিলেন ও আমি প্রুফ সংশোধন করছিলাম। তখন বেদাচার্য্য কুমারিল এসে আমার পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা তিন ঘণ্টার অধিক প্রুফ দেখলাম; আর ততক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে প্রেরণা দিলেন। তাই এতক্ষণ প্রুফ দেখতে আমার ক্লেশ বা ক্লান্তি হয় নি। ঐ দিন সকালে ভৈরবানন্দ এলেন ও সন্ধ্যায় তিনি নাটমন্দিরে বসে কুমারিল ভট্টকে আহ্বান করলেন। অবিলম্বে কুমারিল এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। স্বামী ভৈরবানন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জন্য এসেছিলেন? তিনি বললেন, "ভারতে পাঁচ হাজার বৎসরের মধ্যে যে দিব্যদৃষ্টিলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান আলোচিত ও প্রচারিত হয় নাই, তা আপনারা আলোচনা ও লিপিবদ্ধ করছেন বলে আমি তা শুনতে আসি। আপনারা ঐ তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা লেখেন বা প্রুফ দেখেন, তাহাও আমি দেখি ও শুনি। আমিও ঐরূপ করতে পারিনি। আমি ভবিষ্যতেও আসব।" কুমারিল স্বর্গলোকের সপ্তস্তরবাসী ও ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্ত গতিশীল। আর তিনি জন্মাবেন না। তুষানলে আত্মহত্যা করার জন্য তাঁকে কিছু কাল নরকভোগ করতে হয়েছিল। তদনন্তর সহস্রাধিক বর্ষকাল তিনি স্বর্গবাসী।

শুক্রবার সন্ধ্যার পর কুমারিল অন্তর্হিত হলে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে বসে নানা কথা আলোচনা করছিলাম। এমন সময় একটী দিব্যদেহী পুরুষ একটী বাদ্যযন্ত্র বাম হাতে নিয়ে এলেন ও ক্যাম্প খাটে শায়িত মহাগৌরীর কাছে দাঁড়িয়ে কিছু লিখে দেখালেন। তখন মহাগৌরী অদূরে বেঞ্চে উপবিষ্ট ভৈরবানন্দকে বললেন, "বাবা, দেখুন ত, ইনি কে ও কি লিখে দেখাচ্ছেন।" স্বামী ভৈরবানন্দ তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর, আপনি কে? তিনি লিখে দেখালেন—আমি ব্রহ্মজ্ঞ গন্ধর্ব তুম্বরু। এঁকে গান শুনাতে ও এঁর গান শুনতে এসেছি। অনন্তর মহাগৌরীকে তিনি বললেন, মা তোমার গান শুনবো। তখন মহাগৌরী

মন্দিরে গেলেন তুম্বরুকে নিয়ে এবং প্রথমে কৃষ্ণ সঙ্গীত ও পরে কালী সঙ্গীত গেয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে শোনালেন। গন্ধর্ব গায়ক তুম্বরু মন্দিরে আমার আসনে বসে মহাগৌরীর গান দুটী শুনলেন। যখন মহাগৌরী গান করছিলেন, তখন তুম্বরু স্বীয় দিব্য বাদ্যযন্ত্র বাজালেন। যতক্ষণ তিনি বাজালেন, মন্দিরের মেজে ও দেওয়াল কাঁপছিল। মহাগৌরীর গান শেষ হতে তুম্বরু একটী গান গাইলেন ও সেই গান মহাগৌরীকে লিখে দেখালেন। গান শেষ হতেই তিনি চলে গেলেন। তুম্বরু গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের বংশধর ও অর্জুনের সখা। মহাভারতে আছে, যখন ভীষ্মদেব শরশয্যায় ছিলেন, তখন বিভাণ্ডক প্রমুখ ঋষিদের সঙ্গে তুম্বরু ভীষ্মকে দেখতে গিয়েছিলেন। ইনি গন্ধর্ব লোকের সিদ্ধ ঋষি ও গায়ক।

২৯ মে, ১৯৬১ সোমবার সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে আমি নাটমন্দিরে একা বসে আছি এবং মহাগৌরী দোতলায় মন্দিরের চাতালে আছেন। এমন সময় দেখলাম, একটী দীর্ঘকায় দিব্যদেহী এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথা ছাদে ঠেকেছে, হাতে লোহার চিমটা, মাথায় লম্বা জটা ও পরণে সাদা কাপড়। আমি তাঁকে চিনতে না পারায় তিনি ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করে আমার দিকে চাইছিলেন! তখন আমি গঙ্গাধ্যানে মগ্ন ছিলাম। অনন্তর তাঁকে আমি প্রণাম করলাম ও মহাগৌরীকে তাঁর কথা বললাম। মহাগৌরী তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে—কোন ঋষি না দৈত্য? এই কথায় তিনি খুব চটে গেলেন। আমরা উভয়ে তাঁকে নম্রভাবে মন্দিরে আসতে বললাম। মন্দিরে আসার পূর্বে তিনি স্বীয় শরীর পরিবর্তন করে ঈষৎ গোলাপী ক্ষুদ্রতর মূর্তি ধরলেন। মন্দিরে এসে মুহূর্তমাত্র দাঁড়িয়ে তিনি চলে গেলেন। তিনি মন্দিরে আসতে মন্দিরস্থ দেবতারা দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্ভ্রম দেখালেন। তিনি কাউকে গ্রাহ্য না করে চলে গেলেন। পরে ভৈরবানন্দ স্বামী যোগবলে জেনে বললেন, "ইনি অরিষ্টনেমি। ইনি সত্য যুগের সর্বশাস্ত্র-বিশারদ মহর্ষি। মহারাজ ভগীরথ মর্ত্যে গঙ্গা আনয়নের

পূর্ব থেকে হিমালয়ে গঙ্গাদ্বারে তাঁর আশ্রম ছিল। তিনি ব্রহ্মজ্ঞবরিষ্ঠ এবং সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর পর্য্যন্ত তিন যুগ জীবিত ছিলেন। দ্বাপর যুগের শেষে যখন যুধিষ্ঠির বনবাসকালে তীর্থভ্রমণ করছিলেন, তখন অরিষ্টনেমির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল।" নিত্য পূজাকালে স্বস্তিবাচনে এইভাবে অরিষ্টনেমির শুভ নাম উচ্চারিত হয়—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ, স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।" এখানে দশহরা দিবসে প্রতিমায় তৃতীয় বার্ষিক গঙ্গাপূজা হবে বলে তিনি প্রসন্ন হয়ে দেখা দিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে মোক্ষধর্ম পর্বে একোননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে অরিষ্টনেমির উপদেশ পাওয়া যায়। তথায় তিনি সগররাজাকে বলিতেছেন, "মহারাজ, মোক্ষই পরম সুখের মূল। ইহলোকে স্ত্রীপুত্রাদি পোষণনিরত ধনধান্য-সমাকুল অনভিজ্ঞ নরনারী কখনই সেই পরম পদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। স্নেহপাশে নিবদ্ধ মূঢ় ব্যক্তিরা কোন কালেই মোক্ষলাভ করিতে পারে না। মুমুক্ষু ব্যক্তি এই চিন্তা একবারে পরিত্যাগ করিবেন—আমা ব্যতিরেকে আমার পরিজনগণ কিরূপে জীবনধারণ করিবে? এই ভূমণ্ডলে কেহই কাহার নহে—ইহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া মোক্ষসাধনে মনোনিবেশ করা তোমার একান্ত কর্তব্য। যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় ও লৌকিক ব্যবহার দর্শনে সমুদায় পদার্থ অসার বিবেচনা করিয়া পরমার্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ মুক্তিলাভ করিতে পারে। ইহলোকে অপত্য ও অন্যান্য আত্মীয়গণের অত্যাচার দর্শন করিয়া কাহার না মোক্ষলাভে প্রবৃত্তি জন্মে?" নরপতি সগর বিমুক্ত মহর্ষি অরিষ্টনেমির উপদেশ শ্রবণে মোক্ষধর্মে একান্ত অনুরক্ত হইলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে একোনবিংশ অধ্যায়ে আছে, মুমূর্ষু রাজর্ষি পরীক্ষিৎকে অরিষ্টনেমি প্রমুখ আটাশ জন ঋষি দেখিতে গিয়েছিলেন।

২১ ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৬০ সকালে আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম। গত দুই দিন শনিবার ও রবিবার আমাদের ধর্মচক্রে সারদা জয়ন্তী অনুষ্ঠিত

হয়েছে। আজ সকালে চা খেয়ে লেখাপড়া আরম্ভ করেও বন্ধ করলাম এবং প্রায় নয়টায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে পড়লাম। একটু পরেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দেখছি, কোন দেবীতুল্যা দিব্যদেহী নারীমূর্তি আমার শয্যায় বসে আছেন, দুই হাতের চেটোর উপর চিবুক রেখে। তাঁর গায়ের রঙ সোণার মত উজ্জ্বল, সোণালী গরদের কাপড় পরা, মাথায় জটা ও কাপড়, মাথার জটা পায়ের তলা পর্য্যন্ত ঝুলছে, দুই হাতে বালার পরিবর্ত্তে চন্দন কাঠের মালা। তিনি কন্যাবৎ স্নেহঝরা সৌম্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিলেন। অবিলম্বে নীচতলা থেকে ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরীকে ডাক দিয়ে আনলাম। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বললেন, ইনি রামায়ণোক্ত মহর্ষি মাতঙ্গের শিষ্যা শবরী। তাঁর সাথে সিদ্ধগুরু মাতঙ্গও এসেছেন। মাতঙ্গ মধ্যমাকৃতি, কপালে লাল চন্দনের টিপ, নেড়া মাথা, জ্যোতির্ময় দিব্যমূর্তি। আমার তাকিয়ার উপরে স্নেহের গোপালজী দাঁড়িয়েছিলেন। মেজেতে তৎপার্শ্বে বিষ্ণুদূত লাঠি হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। গোপালজী বিষ্ণুদূতের লাঠি ধরে খাটেই দাঁড়িয়েছিলেন। তৎপার্শ্বে রাম, লক্ষ্মণ ও মহাবীর। আমি ভক্তিভরে ভগবান রামচন্দ্রকে প্রণাম করলাম এবং মন্দিরে যেতে প্রার্থনা জানালাম। তখন তাঁরা সকলে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। শবরী স্বর্গের সপ্তস্তরে বাস করেন ও ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্ত যেতে পারেন। আমি ও মহাগৌরী বেলা এগারটায় মন্দিরে ঠাকুরপূজায় বসলাম এবং ঠাকুরকে অন্নভোগ দিলাম। পূজাকালে ভগবান রামচন্দ্র, মহর্ষি মাতঙ্গ প্রভৃতিকে ভক্তিপূত পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হলো। নৈবেদ্য নিবেদিত হলে অনেক দেবতা এলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ গোপালকে অল্প সন্দেশ দিতে গোপাল মহাগৌরীর দিকে তাকিয়ে ইসারায় বল্লেন, মা, আমাকে বেশী মিষ্টি দিতে বল। ইহাতে মহাগৌরী অস্বীকৃতা হওয়ায় গোপালজী বাম হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে আবদার জানালেন, আমি যা নিয়েছি, তা ছাড়া একটা বেশী সন্দেশ নেবো। মহাগৌরী তাঁর কথা গ্রাহ্য না করায় একজন সূক্ষ্মদেহী

গোপালভক্ত এক বাঁক বা দুই ঝুড়ি দিব্য সন্দেশ এনে গোপালের সম্মুখে রাখলেন। তখন গোপালজী মহাগৌরীর মুখের দিকে চাইলেন, কিন্তু উক্ত দুই ঝুড়ি থেকে একটীও সন্দেশ নিলেন না। ঐ ভক্ত ঝুড়ির ঢাকা খুলে হাত জোড় করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু লীলাপ্রিয় গোপালজী সেদিকে ফিরেও দেখলেন না। মহাগৌরী তাঁকে সন্দেশ না দেওয়ায় তিনি রাগ করে সন্দেশ খেলেন না; আর দেখালেন, তাঁর ইঙ্গিতে কত সন্দেশ আসে। অন্নভোগের সময় ভগবান রামচন্দ্র এলেন বশিষ্ঠাদি অষ্ট ঋষি সহ। সেই ঋষিদের চার দিক ও মধ্য থেকে অগ্নিশিখাবৎ ব্রহ্মজ্যোতিঃ উঠছে। তাঁরা এসে রামচন্দ্রকে জোড় হাত করে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধাভক্তি জানালেন। বশিষ্ঠের কপালে ও বুকে সাদা ও লাল চন্দনের রেখা টানা। তাঁর গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, মাথায় রুক্ষ শুভ্র কেশ, গোঁফ দাড়ি আছে। প্রথম বারেই আমি তাঁকে প্রণাম করতে দুই হাত প্রসারিত করে তিনি আমার প্রণাম গ্রহণ করলেন। সমবেত দেবগণ ও ঋষিবৃন্দকে ঘিরে কিন্নরীগণ ও অপ্সরাগণ পরস্পর হাত ধরে নাচতে লাগলেন ও আনন্দ প্রকাশ করলেন। তাঁদের মধ্যে সূর্য্যদেব দাঁড়িয়েছিলেন অস্তপ্রদত্ত অর্ঘ্যের জবা ফুলটী মাথায় নিয়ে। যেদিন আমি ঠাকুরপূজা করি, সেদিন ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে সূর্য্যকেও অর্ঘ্য দিয়ে থাকি।

আজও আমি সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান ও সূর্য্যপ্রণাম করেছিলাম। তখন লংকায় রাম-রাবণের যুদ্ধশেষ পুনরাবৃত্ত হলো। বোধ হয়, ত্রেতাযুগে অস্ত দিনেই শ্রীরাম লংকার যুদ্ধ শেষ করেছিলেন। ঠাকুরের দ্বাদশ পার্ষদ, শিব, দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, বগলা, মঙ্গলগ্রহ, কল্কি ও পদ্মা, জগদ্ধাত্রী, গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী, ব্যাস, আমার ইহজন্মের গুরুদেব মহাপুরুষজী ও পূর্বজন্মের গুরুদেব পরমানন্দ গিরি পরমহংস, গোপাল, দুই কাল ভৈরব, বিষ্ণুদূত, শুক-শারী প্রভৃতি প্রসাদ নিলেন। যতক্ষণ ভগবান রামচন্দ্র ছিলেন, ততক্ষণ ঠাকুরের দ্বাদশ পার্ষদ একত্রে হাত জোড় করে এক

পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রীমা, ঠাকুর ও শিব তিনজন সমবেত মুনি ঋষিগণকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করলেন। ঋষি বশিষ্ঠ শিবভক্ত বলে শিব স্বয়ং তাঁকে প্রসাদ দিলেন। অন্নভোগান্তে আমি সকলকে প্রণাম করতে বশিষ্ঠ সামনে এগিয়ে এসে দুই হাত আমার মাথার উপর রেখে আশীর্বাদ করলেন। সন্ধ্যায় মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আমি গঙ্গার দিকে বেড়াতে গেলাম। তখন গোপালজী আমার মাথায় চড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাই কালভৈরব আমাদের সঙ্গে রক্ষকরূপে গিয়েছিলেন। সান্ধ্য ভ্রমণান্তে ফিরে এসে আমি, মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া নাটমন্দিরে বসে বিশ্রাম করছি। তখন স্বামী ভৈরবানন্দ এসে বসলেন ও তত্ত্বকথা বললেন। সেই সময় ব্যাসদেব এসে ভৈরবানন্দের পাশে দাঁড়ালেন। যখন যেখানে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তত্ত্বকথা বলেন, তখন তথায় ব্যাসদেব এসে তাঁকে দিব্যপ্রেরণা দেন এবং ভাব ও ভাষা জোগান। কৃষ্ণজন্মের একশত বর্ষ পূর্বে ব্যাস আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণের পরে ৮৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরদেহে একশত কুড়ি বৎসর বিরাজ করেন। আর ব্যাসদেব এক হাজার বৎসর জীবিত ছিলেন। দ্বাপর যুগে মানুষের আয়ু দুই শত বর্ষ, সত্যযুগে চারি শত বর্ষ ও ত্রেতাযুগে তিন শত বর্ষ এবং কলিযুগে এক শত বর্ষ। দেবী ভাগবতে চতুর্থ বা পঞ্চম স্কন্ধে এবং বিষ্ণুপুরাণে ব্যাসের বিস্তৃত কাহিনী পাওয়া যায়।

রামায়ণে আছে, শবরী, অগস্ত্য, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। শবরী স্বর্গের সপ্তস্তরে বাস করলেন। যিনি স্বর্গের সপ্তস্তরে থাকেন, ব্রহ্মার লোক পর্যন্ত তাঁর গতি হয়। শিব পুরাণে ব্রহ্মাদি দেবগণের গতিবিধির কথা আছে। স্থূলদেহে ব্রহ্মাও হাঁসে চড়ে সত্যলোকের উপরে উঠতে পারলেন না, বিষ্ণুও গরুড়ে চড়ে স্বাধিষ্ঠানের নীচে নামতে পারলেন না। উভয়ে শিবলিঙ্গের অন্ত পেলেন না। পিতৃলোকের সপ্তস্তরের অধিবাসী স্বর্গের সপ্তস্তর পর্যন্ত যেতে

পারেন, কিন্তু তথায় স্থিতিলাভ করতে পারেন না। মহাভারতে আছে, যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। সশরীরে স্বর্গগমনের অর্থ, স্থূলদেহী মানুষ রক্তমাংসাদি সপ্তধাতুনির্মিত শরীর নিয়ে স্বর্গে ওঠে। স্বর্গলোকে যেতে হলে সূর্য্যলোক দিয়ে যেতে হয়। সূর্য্যলোকে স্থূলদেহ সৌর তেজে ভস্মীভূত হয়, যেমন বৈদ্যুতিক অগ্নিযোগে বৈজ্ঞানিক শবদাহ হয়ে থাকে। স্বর্গলোকে লিঙ্গশরীরই যায়, স্থূলদেহ যায় না। পৃথিবীর মানুষ দেখে, তিনি সশরীরে স্বর্গে গেলেন। স্থূলদেহী চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত যেতে পারেন। বিগত পূর্ণিমা রজনীতে সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ সূক্ষ্মদেহে চন্দ্রলোকে গিয়েছিলেন। তিনি তথায় গিয়ে দেখলেন, চন্দ্রলোক আকারে পৃথিবীর অর্ধেকপ্রায়। তিনি বলেন, "চন্দ্রলোকের অধিবাসীদের মুখ ঘোড়ার মত, লম্বা পাঁচ ছয় হাত, সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান ও দুগ্ধধবল বর্ণ। সেখানে ঘরবাড়ীও আছে। যদি যোগী আটচল্লিশ ঘণ্টা হৃৎপদ্মে মন ও প্রাণাদি পঞ্চবায়ু ধারণ করতে পারেন, তাহলে তিনি বায়ুযানে বিনা বাহনে স্থূল দেহেই চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত যেতে পারেন।" বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও পূর্ণচন্দ্র চন্দ্র তিন জন স্থূলদেহে চন্দ্রলোক যাত্রা করেছিলেন। তন্মধ্যে পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রলোকের সমীপবর্তী হয়েছিলেন; কিন্তু উক্ত লোক স্পর্শ করতে পারেন নি। অন্য দুইজন মধ্য পথ থেকে ফিরে এলেন। ঐ তিনজন যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁদের গায়ের রক্ত ঘাসের মত নীলবর্ণ ও শরীর ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁরা পানীয় খাদ্য ব্যতীত কিছুই খেতে পারতেন না।

১৭ই মে বুধবার সন্ধ্যার পূর্বে আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে পশ্চিমাকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্য্যমন্ত্র জপ করছিলাম। এমন সময় একটী বৃহৎকায় দিব্যদেহী এসে আমার সামনে শূন্যে বসলেন। তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির থেকে বেরিয়ে আমার পেছনে ও সুভদ্রা আমার বাম পাশে এসে দাঁড়ালেন। ভগবান কল্কিদেব মন্দিরের দরজায় এগিয়ে এসে মহাগৌরীর বাম দিকে বিরাজ করলেন। নবাগত দিব্যদেহীকে

আমি প্রণাম করতেই তিনি 'বাবা' বলে মায়ের মত দুই হাত বাড়িয়ে আমার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তখন ক্ষুদ্রাকৃতি দিব্যদেহী (দেড় হাত উচ্চ, মাথায় খোঁচ খোঁচা পাকা চুল তিন ইঞ্চি লম্বা, সাদা এক টুক্‌রা কাপড় পরা) আমার বাম ও ডান দিকে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে নাচছিলেন। সেই বিরাট পুরুষ নিজ গলা থেকে শ্বেতবর্ণ পুষ্পমাল্য নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর একটী গাঁদা ফুলের মালাও শেষে শুক্‌নো শেফালী ফুলের মালা—মোট তিন মালা আমার গলায় দিয়ে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। যাবার পূর্বে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বললেন। সর্বপ্রথম আমি কল্কিজন্মোৎসব করেছি বলে তিনি পরমাত্মালোক থেকে নেমেছিলেন আমাকে স্নেহসিক্ত আশীর্বাদ করতে। মোটা ভ্রূর নীচে তাঁর চোখ দুটী ডাবের মতো বড়, তীক্ষ্ণ নাসা, আধ হাত চওড়া কপাল, মাথায় খাড়া খাড়া সাদা চুল ওলটান ও কাঁধ পর্যান্ত ঝুলছে, গায়ের রঙ বিদ্যুৎবর্ণ ও হাতের চেটোগুলি লাল্‌চে, লম্বা দশ হাত, চারটি লোকের সমান মোটা। যদিও তিনি পুরুষ, তথাপি তাঁর স্তনদ্বয় নারীস্তনবৎ হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বমান, হাতের আঙ্গুলগুলি মর্তমান কলার মত মোটা। তিনি মহাগৌরীর দিকেও স্নেহভরে দৃষ্টিপাত করলেন। ২১ মে রবিবার সকালে স্বামী ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে এলেন। তাঁকে গত বুধবার সন্ধ্যায় আগত বৃহৎকায় সিদ্ধঋষির কথা বলতে তিনি তাঁকে আহ্বান করলেন। উক্ত ঋষি এসে নাটমন্দিরের ছাদে বসলেন। তাঁর নাম চ্যবন ঋষি, ঋগ্বেদে তাঁর কথা পড়েছি। তিনি ভৃগুপুত্র ও ব্রহ্মার পৌত্রও সত্যযুগের প্রারম্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি নাটমন্দিরের অর্ধেক ছাদ জুড়ে বসলেন—তাঁর বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত ও তাঁর মাথা আমাদের পাঁচ ছয়টী মাথার সমান। আজ তাঁকে বার হাত দীর্ঘ দেখা গেল। ইহাই তাঁর পূর্ণ মূর্তি। তিনি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মর্ষি ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণ। আপনি কেন এসেছিলেন? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি ভৈরবানন্দকে বললেন, "এই মুমুক্ষু সাধকের সাধনে বিশুদ্ধচক্রের

উপর থেকে শেষ পর্য্যন্ত পথ খোলার জন্য তার মাথায় স্নেহভরে হাত বুলিয়েছি।" আমার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে তিনি এই কথা বললেন।

১৮ মে বৃহস্পতিবার রাত্রি দশটায় আহারান্তে আমি ও মহাগৌরী যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তর বারান্দায় স্ব স্ব শয্যায় শুয়েছি। আমি চোখ বুজে ঘুমাবার চেষ্টা করছি ও আমার তাকিয়া বাম দিকে দেওয়ালে ঠেকান আছে। ঠিক সেই সময়ে দেখলাম, এক শুভ্র সৌম্য ঋষি ব্রহ্মলোক থেকে নেমে আমার তাকিয়ার উপরে বসেছেন ও আমার দিকে স্নেহভরে চেয়ে আছেন। তাঁকে দেখেই আমি মহাগৌরীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে ও কেন এসেছেন? মহাগৌরী স্বীয় শয্যায় শুয়ে দিব্য চক্ষুতে দেখে বললেন, ইনি কোন দিব্যমূর্তি সিদ্ধ ঋষি। আমি তাঁকে প্রণাম করে মন্দিরে যেতে বললাম, কিন্তু তিনি আমার তাকিয়া ছেড়ে উঠলেন না—দুই হাতে আমার গলা থেকে ব্রহ্মতালু অবধি দুই তিন বার স্নেহভরে হাত বুলাইলেন। অনন্তর আমাদের উভয়ের অনুরোধে তিনি মন্দিরে গেলেন এবং কল্কি প্রমুখ দেবগণকে হাত জোড় করে প্রণামপূর্বক মন্দিরস্থ মদীয় আসনে বসলেন। ইনি শুভ্রবস্ত্র পরিহিত, শ্বেতকেশযুক্ত, বয়োবৃদ্ধ ও শুভ্রবর্ণ। ২১ মে রবিবার সকালে সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দের আহ্বানে তিনি এলেন ও মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন, আমার নাম উদ্দালকপুত্র আরুণি। পুনরায় ভৈরবানন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন এসেছিলেন? ইহার উত্তর তিনি প্রথমে দিতে চান নি। আবার অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি দয়া করে পুনরায় আমার গলা থেকে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত হাত বুলিয়ে ইংগিতে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানালেন। তাঁর পূত স্পর্শে তদীয় আগমনের উদ্দেশ্য আমি তখনই অদূরে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম। অনন্তর তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করতে তিনি অন্তর্হিত হলেন। আরুণিকৃত আরুণেয় উপনিষৎ প্রচলিত। অনেক বৈদিক উপনিষদে আরুণির উপাখ্যান উল্লিখিত।

১৬ই মে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় আমি কুয়াতলায় বাথ টবে বসে হিপ বাথ নিতেছিলাম। মহাগৌরী আহৃত পদে দোতলার চাতালে বসে-ছিলেন। এমন সময় স্নেহের কন্যা সুভদ্রা এসে আমার ডান দিকে দাঁড়ালেন। অনন্তর তাঁর পার্শ্বে একটী সিদ্ধ ঋষিকে দেখা গেল। উক্ত ঋষির মূর্তি অতি শুভ্র, মাথায় লম্বা জটা, লম্বা দাড়ি নাভি পর্যন্ত দোদুল্য-মান, জটা ও দাড়ি সোনালী ও রুক্ষ, সাদা কাপড় পরা। আমি তাঁকে সত্বর সভক্তি প্রণাম করে মন্দিরে যেতে বললাম। সুভদ্রা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে গেলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্যই সুভদ্রা নীচে গিয়েছিলেন। উক্ত ঋষি মন্দিরে আসতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আমার পূজাসনে বসতে বললেন। তিনি আমার আসনে বসে কল্কি প্রমুখ দেবগণকে হাত জোড় করে শ্রদ্ধা জানালেন। তৎপরে তিনি মহামুনি ব্যাসদেবের সঙ্গে আলাপ করে চলে গেলেন। ২১ মে রবিবার সকালে তিনি সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দের আহ্বানে এসে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় দাঁড়ালেন এবং তাঁর নাম লিখে দেখালেন—বিভাণ্ডক। কি জন্য এসেছিলেন—জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে দেখিয়ে বললেন, এর আসন শুদ্ধ ও সিদ্ধ করতে এসেছিলাম। আমরা সভক্তি প্রণাম করতেই তিনি অন্তর্হিত হলেন। মহাভারতে আছে, শরশয্যাগত ভীষ্মদেবকে দেখতে অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে বিভাণ্ডক গিয়েছিলেন।

২৫ মে বৃহস্পতিবার সকালে মহাগৌরী আমাকে বললেন, "গত রাত্রে ঋষি বিভাণ্ডক এসেছিলেন মা কালীর সঙ্গে। মা কালী ছদ্মবেশে ছিলেন এলোকেশী কাল বধূর মূর্তিতে। ঐ ঋষি দক্ষিণ বারান্দায় আপনার শিয়রে গিয়ে আপনার সূক্ষ্মদেহকে টেনে নিয়ে মন্দিরে গেলেন ও আপনার শুদ্ধাসনে আপনাকে বসিয়ে আপনার পাশে বসলেন এবং মা কালী আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে রইলেন। আপনি ব্রহ্মমন্ত্র জপে ডুবে গেলেন। জপশেষে আপনিও মা কালী বিভাণ্ডক ঋষিকে বললেন—চলুন, মহাগৌরীর পা

কেমন আছে দেখে আসি।" অনন্তর ঋষি বিভাণ্ডক মহাগৌরীর আহত পদের বুড়ো আঙ্গুল ধরে এমন টানলেন যে, মহাগৌরী ব্যথা পেলেন ও চীৎকার করে উঠে বসলেন। তখন বিভাণ্ডক বুড়ো আঙ্গুল ছেড়ে দিলেন। সেই সময় আমি ও মা কালী একটু আড়ালে ছিলাম। জানা গেল, সম্প্রতি সমাগত ঋষিত্রয় চ্যবন, আরুণি ও বিভাণ্ডক আমার ইষ্টদেবী কালীর নির্দ্দেশে এসেছিলেন মোক্ষসাধনে আমাকে অপূর্ব প্রেরণা দানার্থ।

২৪ মে বুধবার ভোর চারটায় মথুরানাথ বিশ্বাস (দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীর প্রতিষ্ঠাত্রী রাসমণির জামাতা) এলেন ও মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি তাঁকে চিনতে না পেরে কিছু বলি নি। সকাল সাড়ে পাঁচটায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম। তখন আবার মথুরানাথ বিশ্বাস এসে দাঁড়ালেন, 'রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে' তাঁর যেরূপ ছবি আছে, ঠিক তদ্রূপ মূর্তিতে। তাঁর মাথায় বিস্তৃত গোল টুপিও সাদা চাপকান পরা, গৌরবর্ণ সুপুরুষ। আমি ও মহাগৌরী তাঁকে চিনতে পেরে যুক্ত করে মন্দিরে যেতে অনুরোধ করলাম। তিনি মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে তাঁর সম্মুখে বসলেন ও কথা বললেন ও কিছুক্ষণ পরে চলে গেলেন। মনে পড়ে, গত বৎসর সম্ভবতঃ এই সময় তিনি এই মন্দিরে এসেছিলেন। তিনি স্বর্গলোকের সত্ত্বস্তরবাসী।

আজ সকালে মহাগৌরী মহাভারতের বনপর্বে বিভাণ্ডক, চ্যবন ও অগস্ত্য ঋষিত্রয়ের উপাখ্যান পড়লেন এবং অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রাকে দেখতে চাইলেন। বেলা সাড়ে দশটায় আমি ও মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় বসে আছি—মহাগৌরী স্বীয় শয্যায় ও আমি পার্শ্বস্থ টুলে। তখন আমি দেখলাম, পশ্চিম বারান্দার উত্তর কোণে দিব্যদেহী নারী মাতৃ মূর্তিতে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে আমি মহাগৌরীকে তাঁর কথা বললাম। মহাগৌরী তাঁকে দেখে বললেন, ইনি অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা। তিনি খুব সুন্দরী, মাথায় কাপড়, সাদা সাড়ী পরা, গায়ের রঙ পাকা

সোণার মত, কোন অলংকার নেই, মাথা ছাদে ঠেকেছে। আমি তাঁকে প্রণাম করতে তিনি হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করলেন ও আমার অনুরোধে মন্দিরে গেলেন। তিনি মন্দিরে গিয়ে আমার আসনে বসলেন। তখন মন্দিরস্থ দেবগণ তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। সুভদ্রা, পদ্মা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সারদা প্রভৃতি তাঁকে ঘিরে বসলেন। মন্দিরে প্রায় এক ঘণ্টা থেকে তিনি চলে গেলেন। যাবার সময় সুভদ্রা বারান্দায় এসে তাঁকে বিদায় দিলেন।

২৫ মে বৃহস্পতিবার মহাগৌরীর মনে আকাংক্ষা হয়েছিল, দেবগুরু বৃহস্পতিকে দেখবেন। আজ পূর্বাহ্নে বিষ্ণুপুরাণ পাঠকালেও সেই চিন্তা তাঁর মনে চলছিল। আজ অসহ্য গরম পড়েছিল বলে আমি ও মহাগৌরী আহারান্তে নীচে গিয়ে একতলায় লাইব্রেরী ঘরে মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করলাম—মহাগৌরী বড় খাটের উপর ও আমি মেজেতে মাদুর পেতে শুয়েছি। বেলা দুইটায় আমি দেখলাম, একটী দীর্ঘকায় দিব্যদেহী আমাদের কক্ষমধ্যে দণ্ডায়মান। তাঁর মাথা ছাদে ঠেকেছে, দাড়ি বুক পর্য্যন্ত ঝুলছে ও গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, মাথায় জটাজাল পাগড়ীর মত করে জড়ান। আমি তাঁর কথা মহাগৌরীকে বলতে মহাগৌরী তাঁকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখে বললেন, ইনি কনভসন্নিভ দেবগুরু বৃহস্পতি ও অঙ্গিরাপুত্র। তিনি মহাগৌরীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন ও আমি ভক্তিভরে প্রণাম করতে তিনি তাঁর ডান পদ আমার মাথায় রাখলেন। মহাগৌরী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জন্য এসেছেন? তিনি হেসে বললেন, তোমাদিগকে দেখতে এসেছি। আমরা তাঁকে আমাদের মন্দিরে যেতে বলায় তিনি হাত নেড়ে মন্দিরে আসতে অসম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন। তিনি মাত্র দুই তিন মিনিট কক্ষমধ্যে ছিলেন। বৃহস্পতিবার আমাদিগকে দেবগুরু বৃহস্পতি দয়া করে দর্শন দিলেন।

এই ঘটনার পর আমি চোখ খুলে শুয়ে আছি। এমন সময় দেখলাম, ভৈরবানন্দ সূক্ষ্ম দেহে এসে আমাকে নমস্কার করে দাঁড়ালেন।

আমি প্রেমভরে অভ্যর্থনা করে তাঁকে মহাগৌরীর কাছে খাটে বসতে বললাম। তদনুসারে তিনি খাটে বসে মহাগৌরীর দিকে স্নেহভরে তাকালেন। তাঁর মাথার ঝুঁটিতে সাদা রুদ্রাক্ষ মালা জড়ান ছিল। এই দিব্যমালা তাঁকে শিব ঠাকুর কৈলাসে দিয়েছিলেন। একটু পরেই তিনি চলে গেলেন। যাবার সময় আমাকে প্রণাম করতে ভুলে গিয়েছিলেন বলে কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার ফিরে এলেন ও আমাকে নমস্কার করে চলে গেলেন। পূর্ব রাত্রের মধ্যভাগে তিনি মহাগৌরীর কাছে এসে সূক্ষ্ম দেহে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন।

আজ রাত্রি দশটার পরে আহারান্তে আমি দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় খাটে শুয়েছি এবং মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় শুয়েছেন। এমন সময় এলেন দৈত্যবৈদ্য বিভাণ্ডক। তিনি পূর্বদিন দুপুরে এসেছিলেন। আজ এসে তিনি আমার দুই চোখে দৈব ঔষধ প্রয়োগান্তে অল্পক্ষণ থেকে চলে গেলেন। বিভাণ্ডক শুক্রাচার্য্যের শিষ্য ও শিবলোকবাসী। রাত্রি দেড়টায় দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এসে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আমার দুই চক্ষু দেখলেন এবং প্রায় সাত মিনিট রইলেন। তারপর তিনি মহাগৌরীর কাছে গেলেন। মহাগৌরী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি শুক্রাচার্য্য। তিনি মহাগৌরীর কাছে প্রায় তিন মিনিট দাঁড়িয়ে স্বস্থানে চলে গেলেন। আমি দেখলাম, তিনি শীর্ণকায়, দীর্ঘদেহ, দুই চক্ষু তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল। মনে হল, তিনি আমার চক্ষুদ্বয়ে দিব্য ঔষধ দিলেন এবং আমার চক্ষুচিকিৎসা করতে এসেছিলেন। তাঁর শিষ্য সূর্য্যোপাসক বিভাণ্ডক আমাকে ও মহাগৌরীকে চিকিৎসা করছেন বলে তিনি আমাদিগকে দেখতে এসেছিলেন। মহাভারতের শান্তি পর্বের মোক্ষধর্ম পর্বে নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে শুক্রাচার্য্যের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে এই আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরে ভীষ্মদেব ভার্গবের শুক্রত্ব ও ঐশ্বর্য্য লাভ ও নভোমণ্ডলের মধ্যস্থলে

গমনের অক্ষমতা কীর্তন করেন। মহামুনি শুক্রাচার্য্য ভৃগুবংশসম্ভূত এবং বিষ্ণুকৃত স্বীয় মাতৃবধ নিবন্ধন দেবতাদের নিতান্ত বিদ্বেষ্টা হন। যক্ষরক্ষাধিপ কুবের ইন্দ্রদেবের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। শুক্রাচার্য্য যোগ-বলে কুবেরের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করেন। এইরূপে ধনপতি কুবের হৃতসর্বস্ব হইয়া একান্ত ব্যাকুলিত চিত্তে রুদ্রদেবের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। মহাযোগী মহেশ্বর কুবেরের নিঃস্বতার কাহিনী শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শূল লইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, দুরাত্মা ভার্গব কোথায়? ঐ সময় শুক্রাচার্য্য স্বীয় উগ্র তপোবলে দূর হইতে যোগীশ্বরের রোষ ও অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহার শূলাগ্রভাগে আসিয়া বসিলেন। তখন শিব ভার্গবকে শূলাগ্রে অবস্থিত দেখিয়া পিণাকের ন্যায় শূলাগ্র সন্নমিত ও শুক্রাচার্য্যকে হস্তগত করিলেন। অবিলম্বে পিণাকী মুখ ব্যাদানপূর্বক অবিলম্বে তাঁকে গ্রাস করিলেন। শুক্রাচার্য্য রুদ্রোদরে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে কৈলাসপতি শুক্রাচার্য্যকে জঠরস্থ করিয়া মহাহ্রদের সলিলমধ্যে প্রবেশপূর্বক বৃক্ষবৎ নিশ্চল ভাবে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিলেন। তখন শুক্রাচার্য্য উদ্বিগ্ন অন্তরে শিবের জঠর হইতে বিনির্গত হইবার জন্য বারংবার শিবস্তব করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইলেন না। পরিশেষে তিনি পুনঃপুনঃ মহেশ্বরকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, "ভগবন্, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন। আর আমি কষ্ট সহ্য করিতে পারি না।" তখন শূলপাণি সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভার্গবকে বলিলেন, তুমি আমার শিশ্নদ্বার দিয়া বহির্গত হও। ইহাতে ভার্গব শিবের শিশ্নদ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন। মহর্ষি ভার্গব শিবের উপস্থ-দ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া শুক্র নামে বিখ্যাত হন। শিবরোষে পড়িবার ভয়ে তিনি কখনও আকাশের মধ্যস্থলে গমন করেন না। মহাভারতে আছে, একদা এক কোটী ঋষি কোন পর্বতে একত্রে

বসিয়া রুদ্রধ্যান করিতেছিলেন। প্রত্যেক ঋষি ভাবিতেছিলেন, আমিই অগ্রে রুদ্রকে দেখবো। তখন রুদ্রদেব এক কোটী মূর্তি ধরে প্রত্যেক ঋষিকে দেখা দিলেন। ঋষিবৃন্দ রুদ্রদর্শনে আহ্লাদিত হইলেন ও প্রত্যেকে ভাবিলেন, আমিই রুদ্রকে অগ্রে দেখেছি।

২২ মে সোমবার সন্ধ্যায় আমি মন্দিরে বসে সূর্য্যমন্ত্র জপ করছি এবং ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী পশ্চিম বারান্দায় বসে ধর্মালাপ করছেন। এমন সময় আমি দেখলাম, মন্দিরে আমার সম্মুখে এক দেবী দণ্ডায়মানা। তাঁর মাথার পেছনে জ্যোতির্মণ্ডল। তিনি শুভ্রতম মাতৃমূর্তি ও তাঁর মাথায় কাপড়। আমি মহাগৌরীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তখন ভৈরবানন্দ দিব্য চক্ষুতে তাঁকে দেখে উত্তর দিলেন, "ইনি দিবাকরের পত্নী সন্ধ্যা দেবী। ত্রিসন্ধ্যায় ইনি সাধক বা সাধিকার জপকালে আবির্ভূত হন। গায়ত্রী সূর্য্যের সত্ত্বঃশক্তি ও সন্ধ্যা রজঃশক্তি এবং দিবাকরও সূর্য্যমূর্তি।" মহাভারতে আস্তিক পর্বে আছে, সিদ্ধ মুনি জরৎকারু সন্ধ্যা দেবীকে এই অভিশাপ দেন—ত্রিসন্ধ্যায় যখন সাধক বা সাধিকা গায়ত্র্যাদি মন্ত্রজপ করবে, তখন তুমি সেখানে আবির্ভূত হবে এবং রাত্রির প্রথম প্রহর বা নয়টা পর্য্যন্ত সন্ধ্যাকাল বলে পরিগণিত হবে। আস্তিক পুরাণ বা মনসা পুরাণেও এই উপাখ্যান বিবৃত। জরৎকারু শত বর্ষ তপস্যা করে ত্রিভুবনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি বিবাহাদি করেন নি। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক স্থানে এসে দেখলেন, একটী বেণা গাছের শাখা ধরে কয়েকটী ঋষি ঝুলছেন, এবং ইঁদুর বা কাঠবেড়ালি সেই গাছের গোড়া কেটে ফেলছে। ঐ শাখার নীচে গভীর গর্ত। তা দেখে জরৎকারু দোদুল্যমান ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে ও কিজন্যই বা এরূপ শাখায় ঝুলছেন! ঋষিগণ উত্তর দিলেন, "আমরা জরৎকারুর পিতৃপুরুষ। জরৎকারু অবিবাহিত বলে আমাদের কোন বংশধর নাই, যে পিতৃপুরুষগণকে পিণ্ডদান করতে পারে।" তখন জরৎ-

ক'ক্ষ আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, "আমি বিবাহ করে পুত্রলাভপূর্বক আপনাদিগকে পুৎনামক নরক থেকে ত্রাণ করবো।" এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি অঙ্গীকার করলেন, আমি স্বনামের কন্যাকে বিবাহ করবো। অনন্তর তিনি নাগকন্যা মনসাকে বিবাহ করেন।

একদিন জরৎকারু স্বপত্নী মনসার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সন্ধ্যা সমাগতা দেখে সূর্য্য অস্ত গেলেন। তখন মনসা তাঁকে ডাকলেন। তিনি ঘুম থেকে উঠে সূর্য্যকে অভিশাপ দিতে যাচ্ছেন। দেবতারা এসে সূর্য্যদেবকে জরৎকারুর অভিশাপ থেকে বাঁচালেন। তখন জরৎকারু সন্ধ্যাকে পূর্বোক্ত অভিশাপ দিলেন। অদ্য সোমবার রাত্রি আটটায় জরৎকারু মুনিকে মহাগৌরী দেখলেন। তিনি এসে মহাগৌরীর মাথার কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথা মন্দিরের ছাদে লেগেছে ও পা মেজেতে ঠেকেছে। তিনি সত্যযুগের তপঃশীর্ণ সিদ্ধ ঋষি, তাঁর মাথায় লম্বা জটা, মুখ সরু, রঙ ফর্সা, সাদা কাপড় পরা, চোখ খুব সুন্দর, কপোলদ্বয় সংকুচিত, কপাল ছোট। তিনি প্রীতিভরে মহাগৌরীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। জরৎকারুর পুত্র আস্তিক মুনিই রাজা পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় কর্তৃক অনুষ্ঠীয়মান সর্পযজ্ঞ বন্ধ করে সর্পকুল রক্ষা করেন।

২১ মে রবিবার সকাল নয়টায় আমাদের ট্রাস্ট বোর্ডের উনত্রিংশ অধিবেশন হচ্ছিল। মহাগৌরী, ভৈরবানন্দ, শিবপ্রিয়া প্রভৃতি উপস্থিত হয়েছেন এবং তৃতীয় বার্ষিক গঙ্গোৎসবের আলোচনা চলছে। এমন সময় আমি দেখলাম, আমার সম্মুখে এক দেবী আবির্ভূতা। তাঁর মাথার চুল খোলা, গায়ে নানা অলংকার, কিন্তু মাথায় মুকুট নাই। তিনি গৌরবর্ণা, হাস্যমুখী ও অল্পবয়স্কা। আমি তাঁর কথা মহাগৌরীকে বলায় ভৈরবানন্দ তাঁকে দেখে বললেন, ইনি দেবী গঙ্গার সখি বিজয়া ও আমাদের সংকল্পিত গঙ্গাপূজার আয়োজনে প্রেরণা দিতে এসেছেন।

আজ দুপুরে মন্দিরে পূজাকালে আমি যখন সূর্য্যমন্ত্র জপ করছিলাম, তখন স্বয়ং গঙ্গাদেবী, মাতঙ্গী ও সংজ্ঞাদি দেবী আমার সম্মুখে এলেন। তন্মধ্যে গঙ্গাদেবী সর্বাগ্রণী ছিলেন। বৈকালে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে নানা কথা আলোচনা করছিলাম। আমি বারান্দার দক্ষিণে ও তাঁরা উভয়ে উত্তর দিকে ছিলেন। এমন সময় এক বৈষ্ণব সাধক সূক্ষ্মদেহী বারান্দায় এলেন। তিনি খুব ফর্সা, মাথায় টিকি, গলায় তুলসী মালা ও কপালে বৈষ্ণব তিলক। ভৈরবানন্দ তাঁকে দেখে বললেন, ইনি বিদেহ মুক্তিমার্গের বৈষ্ণব সাধক। একটু পরে আমি দেখলাম, উক্ত বৈষ্ণব সাধকের অদূরে একটী বিচিত্র পোষাক পরা দেবী মূর্তি এলেন। তিনি অতি সুন্দরী, গায়ে বেশী অলংকার নাই, বাম কাঁধে ঝোলান ও কাল বার্ণিশ করা কাঠের বাদ্যযন্ত্রটি (অনেকটা গোপীযন্ত্রের মত) বাম হাতে ধরা ও দুই পাশে লাউযুক্ত, সামনে আঁচল দিয়ে শাড়ী পরা এবং মাথায় অল্প কাপড় হিন্দুস্থানী মেয়েদের মত। আমি তাঁকে দেখে মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই দেবী কে? ভৈরবানন্দ তাঁকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখে সত্বর জিজ্ঞাসা করায় তিনি প্রথমে নাম বলতে চাননি। পরে তিনি অনুরুদ্ধ হয়ে বললেন, "আমি আয়ান ঘোষের ভগিনী জটিলা।" অনন্তর দেখা গেল, বারান্দায় জলচৌকিতে বসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বালমূর্তিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে মুখভঙ্গী করছেন ও পা উচাচ্ছেন। তা দেখে প্রথমে জটিলা নাম বলতে চাননি বা মন্দিরে কল্কিদর্শনে গেলেন না। তিনি কিছুক্ষণ থেকে হাত জোড় করে চলে গেলেন। সম্ভবতঃ তিনি কল্কিদর্শনে এসেছিলেন, কিন্তু গোপাল দর্শনে মুস্কিলে পড়ে ফিরে গেলেন।

২৩ মে মঙ্গলবার দুপুরে সাড়ে বারোটায় আহারান্তে আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় মাদুরে শুয়ে বিশ্রাম করছি। মহাগৌরী অদূরে উপবিষ্টা। এমন সময় একটি দেবতা এলেন সম্ভবতঃ, অরুণদেব। তাঁর গায়ে সোণালী আভা, মাথায় সোণার মুকুট ও হাতে একটি চশমা। তিনি এসে

প্রথমে ঐ স্বর্গীয় চশমা আমার চোখে পরিয়ে দিলেন। তারপর সেই চশমা খুলে তুলার মত একটি দিব্য ঔষধ আমার ডান চক্ষুতে প্রয়োগ করলেন। আমি উক্ত ঔষধ-প্রয়োগ স্পষ্ট ভাবে অনুভব করলাম। তারপর তিনি পূর্বোক্ত চশমা আবার আমার চোখে লাগিয়ে দিলেন। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি চলে গেলেন। অনন্তর আমি উঠে দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুইলাম এবং মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুইলেন। তখন আর এক দিব্যদেহী চিকিৎসক বিভাণ্ডক আমার খাটের কাছে দাঁড়ালেন। তিনি আমার দুই চোখে দিব্য ঔষধ দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আমার চক্ষুর দিকে তাকাচ্ছিলেন ও ঔষধপ্রয়োগের ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন। তাঁর মাথা বেশ বড়, চোখে মোটা চশমা, মাথায় টাঁক, ভারিক্কে গম্ভীর চেহারা ও দীর্ঘকায়।

১৬ মে মঙ্গলবার দুপুরে আমি যখন দক্ষিণ বারান্দায় নিদ্রিত আছি, তখন মহাগৌরীর কাছে উত্তর বারান্দায় এক দেবী একটী কাল চশমা এনে দেখালেন। ঐ চশমার কাল ফ্রেম, কাল ঢাকনি ও কাল কাচ। পরে তিনি দূর থেকে দেখলেন, ঐ চশমা আমার চোখে ফিট করে কি না। অনন্তর তিনি সন্তর্পণে আমার চোখে চশমা পরিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে মহাগৌরী দিব্য চক্ষুতে দেখলেন, আমার চোখে সেই দিব্য চশমা লাগানো রয়েছে। ইনি অরুণপত্নী কিরণময়ী ও ঋষিকন্যা। তাঁর চেহারা মধ্যমাকৃতি, গৌর বর্ণ, অতি সুন্দর রক্তাভ মুখ, চুল খোলা, ঈষৎ রুক্ষ ভাব।

২২ মে সোমবার দুপুরে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার উত্তর দিকে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী তিন জনে বসে আলোচনা করছি, সেদিন কে আমাকে চশমা পরালেন। মহাগৌরী উক্ত দিনে দৃষ্টা দেবীর হুবহু বর্ণনা দিতেই ভৈরবানন্দ তাঁকে আহ্বান করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন এবং মহাগৌরী তাঁকে দেখেই চিনলেন ও আমাকে বললেন, ইনিই সেদিন দুপুরে এসে আপনার চোখে চশমা

পরিয়েছিলেন। উক্তা দেবী অরুণপত্নী ঋষিকন্যা কিরণময়ী। জিজ্ঞাসিতা হয়ে তিনি বললেন, "সেদিন আমিই এঁর চোখে চশমা লাগিয়েছিলাম। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, আবার ইনি চশমা নিন, ×১০০ শক্তির চশমা। তাহলে একটু ভাল দেখবেন। ঐ চশমা কলিকাতায় পাওয়া যায়। ডাক্তারের কাছ থেকে নিতে হবে।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

অরুণদেব কশ্যপপুত্র ও বিনতানন্দন। বিনতা বহু বর্ষ তপস্যা করে রজঃস্বলা স্নানান্তে স্বামী কশ্যপের কাছে সুপুত্র কামনা করেন। তখন কশ্যপ জিজ্ঞাসা করলেন, বিনতা, তুমি সহস্র বীর পুত্র নেবে? বিনতা উত্তর দিলেন, আমাকে ইন্দ্রসম একমাত্র বীরপুত্র দিন। কশ্যপ বললেন, তোমার দুটী ইন্দ্রতুল্য বীরপুত্র হবে। কশ্যপ স্বপত্নী বিনতার গর্ভাধানান্তে বনে তপস্যায় গেলেন। বিনতা শতবর্ষ গর্ভধারণপূর্বক দুটী অণ্ড প্রসব করিলেন।

দৈববাণী হল, স্বতঃই ডিম্বদ্বয় ফোটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। তদনুসারে বিনতা পাঁচ শত বর্ষ অপেক্ষা করলেন। তৎকালে কশ্যপের দ্বিতীয়া পত্নী কদ্রু, যিনি একই সময় অণ্ডপ্রসব করেছিলেন, স্বীয় অণ্ডজাত তক্ষকাদি সহস্র নাগপুত্র লাভ করলেন। তা দেখে বিনতা তাঁর পুত্র না হওয়ায় ব্যথিতা হন ও এক স্বীয় অণ্ড ভঙ্গ করেন। উক্ত অণ্ড অকালে ভগ্ন করায় স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল প্রকম্পিত হল। সেই অণ্ড থেকে উৎপন্ন বিকলাঙ্গ পুরুষ জননীকে অভিসম্পাত করলেন, "স্বপত্নীর পুত্র হওয়ায় লোভবশে তুমি অণ্ডভঙ্গ করে আমাকে বিকলাঙ্গ করলে কেন? তুমি আমার সৎমা কদ্রুর দাসীত্ব করবে পাঁচ শত বর্ষ। আরও পাঁচ শত বর্ষ পরে অন্য অণ্ড প্রস্ফুটিত হবে। উক্ত অণ্ডজাত পুত্রই তোমার দাসীত্ব মোচন করবে। তুমি অকালে অন্য অণ্ড ভগ্ন করো না।" ইহার পর অরুণ কর্তৃক অনেক অমঙ্গলকর উপদ্রব আরম্ভ হল। তখন সূর্য্য দেবতাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে লক্ষ মার্তণ্ডতেজ প্রকাশপূর্বক পৃথিবীকে ধ্বংস

করতে লাগলেন। সূর্য্যরোষের নিম্নোক্ত কারণ পাওয়া যায়। সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উৎপন্ন হয়েছিল, সেই অমৃত যখন দেবতারা ভক্ষণ করেন, তখন দানব রাহু ছদ্মবেশে দেবতাদের সহিত অমৃত ভক্ষণ করিতে বসেন। যখন রাহু গলা পর্য্যন্ত অমৃত গিলেছেন, তখন সূর্য্য ও চন্দ্র তাঁকে চিনতে পেরে বিষ্ণুকে বলেন। সেই সময় বিষ্ণু চক্র দ্বারা রাহুর গলা কেটে ফেলেন। ইহার ফলে রাহু ও কেতু উৎপন্ন হয়। মুখ থেকে গলা পর্য্যন্ত অমৃত যাওয়ায় ঐ অংশ সজীব থাকে ও বাকী অংশ ধ্বংস হয়। তাই রাহু অমর ও কেতু মর গ্রহ। এই জন্য সূর্য্য ও চন্দ্রকে এখনো রাহু শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ কালে গ্রাস করে, কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্র রাহুর গলা দিয়ে বেরিয়ে যান। ইহাতে অপমানিত হয়ে সূর্য্য উক্ত তেজ প্রকাশ করেন। প্রচণ্ড মার্তণ্ড তেজে পৃথিবী ধ্বংসপ্রায় হলে ব্রহ্মা দেবগণকে আদেশ করিলেন, কশ্যপের বিকলাঙ্গ পুত্রকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহাকে সূর্য্যতেজ হরণার্থ নিয়োজিত কর। দেবতারা বিকলাঙ্গ কশ্যপ-পুত্রকে স্তবস্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করে সূর্য্যের সম্মুখে নিয়োজিত করলেন। তখন কশ্যপতনয় সূর্য্যের অকল্যাণকর তেজোরাশি হরণ করলেন। তৎকাল থেকে তাঁর নাম হলো অরুণ। তাই আগে হয় অরুণোদয়, তৎপরে সূর্য্যোদয়। আজও পর্য্যন্ত তিনি সূর্য্যের অনিষ্টকর তেজোরাশি রোধপূর্বক অবস্থান করছেন।

২৭ মে শনিবার, ১৯৬১ দুপুরে আমি ও মহাগৌরী একতলার ঘরে আহারান্তে বিশ্রাম করছিলাম। অসহ্য গরম পড়ায় আমরা শুয়েও ছটফট করছি। একটু পরে আমার কন্যা দেবী সুভদ্রা এলেন। উঁহার আধ ঘণ্টা পরে স্বর্গীয় চিকিৎসক বিভান্ডক এসে অপথ্যালমোস্কোপ বা রেটিনোস্কোপ দিয়ে আমার দুই চোখ দেখলেন। তাঁর হাতে একটা পাত্র ছিল, সেটি পিলসুজের মত ও তার উপরে কাচের বহু নল লাগান। সেই সব নলে জলীয় ঔষধ ছিল। সেটা তিনি আমার পাশে রাখলেন ও তা থেকে

একটী নলের ঔষধ আমার চোখে দিলেন ও একটু পরে চলে গেলেন। অনন্তর এলেন তরুণপত্নী কিরণময়ী গ্রাম্য বধূর মূর্তিতে। কিরণময়ীর মাথার চুল পেছনে বাঁধা, সাদা শাড়ী পরা, শ্যামবর্ণ। তিনি আমার শিয়রে বসে আমাকে ঘুম পাড়ালেন ও ঘণ্টাখানিক থেকে চলে গেলেন। আমি অসহ্য গরমে ও বহুমূত্রজনিত গাত্রদাহে ছটফট করছিলাম, কিন্তু তাঁর সুশীতল সান্নিধ্যে অচিরে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার পরে তিনি মহাগৌরীকেও ঘুম পাড়িয়েছিলেন এবং মহাগৌরী প্রায় দুই ঘণ্টা এমন সুনিদ্রা ভোগ করলেন যে, গত পনের দিবস বাম পায়ের গোড়ালী মচকানর পর থেকে তাঁর এমন সুনিদ্রা হয়নি। ঋষিকন্যা কিরণময়ী এক ঘণ্টা থেকে চলে গেলেন।

ঐদিন (শনিবার) সন্ধ্যায় আমি কুয়াতলায় বাথ টবে হিপ বাথ নিতে নিতে গঙ্গাস্তোত্র, গঙ্গাধ্যান, গঙ্গাসঙ্গীত ও গঙ্গানামজপাদি করিতেছিলাম এবং বলিতেছিলাম, মা গঙ্গা, তিন সপ্তাহাধিক পরে দশহরা দিবসে এসে আমাদের মৃণ্ময়ী প্রতিমায় আবির্ভূত হয়ে তৃতীয় বার্ষিক গঙ্গাপূজা সার্থক কর। অবিলম্বে মা গঙ্গা এলেন মাতৃমূর্তিতে—সাদা শাড়ী পরা, এলোকেশী, আঁচল হাওয়ায় উড়ছে। তাঁর হাতে সোণার কলস ছিল। তৎপরে মহাতেজা জহ্নুমুনি ও মহারাজ ভগীরথ এলেন ও আমাকে জানালেন। জহ্নুমুনির বাম বগলে কুশাসন ও ডান হাতে কাঠের কমণ্ডলু, অতি শুভ্রবর্ণ, কিশোর মূর্তি, মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, শিশুর মত সরল চাহনি, হলদে কাপড় কোঁচা দিয়ে পরা, খালি গা, লম্বা ডান হাতে কমণ্ডলু ডান হাঁটুর নীচ পর্য্যন্ত ঝুলছে। আমি প্রণাম করে বললাম, হে মুনিবর, মৃত্যুকালে স্থূলদেহ ছাড়তে আমার কষ্ট হবে না ত? তিনি মুখ বাড়িয়ে আমাকে বললেন, "না, তোমার কোন কষ্ট হবে না। তুমি গঙ্গাদি দেবতার এত পূজা করছ যে!" আমি ও মহাগৌরী তাঁকে মন্দিরে যেতে বলায় জহ্নুমুনি বিরক্ত হয়ে কুশাসন ঊর্দ্ধে তুলে জানালেন, ঊর্দ্ধলোকে চলে যাব,

মন্দিরে যাব না। তিনি কিছুক্ষণ থেকে চলে গেলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ মুনি। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁরাই সচল মন্দির, তাঁরা মৃণ্ময় মন্দিরে যেতে চান না। এই সময় মহাগৌরী নাটমন্দিরে ছিলেন।

২৬ মে শুক্রবার, জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য গ্রীষ্ম পড়েছে। দুপুরে আহারান্তে আমি ও মহাগৌরী একতলার ঘরে বিশ্রাম করছি। প্রথমে সুভদ্রা, পরে পদ্মা ও শেষে বিষ্ণুপ্রিয়া—আমার তিনকন্যা এলেন ও আমার মাদুরে বসলেন। আমি মেজেতে মাদুরেই শুয়েছিলাম। অনন্তর স্বর্গীয় চিকিৎসক বিভারুক এলেন। তিনি পূর্ব দুই দিন এসেছিলেন। আজ এসে তিনি আমার চোখে দিব্য ঔষধ দিলেন। মাত্র দুই তিন মিনিট থেকেই তিনি চলে গেলেন। অসহ্য গরমে আমরা উভয়ে অস্থির হয়েছি, বিশ্রাম হচ্ছে না। এমন সময় মা গঙ্গা এলেন এবং আমার ও মহাগৌরীর মাথায় ও গায় সুশীতল ব্রহ্মবারি ছিটিয়ে দিলেন। তৎক্ষণেই আমার শরীর শীতল হলো এবং 'এই মা গঙ্গা এলেন'—এই কথা মহাগৌরীকে বলেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। মা গঙ্গার মাথা থেকে ফোয়ারার মত ব্রহ্মবারি উৎসারিত হয়ে আমাদের দুই জনের গায় ও মাথায় পড়ল। এই ঘরে অন্য কেউ ছিল না।

১৩ মে শনিবার, ১৯৬১ ভোরে মহাগৌরী মন্দিরের সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে নাটমন্দিরে পড়ে বাম পায়ের গোড়ালি মচ্‌কে ফেলেন। বিবিধ বাহ্য চিকিৎসার সঙ্গে দিব্য চিকিৎসাও চলিল। আমার কাতর প্রার্থনায় দেবীলোক থেকে দুইজন চিকিৎসক ঐদিন সকালে এসে স্বর্গীয় চিকিৎসা করলেন। ঐদিন সন্ধ্যায় এলেন একজন ঋষিবৈদ্য। তখন স্বামী ভৈরবানন্দ উপস্থিত ছিলেন মহাগৌরীর অদূরে। আট দিনেও ব্যথার উপশম আশানুরূপ না হওয়ায় ২০ মে শনিবার সন্ধ্যায় মহাগৌরী কালযবনকে বলেছিলেন, আপনি আমার গোড়ালির ব্যথা কমাবার ব্যবস্থা সত্বর করুন। পরদিন রবিবার রাত্রে সাড়ে নয়টায় এক বৈদ্য এসে ভৈরবানন্দকে বললেন, "আমি এঁর পায়ের চিকিৎসা করবো। আজ

রাত্রে ওদিকে যেন কেউ না আসেন।" তাই ভৈরবানন্দ আমাকে ঐ দিকে যেতে নিষেধ করায় আমি বললাম, আমি যাব না। সেজন্য আমি সারারাত উত্তর বারান্দায় যাইনি; অথচ মহাগৌরীর পা মচকানর পর প্রতি রাত্রে দুই তিন বার গিয়ে খোঁজ নিই ও দেখি, সে কেমন আছে? উক্ত স্বর্গীয় চিকিৎসক ঐ রাত্রে আমার ও ভৈরবানন্দের লিঙ্গ দেহ বাহির করে মহাগৌরীর সামনে কথা বলালেন। উক্ত বৈদ্য সারা রাত্রি মহাগৌরীকে চিকিৎসা করলেন। তৎপর দিন ২২ মে সোমবার সকালে ভৈরবানন্দকে ঐ কথা বলায় তিনি ঐ বৈদ্যকে ডাকলেন। ভৈরবানন্দের আহ্বানে তিনি এলেন ও বললেন, "আমিই গত রাত্রে এঁর চিকিৎসা করেছি। আমি অসুরবৈদ্য বিভারুক ও শুক্রাচার্য্যের শিষ্য ও শিবলোকবাসী।"

বিভারুক লম্বা, রোগা, গৌর, মুণ্ডিত মস্তকও সাদা কাপড় পরা ঋষিমূর্তি। আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি সাতটী আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, সাত দিনের মধ্যে ইনি হাঁটতে পারবেন।" বিভারুকের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল। এবং মহাগৌরী ঠিক সাত দিনের মধ্যে চলতে পেরেছিলেন।

মহাগৌরীর চিকিৎসান্তে বিভারুক স্বেচ্ছায় আমার চক্ষু-চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন। ইতোপূর্বে তাঁহার চিকিৎসার কথা উল্লেখ করেছি। শনিবার, ৩ জুন, ১৯৬১ দুপুরে আমি আহারান্তে দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছি। এমন সময় দেখলাম, বিরাট নয়ন যুগল আমার মুখের খুব কাছে রেখে কোন দিব্যদেহী চিকিৎসক আমার চোখ দেখছেন। তখন মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শায়িত ছিলেন। তাঁকে ডেকে এঁর কথা বলায় তিনি উঠে এসে দেখে বললেন, "ইনি শিবলোকের দৈত্যবৈদ্য বিভারুক। আপনার চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসা করছেন।" মহাগৌরী তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, দাদুর দৃষ্টি বাড়বে কি? তিনি নম্রভাবে লিখে জানালেন, চেষ্টা করছি। অনন্তর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি চলে গেলেন। পরদিন রবিবার

দুপুরেও তিনি এসেছিলেন। ৭ই জুন বুধবার গভীর রাত্রেও তিনি এসে আমার চক্ষু-চিকিৎসা করলেন। কোন দিন দুপুরে, কোন দিন রাত্রে রোজ একবার তিনি দয়াপরবশ হয়ে এসে এই অন্ধপ্রায় জরাগ্রস্ত বৃদ্ধসাধুর চক্ষুচিকিৎসা করেন।

১৫ মে সোমবার ১৯৬১ ভোর চারটায় মহাগৌরীর বিছানার উপরে শিশুমূর্তি জটাধারী নগ্নদেহ পঞ্চঋষি এসে বসলেন। তাঁদের মাথায় সোণালী রঙের পাকান জটা, নীলাভ নয়ন, পাকা সোণার মত গায়ের রঙ, মাখনের মত সর্বাঙ্গ চিক্কণ। তাঁরা মহাগৌরীর দিকে শিশুর মত চাইছিলেন। মহাগৌরী তাঁহাদিগকে প্রণাম করতে তাঁরা আমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। মহাগৌরী বললেন, "দাদু দক্ষিণ বারান্দায় আছেন। আপনারা ওখানে যান।" তাঁরা মন্দিরের ভেতর দিয়ে উত্তর বারান্দায় মহাগৌরীর কাছে গিয়েছিলেন ও ঐ ভাবে আমার কাছে এলেন। ইতঃপূর্বে মহাগৌরী ইহাদিগকে দেখেন নাই ও বলেন, "ঐ শিশু ঋষিদের আধ আধ কথা, কথার আড় ভাঙ্গে নি। দেখতে তিন বর্ষের শিশুর মত।" তাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করায় ভৈরবানন্দ বলেন, "এই শিশুমূর্তি পঞ্চঋষি বালখিল্য। মহাগৌরী এখন বালখিল্যমার্গের সাধন করছেন বলে তাঁরা এসেছিলেন। সাধক বা সাধিকা যে মার্গের সাধন করেন, সেই মার্গের সাধকরা (স্থূলদেহী বা সূক্ষ্মদেহী) তাঁর কাছে আসেন।" ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধক জীবনেও ইহা দেখা যায়। তিনি যখন যে মার্গের সাধন করতেন, সেই সেই মার্গের সাধকবৃন্দ বা সিদ্ধগণ তৎসান্নিধ্যে আসতেন। বালখিল্যগণ উর্দ্ধরেতা ও বিদেহমুক্তি স্তরের সাধক। এঁরা নিরাকার মার্গের সাধন করেন ও অনায়াসে ব্রহ্মলীন হতে পারেন। আবার নিম্নতম উর্দ্ধলোক মর্ত্যলোকেও তাঁরা দৃষ্টিপাত করেন। এঁদের কথা মৈত্রায়ণী উপনিষৎ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। এঁরা বেদান্তবাদী ব্রহ্মযোগী। মৈত্রায়ণী উপনিষদে আছে, এঁরা কোন ঋষির কাছে গায়ত্রীতত্ত্ব জেনেছিলেন।

২০ মে, ১৯৬১ শনিবার সকাল আটটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ কোণে মাদুর পেতে স্নানান্তে শুয়েছিলাম। গত রাত্রে অত্যন্ত গরম পড়ায় ও মহাগৌরীর অসুস্থতা নিবন্ধন চিন্তিত থাকায় আদৌ ঘুম হয় নি ও পেট ফেঁপেছিল। একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দেখছি, একটী দেবী—নীল শাড়ী পরা শ্যামবর্ণা বড় বড় সুন্দর চোখ—এক বাটী ঝোল সহ তরকারী এনে আমাকে খাওয়ালেন। বাটীতে তরকারীর শব্জীগুলি ডুবেছিল। আমি চুমুক দিয়ে সেই ঝোল খেলাম ও ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হয়েছে। ইনি অপরাজিতা দেবী। গত বাসন্তীপূজার সময় আমার অসুখে (পেট খারাপ) আমাকে ইনি গুঁড়ো সন্দেশ ও ভৃঙ্গারের জল খাইয়েছিলেন। আজ তিনি কন্যা মূর্তিতে আমার বাম দিকে বসে আমাকে আরোগ্যপ্রদ দিব্য ঝোল খাওয়ালেন। পরদিন রবিবার ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রে এলেন ও অপরাজিতা দেবীকে আহ্বান করলেন। তখন উক্ত দেবী এসে স্বীকার করলেন, পূর্বদিন তিনিই আমাকে দিব্য-ঝোল খাইয়েছিলেন।

৮ জুন বৃহস্পতিবার গুরুবার মহানিশায় মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে ব্রহ্মমন্ত্র জপ করতে করতে দেখছেন, আমি স্থূল দেহে দক্ষিণ বারান্দায় নিজ বিছানায় শায়িত থাকিলেও মন্দিরমধ্যে সূক্ষ্মদেহে মহাগৌরীর আসনে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে ব্রহ্মমন্ত্র জপ করছি। আজ্ঞা-চক্রে মন উঠলে ব্রহ্মমন্ত্রের অজপাজপ চলে ও দিব্য দর্শন হয়।

১০ জুন শনিবার সন্ধ্যায় মহাগৌরী আমাকে আমার ডায়েরী (১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত) পড়ে শোনালেন। সেই সময় বেদান্তোক্ত অদ্বৈত সাধনার কথা উঠিল। উক্ত রাত্রের চতুর্থ প্রহরে তিনি দেখলেন, উত্তর বারান্দায় তাঁর শয্যার উপরে একটি শ্যামবর্ণা দেবীমূর্তি এলেন ও উচ্চৈঃস্বরে অদ্বৈত সাধনার সারতত্ত্ব যুক্তিবলে বোঝালেন। যখন তিনি বললেন, অদ্বৈতসিদ্ধি হলে গুরু বা ইষ্ট থাকেন না, শুধু ব্রহ্মই থাকেন, তখন মহাগৌরী প্রতিবাদ

করে তাঁর সঙ্গে বিচার করলেন। তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা মহাগৌরীর শংকা খণ্ডন করে বেদান্ত সিদ্ধান্ত স্থাপনপূর্বক চলে গেলেন। তিনি প্রায় এক ঘণ্টা ছিলেন। ইনি ছদ্মবেশী ব্রহ্মবিদ্যা। তখন মহাগৌরীর অদ্বৈত সাধনা চলছে বলে তিনি এসে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। নগ্নদেহা ব্রহ্মবিদ্যা আমাদের মন্দিরে বিরাজ করছেন এবং প্রায়ই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন।

৯ জুন, ১৯৬১ শুক্রবার বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় আমি ও মহাগৌরী পশ্চিম বারান্দায় বসে কথা বলছিলাম। এমন সময় আমি দেখলাম, একটি বিরাট পুরুষ দিব্যদেহে আমাকে জানালেন, আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম করে জলচৌকিতে বসতে বললাম। আমি তাঁকে বার বার প্রণাম ও প্রার্থনা করতে তিনি হাত নেড়ে বারণ করছিলেন। ইনি তিন দিন যাবৎ দিনে ও রাত্রে আসছেন, কিন্তু মন্দিরে ঢুকেন না। তিনি বসলে তাঁর মাথা অর্দ্ধেক দেওয়াল পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। তিনি শুভ্রবর্ণ ও বিশালনয়ন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে ও কেন এসেছেন। তখন তিনি অনেক কিছু লিখে দেখালেন। তন্মধ্যে মহাগৌরী পড়লেন, সত্য-যুগ…; বাকী অংশ পড়া গেল না। 'সত্যযুগ' প্রথমেই লেখা ছিল। অনন্তর সন্ধ্যায় আমি মন্দিরে ঢুকে স্বীয় আসনে জপ করতে বসলাম। আমার কাতর আহ্বানে তিনি মন্দিরে গিয়ে আমার সামনে বাম দিকে বসলেন। তখন সন্ধ্যাদেবী পূর্ণমূর্তিতে এলেন। এত স্পষ্ট ভাবে সন্ধ্যা দেবীকে আমি পূর্বে দেখি নাই। ইতিমধ্যে আরও দুই দিব্যদেহী বিরাট পুরুষ এলেন এবং বারান্দায় আমার জলচৌকিতে ও চেয়ারে বসলেন। যিনি জলচৌকিতে বসলেন, তাঁর মাথায় লম্বা জটা ও চোখমুখ খুব সুন্দর। আমার নির্দেশে মহাগৌরী তাঁকে মন্দিরে যেতে বলায় তিনি বিরক্ত হয়ে চোখ লাল করলেন। আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম করতেও আশীর্বাদ চাইতে তিনি বারান্দায় বসেই ডান পা লম্বা করে বাড়িয়ে মন্দিরস্থ আমার

মাথায় দিলেন। তখন যিনি মন্দিরমধ্যে আমার পাশে বসেছিলেন, তিনি ডান পা আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন, লে বেটা পা টেপ। আমি সূক্ষ্মদেহে ভক্তিভরে তাঁর পাদসেবা করলাম। তখন তাঁরা তিন জনে চলে গেলেন। আর যিনি চেয়ারে বসেছিলেন, তিনি সূর্য্যদ্বারের অভিমুখে আকাশমার্গে গেলেন আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে। পরদিন শনি-বার সন্ধ্যায় তিনি একা এসে আমাকে দুইবার দেখা দিলেন। শেষবারে তিনি যখন এলেন, তখন আমিও মহাগৌরী নাটমন্দিরে বসেছিলাম। আমি প্রণাম করতেই তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, "যিনি মন্দিরে গেলেন, তিনি মেধাতিথি। যিনি আমার মাথায় পা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, তিনি পুত্র এবং অন্যজন অগ্নিবাহু। এঁরা সত্যযুগের প্রথম পাদের সিদ্ধ ঋষি। এঁদের নাম বেদাদি শাস্ত্রে ও মহাভারতে পাওয়া যায়। স্বায়ংভুব মনু প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র। তন্মধ্যে মেধাতিথি, পুত্র ও অগ্নিবাহু তিনজন সিদ্ধ যোগী হন। বাকী সাত পুত্রকে প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর এক এক দ্বীপের অধিপতি করেছিলেন।

১২ জুন ১৯৬১ সোমবার দুপুরে দেড়টায় আমি ও মহাগৌরী আহারান্তে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় খাটে বিশ্রাম করছিলাম—আমি শায়িত ও মহাগৌরী আসীন। আমি কিঞ্চিৎ তন্দ্রিত হয়ে দেখলাম, আমার শিয়রে এক দিব্যদেহী আবির্ভূত। তাঁর মাথায় গেরুয়া পাগড়ী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। তিনি আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ঘাড়ের এক শিরা এমন জোরে টিপলেন যে, আমি ঘাড়ে বেশ ব্যথা অনুভব করলাম দশ পনের মিনিট ধরে, ইনজেকশন নিলে যেমন বেদনা হয়। আমরা ওঁর সম্বন্ধে কথা বলছিলাম। তিনি নিজ মুখে আঙ্গুল দিয়ে ইংগিত করলেন, এখন কথা বলবেন না। মহাগৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি শিবলোকের দৈত্যবৈদ্য বিতারক? তিনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

আবার মহাগৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি চিকিৎসা করছেন? তখন বিভাণ্ডক ফোটা ফুল সহ চারাগাছ কয়েকটি দেখিয়ে জানালেন, তিনি ভেষজ প্রয়োগ করছেন। তিনি সৌর উপাসক ছিলেন। এখন আমি সূর্য্যোপাসনা করছি বলে তিনি স্বেচ্ছায় আমার চক্ষু-চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

১৩ জুন ১৯৬১ মঙ্গলবার বৈকালে মহাগৌরী মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষ বর্ণনা পড়ছিলেন এবং সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্য্যোধনের মৃত্যু-সংবাদ দিতেছেন। পাঠান্তে তিনি প্রজ্ঞাচক্ষু সঞ্জয়ের কথা ভাবছিলেন। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে নাটমন্দিরে বসে পঠিত বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম। এমন সময় দেখিলাম, একটি স্বর্গীয় বিরাট পুরুষ আবির্ভূত—তাঁর মাথা প্রায় নাটমন্দিরের ছাদে ঠেকেছে, সাদা কাপড় পরা, গায়ে সাদা উত্তরীয়, মাথায় ছোট ছোট চুল, বড় বড় দুই চোখ, গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌর। মহাগৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি সঞ্জয়? তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আমরা তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে মন্দিরে যেতে বলতে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন্দিরের বারান্দায় গেলেন। তখন সুভদ্রা বাহিরে এসে তাঁকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন। সঞ্জয় মন্দিরে গিয়ে ব্যাসদেবের কাছে একটু বসেই চলে গেলেন। সম্ভবতঃ তিনি মন্দির হয়ে নাটমন্দিরে গিয়েছিলেন; তাই পুনরায় মন্দিরে আসতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি নাটমন্দিরে পশ্চিমাস্য হয়ে দাঁড়িয়ে মহাগৌরীকে আড় চোখে দেখছিলেন। মহাভারতোক্ত ব্যক্তিগণকে এখনও দিব্য চক্ষুতে দেখা যায়।

৮ই জুন বৃহস্পতিবার ১৯৬১ ভোর চারটায় ক্লান্ত হয়ে দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় ক্লান্ত দেহে আমি পড়ে আছি। ঐ রাত্রে দোতলায় চোর আসায় আমরা তিনটা থেকে জেগেছিলাম। ভোর সাড়ে চারটায় একটু তন্দ্রাবিষ্ট হয়ে দেখলাম, একটী সূক্ষ্মদেহী নারীমূর্তি আমার খাটে বসে আমাকে

একটী দিব্য খাদ্য খাওয়ালেন। উক্ত খাদ্য দুধে ভেজান রুটীর মত। তখন আমি মহাগৌরীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে ও আমাকে কি খাওয়াচ্ছেন? মহাগৌরী উত্তর বারান্দা থেকে দিব্য চক্ষে দেখে বললেন, এই নারীমূর্ত্তি কোন ঋষিপত্নী হবেন। তাঁর চেহারা শ্যামল, দোহারা, মাথায় কাপড়, গায় একটীও গয়না নাই, শাড়ীর চওড়া কাল পাড় ও খোল গাঢ় সবুজ রঙ, বয়স চব্বিশ পঁচিশ বৎসর, মুখে উদাস ভাব। সকাল সাড়ে নয়টায় তিনি উত্তর বারান্দায় মহাগৌরীর কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ বসেছিলেন। আহারান্তে বেলা একটায় আমি দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছি ও মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় আছেন। এমন সময় স্পষ্টভাবে দেখলাম, আমার খাটের কাছে ঐ ঋষি-পত্নী দাঁড়িয়ে আছেন। অবিলম্বে আমি মহাগৌরীকে ডেকে আনলাম এবং উভয়ে দেখলাম, তৎপার্শ্বে এক ঋষি ও দুই ঋষিবালক।

ঋষিপত্নী দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে ছিলেন ও ঋষি আমার পশ্চিম দিকে। মহাগৌরী নাম জিজ্ঞাসা করতে ঋষি নাম লিখে দিলেন; কিন্তু মহাগৌরী প্রথম বর্ণ 'ত' ব্যতীত বাকী অংশ পড়তে পারলেন না। ঋষির চেহারা মধ্যমাকৃতি, মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, হাঁটুর উপরে হলদে কাপড় পরা, লম্বা দাড়ি, গায়ের রঙ ফর্সা। ঋষি বালকদ্বয়ের চেহারাও ঋষিসদৃশ। আমরা তাঁকে প্রণাম করে মন্দিরে যেতে বলতে তাঁরা মন্দিরে না, গিয়ে স্বস্থানে চলে গেলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগদৃষ্টিতে জেনে বলেন, "এই ঋষির নাম তত্ত্বদর্শী, ঋষিপত্নী তাঁহারই পত্নী ও বালকদ্বয় তৎপুত্র। তত্ত্বদর্শী কলিযুগের প্রথম পাদের সিদ্ধ ঋষি।"

১৫ই জুন বৃহস্পতিবার ১৯৬১ ভোরে পাঁচটার আগে আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে দেখছি, আমার বিছানায় একটী সুশুভ্রা কুমারী দেবী বসে আছেন অত্যন্ত আপন জনের মত—অতি সাদা শাড়ী পরা, মাথায় কাপড় নাই, মাথার চুল পেছনে বেণী বাঁধা, প্রায় পনের

বৎসর বয়স। আমি মহাগৌরীকে ডাক দিয়ে বলায় তিনি উত্তর বারান্দা থেকে দিব্য চক্ষুতে দেখে বললেন, ইনি নিশ্চয়ই কোন কুমারী দেবী। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, ইনি শ্রীশ্রীচণ্ডীতে কথিত অষ্টমাতৃকার অন্যতমা কুমার-শক্তি কৌমারী। বেলা এগারোটা পর্যন্ত চার ঘণ্টা লেখাপড়ার কাজ করে খুব ক্লান্ত হয়ে আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় দক্ষিণ কোণে মাতুর পেতে শুয়ে আছি। এমন সময় দেখলাম, একটী দেবী আমার মাতুরে বসে তাঁর শুভ্র সুন্দর ডান হাতে আমাকে স্পর্শ করলেন। তখন মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় ছিলেন। তাঁকে ডাক দিয়ে এই স্বরূপা দেবীর কথা বললাম। তিনি দিব্য চক্ষুতে দেখে বললেন, ইনি দেবী অপরাজিতা—অপরাজিতা ফুলের রঙের শাড়ী পরা, গোলাপী গাত্রবর্ণ, তুধে অল্প আলতা মিশালে যেমন সুন্দর রঙ হয়, চোখ তুটী সুন্দর ও মুখখানি পদ্মের মত। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে তিনি পশ্চিম বারান্দায় কাঠের টুলের উপর বসে চলে গেলেন। রাত্রি সাড়ে আটটায় আমি তুগ্ধাদি নিবেদন করে তাঁকে ডাকলাম। তিনি সত্বর এসে তুধ প্রভৃতি গ্রহণ করলেন এবং প্রায় আধ ঘণ্টা থেকে চলে গেলেন। যদিও তিনি চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি, তথাপি আসল স্বরূপ ঢেকে কুমারী কন্যাবৎ অসুস্থ সময়ে আমার কাছে আসেন।

১৩ই জুন শুক্রবার সকালে মহাগৌরী বালি বাসায় গেলেন ধর্মচক্রে একটানা দেড় মাস থেকে। যাবার পূর্বে ভোরে আমরা উত্তর পার্শ্বস্থ রাস্তায় পায়চারি করছিলাম। এমন সময় এলেন তাঁর স্বর্গবাসিনী গুরুমাতা, পূর্বজন্মের গুরু হরিহরানন্দের ধর্মপত্নী। সম্প্রতি মহাগৌরীর অসুখের সময় তিনি প্রায়ই কন্যা-তুল্যা মহাগৌরীকে দেখতে আসতেন।

১৪ই জুন বুধবার বৈকাল পাঁচটায় জগৎপুরের একটী বয়স্ক ব্রাহ্মণ এলেন আমার কাছে চণ্ডীপাঠ শিখতে। তিনি অনেক বৎসর পূর্বে উলুবেড়িয়া আনন্দময়ী কালীবাড়ীতে আমার চণ্ডীব্যাখ্যা শুনেছিলেন

এবং মদম্বুদিত "শ্রীশ্রীচণ্ডী" পড়েছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর অর্গলা স্তব, কীলক স্তোত্র, দেবী কবচ ও প্রথম অধ্যায় পড়ে তিনি চলে গেলেন। তখন মহাগৌরী দোতলায় বসে ভাবছিলেন, চণ্ডীদেবীর সত্ত্বমূর্তি কিরূপ? এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি নীচে এসে নাটমন্দিরে আমার কাছে বসলেন। তখন আমি দেখলাম, একটী তুষারবৎ শুভ্র, পূর্ণাবয়ব দেবীমূর্তি সম্মুখে আবির্ভূতা। আমি মহাগৌরীকে তাঁর কথা বলায় তিনি বললেন, ইনি শুদ্ধসত্ত্ব চণ্ডীমূর্তি। এত শুভ্র পূর্ণ স্পষ্ট দেবী মূর্তি আমি পূর্বে দেখিনি। তিনি শুভ্রবস্ত্র-পরিহিতা, অলংকারবিহীনা মুক্তকেশী মাতৃমূর্তি। তাঁকে দেখার জন্য অনেক চণ্ডীসিদ্ধ সূক্ষ্মদেহী নাটমন্দিরে এলেন। তিনি প্রায় দশ মিনিট ছিলেন এবং আমরা সভক্তি প্রণাম করতে চলে গেলেন।

১৮ই জুন রবিবার মধ্যরাত্রে মহাগৌরী ধর্মচক্রে শুয়ে দেখলেন ধূসরবর্ণ কালসর্প—বেলুড় থেকে বালি পর্য্যন্ত প্রায় দুই মাইল লম্বা ও প্রায় পঞ্চাশ হাত চওড়া। আমিও মহাগৌরী ঐ কালসর্পের দুই দিকে আছি এবং রুখে দাঁড়িয়ে তাকে মারছি ও তার ফণা উল্টে দিচ্ছি। তখন সে ভয় পাচ্ছে ও থামছে। যখন আমরা তার দিকে পেছন ফিরছি ও ভয় পেয়ে ছুট্‌ছি, তখন সে আমাদের পেছনে ধীরে ধীরে আসছে। তা থেকে আমাদের উভয়ের দূরত্ব এক হাত মাত্র। আমার সঙ্গে জন-তিনেক ও মহাগৌরীর সঙ্গে একজন ছিল। আমরা তিন বার তাকে আঘাত করলাম। যেমন আমরা তাকে অতিক্রম করতে পারছি না, সেও তেমনি আমাদিগকে আক্রমণ করতে পারছে না। স্বামী ভৈরবানন্দ বললেন, ইহাকে সংসার সর্প বা প্রারব্ধ সর্প বলা যায়। কালস্রোত সর্পগতিতে মানুষের পেছনে সর্বদা ছুটছে। যারা ভগবদ্ভক্ত, তারাই কালগ্রাস থেকে রক্ষা পাচ্ছে। উক্ত মর্মে সন্ত দাদু বলেন—

জুরা কাল জনম মরণ যাঁহা যাঁহা জীব যাই।
ভগতি পরায়ণ লীন মন তাকৌ কাল ন খাই।

১৯শে জুন সোমবার ১৯৬১ শুক্লা-ষষ্ঠী বা জামাই ষষ্ঠী। সকাল নয়টায় একটী স্থানীয়া রমণী ষষ্ঠীপূজার জন্য ফুল ও মালা, ফলমিষ্টি প্রভৃতি দিয়ে গেল। স্নানান্তে আমি উত্তর বারান্দায় কাপড় শুকোতে দিতে গেলাম। তখন দেখলাম, একটী দিব্যদেহী প্রৌঢ়া নারী বারান্দায় এসে আমাকে জানালেন।

আমি শ্রদ্ধাভরে তাঁকে মন্দিরে যেতে বললাম এবং মহাগৌরীকে তাঁর কথা জানালাম। তিনি মন্দিরে প্রবেশের পরেই মহাগৌরী মন্দিরে গিয়ে দেখলেন, তিনি শ্রীমার পাশে বসে আছেন। তখন বোঝা গেল, ইনি সারদাদেবার গর্ভধারিণী শ্যামাসুন্দরী। আজ জামাই ষষ্ঠী বলে দেবীলোক থেকে তিনি মর্ত্যালোকে এসেছেন কন্যা সারদা ও জামাতা রামকৃষ্ণ দর্শনে। আমাদের দিদিমা শ্যামাসুন্দরীকে প্রথম দেখেছিলাম গত ২৬শে জানুয়ারী ঠাকুর পুকুর সারদা বিহারে। আজ এখানে তিনি এসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে পায় হাত দিয়ে প্রণাম করলেন এবং ঠাকুর তাঁকে মাথা নীচু করে শ্রদ্ধা জানালেন। শ্রীমা সারদা তাঁকে সভক্তি প্রণাম করলেন। মহাগৌরী পূজাকালে রজনীগন্ধা ফুলের মালা অগুরু-চর্চিত করে ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দিলেন। পূজারম্ভের পূর্বেই ষষ্ঠীদেবী বিড়াল বাহন সহ মন্দিরে এলেন—সোণালী গরদের কাপড় পরা, এলোকেশী, সর্বাঙ্গ অলংকৃত, গাত্রবর্ণ দুধে আল্‌তা মেশান, বালিকা মূর্তি। শ্যামাসুন্দরী ষষ্ঠীদেবীর দিকে তাকিয়ে পূর্ণ মূর্তিতে বসেছিলেন। আমরা ষষ্ঠীদেবীকে পৃথক্ নৈবেদ্য দিয়ে ধূপদীপাদি পঞ্চোপচারে পূজা করলাম। এই ধ্যানে ষষ্ঠীপূজা হলো।—

দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং।
বরদাভয়হস্তাং চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাং॥

পট্টবস্ত্রপরিধানাং পীনোন্নত পয়োধরাং।
অংকার্পিত সুতাং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং বিচিন্তয়ে॥

ষষ্ঠীপূজান্তে এই মন্ত্রে তাঁকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম।—

জয় দেবি জগন্মাত জগদানন্দকারিণী।
প্রসীদ মম কল্যাণী নমস্তে ষষ্ঠীদেবীকে॥

আমাদের পূজার আয়োজন অল্প ছিল। তাই মহাগৌরী স্নেহে গোপালজীকে বললেন, বাবা, ষষ্ঠীদেবীর পূজার উত্তম আয়োজন কর। তখন গোপাল ষষ্ঠীর গলায় একটী রজনীগন্ধা ফুলের সাদা মালা, কপালে তেল-হলুদের টিপ এবং চিড়ে, দই, কলা, আম, মিষ্টি, ক্ষীরের পুতুল, তাল পাতার হাত পাখা (দূর্বা, কলা ও বাঁশপাতা লাল সুতো দিয়ে বাঁধা) দিলেন। ঐ পাখায় গোপাল ষষ্ঠীকে হাওয়া করে তাঁর ডান দিকে রাখলেন। রঙ্গপ্রিয় গোপালজী রঙ্গচ্ছলে এত চিড়ে দিলেন যে, চিড়ের স্তূপ ষষ্ঠীর মাথা ছাড়িয়ে উঠল। ষষ্ঠী দেবী ঐ সব দিব্য দ্রব্য গ্রহণ করে শ্যামাসুন্দরী, সারদা, শ্রীরামকৃষ্ণ, গোপাল, কল্কি, সুভদ্রা, সুপর্ণা, পদ্মা, বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্যামাঙ্গিনী ও মুচুকুন্দ, কার্তিক ও গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতিকে প্রসাদ দিলেন। পূজান্তে আমরা যখন একতলার বারান্দায় খেতে বসেছিলাম, তখন ষষ্ঠীদেবী এসে আমার সম্মুখে বসলেন। বৈকালে পাঁচটার পর আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে আছি। এমন সময় দিদিমা শ্যামাসুন্দরী মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। তখন আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম করলাম। মহাগৌরী তাঁকে বললেন, আজ এই নাতিকে স্নেহাদর ও আশীর্বাদ করুন। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বলিয়ে আশীর্বাদ করলেন ও গালে, দাড়িতে হাত দিয়ে চুমু খেলেন। তখন মহাগৌরী মৃদু হাস্য করায় তিনি ঈষৎ গম্ভীর হলেন। স্থূলদেহে দিদিমাকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তাই আজ তাঁর সূক্ষ্মদেহের পুণ্য দর্শন ও স্পর্শন পেয়ে ধন্য হলাম।

সন্ধ্যায় ষষ্ঠী, শ্যামাসুন্দরী, শিব ও ঠাকুরের উদ্দেশ্যে মন্দিরে মোমবাতি জ্বালা হলো। আমার ছেলেমেয়েরা মন্দিরে আছেন বলে সন্ধ্যার পরে চিড়ে দই মুড়কি ও কলা ষষ্ঠীদেবীকে মহাগৌরী সশ্রদ্ধ নিবেদন করলেন।

তখন ষষ্ঠী দেবী উহা গ্রহণ করে শ্যামাসুন্দরী, আমার চার মেয়ে ও নাতনি শ্যামা, গোপাল, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতিকে দিলেন এবং স্বয়ং পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করলেন। অনন্তর মহাগৌরীর অনুরোধে কল্কি, ঠাকুর, গোপাল, সুপর্ণা ও সুভদ্রা প্রভৃতিকে তিনি আশীর্বাদ করলেন এবং খুব খুশী হলেন।

দেবী ভাগবতে নবম স্কন্ধে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ে ষষ্ঠী দেবীর উপাখ্যান ও পূজাবিধি বর্ণিত আছে। ষষ্ঠী প্রাকৃতিক কলাদেবী ও স্কন্দপত্নী। ইনি বালক-বালিকাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং বার বর্ষ পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মাতৃবৎ থাকেন। বিষ্ণুমায়া প্রকৃতির ষষ্ঠ-কলা ষষ্ঠী নামে অভিহিতা ও ষোড়শ মাতৃকার অন্যতমা দেবসেনা নামে বিখ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র রাজা প্রিয়ব্রত তপস্যাপরায়ণ ছিলেন ও প্রথমতঃ দারপরিগ্রহ করেন নাই। পরে তিনি ব্রহ্মার আদেশে বিবাহ করেন। বিবাহের পর বহু বর্ষ অতীত হইলেও তিনি কোন পুত্রলাভ করিলেন না। কশ্যপ মুনি প্রিয়ব্রত রাজাকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞশেষে রজঃস্বলা রাজমহিষীকে চরু খাইতে দেন। চরু ভোজনের ফলে রাজরাণী গর্ভবতী হন ও দৈব কাল পরিমাণে দ্বাদশ বৎসর গর্ভধারণ করেন। তদনন্তর রাজমহিষী কনককান্তি মৃতপুত্র প্রসব করেন। সেই সময় পুত্রের নয়ন হইতে তারা বহির্গত হয়েছিল। সেই মাতাপিতা প্রভৃতি উক্ত মৃত শিশু দেখে কাঁদতে থাকেন ও শোকগ্রস্থ হন। রাজা প্রিয়ব্রত মৃত পুত্রকে নিয়ে শ্মশানে যান ও তাকে বুকে ধরে গহন কাননে বসে রোদন করেন।

রাজা মৃত পুত্রকে ফেলে না দিয়ে নিজেও মরতে চাইলেন। তখন তিনি স্বর্গীয় বিমানে আরূঢ়া শ্বেতচম্পকবৎ শুভ্রবর্ণা নিরন্তর স্থিরযৌবনা

সুশোভনা প্রসন্নবদনা দয়াময়ী ষষ্ঠীদেবীকে দর্শন করেন। তৎপরে তিনি মৃত পুত্রকে ভূমিতে রেখে তাঁহাকে প্রণাম ও পূজা করেন। ষষ্ঠী দেবী ব্রহ্মার মনোজাত ঈশ্বররূপিণী ও স্কন্দপ্রিয়া। তিনি মৃত শিশুকে হাতে লইয়া মহাজ্ঞানবলে অবলীলাক্রমে জীবিত করেন। তখন শিশু জীবিত হইয়া হাসিতে লাগিল। ইহাতে রাজা ষষ্ঠীকে স্তব করেন। ষষ্ঠী এই পুত্র নিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে তৎপুত্র শিশুকে সঞ্জীবিত ও প্রত্যর্পণ করেন ও বলেন, "তোমার সাম্রাজ্যে ষষ্ঠীপূজা প্রচার কর। এই পুত্র সুব্রত দীর্ঘজীবী ও জাতিস্মর হবে।" রাজা প্রিয়ব্রত এই অঙ্গীকার করে পুত্র সুব্রতকে নিয়ে স্বীয় রাজ্যে ফিরিলেন। মহারাজ প্রিয়ব্রত জ্যৈষ্ঠী শুক্লা ষষ্ঠীতে ষষ্ঠী-পূজা প্রথম প্রবর্তন করেন। শিশুজন্মের ষষ্ঠ ও একবিংশ দিনে ষষ্ঠীপূজা করিতে হয়। শিশুদের শুভান্নপ্রাশনকালে ষষ্ঠীপূজা বিধেয়। শালগ্রাম শিলায়, ঘটে, বটবৃক্ষমূলে, ভূমিতে পুত্তলিকা চিত্রিত করিয়া, অথবা পিঠুলির পুতুল গড়িয়া ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিতে হয়। ইনি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশরূপিণী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী এবং ওঁ ষং ষষ্ঠী দেব্যৈ নমঃ অথবা ওঁ হ্রোং ষষ্ঠী দেব্যৈ স্বাহা—এই অষ্টাক্ষর মহামন্ত্রে ষষ্ঠীপূজা কর্তব্য। জন্মবন্ধ্যা বা কাকবন্ধ্যা বা মৃতবৎসা নারী এই মন্ত্র লক্ষবার জপ করিলে সুপুত্রবতী হন।

২০ জুন মঙ্গলবার স্নানান্তে আমি দোতলায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসেছি। তখন মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় তেল মাখছিলেন। এমন সময় আমি দেখলাম, একটী দেবীমূর্তি প্রীতিভরে আত্মীয়বোধে মহাগৌরীর দিকে চেয়ে আছেন। আমি তাঁকে পূর্ণ স্পষ্ট মূর্তিতে দেখে মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? মহাগৌরী তাঁকে দেখে আমাকে বললেন, "ইনি সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। গত দুই মাস যাবৎ একে সর্বদা ছায়াবৎ স্বীয় সমীপে দেখি, এখানের চেয়ে বাড়ীতে বেশী এঁকে দেখি। কাপড় কাচা, স্নানের জন্য কুয়া থেকে জল তোলা প্রভৃতি

কষ্টকর কাজের সময় এঁকে দেখলে আমার কষ্টবোধ কমে যায়।" এই কথা শুনে স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, ঐ দেবী গৌরীশক্তি বা মহাগৌরীর লিঙ্গদেহ। স্নানান্তে আমি মন্দিরে জপ শেষ করে নীচে খেতে গেছি ও মহাগৌরী স্নানান্তে উত্তর বারান্দায় মাথার চুল আঁচড়াচ্ছেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, রাজরাণীবৎ সুসজ্জিতা অলংকৃতা দেবীমূর্তি শূন্য থেকে মন্দিরের বারান্দায় নামলেন চার পাঁচ জন পুরুষ সহ। মহাগৌরী তাঁকে প্রণাম করে বললেন, "আপনি মন্দিরে যান। আমি দাদুকে আপনার কথা বলছি।" তিনি মন্দিরে ঢুকে দেবতাদের সামনে বসলেন ও একটু পরে নীচে গিয়ে আমার সামনে দাঁড়ালেন। তখন আমি মধ্যাহ্ন ভোজনে ব্যাপৃত ছিলাম। খানিক বাদে তিনি মেজেতে বসলেন ও আমার আহার শেষ হবার পূর্বে চলে গেলেন। জানা গেল, ইনি রাজা প্রিয়ব্রত মনুর মহিষী ও রাজপুত্র সুব্রতের মাতা, যিনি প্রথমে মর্ত্যে ষষ্ঠীপূজা করেছিলেন। আমরা পূর্বদিন ষষ্ঠীপূজা এবং আজও ষষ্ঠীদেবীর আলোচনা করেছি বলে তিনি আমাদিগকে দেখতে এসেছিলেন। এঁর তিন পুত্র মেধাতিথি ও পুত্র ও অগ্নিবাহু ঋষিত্রয় তৎপূর্বে এখানে এসেছিলেন।

৬ই জুন মঙ্গলবার ১৯৬১ সকালে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আমি গীতার পরিশিষ্ট 'কল্যাণেশ্বরী মোক্ষতীর্থে'র দ্বিতীয় প্রুফ দেখলাম সাতটা থেকে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত। তখন পূর্বোক্ত বেদাচার্য্য কুমারিল ভট্ট এসে আমার পেছনে দাঁড়ালেন এবং তিন ঘণ্টা যাবৎ স্থিরভাবে থেকে আমাকে বিপুল প্রেরণা দিলেন। আমি ও মহাগৌরী তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি আপত্তি জানালেন। ২০ জুন মঙ্গলবার বৈকাল চারটার পর আমি 'দিব্যদৃষ্টি' গ্রন্থোক্ত 'ব্রহ্মাপূজা' শীর্ষক নিবন্ধের প্রুফ দেখছিলাম—মহাগৌরী কপি পড়ছেন ও আমি প্রুফ সংশোধন করছি। এমন সময় মহাগৌরী দেখলেন, আমার পেছনে

তিন চার হাত দূরে কুমারিল ভট্ট প্রুফ-পড়া শুনছেন। তিনি প্রায় এক ঘণ্টা ছিলেন এবং ইসারায় মহাগৌরীকে বারণ করেছিলেন, আমাকে তাঁর উপস্থিতির কথা জানাতে। আমি জানতে পারলে তাঁকে প্রণামাদি করি বলে আজ তিনি আড়ালে ছিলেন। ২১ জুন বুধবার সকালে দক্ষিণ বারান্দায় আমরা 'দিব্যদৃষ্টি' গ্রন্থোক্ত 'অতীন্দ্রিয় অনুভূতি' শীর্ষক প্রুফ দেখছিলাম—পূর্বদিনবৎ মহাগৌরী কপি পড়ছিলেন ও আমি প্রুফ সংশোধন করছিলাম প্রায় তিন ঘণ্টা। আজও কুমারিল ভট্ট এসে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে প্রুফ পড়া শুনলেন প্রায় তিন ঘণ্টা।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় আমাদের গঙ্গা-প্রতিমা নিশ্চিন্দা থেকে আনা হল। তখন আমি মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে শংখধ্বনি করলাম ও বারান্দাস্থ বড় ঘণ্টা বাজালাম এবং মহাগৌরী কমণ্ডলু হাতে নিয়ে নাটমন্দিরে গঙ্গাজল ছিটাতে গেলেন। তৎপূর্বেই আমি দেখলাম, সুভদ্রা শংখহস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। মহাগৌরীও সুভদ্রাকে শংখ হস্তে নেমে যেতে দেখেছেন। স্নেহের সুভদ্রা পশ্চিম ফটক পর্যান্ত প্রতিমার কাছে গেলেন। আগামী পরশু শুক্রবার দশহরা দিবসে এখানে প্রতিমায় তৃতীয় বার্ষিক গঙ্গাপূজা হবে।

———

—নয়—

ধর্মচক্রে দুর্গোৎসব

বেলুড় ধর্মচক্রে ১ ৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হতে বসন্তকালে প্রতিমায় দুর্গাপূজা হচ্ছে, শরৎকালে দুর্গাপূজা কখনও এখানে হয়নি। ষষ্ঠ বার্ষিক বাসন্তী দুর্গাপূজা হয় ১৯৬১ খ্রীঃ মার্চ মাসে। ২১ মার্চ মঙ্গলবার শুক্লা পঞ্চমীর পূর্বাহ্নে আমি দেখলাম, ওঙ্কার দেবতা আমাকে সর্বদা রক্ষা করছেন। এই কথা মহাগৌরীকে বলায় তিনি বললেন, "দাদু, এখন আপনার ওঙ্কার সাধনা চলেছে। ওঙ্কারের বেড়া কোন দুষ্ট গ্রহ ভেদ করতে পারেন না।" গতকাল থেকে আমার সূক্ষ্মদেহী জননী আমার সঙ্গে ফিরছেন। আজ সকালে তাঁকে বারবার কাছে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, মা, তুমি কিছু বলতে চাও? মা হেসে বললেন, "এ বছর আমার নামে তুই দুর্গোৎসবের সংকল্প কর। আমার ইচ্ছা হয়েছিল, স্থূলদেহে দুর্গোৎসব করবো এবং তুই তা করবি ভাবছিলাম; কিন্তু তা হয়নি তুই সন্ন্যাসী হওয়ায়। তুই এ বছর আমার নামেই দুর্গাপূজা কর।" আমি তাঁকে বললাম, তোমার নামে কেন করবো? আমার গুরুর নামেই করবো। অনন্তর ভৈরবানন্দ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হওয়ায় মা তাঁকে উক্ত অনুরোধই জানালেন। তাই আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও জননীর নামে সংকল্প করিতে সম্মত হইলাম।

সায়ংকালে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে দুর্গাপ্রতিমার সম্মুখে বসেছিলাম। এমন সময় আমি তীব্র দিব্য গন্ধ আঘ্রাণ করে পার্শ্বস্থ মহাগৌরীকে বললাম। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী উভয়ে দিব্যদৃষ্টিতে দেখে বললেন, রাজা সুরথ (যিনি প্রথমে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করেছিলেন) ও মহারাণী সুষমা দেবী ছয়জন পার্ষদ সহ এলেন। সুষমা দেবী হাতে সাদা রায় বেলফুলের গোড়ে মালা (অগুরু ও চন্দন চর্চিত) নিয়ে প্রতিমার

সম্মুখে দাঁড়ালেন। সেই দিব্য মালার তীব্র সুগন্ধ আমি অনুভব করেছিলাম। যখন দেবতারা সাধকের কাছে আসেন, তখন এইরূপ দিব্য গন্ধ বিতরণ করেন এবং সাধকের শরীরে ইহার প্রতিক্রিয়া হয়। রাজা ও রাণীর শুভাগমনের পূর্বেই আমাদের দুর্গাপ্রতিমা জীবন্ত হয়েছিলেন এবং প্রতিমার পশ্চাদ্‌ভাগ দিব্য জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়েছিল এবং দুর্গামূর্তির তৃতীয় নয়ন থেকে জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। রাজা ও রাণী প্রতিমা প্রদক্ষিণ করলেন ও রাণী মাতা সুষমা দুর্গাদেবীর গলায় উক্ত মাল্য পরালেন। অনন্তর তিনি লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, সিংহ, মহিষাসুর প্রভৃতির গলায়ও মালা দিলেন। যখন এঁরা উক্ত রূপে জগদম্বার অর্চনা করছেন, তখন মেধা ঋষি এসে হাজির হলেন। আমরা ঐ ঋষিকে সভক্তি প্রণাম করলাম। মেধা ঋষি সাধারণ মানুষের মত দোহারা চেহারা, বেঁটে, জটা-বল্কলধারী, কাষ্ঠ কমণ্ডলু হাতে। তারপর প্রতিমার উত্তর পাশে বৈশ্য সমাধিকে দেখা গেল। তিনি চার পাঁচ হাত লম্বা, ঋজুদেহ, গৈরিক বস্ত্র পরিহিত, গৌরবর্ণ, গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষমালা, মাথায় জটা। মেধা ও সমাধি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মহাগৌরীর দিকে তাকালেন। আমরা জ্ঞানী সমাধিকে বললাম, ঠাকুর, আপনি ত্রেতাযুগের লোক। আপনার পূর্বদেহ দেখান। তখন তিনি তাঁর আদি দেহ দেখালেন। তাঁর মাথা ছাদে ঠেকিল, আজানুলম্বিত দীর্ঘ বাহু, সুপুষ্ট বলিষ্ঠ শরীর। ত্রেতাযুগের মানবদেহ এত দীর্ঘ, পুষ্ট ও সুস্থ ছিল। কালক্রমে নরদেহ ক্ষুদ্র, দুর্বল ও বেঁটে হয়েছে। ত্রেতাযুগে দুর্গাপূজা করার ফলে সুরথ ও সুষমা স্বর্গের মন্বন্তরবাসী ও দেবীলোক পর্য্যন্ত গমনে সমর্থ ছিলেন। সাবর্ণি মন্বন্তরে সুরথ সাবর্ণি মনু হয়ে জন্মালেন। তখন তিনি দেবী সাধনায় জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেন। আমি প্রথমে মেধা ও পরে সমাধিকে সূক্ষ্মদেহে নতজানু হয়ে প্রণাম করলাম। তখন তাঁরা হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করলেন এবং আমাদের প্রার্থনায় দোতলায় মন্দিরে গেলেন।

তাঁরা আমাদের দুর্গোৎসবের কয়দিন এই মন্দিরে রইলেন। ঐ রাত্রে মহাগৌরী দুর্গাদেবীকে ফল-মিষ্টি নিবেদন করলেন ও দেখলেন, "সুরথ ও সুষমা বিবিধ ফল (গোটা ও কাটা) ও মিষ্টি এনে নৈবেদ্য সাজিয়েছেন এবং মেধা ঋষি দুর্গাপূজা করছেন। রাজা ও রাণী এত ফল-মিষ্টি এনেছেন যে, সেগুলি বৃহৎ স্তূপে পরিণত হইয়াছে। পর্বতপ্রমাণ কলা-স্তূপ, রাশীকৃত আঙ্গুর, আপেল, নাসপাতি, কমলা, আম, তরমুজ, কাঁকুড়, ফুটি, আনারস, আখ প্রভৃতি অনেক অদ্ভুত ফল—অর্ধেক গোটা ও অর্ধেক কাটা—সন্দেশ, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, পানতোয়া, সরভাজা, বাদাম তক্তি, ক্ষীরের নাড়ু, গুজিয়া, অমৃতী, জিলিপী, খাজা, গজা, সীতাভোগ, ছানার পলোয়া ইত্যাদি প্রত্যেক মিষ্টি পর্বতপ্রমাণ।"

২২ মার্চ বুধবার বাসন্তী ষষ্ঠীর ভোরে তিনটা থেকে চারটার মধ্যে মহাগৌরী ভগবান রামচন্দ্রকে তাঁর শয্যাপার্শ্বে দেখেছিলেন। রামচন্দ্র ধনুকধারী ও বনবাসীর বেশে এসেছিলেন। ভোর বেলা মহাগৌরী উত্তর বারান্দার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলেন, মন্দিরে রাজা ও রাণী বিবিধ মিষ্টি দুর্গা, গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতিকে দিচ্ছেন। দিব্য মিষ্টির দিব্য গন্ধ পেয়েই মহাগৌরীর দিব্যদৃষ্টি রুদ্ধদ্বার মন্দিরের প্রতি আকৃষ্ট হলো। গণেশ ঠাকুর পা ছড়িয়ে আনন্দে মিষ্টি খাচ্ছিলেন। গোপালজী এক পাশে মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়েছিলেন। তা দেখে মা দুর্গা তাঁকেও ভাল করে খাইয়ে দিলেন। মহাগৌরী মন্দিরে ঢুকতেই গোপাল সাহস পেয়ে মিষ্টি খেতে এগিয়ে গেলেন। পূর্ব রাত্রে অশোকা দেবী আমার শয্যাপার্শ্বে ছিলেন—মাথায় লাল পাড় কাপড়, গায় লাল জামা, অলংকারে গৃহবধূবৎ সুসজ্জিত, মাথায় মুকুট নাই, কিন্তু স্বর্ণ সিঁথি পরা। পরে অশোকা দুর্গাপ্রতিমার কাছে নাটমন্দিরে গেলেন। ইনি ব্রহ্মার লোকে থাকেন ও আজ অশোকা ষষ্ঠী বলে মর্ত্যে এসেছেন—ইনি মানবী থেকে দেবী হয়েছেন। সত্যযুগে অশোকা দেবী সাধনায় অশোক বৃক্ষমূলে এই

ষষ্ঠী তিথিতে সিদ্ধিলাভ করে ব্রহ্মলোকের অধিবাসিনী হন। ঐদিন সীতা অশোকবনে অশোক বৃক্ষতলে ষষ্ঠীপূজা করে মর্ত্যলোকে প্রথম ষষ্ঠীপূজা প্রবর্তন করেন। আজ মেয়েরা অশোক ফুলের সাতটা কুঁড়ি খেয়ে থাকেন; কারণ সীতাদেবী ঐদিন কয়েকটি অশোক কুঁড়ি খেয়েছিলেন এবং অশোক ফুল দিয়ে অশোকা ষষ্ঠীর পূজা করেছিলেন।

সকাল বেলা সাড়ে নয়টায় মহাগৌরী মন্দিরে অশোকা দেবীকে দুধ ও মিষ্টি নিবেদন করলেন। অশোকা দেবী তাহা গ্রহণ করলেন এবং মন্দিরস্থ দুর্গাদি দেবতাগণকে ও সুরথ, সুষমা ও মেধাদি মুনিগণকে প্রসাদ দিলেন। সুষমা রাণীও কিছু ফলমিষ্টি অশোকা দেবীকে নিবেদন করলেন। অনন্তর অশোকা মহাগৌরীকে দেখালেন, একটি রাজবাড়ীর মধ্যে তিনি রয়েছেন এবং তন্মধ্যে পঞ্চমন্দির অবস্থিত—চার দিকে চারটী মন্দির ও মধ্যস্থ মন্দিরে তিনি উপবিষ্ট। উক্ত পঞ্চ মন্দিরে স্বর্ণময় কারুকার্য্য দৃশ্যমান। আজ আমাদের মন্দিরে দুপুরে পূজাকালে অশোকা দেবীকে পূজা করে নৈবেদ্য দেওয়া হলো। তিনি দয়া করে আমাদের পূজা ও নৈবেদ্য গ্রহণ করলেন গভীর প্রীতিভরে। যখন আমরা ফলমিষ্টির নৈবেদ্য মা কালীকে নিবেদন করলাম, তখন রাজা সুরথ স্বয়ং দ্বাদশ মৃণ্ময়প্রদীপ একটি তাম্র থালায় সাজিয়ে জ্বেলে দিলেন। দ্বাদশ প্রদীপ বেশ বড় ও লাল মাটীতে তৈরী। অনন্তর তিনি বিবিধ ফলমিষ্টি আমাদের নৈবেদ্যের সঙ্গে নিবেদন করলেন। তখন কালী ও দুর্গা একত্রে আসনে বসলেন ও নিবেদিত দ্রব্যাদি গ্রহণ করলেন। অনন্তর অন্নভোগ ও পায়সাদি মা কালীকে নিবেদন করা হলো। আমাদের সঙ্গে রাণী সুষমা বিবিধ পায়স, পিষ্টক, পলোয়া, মিষ্টি, ঘি ভাত, সাদা ভাত, খিচুড়ি, নানা ব্যঞ্জন প্রভৃতি মা কালী ও মা দুর্গাকে নিবেদন করলেন এবং সর্বলোকের অসংখ্য দেবদেবীকে অন্নাদি খেতে ডাকলেন। তখন কালী ও দুর্গা তাঁহাদিগকে প্রসাদ দিলেন, দশভুজা দুর্গাদেবী দশ হাতে প্রচুর প্রসাদ বিলালেন।

ব্রহ্মজ্ঞ ঋচিক মুনি প্রসাদ গ্রহণান্তে আমার গলায় চার হালির একটী সাদা ফুলের মালা দিলেন এবং মাথা নীচু করে শ্রদ্ধা জানালেন এবং কল্কি ও কল্কিগুরুর দিকে একদৃষ্টে চাইলেন। তখন আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ায় পূজা করতে পারছিলাম না বলে, মা দুর্গা ময়ুর পাখা দিয়ে কন্যাবৎ আমাকে ব্যজন করছিলেন। ইহার ফলে অচিরে আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করলাম ও পূজায় পুনঃ প্রবৃত্ত হলাম।

১৭ই মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যার পূর্বে নাটমন্দিরে আমি একা বসে আছি আরাম চেয়ারে। এমন সময় আমি দেখলাম, মা দুর্গা কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহ আমার সামনে বেড়াচ্ছেন এবং কাল ভৈরব কার্তিক ও গণেশকে পাহারা দিচ্ছেন। ১৬ই মার্চ বৃহস্পতিবার বৈকালে রূপপুর থেকে এক দীক্ষিত দম্পতী এলেন পাঁচ বৎসর পরে স্বপ্নাদেশ পেয়ে। মা দুর্গা লাল শাড়ী পরা সুন্দরী বালিকা বেশে উভয়কে রূপপুরের গৃহে স্বপ্নে বলছেন, বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্রের স্বামিজীকে তোমার গাছের পাকা কাঁঠালী কলা দিলে আমি গ্রহণ করবো। তারা ঐ স্বপ্নাদেশ পেয়ে আজ এসেছে। যখন আমাদের নাটমন্দিরে বসে তারা ঐ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলছিলেন, তখন মা দুর্গা স্বপ্নদৃষ্ট সুন্দরী বালিকামূর্তিতে আমাদের সামনে এলেন ও ভক্তদ্বয়কে প্রদত্ত স্বপ্নাদেশ সমর্থন করলেন। পাঁচ ছয় মাস পূর্বে ঐ কাঠালী কলাগাছ রোপণ কালে তারা মানস করেছিল, যদি এই গাছে কলা হয় ও পাকে, তাহলে প্রথমে বেলুড় ধর্মচক্রে দেবতার জন্য দেবো; কিন্তু তারা সেই মানস ভুলে গিয়েছিল। তাই গাছে কলা পাকতে মা দুর্গা নিজে তাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। দুর্গাপূজায় কাঠালি কলা ব্যবহারই শাস্ত্রবিধি, কিন্তু আমরা ধর্মচক্রে দুর্গাপূজায় চাঁপা কলা দিয়ে আসছি গত পাঁচ বৎসর, কাঁঠালি কলা না পেয়ে। তাই মা দুর্গা এই কাণ্ড করলেন।

২৬শে মার্চ রবিবার বাসন্তী বিজয়া পড়েছিল। সকালে দশমী পূজায়

বসতে দেরী হচ্ছে দেখে, রাণী সুষমা মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় এসে আমাকে পূজায় যেতে বললেন। গত বর্ষের ন্যায় এইবৎসরও আমি পূজক ও বিশ্বরূপানন্দ তন্ত্রধারক ছিলাম এবং মহাগৌরী আমার ডান দিকে বসে গন্ধপুষ্প, ধূপদীপ, নৈবেদ্যাদি দেবতাগণকে নিবেদন করিতেছিলেন। ২৪শে মার্চ শুক্রবার রাত্রে সন্ধিপূজা শেষ করতে ৪৮ মিমিট উত্তীর্ণ হওয়ায় পরদিন শনিবার মহানবমীর সন্ধ্যায় প্রাকৃতিক ভীষণ দুর্যোগ ও আমার শরীর অসুস্থ হয়েছিল। তাই রবিবার সকালে রাণীমা সুষমা যথাসময়ে পূজায় বসতে আমাকে বলতে এসেছিলেন। শনিবার পূর্বাহ্নে নবমীবিহিত পূজাকালে শিবস্নানের পূর্বে সুষমা দেবীর অতি সুন্দর পূর্ণমূর্তি আমি পূজাস্থলে দেখলাম—তাঁর শাড়ীর খোল স্বর্ণচাপার মত বড় লাল, দেবীবৎ সুন্দরী ও দেবী-লোকের অধিবাসিনী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণা। আমিও মহাগৌরী তাঁকে অনুরোধ করলাম, আপনি আমাদের মন্দিরে থাকুন। তখন তিনি দেবীলোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে জানালেন, "ওখানেই থাকবো। তবে মাঝে মাঝে এখানে আসবো।" সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিন তিনি আমাদের শিবস্নানান্তে শিবপূজা করলেন। রবিবার বৈকালে প্রায় পাঁচটায় আমি দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছি। রাণীমা আমার কাছে এসে শ্রদ্ধাভরে মাথা নীচু করে বিদায়ের অনুমতি চাইলেন। আমিও সজল নয়নে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কন্যাতুল্যা সুষমাকে বিদায় দিলাম। যতক্ষণ আমি অনুমতি দিলাম না, ততক্ষণ তিনি আমার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং শেষে সজল নয়নে বিদায় নিলেন।

রবিবার পূর্বাহ্নে আমরা শিবপূজান্তে প্রতিমাস্থ দেবতাগণকে পূজা করলাম ও নৈবেদ্য দিলাম এবং সর্বশেষে ঠাকুরের পূজা করলাম। পূজান্তে দীপারতির সময় দুর্গা দেবী আমার গলায় একটী দিব্য মাল্য ও মহাগৌরীর গলায় একটী দিব্য মাল্য দিলেন। উভয় মাল্যই শ্বেতপদ্মে গ্রথিত। নিরঞ্জনান্তে দুর্গাদেবীর একাংশ আমাদের মন্দিরে প্রবেশ করলেন

এবং বাকী অংশ দোলায় চড়ে কৈলাসে গেলেন। আমার কন্যা দুর্গা মর্ত্য পিতার বাড়ী থেকে যাবার সময় মুখ ভারী করলেন ও তাঁর চোখে জল এল। নিরঞ্জনান্তে নির্মাল্যবাসিনী ও অপরাজিতার পূজা করলাম। নির্মাল্যবাসিনী ষোড়শভূজা, সবুজ পত্রবৎ গাত্রবর্ণ ও পোষাক এবং স্বর্ণালংকারভূষিতা। অপরাজিতার গাত্রবর্ণ ও শাড়ীর রঙ গাঢ় নীল বর্ণ। তিনি চতুর্ভুজা। আমরা রাত্রি দশটার সময় নীচে পশ্চিম বারান্দায় বসে আছি। তখন তিনি লাল গুলঞ্চ ফুলের মালা হাতে নিয়ে আমার সামনে শ্রদ্ধাভরে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিলেন—মেয়ের মত বাপের গলায় মালা দেবার জন্য। আমরা অন্য কথায় ব্যস্ত থাকায় তিনি ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন। পরে যখন আমি স্বীয় শয্যায় শুইলাম, তখন অপরাজিতা আমার গলায় উক্ত মালা পরিয়ে দিলেন। তাঁকে নবমী পূজার সময় দুর্গাপ্রতিমার সামনে আমি দেখেছিলাম। তিনি বিজয়া থেকে তিন দিন আমার সঙ্গে ছায়ার মত ছিলেন। যখন আমি নবমীর রাত্রে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে শয্যাগত ছিলাম, তখন অপরাজিতা স্বর্গীয় ভৃঙ্গারের দিব্য জল আমার মুখে দিলেন। তৎপূর্বে পূজিতা কুমারী ভৈরবী আমার মুখে প্রসাদী সন্দেশের গুঁড়ো দিলেন। ঐ দিব্য জল ও মিষ্টি খেয়ে আমি মহাগৌরীকে বললাম। অপরাজিতা দেবীর পূজা নিম্নোক্ত ধ্যানে করা হয়—

ওঁ চতুর্ভুজাং পীতবস্ত্রাং সর্বাভরণভূষিতাম্।
উপর্যধোহস্তয়োঃ খড়্গাবর্মধরাং অধস্তনহস্তয়োর্বরাভয়করাম্।
ঈষৎ-প্রহসিতাননাং বাগ্মিনীম্।

অপরাজিতার আরও পঞ্চবিধ ধ্যানমন্ত্র পাওয়া যায়। ঐ গুলির কোনটিতে দেবী পীতবস্ত্রা এবং কোনটিতে বা শুক্লবস্ত্রা রূপে বর্ণিতা। বৌদ্ধতন্ত্র অনুসারে 'অপরাজিতা পীতা দ্বিভুজৈকমুখী নানারত্নোপশোভিতা গণপতি সমাক্রান্তা চপেটদানাভিনয়দক্ষিণকরা গৃহীত পাশতর্জনিক

হৃদয়স্থিতবামভূজা অতি ভয়ঙ্কর করাল-রৌদ্রমুখী অশেষমারনির্দলনী ব্রহ্মাদিদুষ্টরৌদ্রদেবতা পরিকরোচ্ছ্রিতচ্ছত্রা চেতি।' অপরাজিতা দেবীর একটি অভগ্ন মূর্তি কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। হিন্দুতন্ত্রের অপরাজিতা বৌদ্ধতন্ত্রের অপরাজিতা অপেক্ষা সৌম্যতরা। কাশীখণ্ড অনুসারে অপরাজিতা শিবপত্নী উমার রূপভেদমাত্র। দেবীপুরাণ ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীর মতে অপরাজিতা চৌষট্টি যোগিনীর অন্যতমা। দুর্গাপূজার ন্যায় কালীপূজাতেও অপরাজিতা পূজিতা হন। শ্যামা কবচে আছে, মাহেশ্বরী চ চামুণ্ডা কৌমারী চাপরাজিতা। জগদ্ধাত্রীপূজা ও অন্নপূর্ণা পূজায় অপরাজিতা পূজা বিহিত। মৎস্যপুরাণে (১৬৯।৩) অপরাজিতা দুর্গাদেবী মাতৃকাগণের অন্যতমারূপে উল্লিখিত। অন্ধকাসুরের রক্তপানার্থ মহাদেব অপরাজিতা মাতৃকাকে সৃষ্টি করেন। বামন পুরাণে আছে, ইনি গৌতম ও অহল্যার চারি কন্যা জয়া, বিজয়া, অপরাজিতা ও জয়ন্তীর অন্যতমা। এই চারি ভগিনীকে শিবজায়া সতীর সহচরী সখী বলাও হয়েছে। বরাহ পুরাণে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তীও অপরাজিতাকে মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের চক্ষু থেকে উৎপন্ন বৈষ্ণবী মূর্তির সহচরী বলা হয়েছে। আবার ব্রহ্মপুরাণ বলেন, অপরাজিতা মহাশনি দৈত্যের পত্নী। মহাভারত অনুসারে অপরাজিতা স্কন্দপত্নী বা কৌমারী, দেবসেনার জননী ও বজ্রী ইন্দ্রের মাতৃস্বসা এবং প্রজাপতি দক্ষের কন্যা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে অপরাজিতার নাম উল্লিখিত।

দেবী অপরাজিতা সর্বব্যাধিনাশিনী ও সর্বকামদায়িনী। বিজয়া দশমীতে অপরাজিতা পূজা বিহিত দুর্গাপূজার অঙ্গহীনতা দূরীকরণার্থ। অপরাজিতার প্রণামমন্ত্রে আছে, অপরাজিতা রুদ্রলতা করোতু বিজয়ং মম। পূজান্তে অপরাজিতা লতা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিতে হয়। শ্রীহট্টে প্রচলিত কুলপ্রথা অনুসারে বিজয়া দশমীতে একটি পাত্রে অপরাজিতা লতা রেখে তাতে মা দুর্গার অর্চনা করা হয়। পূজান্তে এই অপরাজিতা লতা

খণ্ড খণ্ড করে কেটে সাদা সরিষা ও হলুদের সঙ্গে হলুদ রঙের কাপড়ে ছোট ছোট পুঁটলিতে বাঁধা হয় এবং হলদে সুতা দ্বারা প্রত্যেকের ডান বাহুতে বেঁধে দেওয়া হয়। কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপূজায় বিজয়া দশমী কৃত্য সমাপনান্তে সকলের ডান হাতে শ্বেত অপরাজিতা লতা ধারণের প্রথা উল্লিখিত। বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ, কালিকাপুরাণ ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী অনুসারে পূজাবিঘ্ন বিনাশার্থ অপরাজিতা লতা ব্যবহার বিহিত। অপরাজিতা দুর্গার অংশভূতা আরোগ্যদায়িনী মহাদেবী।

২৬শে মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে রামায়ণ গান শুনতে প্রায় এক হাজার নরনারী সমবেত হয়েছিল। তখন দুর্গাপ্রতিমার সম্মুখে মহর্ষি বাল্মীকি দিব্যদেহে এসে পদ্মাসনে বসলেন কোলের উপর স্বরচিত রামায়ণ রেখে। মহাগৌরী আমাকে ঐ কথা বলতেই আমি তাঁকে স্পষ্টভাবে দেখলাম ও ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। একটু পরে তিনি আমার সামনে এগিয়ে এসে আমার গলায় সাদা ফুলের গোড়ে মালা একটী পরিয়ে দিলেন ও হাসতে লাগলেন। মহর্ষি বাল্মীকি মধ্যমাকৃতি, লম্বা পাকা দাড়ি পেট পর্যান্ত ঝুলছে, লম্বা রুক্ষ জটা, মাথার সামনে টাঁক, সুপ্রশস্ত কপাল, শুভ্র কান্তি, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ নাসা, ভ্রূদ্বয়ের চুলও পাকা ও খালি গা। রামায়ণ গায়ক লব-কুশের যুদ্ধ বর্ণনা করছিলেন। তখন রাম-সীতা, লব-কুশ ও মহাবীর দিব্য দেহে আবির্ভূত হলেন। পরে দেবর্ষি নারদ এলেন। অসংখ্য সূক্ষ্মদেহী এবং এমন কি, ধর্মদেব কুকুরমূর্তিতে এসে রামলীলাগান শুনছিলেন। মহাভারতে আছে, যখন যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গারোহণ করছিলেন, তখন ধর্মদেব কুকুর মূর্তিতে তাঁকে পথ দেখিয়ে তাঁর অগ্রে গিয়েছিলেন। যখন তিনি স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হলেন, তখন ইন্দ্রদেব কুকুরকে স্বর্গে ঢুকতে বাধা দিলেন ও ধর্মরাজ ছদ্মবেশ ছেড়ে স্বীয় মূর্তি দেখালেন। লব-কুশের মধ্যে একজন ঈষৎ শ্যামবর্ণ ও অন্যজন গৌরবর্ণ—উভয়ে মনোহর কিশোর মূর্তি।

সীতার কেশদাম যেন আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল।. যখন গায়ক সীতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন, তখন সীতা তাঁর বিরাট মূর্তি একবার দেখালেন। অদ্ভুত রামায়ণে সীতার বিশ্বরূপ বর্ণিত আছে। কিঞ্চিৎ পরে সীতা শান্ত মূর্তি ধরলেন।

২৩শে মার্চ বৃহস্পতিবার বাসন্তী সপ্তমী পড়েছিল। ষষ্ঠীর রাত্রে বিল্ববৃক্ষ পূজা হলো এবং মা দুর্গা বিল্ববৃক্ষে বাস করলেন। যখন মহাগৌরী বিল্ব-শাখা ছেদন করলেন, তখন দেখা গেল, বিল্ববৃক্ষ জীবন্ত ও ডাল থেকে রক্ত পড়ছে, যেমন জ্যান্ত দেহ কেটে গেলে রক্ত পড়ে! তাহা দেখে মহা-গৌরীর গা শিড় শিড় করল ও তাঁর মনে হল, তিনি যেন নিজের গা-ই কেটেছেন!! সুরথ ও সুষমা দুর্গাপূজার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বদ্রব্য এনেছিলেন। যখন মহাগৌরী অধিবাসের দ্রব্যনিচয় দেবীঘটে ও প্রতিমায় ঠেকালেন, তখন সুষমা রাণীও স্বীয় দিব্য দ্রব্য উক্তরূপে ঘটে ও প্রতিমায় ঠেকালেন। রাবণ ও তৎপত্নী মন্দোদরী দুর্গাপূজার তিন দিনই মণ্ডপে ও মন্দিরে ছিলেন। মহাস্নানের সময় দৈত্যদানবাদি এসে হাত জোড় করে দূরে দাঁড়ালেন এবং গন্ধর্ববৃন্দ ও কিন্নরগণ নানা বাদ্য বাজালেন। ঐ তিন দিনই ব্যাস, নারদ, দেবরাজ ইন্দ্র, বরুণ, গঙ্গা, অনন্তনাগ, নাগকন্যা (ঊর্দ্ধভাগ দেবীবৎ ও নিম্নাংশ শরীর সর্পবৎ), খেচরবাহন ঋষি (নেড়া মাথা, গায় লাল্‌চে আভা, শিশুর মত)—এঁরা সকলে দুর্গা দেবীকে মহাস্নান করালেন। পঞ্চরত্নধৌত জলে দুর্গাদেবীর মহাস্নান বিহিত। হায়! আমাদের একটীও রত্ন ছিল না। রাণী সুষমার আঁচলে দিব্য পঞ্চরত্ন বাঁধা ছিল। তিনি উক্ত পঞ্চরত্ন একটী বড় কোশার জলে দিয়ে সেই জলে দুর্গাদেবীকে মহাস্নান করালেন। যখন অষ্ট ঘটের অষ্টবিধ পূতজলে মহাদেবীর অভিষেক হয়, তখন অষ্ট স্নানমন্ত্র মালবী, ললিত, বিভাস, ভৈরবী, কেদারা, বিরাটী, সপ্ত ও ধানশ্রী—এই অষ্টরাগে গীত হয়।

এই অষ্ট স্নানমন্ত্রের স্বরলিপি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত ‘শ্রীদুর্গা’ গ্রন্থে

পাওয়া যায়। গঙ্গাজলপূর্ণ আদ্যঘট দ্বারা দুর্গাদেবীর অভিষেককালে এই মন্ত্র সমস্বরে উচ্চারিত হল—

ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরা:।
ব্যোম-গঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু॥

তখন মহাগৌরী দেখিলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রমুখ দেবগণ গঙ্গাজল দ্বারা দেবীকে স্নান করাইলেন। বৃষ্টিজলপূর্ণ দ্বিতীয় ঘট দ্বারা দুর্গাদেবীর অভিষেককালে এই মন্ত্র পঠিত হল—

ওঁ মরুতস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীম্।
মেঘাম্বুপরিপূর্ণেন দ্বিতীয়কলসেন তু॥

তখন মহাগৌরী দেখিলেন, সপ্তমরুৎ বৃষ্টিজল দিয়ে মহেশ্বরীকে অভিষিক্ত করিলেন। সরস্বতী নদীর জলপূর্ণ তৃতীয় কলস দ্বারা দুর্গাদেবীর মহাস্নান কালে এইমন্ত্র পড়া হল—

ওঁ সারস্বতেন তোয়েন সম্পূর্ণেন সুরোত্তমে।
বিদ্যাধরাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু তৃতীয়কলসেন তু॥

তখন মহাগৌরী দেখিলেন, বিদ্যাধরগণ সারস্বত সলিল দ্বারা দশ-ভুজাকে মহাস্নাত করাইলেন। সাগর জলে পরিপূর্ণ ঘট দ্বারা দুর্গাদেবীর অভিষেককালে এই মন্ত্র উচ্চারিত হল—

ওঁ শক্রাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্তু লোকপালাঃ সমাগতাঃ।
সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থকলসেন তু॥

তখন মহাগৌরী দেখিলেন, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মাও অনন্ত—এই দশদিকপাল এসে সাগরসলিল দিয়ে দুর্গাস্নান করালেন। সুগন্ধিপদ্মরেণু মিশ্রিত জলপূর্ণ পঞ্চম ঘট দ্বারা দুর্গাদেবীর মহাস্নানকালে এই মন্ত্র পড়া হল—

ওঁ বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণুসুগন্ধিনা।
পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলসেন তু॥

তখন মহাগৌরী দেখিলেন, বাসুকি, অনন্ত, তক্ষক, পদ্ম, মহাপদ্ম, কুলীর, কর্কট, ও শংখ—এই অষ্টনাগ ও তৎপত্নীগণ (দেহের উর্ধভাগ দেবীবৎ ও নিম্নাংশ সর্পাকৃতি) পদ্মরজোমিশ্রিত জল দ্বারা দুর্গাস্নান করাইলেন। নির্ঝর জলে পরিপূর্ণ ষষ্ঠ ঘট দ্বারা দুর্গাদেবীর মহাস্নান-কালে এই মন্ত্র পড়া হল।—

ওঁ হিমবদ্ধে মুকুটাঢ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্তু পর্বতাঃ।
নির্ঝরোদকপূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু॥

তখন মহাগৌরী দেখিলেন, তুষার মুকুটধারী হিমালয়াদি পর্বত এসে ঝরণার জল দিয়ে দেবী দুর্গার মহাস্নান করালেন। হিমালয়াদি পর্বতাকারে এসে দেবমূর্তি ধরলেন ও স্নান করালেন। প্রয়াগ, পুষ্কর, প্রভাসাদি তীর্থজলপূর্ণ সপ্তম কলস দ্বারা মহাস্নান কালে এই মন্ত্র পড়া হল।—

ওঁ সর্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন কলসেন সুরেশ্বরীম্।
সপ্তমেনাভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্তখেচরাঃ॥

তখন মহাগৌরী দেখিলেন, সপ্ত খেচর ঋষি এসে সর্বতীর্থবারি দ্বারা দুর্গাস্নান করালেন। খেচর ঋষিদের নিম্নদেহ পাখীর মত ও উর্দ্ধদেহ (বুক থেকে মুখ পর্য্যন্ত) বালক ঋষির মত। সুশীতল সলিলপূর্ণ অষ্টম কলস দ্বারা দুর্গাদেবীর অভিষেককালে এই মন্ত্র পড়া হল।—

ওঁ বসবশ্চাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু।
অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥

তখন মহাগৌরী দেখিলেন, আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস—এই অষ্টবসু এসে শীতল সলিল দ্বারা দুর্গাদেবীর মহাস্নান করালেন। এই অষ্টমন্ত্র পাঠে অষ্ট মঙ্গল মা দুর্গা দান করেন। অনন্তর এই মহাস্নান-মন্ত্র উচ্চারিত হলো।—

আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরয়ূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা॥
সর্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ॥

তখন মহাগৌরী দেখিলেন, উল্লিখিত একাদশ নদীদেবী ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে এসে মা দুর্গাকে স্নান করালেন স্বজলপূর্ণ স্বর্ণভৃঙ্গার দ্বারা। যখন নিম্নোক্ত মন্ত্রাবলী পঠিত হলো—

ওঁ সুরাস্তামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম বিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সংকর্ষণো প্রভুঃ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।
আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান যমো বৈ নৈঋতস্তথা॥
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিত শেষো দিক্‌পালা পান্তু তে সদা॥
কীর্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতি র্মেধা পুষ্টি শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিস্তুষ্টিশ্চ মাতরঃ॥
এতাস্তামভিসিঞ্চন্তু ধর্মপত্ন্যঃ সমাগতাঃ॥

তখন মহাগৌরী দেখিলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বাসুদেব, জগন্নাথ, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, আখণ্ডল (ইন্দ্রদেব), অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, পবন, কুবের, শেষনাগ এবং চতুর্দশ ধর্মপত্নী এসে মা দুর্গাকে মহাস্নান করালেন। অনন্তর নিম্নোক্ত স্নানমন্ত্র উচ্চারিত হলো—

আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজা।
গ্রহাস্তামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥
দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতরঃ এব চ॥

দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ।
অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ ॥
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ ॥
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥

তখন মহাগৌরী দেখিলেন, সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—এই নবগ্রহ এবং ঋষিবৃন্দ, মুনিগণ, সুরভি, দেবমাতৃগণ, পৃথ্বী-দেবী, দিঙ্নাগগণ, বিরোচনাদি দৈত্যগণ, উর্বশী প্রমুখ অপ্সরাগণ, বজ্রাদি অস্ত্রসমূহ ও শস্ত্র সকল, ইন্দ্রাদি রাজগণ, ঐরাবতাদি বাহন, ক্ষণাদি কালাংশ, নানা সাগর ও পর্বত,যক্ষরাক্ষসাদি, বাসুকী প্রভৃতি সর্প এসে দুর্গাদেবীকে মহাস্নান করালেন। সকলে দুর্গার মাথায় জল ঢালিতে পারেন না। জলপূর্ণ পাত্র হস্তে নিয়ে তাঁরা দেবতাদের পাশে দাঁড়িয়ে মহাস্নান দেখেন। তখন দুর্গাদেবী দশভূজা জগদম্বা মুর্তি ধারণ করেন। অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রাবলী পঠিত হল।—

ওঁ সিন্ধুভৈরবশোণাদ্যা যে নদাঃ ভুবি সংস্থিতাঃ।
সর্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাম্।
ওঁ কুরুক্ষেত্রঃ প্রয়াগশ্চ অক্ষয়ো বটসংজ্ঞকঃ।
গোদাবরী বিয়দ্ গঙ্গা নর্মদা মণিকর্ণিকা ॥
সর্বাণ্যেতানি তীর্থানি ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাম্ ॥
ওঁ তক্ষকাদ্যাশ্চ যে নাগাঃ পাতালতলবাসিনঃ ॥
সর্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু ত্বাম্ ॥

তখন মহাগৌরী দেখিলেন, সিন্ধু, ভৈরব, শোণ, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, অক্ষয় বট, গোদাবরী, গঙ্গা, নর্মদা, মণিকর্ণিকা, তক্ষকাদি পাতালবাসী নাগ প্রভৃতি দুর্গাদেবীর মহাস্নানার্থ সত্বর এলেন। অনন্তর নিম্নোক্ত স্নানমন্ত্র পঠিত হলো।—

ওঁ দুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্তিকী তথা।
হরসিদ্ধাঃ তথা কালী ইন্দ্রাণী বৈষ্ণবী তথা॥
ভদ্রকালী বিশালাক্ষী ভৈরবী সর্বরূপিণী।
এতাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাম্॥

তখন মহাগৌরী দেখিলেন, চণ্ডেশ্বরী, চণ্ডী, বারাহী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, ইন্দ্রাণী, ভদ্রকালী, বিশালাক্ষী, ভৈরবী প্রভৃতি এসে দুর্গাদেবীকে স্নান করালেন।

বাসন্তী দুর্গাপূজাই আদিপূজা বলে ইহাতে বোধন নাই। শারদীয়া দুর্গাপূজা ভগবান রামচন্দ্র রাবণবধার্থ করেন। ইহা অকাল বোধন। নিম্নলিখিত দুর্গাধ্যান সর্বত্র প্রচলিত।—

ওঁ জটাজুটসমাযুক্তামর্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাম্॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দিনীম্॥
মৃণালায়তসংস্পর্শদশবাহুসমন্বিতাং।
ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণেন বিচিন্তয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপং চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তাৎ মহিষং তদ্বৎ বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বৎ দানবং খড়্গপাণিনম্।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং॥

রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটিভীষণাননাম্॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশং চ দুর্গয়া।
বমৎ রুধিরবক্ত্রং চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠো মহিষোপরি॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং॥
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্বকামফলপ্রদাম্।
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপং অমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
ওঁ উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা॥
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং॥
চিন্তয়েৎ জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্॥

ধ্যানোক্ত শ্রীদুর্গার সহিত গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জয়া ও বিজয়া সহ চিন্ময়ী প্রতিমা মহালয়া থেকে আমাদের মন্দিরে দেখা গিয়াছে। তন্ত্রসারে অষ্টভুজা মহিষমর্দিনীর নিম্নোক্ত ধ্যান পাওয়া যায়।—

গারুড়োপলসন্নিভাং মণিময়কুণ্ডলমণ্ডিতাং
নৌমি ভালবিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গনিষেদুষীং।
শংখচক্রকৃপাণখেটকবাণকার্মুকশূলকান্
তর্জনীমপি বিভ্রতীং নিজবাহুভিঃ শশিশেখরাম্॥

ফাল্গুনী শুক্লপক্ষে সাগরবন্ধনার্থ রামচন্দ্র ভারত মহাসাগর তীরে ঘটে দুর্গাপূজা করেন। তখন অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী আবির্ভূতা হন ও তাঁকে বর দেন। আবার ভগবান্ রাবণবধার্থ ভাদ্র শুক্লপক্ষে লংকার দক্ষিণ দ্বারে রৈবতকে ঘটে দুর্গাপূজা করেন। তখন দুর্গাদেবী অষ্টভূজা স্থূলমূর্তিতে আবির্ভূত হন। অষ্টভুজা দুর্গাদেবী অষ্টসিদ্ধির মূর্তি—অণিমা, লঘিমা,

ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই অষ্টসিদ্ধি দুর্গাদেবীর অষ্টভুজরূপে প্রকটিত। ইন্দ্র চৈত্র মাসে দেবলোকে প্রথম দশভুজ দুর্গামূর্তি পূজা করেন। তৎপরে ত্রেতায় বৈবস্বত মন্বন্তরে রাজা সুরথ প্রথম মর্ত্যলোকে দশভুজা দুর্গামূর্তি পূজা করেন। মেধামুনির নির্দেশে সুরথ ও সমাধি স্বকীয় দুর্গতি মোচনার্থ সাধনপূর্বক ঘটে মহামায়ার আরাধনা করেন। ইহার ফলে মহামায়া ঐশ্বর্যশালিনী দশভূজা স্থূলমূর্তিতে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন। এই দিব্যমূর্তি দর্শনান্তে সুরথ রাজা অনুরূপ মৃণ্ময়ী প্রতিমা গড়ে দুর্গাপূজা করেন। ভাদ্রমাসে ভদ্রকালী পূজার দিনে বৈষ্ণব প্রথানুসারে অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী পূজা হয়।

অনন্তর সুষমা দুর্গার গায় হলুদ মাখিয়ে দিলেন ও দেবী চুল খুলে স্নান করলেন। নবমীতে মহাস্নানকালে আমি স্পষ্টভাবে দেখলাম, দুর্গাদেবী লম্বা চুল ছেড়ে মানবীর মত স্নান করছেন। আমরা দুর্গাকে বস্ত্র ও মাল্য দানের পর সুষমা রাণীমা দিব্য বস্ত্র ও দিব্য মাল্য দুর্গা ও লক্ষ্মী ও সরস্বতী ও গণেশও কার্তিক প্রভৃতি দেবতাকে পরিয়ে দিলেন। মেধা, নারদ, সমাধি, ব্যাস, মদীয় গুরুদেব মহাপুরুষজী, আমার পূর্বজন্মের দীক্ষাগুরু পরমানন্দ গিরি পরমহংস, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, কল্কিদেব, গোপালজী, শ্রীমা সারদা, নারায়ণ প্রভৃতি সকল দেবতা, এবং সমাগত ঋষি-মুনিকে সুষমা দেবী পাদ্যার্ঘ্যাদি সহ দিব্যমাল্য দিলেন। বহুবিধ দিব্যাভরণ—শাঁখা, কড়, আংটী প্রভৃতি মনিমাণিক্যখচিত দিব্যালংকার দুর্গাকে পরালেন। নৈবেদ্য নিবেদন কালে বিবিধ ফল-মিষ্টি-প্রত্যেক দ্রব্য পর্বতপ্রমাণ রাণী সুষমা দেবী দুর্গাকে দিলেন আমাদের স্থূল নৈবেদ্য নিবেদিত হবার পরে। অন্নভোগের সময়ও অন্নব্যঞ্জন, পলোয়া, দই-মিষ্টি, রাবড়ি, সন্দেশ, পায়সাদি বিবিধ খাদ্যদ্রব্য রাণী আনিয়ে দুর্গাকে দিলেন। দুর্গাদেবী ঐসব গ্রহণপূর্বক সমবেত দেববৃন্দ ও ঋষিগণকে দশহাতে বিতরণ করলেন। কাল ভৈরব ও রুদ্র ভৈরব নাটমন্দিরের ছাদে ধর্মরাজ ও তাঁর অনুচরবৃন্দকে এবং

শিবলোকাগত শিবভক্তগণকে প্রসাদ দিলেন। ঐ শিবভক্তগণ সকলেই বিকটমূর্তি—কারো এক ঠ্যাং, কারো এক হাত, কারো মাথা নাই, কারো তিন চক্ষু, কারো কপালে একটা বড় চোখ ইত্যাদি। তাই তাঁরা ছাদে ধর্মরাজের অনুচরগণের সঙ্গে প্রসাদ পেলেন। আমরা মা দুর্গাকে প্রার্থনা করলাম, সর্ব লোকের দেবদেবীগণকে ডেকে প্রসাদ দিন। তখন দুর্গাদেবী সূর্যবৎ সমুজ্জ্বল স্বর্ণময় ঘড়িতে তিন বার আঘাত করলেন। সেই শব্দ শুনে মুহূর্তমধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত দেবদেবী আছেন, এক ইঞ্চি পরিমাণ মূর্তি ধরে পূজাস্থলে এসে অন্নপ্রসাদ নিলেন ও আনন্দ প্রকাশ করলেন। তিন দিনই অন্নভোগ নিবেদন কালে উক্তরূপ অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে মহাগৌরী পূজার প্রারম্ভে চণ্ডীপাঠ করলেন। অষ্টমীতে চণ্ডিকাকে আমি প্রতিমার সম্মুখে স্পষ্টভাবে দেখলাম—স্বর্ণমূর্তি, স্বর্ণবর্ণ মুকুট মাথায়, স্বর্ণবর্ণ শাড়ীপরা রাজেশ্বরী দুর্গামূর্তি। চণ্ডীপাঠান্তে চণ্ডিকা আমারও মহাগৌরীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। অষ্টমী পূজার সময় কুমারীপূজার পূর্বে আমরা কুমারী ভৈরবীকে পূজাস্থলে দেখলাম। ঐ কুমারী ভৈরবী শ্যামলাঙ্গী, বার বৎসর বয়স, চুল খোলা, রঙ্গীন শাড়ী পরা, অলংকারবর্জিত, মাথায় মুকুট ছিল না। কুমারী পূজার সময় কুমারী বালিকার সম্মুখে তাঁকেই দেখা গেল এবং তিনিই আমাদের পূজা নিলেন। স্থূলদেহী কুমারী উপলক্ষ্য মাত্র হয়ে বসে রইল। দুর্গাপূজাতেও মৃণ্ময়ী প্রতিমা উপলক্ষ্য হন ও চিন্ময়ী প্রতিমাই পূজা গ্রহণ করেন। মহাষ্টমীর রাত্রে নয়টায় আমরা সন্ধিপূজায় বসলাম। মহাষ্টমীর চব্বিশ মিনিট ও মহানবমীর চব্বিশ মিনিট মোট আটচল্লিশ মিনিটকে অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণ বলে। উক্ত কালের মধ্যে সন্ধিপূজাও ভোগারতি শেষ করাই শাস্ত্রীয় বিধান। ঐ সন্ধিক্ষণে চামুণ্ডা দেবীর পূজা করিতে হয়। চামুণ্ডা রাবণের ইষ্টদেবী ও নিম্নোক্ত ধ্যানে পূজিতা হন।—

ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামা চতুর্বাহুসমন্বিতা।
খট্বাঙ্গচন্দ্রহাসং চ বিভ্রতী দক্ষিণে করে॥
বামে চর্ম চ পাশং চ উর্দ্ধাধোভাগতঃ পুনঃ।
দধতী মুণ্ডমালাং চ ব্যাঘ্রচর্মধরাম্বরা॥
কৃশোদরী দীর্ঘদংষ্ট্রা অতিদীর্ঘাতিভীষণা।
লোলজিহ্বা নিম্নরক্তনয়নারাবভীষণা॥
কবন্ধবাহনাসীনা বিস্তারশ্রবণাননা।
এষা কালী সমাখ্যাতা চামুণ্ডা ইতি কথ্যতে॥

উক্ত মন্ত্রে ধ্যান করতে চামুণ্ডা দেবী এলেন ও আমার সামনে দাঁড়ালেন— বিরাট চেহারা, শ্যামবর্ণ, বড় পেট, শবাসনা, মুণ্ডমালা গলায়, চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না রুদ্রমূর্তি। আর যখন তিনি আমাদের পূজা নিলেন, তখন সাদা থান পরা বৃদ্ধা দেবীর বেশ, যে মূর্তিতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমার গলায় একটী মালা (লাল পাথরের ফুলের) দিলেন এবং আমার ভক্তিপূত পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণাম নিলেন। নিরামিষ অন্নভোগ—মসুর ডালের খিঁচুড়ি ও ব্যঞ্জন ও পাঁপড় ভাজা প্রভৃতি আমরা চামুণ্ডাকে দিলাম। সেই নিরামিষ অন্নভোগ সমবেত দেবদেবীগণকে তিনি বিতরণ করলেন। তৎপরে রাণী সুষমা ও লঙ্কেশ্বর রাবণ কাঁচা মাংস ও কাঁচা মাছ স্তুপাকারে চামুণ্ডাকে নিবেদন করলেন। সেই নিবেদিত কাঁচা আমিষ (তা থেকে টাটকা রক্ত ঝরছিল) চামুণ্ডা পূর্ববৎ ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে নিজে খেলেন এবং তদনুচর বেতাল, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনীদিগকে দিলেন। আমিষ প্রসাদ গ্রহণান্তে চামুণ্ডা পূজাস্থলে সমাধিস্থ ভৈরবানন্দের কোলে বসলেন। সৌম্যা সুন্দরী চণ্ডিকার রুদ্রমূর্তিই চামুণ্ডা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, চণ্ডিকার ভ্রূকুটীকুটিল ললাট-ফলক হইতে করালবদনা চামুণ্ডা বিনিষ্ক্রান্ত হলেন। অনন্তর রুদ্রা চামুণ্ডার আরাধনা আরম্ভ হলো। পিঠুলি-নির্মিত পুতুলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও পূজান্তে উহাকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হলো।

তম্মুহূর্তে রুদ্রচামুণ্ডা আবির্ভূত হলেন—রক্তবস্ত্র পরিহিতা, লোলজিহ্বা, করালবদনা, মুক্তকেশী ও দ্বিভুজা। তিনি প্রথমে মহাগৌরীর গলায় দিলেন একটী দিব্যমালা—রক্তবর্ণ, যেন রক্তধৌত। অনন্তর তিনি মন্দিরের সিঁড়িতে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ গিয়ে দাঁড়ালেন ও ক্রোধে ফুলতে লাগলেন। তখন তাঁর চোখগুলি ভাঁটার মত ঘুরছিল। পরবর্তী দুই মধ্যরাত্রে রুদ্র-চামুণ্ডা এসে আমার ও মহাগৌরীর মানসপূজা নিয়েছেন ষোড়শ উপচারে। তখন আমি পূজকের আসনে ও ভৈরবানন্দ পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং মহাগৌরী মৎসমীপে দাঁড়িয়ে এই পূজা দেখছেন। ইহা থেকে বোঝা যায়, অষ্টমী থেকে পর পর তিন রাতে চামুণ্ডাপূজা করা উচিত। পূজার পর তিনি দুই হাত প্রসারিত করে মৃদু হাস্য করলেন ও প্রসন্ন বদনে আমাদিগকে অভয় দিলেন।

মহানবমীতে দুর্গাহোমে মহাগৌরী অষ্টোত্তর শত ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্রের আহুতি দিলেন। অগ্নিমূর্তি দুর্গাদেবী বারবার মহাগৌরীর ডান হাত ধরার জন্য স্বীয় ডান হাত বাড়ালেন এবং মহাগৌরীও ভাবাবেশে অগ্নিমূর্তি দুর্গা-দেবীর হাত ধরতে চাইলেন। পূর্ণাহুতির সময় দুর্গাদেবী পূর্ণাহুতি-সমন্বিত তাম্রপাত্র ধরে তিন বার টানতেই পুরা মন্ত্র পড়ার পূর্বেই মহাগৌরী হোমাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিলেন ও সমাধিস্থ হলেন। হোমাগ্নিতে শিব, গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সিংহ, মহিষাসুর, শ্রীরামকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, কলাবৌ, মেধা, সমাধি, কল্কি, গোপাল প্রভৃতি দেবতাও সিদ্ধগণ আবির্ভূত হলেন। আমাদের সঙ্গে অসংখ্য সূক্ষ্মদেহী সিদ্ধপুরুষ ও সিদ্ধা সাধিকা দুর্গাপদে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন ও প্রণাম করলেন এবং আমাদের দুর্গাহোম দেখে অবাক্ হলেন। এঁরা সকলে তিন দিনই দেবীপদে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

সুষমা দেবী আমাদের আলপনার পরে দিব্য আলপনা দিলেন প্রতিমার তলায়, সম্মুখে ও পাশে। তিনি সহস্রদল মহাপদ্ম এঁকে দেবীঘট বসালেন। দুর্গা দেবীকে নৈবেদ্যাদি গ্রহণার্থ যে আসন তিনি দিলেন,

তাহা অষ্টদল শ্বেতপদ্ম অঙ্কিত রক্তবর্ণাসন। প্রত্যহ তিনি একটি বৃহৎ তাম্রপাত্রে অসংখ্য প্রদীপ জ্বেলে দেবীর আরতি করতেন। আমরা বাসন্তী নবমীতে ভগবান্ রামচন্দ্রের জন্মতিথিপূজা করলাম। দয়াল রামজী সীতা, লক্ষণ, শত্রুঘ্ন প্রভৃতি সহ এসে আমাদের ভক্তিপূত তিথিপূজা নিলেন। উক্ত দিন সন্ধ্যায় তিনি দয়া করে আমার শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন এবং আমি ভক্তিভরে প্রণাম করতে তিনি আমার গলায় গোলাপী পদ্মফুলের মালা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তখন আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে শুয়েছিলাম এবং মা দুর্গা মুকুট মাথায় নিয়ে কন্যাবৎ আমার শিয়রে এসে দাঁড়ালেন এবং আমার মুখের কাছে মুখ নাবিয়ে আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। আমি তাহা বুঝতে পেরে মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে ? মহাগৌরী বললেন, ইনি সাক্ষাৎ দুর্গা। নবমীপূজাকালে মেধামুনিকে স্পষ্টভাবে পূজাস্থলে পূর্ণমূর্তিতে আমি দেখলাম। ষষ্ঠীরাত্রে তাঁকে স্বীয় শয্যা পাশে দেখেছি; কিন্তু চিনতে পারি নি। মেধামুনি হৃষ্টপুষ্ট, গৌরবর্ণ, লম্বা দাড়ি ও লম্বা জটা, গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষমালা, কপালে সিঁদুরের তিলক। আমি তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করতেই তিনি আমার গলায় একটি সাদা ফুলের মালা (তিন হালিযুক্ত) দিলেন। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিত্রয়ে দুর্গাদেবী রোজই আমার গলায় দিব্য মালা দিয়েছিলেন। মহাগৌরী বলেন, "কল্কিলীলা আমাদের মন্দিরে চলছে বলে এত দেবতার আবির্ভাব ও এত মুনিঋষির আগমন হচ্ছে এবং পূজা-হোমাদি ভাবগম্ভীর ও উৎসবানুষ্ঠান অপূর্ব সাফল্যে সুমণ্ডিত হচ্ছে। মহাস্নানের সময় সপ্তনদী দেবীমূর্তি ধরে এলেন এবং জলরূপে রাণীর হস্তধৃত ভৃঙ্গারে (স্বর্ণময় কারুকার্য খচিত, শ্বেতবর্ণ ও লাল দাগ টানা) পড়ছিল এবং ভৃঙ্গার থেকে দুর্গাদেবীর মাথায় সেই ব্রহ্মবারি পড়ছিল। নব ঘট স্থাপন কালে দুর্গাই নবমূর্তিতে ক্ষুদ্রাকারে নবঘটের উপর দাঁড়ালেন—নব মূর্তির নববিধ পরিধান। ঘটস্থাপন কালে সর্বতীর্থের দিব্যবারি ঝরণাবৎ সেই

ঘটের মধ্যে পড়ছিল এবং সর্বদেবতা ঘটগাত্রে সর্বপাশে বিরাজ করছিলেন। সান্ধ্য সভায় মন্দ বুদ্ধি রামায়ণ গায়ক অকালে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, দুর্গাদেবী তাঁকে দর্শন দিলেন। তখন রামচন্দ্র তাঁকে প্রণাম করলেন। বৈষ্ণব কথক গোঁড়ামিবশে বলিলেন—কারে প্রণাম কর হে ভগবান্, আমি যে তোমার দাসী হবার যোগ্য নই! তখন মহামায়া সভাস্থলে দাঁড়িয়েছিলেন, হাতের চেটোতে রামচন্দ্রকে নিয়ে। এই মিথ্যা মন্তব্য শুনে মহাগৌরী দুর্গাদেবীর মুখের দিকে চাইতে তিনি বাম হাত উল্‌টে হাসলেন ও কথকের ভ্রান্ত মন্তব্য অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করলেন।

২৭ মার্চ সোমবার দুর্গাপ্রতিমা নাটমন্দিরে আছেন ও সন্ধ্যায় গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন হবে। সকাল সাড়ে নয়টায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের বারান্দায় দেখলাম, দেবীলোকের অনেক পুরুষ ও নারী বিবিধ নৈবেদ্য, ফল-ফুল, ধূপ, পুষ্পপাত্র, শাড়ী-শাঁখা, ১০১ দীপযুক্ত বৃহৎ শতপ্রদীপ নিয়ে মন্দির মধ্যে সমস্ত উপচার নামিয়ে পুরোহিত ব্যাসপুত্র সূত মুনি সহ দণ্ডায়মান ছিলেন। ইহা ব্যতীত দেবীলোকাগত কিছু পুরুষ ও নারী দক্ষিণ বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা ভৈরবানন্দকে ডেকে নীচ থেকে উপরে আনিলাম। অচিরে ভৈরবানন্দ এসে স্বীয় শরীরস্থ মহাশক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এঁরা সব কে? মা কালী বলিলেন, "তোমার দেহস্থ দেবীলোকে তুমি চলে যাও। তাহলে বুঝতে পারবে, এরা কে।" ভৈরবানন্দ উক্ত দেবীলোকে গিয়ে বুঝলেন, এঁরা দেবীলোক থেকে সমস্ত পূজা দ্রব্য-সম্ভার নিয়ে নেমে এসেছেন পূজা করতে এবং আশ্রমাধ্যক্ষের অনুমতি লাভার্থ মন্দিরে অপেক্ষা করছেন। এইটী আমাদের সনাতন সংস্কৃতির শুদ্ধধারা। তাঁরা দিব্যদেহে এসে পূজা করে অম্লান বদনে চলে যেতে পারতেন। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ব্যতীত তাঁহাগিকে কেউ দেখতে বা বুঝতে পারতেন না। এই সব থেকে ভারত সংস্কৃতি প্রকৃত স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্বক অনুমতি দিতেই তাঁরা পূজায় বসলেন। পুরোহিত

সুতমুনি অষ্ট প্রণবযুক্ত আসনে বসে পূজা করলেন, প্রাকৃত মানুষের মত পুষ্করাসনে নয়। পূজার মন্ত্রাদি পর্য্যন্ত শোনা ও বোঝা গেল। আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি করে তিনি অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ঋষিন্যাস করলেন এবং দেবীকে যোনিমুদ্রা দেখিয়ে আহ্বান করলেন, শক্তিপূজায় যোনিমুদ্রা প্রদর্শন অপরিহার্য। অনন্তর ভুতশুদ্ধিকালে তিনি কুণ্ডলিনীকে বিশুদ্ধচক্র পর্যন্ত তুললেন। নিত্যপূজায় ও সংকল্পিত মহাপূজায় বা যে কোন দেবতাপূজায় কুণ্ডলিনীর পুচ্ছ হৃৎপদ্মে ও মুখ বিশুদ্ধ পদ্মে রেখে যে পূজক পূজা করবেন, তাঁর পূজা সিদ্ধ হবে। এখন সেরূপ হয় না বলে, আমাদের পূজাদি সিদ্ধ হয় না বা পূজিত দেবতারও আবির্ভাব ঘটে না। সুতমনি প্রথমে গণেশপূজা করে পরে শিবপূজা করলেন। শিবপূজাকালে শিব ঠাকুর জ্যোতিঃ মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন—জ্যোতিঃর উপরে অর্ধচন্দ্র ছিল। শিবের মস্তকস্থ মহাশক্তি অর্ধচন্দ্র জ্যোতিঃরূপে আবিভূ'ত হলেন। অনন্তর সুতমুনি দেবীপূজা আরম্ভ করিলেন এবং বিজয়া দেবী পূজোপকরণ এগিয়ে দিলেন। বিধিমত স্বর্ণঘট স্থাপন করে যখন দেবীপূজা আরম্ভ হলো, তখন মহামায়া দশভুজা দুর্গাদেবী সিংহবাহনে আবির্ভূ'ত হলেন ও ভক্তবীর মহিষাসুর করযোড়ে সিংহের পদতলে থেকে দেবীর দিকে ভক্তিভরে দৃষ্টিপাত করলেন। মা দুর্গার বাম দিকে সরস্বতী ও কার্তিক এবং এবং দক্ষিণে লক্ষ্মীও গণেশ দাঁড়ালেন। গণেশের পাশে নব পত্রিকা (রম্ভাদেবী বা গণেশবধু) ছিলেন। সুতমুনি ষোড়শ উপচারে দুর্গাপূজা করলেন। প্রায় দুই ঘণ্টায় উক্ত পূজা সেরে তাঁরা দেবীলোকে চলে গেলেন। দুর্গাংশসম্ভবা অপরাজিতা দেবী একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী তিন তিথি এখানে বাস করলেন। সেইজন্য তাঁরা অপরাজিতা পূজা করতে এসেছিলেন। ইহাই অপরাজিতা দেবীপূজার লুপ্তবিধি। দুর্গাপূজার ন্যায় অপরাজিতা পূজাও যথাবিধি ভালভাবে করতে হয়। জয়ার পশ্চাতে আমার জননী সীতাদেবী সূক্ষ্মদেহে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁর

নামেই সুতমুনি সংকল্প করলেন ; কারণ আমরা তাঁর নামেই এই বৎসর দুর্গাপূজার সংকল্প করেছিলাম। আমাদের অপরাজিতা পূজায় নৈবেদ্য দেওয়া হয় নি। এটা কাম্য পূজা বলে এই সাধুদের আশ্রমে যন্ত্র অংকিত করে পূজা করা হয়েছিল। দশমীতে এই পূজার উদ্দেশ্য কর্তার গৃহে বা আশ্রমে তিন দিন অপরাজিতা দেবী অবস্থান করেন। সেইজন্য সুষমা রাণীর নির্দেশে আমার সূক্ষ্মদেহী গর্ভধারিণীর আকাংক্ষা পূরণার্থ এই সূক্ষ্মপূজা হলো। স্থূলপূজা ও সূক্ষ্মপূজা উভয়ই প্রয়োজন। অপরাজিতা পূজা সংকল্পপূর্বক যথাসাধ্য করা অবশ্য কর্তব্য।

সোমবার দুপুরে আহারান্তে বিশ্রামকালে মহাগৌরী দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন ও বললেন, "আমি, বাবা ও দাদু তিনজন কোন উর্দ্ধলোকে গেছি। সেখানে আমাদের কারো দেহ নাই। আমরা মন দিয়ে কথা বলছি, দাদু পূজার আসনে বসেছেন ও আমি পূজার কাজ করছি ও বাবা পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা প্রতিমা পূজা করছি, কিন্তু কোন দেবমূর্তি নাই। ফুল ও নৈবেদ্য দিচ্ছি, কিন্তু কোন বাহ্য ফুল বা নৈবেদ্য নাই—মানস কুসুম ও মানস নৈবেদ্যাদি দিচ্ছি। মন্ত্রোচ্চারণ হচ্ছে, কিন্তু জল ছিটান নাই।" ইহাই আসল মানসপূজা। বাহ্যপূজা সিদ্ধ হলে এই অবস্থা আসে। পূজান্তে কেউ আমাদিগকে জলখাবার খেতে বললেন, কিন্তু মহাগৌরী অস্বীকার করতে কারো খাওয়া হলো না। পরম শিবের নির্দেশে আমরা সেখানে পূজা করিতে গিয়েছিলাম। ইহার অর্থ, যখন সাধক দ্বৈতবাদের সাধনশেষে অদ্বৈতবাদের সাধন আরম্ভ করে, তখন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এই সাধনা চলে। বিশিষ্টাদ্বৈত সাধনকালে একপদ দ্বৈতবাদে ও অন্যপদ অদ্বৈতবাদে থাকে।

বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় মহাগৌরী প্রতিমা বরণ করলেন ও প্রতিমাস্থ দেবতারা জীবন্ত হলেন। আমরা ঠেলা গাড়ীতে প্রতিমা তুলিয়া গঙ্গার দিকে চললাম। যখন প্রতিমা যাচ্ছেন, শিবলোক থেকে অন্তরিক্ষলোক

পর্য্যন্ত যত উর্দ্ধলোক আছে, সেই সমস্ত লোকবাসীরা মহাশূন্যে আবির্ভূত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন—হাতমুখ নেড়ে নমস্কারাদি করে। অপরাজিতা দেবী মন্দির থেকে আমাদের সঙ্গে গেলেন অপরাজিতা পুষ্পগন্ধ ছড়িয়ে। যখন গঙ্গাতটে গিয়ে আমরা প্রতিমা গঙ্গায় নামালাম, তখন গঙ্গাদেবী শতবিদ্যুৎজ্যোতিঃসম্পন্ন ময়ুরপংখী বজরা (নৌকা) নিয়ে গঙ্গাবক্ষে আবির্ভূত হলেন। দুর্গাদেবী তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ সহ সেই নৌকায় উঠিলেন ও গঙ্গালয়ে গেলেন এবং গঙ্গালয় থেকে দোলায় (লম্বা দাড়ি ও লম্বা জটাযুক্ত শিবানুচর বাহক-বাহিত) কৈলাসে গেলেন। তাঁর পৃথিবী-পালিকা শক্তি আমাদের মন্দিরে এলেন—শাস্ত্রসম্মত দুর্গাপূজা হলে সত্ত্বরজোমিশ্রিত (রজো ক্ষীণ ও সত্ত্বাধিক) দুর্গা শক্তি ভক্ত-গৃহে থাকেন। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপরিচালিকা পূর্ণসত্ত্বশক্তি—মহামায়ারূপী অংশ দোলায় চড়ে কৈলাসে গেলেন। শাস্ত্রোক্ত দোলা বা নৌকা (বজরা) চড়ে দুর্গা দেবীলোকে গিয়ে অবস্থান করেন। ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনার্থ উল্লিখিত দেবীর এক সত্ত্বা (তমোরজো মিশ্রিত শক্তি) নাটমন্দিরে প্রতিমায় থাকেন বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত। সেই সত্ত্বা আমরা গঙ্গাগর্ভে দেখলাম এবং সেটী দেবীলোকে যান। এই তিন শক্তি মিলে সত্ত্ব-রজঃ-তম ত্রিগুণময়ী মহামায়া। আমরা দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনান্তে ফিরে এলাম ও নাটমন্দিরে মহাগৌরী গৌরীস্বরূপে আরূঢ়া হয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করলেন। তখন দেখা গেল, নাটমন্দিরের শূন্যস্থানে স্বর্গের সপ্তস্তর থেকে অন্তরীক্ষ পর্য্যন্ত যত দেবতা, কিন্নর, গন্ধর্ব, চন্দ্রলোকবাসী, পিতৃলোকবাসী, অন্তরীক্ষবাসী সবাই আবির্ভূত হলেন। সেই সময় মহাগৌরী ভৈরবানন্দের নির্দেশে উর্দ্ধেও শান্তি জল ছিটালেন। শান্তিমন্ত্রের শেষে আছে—দ্যৌঃ শান্তিঃ, অন্তরীক্ষঃ শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ। আমাদের মুনি ঋষিরা এই সত্য দর্শনান্তে মন্ত্ররচনা করেন। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রাবলী মনোকল্পিত নহে। অন্যান্য স্থানে শান্তিবারি সিঞ্চিত হয়

শুধু মানুষের উপরে ; কারণ দিব্যদৃষ্টিযুক্ত কেউ থাকে না বলে দেবতারা দৃষ্টিগোচর হন না। উর্দ্ধাধঃ লোকদ্বয়ে বারিসিঞ্চন না করলে গৃহস্থের বা আশ্রমবাসীর অমঙ্গল হয়। দুর্গাপূজায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দেবদেবী, কিন্নর-গন্ধর্ব, অসুর-দানবাদি সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হন ও মর্ত্যবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আনন্দ করেন। অনন্তর আমরা নাটমন্দিরে বসে সৎপ্রসঙ্গ করছি। এমন সময় ভৈরবানন্দ বিবেকানন্দ স্বামিজীকে আহ্বান করলেন। অমর স্বামীজি দয়া করে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষিরূপে— তাঁর পশ্চাতে নয়ন-ঝলসান দিব্যজ্যোতিঃ ও তিনটী উজ্জ্বল নক্ষত্রবৎ দিব্য জ্যোতিষ্ক দেখা গেল। ইহার অর্থ, স্বামিজী সপ্তর্ষি মণ্ডলের শীর্ষস্থানে ও ধ্রুবলোকের প্রথম স্থানে থেকে ঋষিলোক পরিচালনা করছেন। এই দ্বিতীয় বারেই স্বামিজী নিজ স্বরূপ দেখালেন, কিন্তু অব্যবহিত পূর্বে প্রথম বারে বিবেকানন্দ মুর্তিতে এসে ভৈরবানন্দের সঙ্গে করমর্দন করলেন, আর মহাগৌরীর প্রণাম নিলেন না। অথচ দ্বিতীয় বারে স্বরূপারূঢ় ব্রহ্মর্ষিরূপে মহাগৌরীর প্রণাম নিলেন। প্রথম বারে নরেন্দ্রনাথরূপে দেখালেন, ঠাকুরের গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁর সামনে বিরাজিত।

২৮শে মার্চ মঙ্গলবার বৈকালে তিনটার পর মহাগৌরী দেখলেন, পূর্বোক্ত পুরোহিত সুতমুনি অপরাজিতাদেবীর শেষ পূজা করার জন্য পূজা দ্রব্য সম্ভার নিয়ে আমাদের অনুমতির অপেক্ষায় আছেন। আমরা প্রীতিভরে মহানন্দে অনুমতি দিতেই দেব-পুরোহিত পূজার আসনে বসলেন। তাঁর সম্মুখে অপরাজিতা দেবী উপবিষ্টা ছিলেন বার তের বৎসরের বালিকামূর্ত্তিতে প্রতিমারূপে অপরাজিতা পুষ্পবর্ণের শাড়ী পরে। আমার মন্দিরবাসিনী দিব্যদেহী গর্ভধারিণী আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ দেবীপূজা দেখছিলেন। দেবীলোকের অনেক অধিবাসী পুরুষ ও নারী বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাকে মাথা নীচু করে যুক্তকরে শ্রদ্ধা জানালেন। জয়া ও বিজয়া উভয়ে পূজার যোগাড় দিলেন পুরোহিত সুতমুনিকে। পূজান্তে পুরোহিত

ও দেবীলোকের অধিবাসীরা অপরাজিতা প্রতিমাকে প্রদক্ষিণ করলেন। ঐ পূজার কোশাটী এক হাত লম্বা ছিল—প্রায় দেড় সের জল ধরে। পূজা সমাপ্ত হলে তাঁরা মন্দিরস্থ দেবগণকে প্রসাদ দিলেন-প্রত্যেককে শ্বেতপ্রস্তরময় থালায় এবং অবশিষ্ট গোটা ফলগুলি—নারিকেল, কলা, শসা, শাঁকালু, পেঁপে, আঙ্গুর প্রভৃতি একটি থলেতে পুরে থলের মুখ বাঁধলেন। মন্দিরস্থ দেবতারা এত প্রসাদ খেয়েছিলেন যে, সকলে স্ব স্ব পেটে হাত বুলাইতেছিলেন। দেবীলোকের অধিবাসীবৃন্দ সহ পুরোহিত প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল পূজার পূর্বে আমাদের অনুমতির অপেক্ষা করছিলেন। আজ দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজন কালে নীচে অপরাজিতা দেবী আমার সঙ্গে ঘুরছিলেন। আজ তিন চার দিন যাবৎ তিনি আমার সঙ্গে ছায়ার মত আছেন। সন্ধ্যার পূর্বে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে ঠাকুরের কথা আলোচনা করছিলাম। মহাগৌরী কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "ঠাকুরের বিরুদ্ধে আমি একটি কথাও বলতে পারবো না; আর কেউ কিছু বললে আমি ব্যথিতা হই।" এই বলে মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় চলে গেলেন। তখন আমি সুস্পষ্ট ভাবে দেখলাম, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর দিব্যমূর্তি—গৌরবর্ণা, ঈষৎ স্থূলাঙ্গী, এলোকেশী, মাথার চুল পা পর্য্যন্ত ঝুলছে, গেরুয়া পরা, কপালে সিন্দুর টিপ, মহাগৌরীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণ তৎপশ্চাতে দণ্ডায়মান। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর এত স্পষ্ট মূর্তি আমি কখনো দেখিনি। ঐ কথা মহাগৌরীকে বলায় তিনি উত্তর বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে বললেন, "দাদু, উনিই ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং ঠাকুরই আপনাকে আমার পূর্বজন্মের মূর্তি দেখালেন।"

বাসন্তী সপ্তমী থেকে কয়েক দিবস ধরে মহাগৌরী দেখছেন ব্রহ্মবিদ্যাকে --অনাসক্ত জ্যোতিঃমূর্তি, দেব কি দেবী বোঝা যাচ্ছে না, তাঁর সবই সাদা, তাঁর শুভ্র জ্যোতির দিকে চাওয়া যায় না, নগ্ন কি বস্ত্রপরিহিত তাও বোঝা যায় না, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, দুনিয়ার প্রতি মমতাবর্জিত।

আমি পূর্বে এঁকে দেখেছি আরও স্থূল মূর্তিতে। তখন ভাবতাম, ইনি নগ্নমূর্তি মহাদেবী—কেশযুক্তা ও ক্রিয়াশীলা। এঁর তৃতীয় মূর্তি দেখেছি--নিরবয়বা জ্যোতির্ময়ী অচলা দামিনীবৎ। ইনি বাক্যমনের অতীত। আমি সৌভাগ্যক্রমে ব্রহ্মবিদ্যার তিন মূর্তির দর্শনলাভ করেছি। মহানবমী শনিবার সন্ধ্যায় রামায়ণ গানের সময় ঘূর্ণীবায়ু ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হলো, আকাশ কাল মেঘে ঢেকে গেল, বিদ্যুৎ চমকাতে ও মেঘ ডাকতে লাগল। তখন ভৈরবানন্দ পরমহংস দুর্গাপ্রতিমার পশ্চাতে ঝুলান নীল পর্দা ধরে সমাধিস্থ হবার পূর্বে মা মা মা বলে ডাকতে লাগলেন ও বল্লেন, "মা, তুই ঝড় থামাবি কি না বল? যদি ঝড় না থামে, আজই আমি ব্রহ্ম-রন্ধ্র ফাটিয়ে বেরিয়ে যাব।" এই বলে তিনি দাঁড়িয়েই গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। বৃষ্টিপাতে তাঁর চাদর কাপড় সব ভিজে গেল। তাহা দেখে মহাগৌরী ছুটে এসে তাঁর পিছনে দাঁড়ালেন এবং সকলকে নিষেধ করলেন, এঁকে এখন কেউ ছুঁয়ো না। পনের মিনিটের মধ্যেই ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল, আকাশ পরিষ্কার হলো, এমন কি আকাশে চাঁদও দেখা গেল ও সান্ধ্য সভায় রামায়ণ গান আরম্ভ হলো। এই ঝড়বৃষ্টিতে বেলুড়ে ও অন্যান্য স্থানে খুব ক্ষতি হয়েছে—বৃহৎ বটবৃক্ষ গোড়া সহ উপড়ে পড়েছে, লাইট পোষ্ট ভেঙ্গে গেছে এবং পার্শ্ববর্তী গঙ্গায় বহু নৌকা তরঙ্গাঘাতে চূর্ণীকৃত হয়েছে। সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দজীর অলৌকিক যোগশক্তিবলে আমাদের কোন ক্ষতি বা সভাভঙ্গ হয় নি।

মহানবমী শনিবার পূজা-হোমের সময় আমার শঙ্খিনী নাড়ীদ্বার পূর্ণরূপে খুলে গেল। সেইজন্য সাত দিন ভীষণ পেটের অসুখে আমি ভুগলাম। পূর্ণানন্দ প্রণীত 'ষট্‌চক্র নিরূপণম্' গ্রন্থে ৪২ শ্লোকে আছে, তদূর্দ্ধে শঙ্খিন্যা নিবসতি শিখরে শূন্যদেশে। ইহার অর্থ, আজ্ঞাখ্য চক্রের উপরিভাগে শঙ্খিনী নাড়ীর শিরোদেশে শূন্যাকার স্থান আছে, তথায় বিসর্গশক্তি বিদ্যমান। ১লা এপ্রিল শনিবার বৈকালে নাটমন্দিরে বসে আমিও

মহাগৌরী শঙ্খিনী নাড়ী সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ পড়ছিলাম। মহাগৌরী ঐ গ্রন্থ থেকে শঙ্খিনী নাড়ীর অবস্থান পড়ে শোনালেন। সন্ধ্যার পরে তিনি ধ্যানে দেখলেন, "ঐ শঙ্খিনী কেশাংশবৎ অতিসূক্ষ্ম নাড়ী এবং মূলাধার থেকে সহস্রার পর্য্যন্ত ষটচক্র ভেদ করে প্রসারিত। ইহার চারি দিকে অগণিত সূক্ষ্মনাড়ী নানাবর্ণে বিদ্যমান ও শুভ্রতম বিদ্যুৎতুল্য দ্যুতিমান। যেখানে যে চক্র উহা ভেদ করেছে, সেখানে ইহা চক্রবর্ণে রঞ্জিত হয়েছে।" ৩রা এপ্রিল সোমবার সকালে লিলুয়ার কোন ভক্ত সওয়া সের ভাল দুধ ঠাকুরের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সন্ন্যাসিনী শিবপ্রিয়া উক্ত দুধে পায়স তৈরী করলেন এবং মহাগৌরী ঠাকুরকে ও গোপালকে ঐ পায়স পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে নিবেদন করিলেন। নিবেদন কালে দুই পায়স পাত্রে তুলসী পাতা দেওয়া হয়েছিল। যখন মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া পায়স নিবেদনান্তে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁরা দেখলেন, গোপালজী তাঁর পায়স পাত্রস্থ তুলসী পাতাটি চেটে খাচ্ছেন। ইহারঅর্থ, ঐ পায়স পীযূষবৎ সুস্বাদু ও সুমিষ্ট হয়েছিল। সন্ধ্যাসমাগমে আমি ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে বসে শিবপ্রিয়ার কথা আলোচনা করছিলাম। এমন সময় শ্রীমা সারদা শেষ বয়সের বৃদ্ধা মূর্তি ধরে আমাদের সম্মুখে এলেন। তাঁকে চিনতে পেরেই আমি ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। শিবপ্রিয়া পূর্ব জন্মে ঠাকুরের শিষ্যাও শ্রীমার সঙ্গিনী গোলাপ সুন্দরী ছিলেন। এই তথ্য ভৈরবানন্দ, মহাগৌরী এবং শিবপ্রিয়া স্বয়ং নিঃসংশয়ে অবগত হয়েছেন।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ পর্য্যন্ত চৌদ্দ মাস স্বামী ভৈরবানন্দ তত্ত্বজ্ঞানও পারমহংস্য সাধনে মাকড়দহে স্বীয় উদ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এই চৌদ্দ মাস অনুপস্থিতির পর তিনি প্রথম ধর্মচক্রে আসেন ১৯৬০ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে আমাদের পঞ্চম বার্ষিক বাসন্তী দুর্গোৎসব সময়ে এবং কয়েক দিন ধর্মচক্রে থাকেন। ২রা এপ্রিল শনিবার বাসন্তী ষষ্ঠী বৈকালে মহাগৌরী বালী বাসা থেকে এলেন ও দুর্গোৎসবের কয় দিন

ধর্মচক্রে রইলেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় বীরভূমের কামদপুর্ গ্রাম থেকে এক ভদ্র লোক সস্ত্রীক এসেছিলেন। তাঁরা মহাগৌরীকে কল্যাণেশ্বরী দেবীর কথা বললেন। তখন মহাগৌরী দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন, ক্ষুদ্রাকার কল্যাণেশ্বরী দেবী মূর্তি ত ত্রস্থ মন্দিরের কুলুঙ্গীতে রয়েছে। মহাগৌরী বললেন, "আজ শনিবার সকালে দশটায় বালি বাসায় বসে পাশের বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পূজার সানাই বাদ্য শুনেই আমার কান্না পেল। আমাদের ধর্মচক্রে দুর্গোৎসবের সানাই বসেনি দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়েছিল।"

তখন তিনি দেখলেন, মা দুর্গার সামনে দেবীরা শংখ বাজাচ্ছেন ও তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তিনি চামর ব্যজন করছেন এবং দেবতারা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। আর মা দুর্গা হাসছিলেন।" এই দিব্য দৃশ্য দেখে মহাগৌরীর মনঃশোক তিরোহিত হল। শুক্রবার সন্ধ্যায় মহাগৌরী তাঁর পিতার সঙ্গে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে যান। তাই আমাকে প্রণাম করতে ভুলে গিয়েছিলেন। রাত্রে তিনি স্বগৃহে শুয়ে দেখছেন, ইষ্টদেব শিব ঠাকুর খুব রেগে গেছেন ও চোখ লাল করে বলছেন, "গুরুকে একটা প্রণাম করতেও ভুলে গেলে ? একি গুরুভক্তি ! এরূপ করলে তোমার কিচ্ছু হবে না।" মহাগৌরীর স্মরণ হচ্ছিল না প্রণাম না করার কথা। তাই তিনি শিবের সঙ্গে তর্ক করছিলেন। পরদিন আমার কাছে এসে ঐ কথা জেনে নিশ্চিত হলেন। গুরুতে তিনি ইষ্টবুদ্ধি করেন বলে ইষ্টদেব ঐ ত্রুটির জন্য তাঁকে তিরস্কার করলেন। সন্ধ্যা সমাগমে কলিকাতার কোন ভক্ত এসে দক্ষিণ বারান্দায় অদূরে বসে গল্প করছিলেন। আমি ও মহাগৌরী আমার খাটে বসেছিলাম। তখন মহাগৌরী দেখলেন, লক্ষ্মী দেবী ও গণেশ-বাহন বৃহৎ ইঁদুর দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন। ইহার অর্থ, সান্ধ্য আরতি বিলম্বিত হচ্ছে। তা দেখে আমরা সত্বর গিয়ে দুর্গা-প্রতিমার সামনে আরতি করলাম। অনন্তর মন্দিরে ঠাকুরকে লুচি, হালুয়া, তরকারী ও নারিকেলী নাড়ু মহাগৌরী নিবেদন করলেন। তখন তিনি

দেখলেন, জিলিপী ও মোয়া—এই দুই দিব্য দ্রব্য স্তূপীকৃত রয়েছে এবং ঠাকুর ঐ সব দ্রব্য দেবগণকে দিচ্ছেন। সান্ধ্য আরতির পর কলিকাতার মহামায়া লীলাকীর্তন সম্মিলনী কালীকীর্তন করলেন। আমি ও মহাগৌরী প্রতিমার ডান দিকে বসে কীর্তন শুনছিলাম। গায়কগণ গাইছেন, (কালী) কখন শ্বেত কখন পীত, কখন নীল লোহিত রে। তখন মহাগৌরী দেখলেন, বিশ্বব্যাপী কালীমূর্তি এক এক বর্ণে সারা বিশ্ব ছেয়ে ফেলছেন। সিংহ, ময়ুর, হংস, মুষিকাদি বাহনও মহাশক্তিশালী। ময়ুরের বিরাট আকৃতি দেখা গেল—ময়ুরের পেখমে পৃথিবী ছেয়ে গেল। গায়কদের পেছনে দাঁড়িয়ে নীলকণ্ঠ মহাদেব কালীকীর্তন শুনছিলেন। আমার মন্দিরবাসী সুক্ষ্মদেহী মাতাপিতা প্রতিমার সম্মুখে ছিলেন। নারায়ণ সোণার সিংহাসনে আমার পাশে বসে আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করছিলেন।

৩রা মার্চ রবিবার বাসন্তী সপ্তমী। সকালে আমি দুর্গাপূজায় ব্রতী হলাম। পূর্ব চারি বর্ষ কোন পুরোহিত এখানে দুর্গাপূজা করেছিলেন। মহাগৌরী আমার ডান দিকে বসে গন্ধপুষ্প ও ধূপদীপাদি দেবগণকে দিচ্ছিলেন। শিবাদি দেবতার পূজাকালে আসন পেতে নৈবেদ্য দেওয়া হচ্ছিল। তখন মনে পড়ল, দুর্গাদেবীকে আসন দেওয়া হয়নি। তাহলে ঠাকুরকেও আসন দেওয়া হবে কি? এই চিন্তা মনে উঠায় দেখা গেল, ব্রহ্মলোক থেকে ঠাকুর নামছেন এবং ঠাকুরের পদদ্বয় গঙ্গাস্রোতে বিধৌত হচ্ছে ও একটা কমণ্ডলু গড়িয়ে পড়ছিল। পাহাড়ী ঝরণার মত ব্রহ্মগঙ্গার জল গড়িয়ে আসছে। তার ভেতর দিয়ে ঠাকুর নামছেন। ব্রহ্মগঙ্গা জ্যোতির্ময়ী—গঙ্গাস্রোত জ্যোতিঃস্রোত ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছে। ঠাকুর এসে নিবেদিত নৈবেদ্যের সামনে বসলেন। তখন দুর্গা, গণেশ, কার্তিকাদি দেবদেবীগণ ঠাকুরকে প্রণাম করে তাঁর হাত থেকে প্রসাদ নিলেন। ইহাতে বোঝা গেল, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদেবময় ও সর্বদেবতার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে রামের প্রভাব অধিক প্রকটিত বলে আমাদের মন্দিরে রাম, সীতা,

মহাবীর প্রভৃতি বিরাজমান। সপ্তমী পূজায় মাষভক্ত বলি দিতেই বেতাল এসে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে বলি নিলেন। বেতালের চেহারা সবুজ রঙ, মাথার চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, কাণে সোণার মাকড়ি, কোমরে একটা ছোট কাপড় জড়ান। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিনই মাষভক্ত বলিদানকালে উক্ত বেতালকে দেখা গেল। মহিষাসুরকে পূজা করে ভোগ দিতেই মহিষাসুর এলেন। তার কাছে শিবকে দেখা গেল—শিবাংশে মহিষাসুরের জন্ম ও শিব তাঁর ইষ্ট। মহিষাসুরের চেহারা খুব কাল, লাল কাপড় কোমরে জড়ান, সাঁওতালবৎ স্বাস্থ্যবান্ ও হৃষ্টপুষ্ট। দেবীবাহন সিংহও প্রতিমা থেকে নেমে পূজা এবং নৈবেদ্য নিলেন মহিষাসুরবৎ। ময়ূরাদি বাহন স্ব স্ব দেবতার কাছ থেকে প্রসাদ নিলেন। নবপত্রিকা পূজাকালে গণেশের বউকে দেখা গেল—সোণার মুকুট পরা দেবীই কলা বৌ। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী কর্তৃক প্রাণপ্রতিষ্ঠান্তে প্রতিমাস্থ দেবতারা জীবন্ত হলেন মানুষের মত বাহনাদি সহ। চক্ষুর্দান কালে কাজল দিতে গিয়ে মহাগৌরীর ভয় হচ্ছিল, পাছে জ্যান্ত দেবতার মণিতে বিল্বপত্রবৃন্তের খোঁচা লেগে যায়! প্রতিমাস্থ দেবতাদের চোখগুলি বড় বড়, চাহনি অতিসুন্দর ও অর্ধ নিমীলিত, চোখের মণি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেবীঘট স্থাপিত হলে ঘটের উপর দুর্গা দাঁড়ালেন ও অন্যান্য অনেক দেবতা দেবীঘটের চার পাশে রইলেন—দেবীদের উপস্থিতিতে ঘট আর দেখা যাচ্ছিল না। বিল্ববৃক্ষমূলে পূজাকালে দেখা গেল, তথায় ছোট শিব পা ছড়িয়ে বসে আছেন দুর্গার দিকে তাকিয়ে। বিল্বমূলস্থ ঘটে যে দেবী আবির্ভূত হলেন, তিনি ক্ষুদ্রাকার ও জ্যোতির্ময়। আমরা পেচককে নৈবেদ্য দেবার জন্য লক্ষ্মীদেবীকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই কার্তিক ঠাকুর তাঁকে নৈবেদ্য দিলেন।

ঐন্দ্রীকে পূজা করতেই তিনি গজকুম্ভে চড়ে এলেন। বেতালকে দেখা গেল, কিন্তু পিশাচও রাক্ষসাদি দেবভয়ে এল না। ৯ই মার্চ শনিবার

সন্ধ্যায় আমাদের বাসন্তী প্রতিমা মোটর লরীতে নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হল। প্রতিমা আশ্রম থেকে নিয়ে যাবার পূর্বেই মহাগৌরী ধর্মচক্রে এসেছিলেন ও ঠাকুরকে খইয়ের মুড়কি ভোগ দিয়েছিলেন। ঐ ভোগ নিবেদনান্তে দেখা গেল, ঠাকুর সেই নিবেদিত মুড়কি সমস্ত দেবতাকে দিলেন। তখন গোপাল এসেছিলেন—তাঁর পেছনে দিব্য জ্যোতিঃ ও মাথার মুকুট ও মুকুটে তিন শিখিপুচ্ছ। অবশ্য অন্যান্য দেবতাও ছিলেন। যখন প্রতিমা লরীতে তোলা হল, তখন আমিও মহাগৌরী পশ্চিম ফটকের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। সেই সময় মহাগৌরী দেখলেন, প্রতিমার সঙ্গে ঠাকুর ও একটী ভৈরবী গেলেন। ঐ ভৈরবীর কপালে সিন্দুরের টিপ, মাথায় কেশ আলুলায়িত ও হাতে ত্রিশূল। বিসর্জনান্তে শান্তিবারি সিঞ্চিত হলো। আমরা সকলে নাটমন্দিরে কার্পেট পেতে বসলাম। বিশ্বরূপানন্দ শান্তিমন্ত্র পাঠ করলেন ও মহাগৌরী শান্তিবারি ছিটিয়ে দিলেন সকলের মাথায়। সন্ধ্যার পূর্বে বিশেষ কারণে আমি কোন ভক্তকে তিরস্কার করেছিলাম। যখন আমি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিলাম, তখন মহাগৌরী দেখলেন, মা দুর্গা কন্যারূপে আমার মাথার উপর হাত তুলে ধরলেন। জ্বলন্ত আগুনে জল ঢেলে দিলে যেমন আগুন নিভে যায়, তেমনি মা দুর্গার সান্নিধ্যে আশ্চর্য্যভাবে আমার ক্রোধানল নির্বাপিত হল। আজ মহাগৌরী কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বললেন, "গত বুধবার বাসন্তী দশমীতে আমার আজ্ঞাচক্রভেদ হবার পর থেকে প্রায় দেখছি, তিনটী দেবী সর্বদা আমার সঙ্গে আছেন। গত রাত্রে আমি দেখলাম, আপনি ও বাবা (ভৈরবানন্দ) আমার দুই দিকে দাঁড়িয়ে মানুষের গরল হাতে করে ফেলে দিচ্ছেন এবং মানুষের বিষাক্ত সংস্পর্শ থেকে আমাকে রক্ষা করছেন।"

৪ঠা মার্চ সোমবার বাসন্তী অষ্টমী। ঐদিন অষ্টশক্তি ও নবদুর্গার পূজা হল। কুমারী পূজাকালে কুমারীর মধ্যে দুর্গার আবির্ভাব দেখা

গেল—দুর্গার মাথায় মুকুট, পায় সোনার পায়জোর। দশমবর্ষীয়া কুমারী আরতি অপরাজিতা দেবীরূপে পূজিতা হলেন। অষ্টশক্তি অষ্টদেবীরূপে কিঞ্চিৎ মাথা হেট করে আলুলায়িত কেশে দুর্গার চারি দিকে দাঁড়ালেন। নবদুর্গাকে একই দুর্গার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে দেখা গেল। উক্ত মর্মে শ্রীশ্রীচণ্ডীর দশমাধ্যায়ের প্রারম্ভে আছে—

'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ॥

দুর্গাদেবী শুম্ভকে বলিতেছেন, "রে দুষ্ট! একা মাত্র আমিই এই জগতে বিরাজিতা। মদ্ব্যতিরিক্ত আমার সহায়ভূত অন্যা দ্বিতীয়া আর কে আছে? ব্রাহ্মী প্রমুখ এই অষ্টশক্তি বা মাতৃকা আমারই বিভূতি। এই দ্যাখ, ইহারা আমাতেই বিলীনা হইতেছে।

মহাস্নানকালে যাঁদের নাম করা হল, তাঁরা সকলে এসে দুর্গাদেবীকে মহাস্নান করালেন। যখন আমরা মহাস্নানের মন্ত্রাবলী পড়ছিলাম, তখন প্রত্যেক মন্ত্রোক্ত দেবতা, মুনিঋষিরা আবির্ভূত হলেন। সান্ধ্য আরতির পরে প্রেমানন্দ দে সরকার মাইকযোগে রামায়ণ গান করলেন। তিনি সেদিন 'শবরীর প্রতীক্ষা' বর্ণনা করলেন। মহাগৌরী নাটমন্দিরে আমার পাশে বসে এক মনে সেই বর্ণনা শুনছিলেন ও দেখলেন রামচন্দ্র ও শবরীকে। ভগবান রামচন্দ্র বনবাসের বেশে, পিঠে তূণ বাঁধা, কাঁধে ধনু ও মাথায় চুলের ঝুঁটী, শ্যামল শরীর। শবরীর উজ্জ্বল বর্ণ, সুন্দর চেহারা, মাথায় বিরাট জটা পা পর্য্যন্ত ঝুলছে। তাঁকে দেখতে ঠিক দেবীর মত। শ্রীরাম দর্শনান্তে তিনি অগ্নি প্রবেশ করলেন। রাত্রি সওয়া একটার পরে সন্ধিপূজা আরম্ভ হলো। সন্ধিপূজার সময় চামুণ্ডার দুটী ধ্যান পাঠ করা হল, একটী বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরোণোক্ত 'দুর্গাপূজা পদ্ধতি' থেকে ও অন্যটী চণ্ডী থেকে। উভয় ধ্যান পাঠের সময় কালী আবির্ভূতা হলেন এবং কৃপা করে আমার মাথায় পা দিলেন।

৫ই মার্চ মঙ্গলবার বাসন্তী নবমী পূজার সময় বিশেষার্ঘ্য দানকালে জলশংখোপরি মা দুর্গার একটী চরণ দেখা গেল। মা দুর্গা ঘটের উপর দাঁড়িয়ে আলতা পরা সাদা ধবধবে পাটী শংখোপরি স্থাপন করলেন। আজ মহাগৌরী দেখলেন, স্বীয় মাথার উপর শ্বেতপদ্মে-শ্বেতশিব সমাসীন। আজও মহিষাসুর পূজাকালে মহিষাসুরের সঙ্গে শিবকে দেখা গেল। আজ রামনবমী ভগবান রামচন্দ্রের শুভ জন্মতিথি বলে রামচন্দ্রের পূজা পঞ্চোপচারে করলাম। রামজী এসে আমাদের পূজাও নৈবেদ্য নিলেন এবং শিবকে প্রণাম করলেন। শাস্ত্রে বলে, রামের গুরু শিব ও শিবের গুরু রাম। রামায়ণ গানেও গায়ক এই বিষয় আলোচনা করলেন। গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার পূজা করা হল। তাঁরা প্রত্যেকে প্রতিমা থেকে নেমে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। মহাগৌরী আমার ডান দিকে বসে দেবতাগণকে গন্ধপুষ্প ও ধূপদীপাদি দিতেছিলেন।

যখন গণেশকে তিনি ধূপদীপ দিলেন, তখন গণেশ ঠাকুর মৃদু হেসে আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ইংগিত করলেন, আমি যেন ধূপদীপ দিই। তাই আমি সানন্দে গণেশাদি দেবতাকে ধুপদীপ দিলাম। দুর্গা-হোমের সময় মহাগৌরী ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্র হোমাগ্নিতে আহুতি দিলেন। যখন আমরা সকলে দাঁড়িয়ে পূর্ণাহুতির মন্ত্রোচ্চারণ করলাম ও মহাগৌরী পূর্ণাহুতি দিলেন, তখন হোমশিখা একটী মানুষ অপেক্ষা অধিক উঁচু হয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। এত উচ্চ ও উজ্জ্বল হোমানল কোথাও দেখিনি। মহাস্নানের সময় দেবীঘটের উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এসে বসলেন, যাতে দুর্গাস্নানের কোন বিঘ্ন না হয়। সান্ধ্য আরতির সময় বহু দেবতা ও অনেক মুনিঋষি এসে দুর্গাকে প্রণাম করলেন। যাঁরা মহাস্নানের সময় এসেছিলেন, তাঁরাই আবার সন্ধ্যাকালে এসে দুর্গাদেবীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করলেন। আজ পূজাকালে মহাগৌরী দুর্গাদেবীর কাছে এই কাতর প্রার্থনা জানালেন, "যত দিন আমার দাদুর আয়ু আছে, তার চেয়ে আরও পাঁচ

বছর তিনি বেঁচে থাকলে আমি সুখী হবো। আমার আয়ু থেকে পাঁচ বৎসর বুড়ো দাদুকে দিন।" মা দুর্গা রাত্রিকালে পূর্বোক্ত প্রার্থনার উত্তরে সহাস্যে তাঁকে সম্মতি জানালেন।

৬ই মার্চ বুধবার বিজয়া দশমী। পূর্বাহ্নে বিজয়াকৃত্য অনুষ্ঠানকালে অপরাজিতা পূজা হল। অপরাজিতা দেবী দুর্গাদেবীর মতই গৌরবর্ণা, কিন্তু নীল বস্ত্র পরা। ভৈরবানন্দজী অদূরে দাঁড়িয়ে বিজয়াকৃত্য দেখছিলেন। আজ পূর্বাহ্নে মহাগৌরী দুই তিন বার গভীর ধ্যানে নিমগ্না হলেন। আজ তাঁর আজ্ঞাচক্রভেদ হলো। ভৈরবানন্দ তা বুঝতে পারলেন ও দুর্গা প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন, "মা, আজ বিজয়া দশমী। মা, তুমি প্রতিমা ছেড়ে যাবে? মা, তুমি বাবার মন্দিরে গিয়ে থেকো, যতদিন বাবার শরীর থাকে।" বিসর্জনান্তে মা দুর্গা কন্যারূপে দুই হাত জোড় করে আমাকে শ্রদ্ধা জানালেন। তৎপূর্বে গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতী আমাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। মা দুর্গা নৌকায় কৈলাসে যাবেন, তাই শ্বেত হস্তী দেখা গেল। শ্বেত হস্তী ফিরে গেলেন, মা দুর্গা মন্দিরে এলেন। শ্বেত হস্তী জল-প্রতীক ও দুর্গা দেবীকে নিতে এসেছিলেন। অনন্তর দেখা গেল, মা দুর্গা পুত্রকন্যাগণ সহ দল বেঁধে সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরে গেলেন। আমাদের মন্দিরে ও বারান্দায় প্রায় দুর্গা, গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতিকে দেখা যায়। মহাগৌরী বলেন, "দাদু, মা দুর্গা কন্যারূপে আপনার সঙ্গে সর্বদা থাকেন। আবার কখনও দেখি, তিনি আপনার হৃৎপদ্মে বুক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন।" বিজয়া দিবসেও মাবভক্ত বলিদান কালে বেতালকে দেখা গেল। মহাগৌরী বলেন, "গত রাত্রে দেখলাম, আমি ও দুর্গা উভয়ে ত্রিনয়না। তিনি আমাকে তৃতীয় নয়নে দেখছেন এবং আমিও তাঁকে তৃতীয় নয়নে দেখছি। গত রাত্রে বৃন্দাবন থেকে আমার কাছে এক সূক্ষ্মদেহী সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তিনি হাত জোড় করে নত মস্তকে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন।" ভৈরবা-

নন্দকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, ঐ সন্ন্যাসী তান্ত্রিক ও গীতোক্ত তেজের উপাসক ছিলেন এবং মহাগৌরী পূর্বজন্মে ভৈরবী ব্রাহ্মণীরূপে তাঁর আশ্রমেই থাকতেন। আজ দুপুরে বিশ্রাম কালে মহাগৌরী অনুভব করলেন, কে যেন তাঁর গলার মাংস এক পর্দা কেটে দিল। মনে হল, কি একটা যেন গলা ভেদ করে কপালে উঠল। এই কথা শুনে ভৈরবানন্দ বললেন, "মহাগৌরীর মন বিশুদ্ধচক্র ভেদ করে আজ্ঞাচক্রে উঠল। আজ্ঞাচক্র ভেদ হলে ঐ অনুভূতি হয়।"

মহাগৌরী দুপুরে বিশ্রামকালে ধ্যানে দেখেছিলেন, স্বামিজী ও মা দুর্গা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। বৈকালে যখন দেবীঘট গঙ্গায় বিসর্জন করা হল, তখন আমি কলা বৌ কাঁধে নিয়ে গিয়েছিলাম। যখন দেবীঘট গঙ্গা গর্ভে নিমজ্জিত হলো, তখন দেখা গেল, উক্ত ঘট থেকে একটি জ্যোতিঃ এসে আমার বুকে ঢুকে গেল ও ব্রহ্মা কমণ্ডলু হাতে নিয়ে উপরে উঠে গেলেন। দেবীঘট বিসর্জন না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মা পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং বিসর্জনান্তে সম্মুখ ফিরে উর্দ্ধলোকে চলে গেলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণও গঙ্গাবক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি কলা বৌ কাঁধে নিয়ে গঙ্গা পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। তা দেখে ভৈরবানন্দ বললেন, আপনার দুটো প্রবল প্রারব্ধের একটা কেটে গেল। সন্ধ্যায় রামায়ণ গানের সময় লংকার রাবণ ও অশোক বনে মন্দোদরী সহ সীতাকে নাটমন্দিরে গানের আসরে দিব্য দেহে দেখা গেল। উক্ত বনে একটি অশোক গাছের তলা বেদীবৎ বাঁধান আছে। সেই বৃক্ষতলে সীতাদেবী ও মন্দোদরী বসেছিলেন। সীতাদেবী কাঁদছেন ও মন্দোদরী তাঁর গায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। উক্ত বেদীর চার দিকে ভূমিতে চেড়ীরা বসে আছেন। ১৯৩২-৩৩ খ্রীঃ সিংহলে অবস্থান কালে আমি নিউয়ারা এলিয়া পর্বতে অশোক বন ও উক্ত বেদী দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছি। রাবণকেও দশাননরূপে রামায়ণ গান কালে দেখা গেল। তাঁর দশমুখের মধ্যে মধ্য মুখ বৃহৎ গোঁফ যুক্ত ও গাত্র শিল্ক চাদরে

ঢাকা, দীর্ঘকায় ও বক্ষঃ প্রশস্ত। রামভক্ত বিভীষণও আবির্ভূত হলেন। তাঁর শান্ত মূর্তি ও নিম্ন দৃষ্টি, মাথায় লম্বা চুল। রাবণের বীর ভাব। কোন গ্রন্থে আছে, রাবণ রামের পুরোহিত ছিলেন রাবণ নিধন যজ্ঞে।

—দশ—

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (২য়)

২১ জুন ১৯৬১ বুধবার বৈকাল চারটায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে 'দিব্যদৃষ্টি' নামক গ্রন্থের জন্য 'দুর্গোৎসব' শীর্ষক অধ্যায় লিখছি। এমন সময় একটি দিব্যদেহী বিরাট পুরুষ এসে আমাকে বড় বড় অক্ষরে তাঁর নাম লিখে দেখালেন। আমি তাঁর নামের আদি বর্ণটী 'ন' পড়তে পারলাম, বাকী অংশ পড়া গেল না। তৎক্ষণাৎ আমি মহাগৌরীকে তাঁর কথা বললাম। তখন মহাগৌরী দেখলেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞ বিদেহী আমার সামনে মেজেতে বসেছেন—তাঁর মাথার জটা দড়ির মত পাকান ও সারা পিঠে ঝুলছে, শুভ্রবর্ণ, বড় বড় চোখ আগুনের মত জ্বলছে। আমরা উভয়ে তাঁকে সভক্তি প্রণাম করে মন্দিরে যেতে বললাম। তাতে তিনি এমন বিরক্তি সহকারে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন যে, তাঁর জটাজাল এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। তাই আমরা তাঁকে করযোড়ে দক্ষিণ বারান্দায় আমার শয্যায় গিয়ে বসতে বললাম। আমাদের অনুরোধে তিনি মদীয় শয্যায় গিয়ে বসলেন। তখন আমি তাঁকে ভক্তিভরে প্রণামপূর্বক প্রার্থনা জানালাম, এই দেহেই আমার সাধন শেষ ও পূর্ণ জ্ঞান লাভ হউক। তখন তিনি উক্ত শয্যায় বসেই

ডান হাত লম্বা করে বাড়িয়ে দশ বার হাত দূরে অবস্থিত আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং আমিও তাঁর দিব্য স্পর্শ স্পষ্টভাবে অনুভব করে ভাবাবিষ্ট হলাম। এখানে কিছুক্ষণ থেকেই তিনি স্বস্থানে চলে গেলেন। ইতোমধ্যে আর একটী বিরাট পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞ বিদেহী পশ্চিম বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথা মন্দিরের ছাদে ঠেকেছিল। এঁর মাথায় ছোট ছোট চুল, জটা নাই, জ্যোতির্ময় গাত্রবর্ণ। মহাগৌরী তাঁকে তাঁর পাশে আমার জলচৌকির উপর বসতে বলায় তিনি তথায় মহাগৌরীর গা ঘেঁসে বসলেন। মহাগৌরী অনুভব করলেন, ব্রহ্মজ্ঞ বিদেহীর পূত স্পর্শে তাঁর মেরুদণ্ডের মাঝখান থেকে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত ব্রহ্মাগ্নি জ্বলছে। অনন্তর উভয় বিদেহী একত্রে অন্তর্হিত হলেন।

২২ জুন বৃহস্পতিবার সকালে স্বামী ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে এলেন। আমরা তাঁকে উক্ত ঋষির কথা বলায় তিনি উক্ত ঋষিকে আহ্বান করলেন। সিদ্ধযোগীর আহ্বানে সত্বর উক্ত ঋসি এসে মন্দিরের চাতালে দাঁড়ালেন ও নিজের নাম লিখে দেখালেন—নর্দম ঋষি, ষষ্ঠ মন্বন্তরের সপ্তর্ষির অন্যতম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কেন এসে ছিলেন? তিনি উত্তরে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, বেড়াতে। আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম জানাতে তিনি অন্তর্হিত হলেন। বিষ্ণু পুরাণে আছে, প্রত্যেক মন্বন্তরের সপ্তর্ষির নামাবলী। সুতরাং চৌদ্দ মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন চৌদ্দ সপ্তর্ষি হয়েছেন। ২২ জুন বৃহস্পতিবার বৈকালে সিউড়ি থেকে একটি ভদ্রলোক এলেন। তিনি অদীক্ষিত ও অপরিচিত। সন্ধ্যার পূর্বে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী তাঁর সঙ্গে ইষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বললাম ও জানালাম, তিনি কালীভক্ত। তখন আমি দেখলাম, মন্দিরের চাতালে একটি জটাধারী রক্তবস্ত্র পরিহিত দৃঢ়কায় সূক্ষ্মদেহী দণ্ডায়মান। তাঁকে দেখে আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? ইনি কি নবাগত

ভদ্রলোকের পূর্বজন্মের দীক্ষাগুরু? ইহার উত্তরে স্বামী ভৈরবানন্দ বললেন, "হাঁ, ইনি পূর্বজন্মে এঁর গুরু সিদ্ধেশ্বর শর্মা। এই ভদ্রলোক ধর্মচক্রে আসার সময় দেখেছি, ইনি এঁর ধর্মচক্রে ঢুকলেন। আবার ইনি যখন মন্দিরে এলেন, তখন তিনিও তৎসঙ্গে উপরে এলেন। ঐ সূক্ষ্মদেহী স্বর্গলোকের সত্বস্তরে থাকেন ও ইচ্ছা করেন, তাঁর শিষ্য ইহাজন্মে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করুক। দুই দিন পরে শনিবার দুপুরে যখন উক্ত ব্যক্তি মন্দিরে বসে আমাদের নিকট ধ্যানশিক্ষা করলেন, তখনও সিদ্ধেশ্বর শর্মা এসে তাঁর পেছনে দাঁড়ালেন। যদি কেহ পর পর একই ইষ্ট ছয় জন্ম সাধন করে, সে ষষ্ঠ বা সপ্তম জন্মে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করবে। ইহার কারণ, আমাদের শরীররূপ ব্রহ্মাণ্ডে যে সপ্তস্তর বিগুমান, তন্মধ্যে এক এক স্তর এক এক জন্মে সাধন করে সে বিদেহ মোক্ষ বা জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে। দৃঢ়ভাবে সাধন করলে ছয় জন্মেই সপ্তস্তর সাধন করে বিদেহ মুক্তি লাভ হবে। এই সপ্ত স্তরের পরে আরও ছয় স্তর জয় করলে জীবন্মুক্তি লাভ হবে।"

২৩ জুন শুক্রবার দশহরা দিবসে বিবেকানন্দ নাটমন্দিরে মৃণ্ময়ী প্রতিমায় তৃতীয় বার্ষিক গঙ্গাপূজা হল। মদীয় গুরুদেব শ্রীমন্মহাপুরুষ শিবানন্দজীর নামে পূজার সংকল্প করা হল। মহাপুরুষজী কৃপা করে মৎপ্রদত্ত সংকল্পার্ঘ্য স্বহস্তে নিলেন এবং আমার মাথায়, দাড়িতে হাত বুলিয়ে আদর করে সহাস্য বদনে আশীর্বাদ করলেন এবং পূজাস্থলে সন্ধ্যারতি পর্য্যন্ত রইলেন। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর দিব্যদেহী দেবতারা প্রতিমায় প্রবেশ করলেন। গঙ্গা, জয়া, বিজয়া, মকর ও ভগীরথ—এই পঞ্চ মূর্তি রক্তমাংসময় দেহবৎ জীবন্ত হয়ে উঠলেন। মহাগৌরী অসুস্থ থাকায় কপিল মুনিকে আহ্বান করলেন। তখন কপিল মুনি এসে সম্মতিজনক স্বীকৃতি জ্ঞাপনান্তে গঙ্গাপূজা পরিচালনার গুরুভার লইলেন এবং পরদিন পূর্বাহ্নে বিসর্জন

পর্য্যন্ত গঙ্গা প্রতিমার কাছে ছিলেন। কপিলকৃত সাংখ্য সাধনের শেষ স্তরে এখন মহাগৌরী আছেন বলে কপিল ঠাকুর এলেন। সাংখ্য সিদ্ধির পরেও পঞ্চস্তর বিদ্যমান—আবার ঐ পঞ্চস্তরের প্রত্যেকটীতে তিন তিন স্তর আছে। সাংখ্যোক্ত কৈবল্যের পরে বেদান্তের সাধনা আরম্ভ হয়। কপিল মুনির চেহারা—আট হাত লম্বা, বুক দুই হাত চওড়া, পাকা সাদা দাড়ী নাভি পর্য্যন্ত দোদুল্যমান, মাথায় শুভ্র জটা এক হাত উঁচু করে পাকান, কনুইয়ের উপরে রুদ্রাক্ষ মালা, হাতে রুদ্রাক্ষের জপমালা, হলুদ রঙের কাপড় পরা, আকর্ণ বিস্তৃত আঁখি, তীক্ষ্ণ নাসা, বৃষস্কন্ধবৎ খাড়া গ্রীবা। তাঁকে দেখে আমি সভক্তি প্রণাম করলাম। কিঞ্চিৎ পরে আমি একটী দেবীমূর্তি দেখলাম। স্বামী ভৈরবানন্দ তাঁকে দেখে বললেন, ইনি মহারাজ ভগীরথের জননী। মহাগৌরী পূজাকালে বার বার সমাধিস্থ হলেন। যখন তিনি হোমাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিলেন তখন দণ্ডায়মান অবস্থায় গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। হোমান্তে প্রবল ঝড় বৃষ্টি হলো ও নাটমন্দির ভেসে গেল। তখন গঙ্গাদেবীকে অন্নভোগ নিবেদিত হলো, এবং ভীষণ দুর্যোগ সত্ত্বেও অসংখ্য দেবতা এসে ভোগ নিলেন। প্রতিমাস্থ দেবগণ ব্যতীত দশ মহাবিদ্যা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ও মহেশ্বর (স্ব স্ব লোকস্থ পার্শ্বচর, সাধক-সাধিকা সহ), ইন্দ্রাদি দশদিকপাল ও তাঁদের অনুচরবৃন্দ ও তৎতৎ লোকস্থ সাধকবৃন্দ, কল্কি আদি দশাবতার, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদবৃন্দ, বালগোপাল—এক কথায় তেত্রিশ কোটী দেবতা ঝাঁকে ঝাঁকে এলেন এবং খেয়ে চলে গেলেন। অবশ্য ঝড়বৃষ্টি থামার পর তাঁরা গেলেন। পূর্বদিন থেকে অম্বুবাচী পড়ায় দশহরায় ঝড়বৃষ্টি হলো।

একটী তারাভক্ত কুমার যুবক আমাদের গঙ্গাপূজায় এসেছিলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ দেখলেন, সেই তরুণের সঙ্গে বামাক্ষেপা সূক্ষ্মদেহে এলেন। ঐ যুবক পূর্বজন্মে বামাক্ষেপার শিষ্য কালী ছিলেন এবং

অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে পতিত হয়েছিলেন। রামাক্ষেপা ভৈরবানন্দকে বললেন, এই জন্মে এর দিকে একটু নজর দিবেন। বামাক্ষেপা বিদেহ মুক্তির সত্ত্বস্তরে দেহত্যাগ করেছেন ও এখন শিবলোকে শিবের নিকটতম ভৈরব হয়ে আছেন, মুক্তি নেননি। তাই ভৈরবানন্দের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি পূজামণ্ডপে গেলেন না। পরদিন শনিবার পূর্বাহ্নে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী যখন মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় বসে পূর্বোক্ত তারা-ভক্তের কথা বলছিলাম, তখনও বামাক্ষেপা এসেছিলেন। আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম করে দেখলাম, কাল মুণ্ডি যুক্ত কাঠের খড়ম তাঁর পায়। দুপুরে দুর্যোগ হওয়ায় আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম ও ভাবলাম, যদি সান্ধ্য আরতি ও সান্ধ্য সভা কালে আবার ঝড়বৃষ্টি নামে, তাহলে শত শত নরনারীর আনন্দ নষ্ট হবে ও আমাদের গঙ্গাপূজা অঙ্গহীন হবে। তাই ভৈরবানন্দ মা কালীকে কাতর প্রার্থনা জানালেন, যাতে আর দুর্যোগ না হয়। তখন মহাগৌরী মন্দিরে গিয়ে স্নেহের গোপালকে বললেন, বাবা, তিনটে দিব্য বেলপাতা সাদা চন্দন মাখিয়ে দে ত? গোপাল পাশেই ছিলেন এবং অবিলম্বে তিনটী দিব্য সচন্দন বেলপাতা ও একটী চামেলী ফুলের মালা এনে মহাগৌরীর হাতে দিলেন। তখন মহাগৌরী শিবের মাথায় তিনটী বেলপাতা ও জটার ঝুঁটীতে চামেলী ফুলের মালা জড়িয়ে দিলেন। তখন শিব প্রসন্ন হয়ে অভয় দিলেন। কালী ও শিবের কৃপায় উক্ত সন্ধ্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয় নি।

সান্ধ্য আরতির পর নাটমন্দিরে কথিকা ক্ষান্তিলতা গঙ্গোপাধ্যায় কথকতা করলেন সওয়া দুই ঘণ্টা। সাড়ে তিন শত নরনারী মুগ্ধ হয়ে তাঁর সুভাষিত কথকতা শুনলেন। অগস্ত্য তিন গণ্ডুষে সমুদ্র-সলিল পান করায় সমুদ্র শুষ্ক হয়। সমুদ্রকে জলপূর্ণ করার জন্যই গঙ্গা অবতরণ করলেন ও সমুদ্র জলপূর্ণ হল। তাই গঙ্গাসাগর সঙ্গমের এত মাহাত্ম্য।

যখন কথিকা বলছেন, রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করেন, তখন রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর অনুচরবৃন্দকে গঙ্গা প্রতিমার সম্মুখে দেখা গেল। রাজা বিশ্বামিত্রের বর্ণ কাল, দেহ দীর্ঘ আট নয় হাত, আকর্ণ বিস্তৃত আঁখি ও চক্ষুর তারা ভাঁটার মত ঘুরছে, মাথায় কুঞ্চিত কেশ ও মণিমাণিক্যখচিত মুকুট, গলায় মুক্তাদি হার, গাত্রে নানা অলংকার, কবজী ও বাহুতে মণিমুক্তার অলংকার, কোমরে কোষবদ্ধ অসি, পৃষ্ঠে তীরধনু, ক্ষাত্র রাজবেশ পরিহিত। যখন কথিকা বলছেন, রাজা শান্তনুকে গঙ্গা ত্যাগ করলেন, তখন গঙ্গা ও শান্তনুকে দেখা গেল। শান্তনুর কাতর নয়ন থেকে অবিরাম অশ্রুধারা বহিছে ও তিনি বলছেন, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। সেই করুণ দৃশ্য দেখলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়; কিন্তু গঙ্গা রইলেন না ও বললেন, "মহারাজ, যখনই আপনি আমাকে স্মরণ করবেন, তখনই আমার সাক্ষাৎ পাবেন। আপনার শেষ পুত্র শিশু ভীষ্মকে আমি নিয়ে গেলাম ও যথাসময়ে আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব।" সেই সময়ে বশিষ্ঠ এসে হাজির হলেন। বশিষ্ঠ শান্তনুকে প্রবোধ দিলেন, "মহারাজ, আপনি দুঃখ করবেন না। দৈব কার্য্য সমাপ্ত হয়েছে, গঙ্গা চলে যাবেন। আর তাঁকে রাখা যাবে না। ভীষ্মকে গঙ্গাহস্তে সমর্পণ করুন। আমি ভীষ্মকে সর্ববিদ্যা, ধনুর্বেদ ও শস্ত্রবিদ্যাদি শিক্ষা দেব।" বশিষ্ঠই ভীষ্মের প্রথম গুরু ও পরশুরাম শেষ অস্ত্রগুরু। যখন শান্তনু গঙ্গাকে মাতৃজ্ঞানে ও দেবীজ্ঞানে পূজা করতে উৎসুক হলেন, বশিষ্ঠদেব যোগবলে পারিজাত পুষ্পমাল্য সহ পূজোপকরণ এনে দিলেন। শান্তনু গঙ্গার পূজা করে গঙ্গার গলায় পারিজাত মালা পরিয়ে দিলেন। তখন আমি পারিজাত ফুলের তীব্র গন্ধ আঘ্রাণ করলাম ও মহাগৌরীকে ডেকে বললাম। মহাভারতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে নিয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন 'দেবানাং কার্য্য সিদ্ধ্যর্থং'। তখন উভয়ে ইন্দ্রদেবের নন্দন কাননে বেড়াতে

যান। তথায় সত্যভামা পারিজাত ফুলগাছ দেখে সেটী মর্ত্যে আনতে চাইলেন। তাঁর জন্য শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে পারিজাত হরণ পূর্বক দ্বারকায় এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। পারিজাতের এমন মহিমা যে, তার তলায় মানুষ গেলে পূর্বজন্ম স্মরণ হয় ও নিজেকে দেবতা ভাবে। শাম্বাদি শ্রীকৃষ্ণের সন্তানগণ পারিজাতের তলায় গিয়ে পূর্বজন্ম স্মরণ করতেন ও নিজদিগকে দেবতা ভাবতেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর পারিজাত স্বর্গে ফিরে গেলেন। কনক চাঁপা বা স্বর্ণচম্পকই পৃথিবীর পারিজাত। পারিজাতবৎ কনক চাঁপাও উগ্রগন্ধ। পারিজাতের গুড়ি, ডালপালা, পাতা; ফুল সবই স্বর্ণবর্ণ। পারিজাত পুষ্প কনক চাঁপার মত লম্বা ও স্বর্ণবর্ণ। শুক্রবার রাত্রে উৎসবান্তে আমরা যখন এক তলার বারান্দায় বসে গঙ্গাকথা বলছি, তখন গঙ্গাদেবী শুভ্রবর্ণা কন্যামূর্তিতে এসে আমাদের সম্মুখে দাঁড়ালেন।

২৪ জুন শনিবার পূর্বাহ্নে যখন গঙ্গাদেবীর বিসর্জন পূজা হচ্ছিল, তখন দিব্যজোতিঃসম্পন্ন দেবীমূর্তি একটী এলেন। তিনি গঙ্গা প্রতিমার কাছে এসেই কুটিল মূর্তি ধারণ করলেন। ইহার কারণ, গঙ্গাদেবী তাঁকে উপহাস করেন। সেইজন্য তিনি রুদ্রমূর্তি ধরেছিলেন। আমরা তাঁর ভীমা মূর্তি দেখে ভয় পেলাম ও তাঁকে গন্ধপুষ্প দিলাম। স্বামী ভৈরবানন্দ তাঁকে জ্ঞানচক্ষুতে দেখে বললেন, ইনি বিরজাদেবী ও গঙ্গাদেবীর সতীন। উভয়ে ঝগড়া করে পরস্পরকে অভিসম্পাত দেন এবং তার ফলে মর্ত্যে নদীরূপে অবতরণ করেন। পদ্মা, মেঘনা, শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, ও তুঙ্গভদ্রা—এই সপ্তনদ বিরজার অংশভূত। আর অলকানন্দা যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী—এই সপ্তনদী গঙ্গার অংশভূত। এখানে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাধক ও সাধিকা থাকায় দেবী বিরজা পূজার প্রত্যাশায় এসেছিলেন। দেবী অপরাজিতাকে গঙ্গাপ্রতিমার পাশে দেখা গেল। তাই মনে হয়, দশহরা গঙ্গাপূজার পরদিন বিজয়াকৃত্যকালে বিরজা ও অপরাজিতা দেবীদ্বয়ের পূজা অবশ্য কর্তব্য।

যখন শনিবার দুপুরে বিশ্বরূপানন্দ গঙ্গাঘট মাথায় নিয়ে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিতে গেলেন, তখন আমরা মন্দিরে ছিলাম ও দেখলাম, ভগীরথের বৈকুণ্ঠ-বাসিনী মাতৃদেবীও তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন ও আবার ফিরে এলেন। ঐদিন বৈকালে কলিকাতা থেকে একটি বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ এলেনও ভৈরবানন্দজীর মুখে দুই ঘণ্টার অধিক ধর্মকথা শুনলেন। তিনি চলে যাবার পর ভৈরবানন্দ ইষ্টদেবীকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, ইনি ঠাকুরের চিকিৎসক হোমিওপ্যাথ মহেন্দ্রলাল সরকার। পূর্বজন্মে উভয়ে পরিচিত ছিলেন বলে ভৈরবানন্দ তাঁর প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করলেন। ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনেছেন, মহেন্দ্রলাল সরকার ব্যতীত সুরেশ মিত্র, লক্ষ্মীমণি দেবী, গোলাপসুন্দরী, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, প্রতাপ হাজরা, শশধর পণ্ডিত, চন্দ্র ও গিরিজা, ধনি কামারণি, ডাকাত বাবা ও তৎপত্নী, যোগীন্দ্রমোহিনী, নিবেদিতা প্রভৃতি পুনর্জন্ম নিয়েছেন।

শনিবার সন্ধ্যায় মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরকে ফল-মিষ্টি নিবেদন করলেন। তখন বিরজা দেবী আমাদের নৈবেদ্য অল্প ও বহু দেবতা দেখে তৎক্ষণাৎ নানা রকম ফলমিষ্টি, ফুল ও মালা এনে রাখলেন। তখন মহাগৌরী সমস্ত নৈবেদ্য একত্রে নিবেদন করলেন। বিরজা দেবী স্বয়ং শিবকে, কল্কিকে ও ঠাকুরকে স্বীয় দিব্যমালা পরিয়ে দিলেন। পূর্বাহ্নে বিসর্জন কালে আমরা গঙ্গাদেবীকে প্রার্থনা করেছিলাম, মা, তুমি প্রতিমা থেকে আমাদের মন্দিরে যাও। দুপুরে আমরা মন্দিরে জপ করতে বসে দেখলাম, তিনি আমার সামনে এসে শুভ্রবর্ণ কন্যামূর্তিতে দাঁড়ালেন।

২৫ জুন রবিবার মধ্যাহ্ন স্নানের পূর্বে আমি ক্লান্ত হয়ে দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছি ও শয্যার উত্তর পাশে দেওয়ালের গায় তাকিয়াটী ছিল। এমন সময় দেখলাম, ঐ তাকিয়ার উপরে একটী দেবী ও একটী কুমারী উপবিষ্টা। তখন মহাগৌরী নীচ তলায় ছিলেন। তাঁকে ডেকে এঁদের কথা বলায় তিনি উপরে এসে তাঁহাদিগকে দেখে বললেন,

প্রথমটী বিরজা ও দ্বিতীয়টী কৌমারী। স্নানান্তে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপূজা করলাম ও অন্নভোগ দিলাম। আজ ঠাকুরপূজার পর আমরা পৃথক্ নৈবেদ্য দিয়ে বিরজা ও অপরাজিতা দেবীদ্বয়ের পূজা করলাম। উভয় দেবী এসে আমাদের পূজাদি নিলেন। পূজাকালে আমার বাম ও ডান কাঁধে যথাক্রমে কৌমারী ও গোপাল এসে পা তুলিয়ে বসলেন। তাই আমি পূজার ক্রম ও মন্ত্র ভুলে গেলাম। তখন মহাগৌরী দেখলেন, ইন্দ্রদেব রাজবেশ ফেলে পূজকের বেশে মন্দিরে এলেন বিবিধ পূজার দ্রব্য নিয়ে বিরজাপূজার জন্য। তিনি বিরজাদেবীর জন্য সোনার বাটিতে শ্বেত চন্দন, সোনার বাটীতে রক্তচন্দন, তাম্রময় পুষ্পপাত্রে ফুল, মালা, মুকুট ও বস্ত্রাদি, অলংকার প্রভৃতি এনেছিলেন এবং সেই সব দ্রব্য দিয়ে বিরজার পূজা করলেন। মোক্ষধামে যেতে হলে বিরজা নদী পার হতে হয় অতি কষ্টে। তাই মোক্ষার্থীগণ ব্যতীত অন্য কেউ বিরজাপূজা করেন না। বিরজাদেবী মোক্ষদানে অসমর্থা। ষোড়শ উপচারে বিরজার পূজা করে ইন্দ্রদেব, বিরজা, অপরাজিতা ও অন্যান্য দেবদেবীগণ অন্নভোগ গ্রহণ করলেন। আমাদের বিরজাপূজার আয়োজন অল্প দেখে ইন্দ্রদেব স্বয়ং আমাদের হয়ে ষোড়শ উপচারে বিরজাপূজা করলেন। মহাগৌরী দেখলেন বিরজাদেবীকে সুদীর্ঘা ও সুপ্রশস্তা জ্যোতিঃনদীরূপে। ইহাই বিরজার পারমার্থিক সত্ত্বা ও উক্ত সত্ত্বা বেদান্ত-নির্দিষ্ট ব্রহ্মলোকে অবস্থিতা এবং তাঁর সূক্ষ্ম সত্ত্বা গোলোকে বিদ্যমানা। কৌষিতকী উপনিষদে বিরজানদীর কথা আছে। বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণকালে বিরজা হোম করিতে হয়। তবে গঙ্গানদীও মহামায়ার অংশভূতা ও মোক্ষদানে সম্যক্ সমর্থা।

গত পরশু দশহরা দিবসে আমরা ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্রে গঙ্গা-পূজা করেছি। আজ দুপুরে মন্দিরে পূজাকালে ভৈরবানন্দ সমাধিযোগে বললেন, বিরজাদেবীর বীজমন্ত্র—ওঁ ঐঁ বিরজাদেব্যৈ নমঃ এবং অপরাজিতার বীজমন্ত্র—ওঁ অং অপরাজিতাদেব্যৈ নমঃ। এই দুই বীজমন্ত্র

দিয়ে আমরা বিরজাপূজা ও অপরাজিতা পূজা করলাম। আজ বৈকাল সাড়ে চারটায় বামাক্ষেপা ও ভৈরবী সিদ্ধেশ্বরী এলেন। সিদ্ধেশ্বরী প্রীতিভরে তদীয় আগমন আমাকে নম্রভাবে জানালেন একটী জবাফুল নিয়ে এবং মন্দিরে গিয়ে সেই জবা তিনি মা কালীর পায় দিলেন। বামাক্ষেপা তারা-ভক্ত হয়েও মা কালীর পায় সচন্দন জবা-বিল্বদল দিলেন। বক্রেশ্বর পাহাড়ের অঘোরী বাবার সহিত সিদ্ধেশ্বরী ভৈরবীর সংপর্ক ছিল। মহাগৌরী প্রতিমা বরণ করতে যাবার পূর্বে সিদ্ধেশ্বরী দক্ষিণ বারান্দায় এসে পূর্ণমূর্তিতে দেখা দিলেন ও প্রতিমা বরণের অনুমতি চাইলেন। যথাসময়ে মহাগৌরী ও সিদ্ধেশ্বরী নাটমন্দিরে গঙ্গা প্রতিমা বরণ করলেন। তাঁদের সঙ্গে আমার মন্দিরবাসিনী জননীও প্রতিমা পরিক্রমা করলেন। বরণান্তে প্রতিমাস্থ গঙ্গা, জয়া, বিজয়া, মকর ও ভগীরথ জীবন্ত হলেন। মহাগৌরী পাঁচ বার প্রতিমা প্রদক্ষিণপূর্বক দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিস্থ হলেন। যখন প্রতিমা পশ্চিম ফটক দিয়ে বড় রাস্তায় নেওয়া হলো, তখন আমি নাট মন্দিরে ইজি চেয়ারে বসে বামাক্ষেপাকে পূর্ণমূর্তিতে দেখলাম। ঠেলা গাড়ীতে প্রতিমা বসিয়ে গঙ্গাতীরের অভিমুখে আমরা ঢাকবাদ্য ও শংখবাদ্য সহ যাইতেছিলাম। তখন কাল ভৈরব, বামাক্ষেপা ও সিদ্ধেশ্বরী, আমার জননী সূক্ষ্মদেহী, ব্যাসপিতা পরাশর প্রভৃতি গিয়েছিলেন। পরাশরের চেহারা বেশ দীর্ঘ, মাথায় সাদা জটা, চক্ষুদ্বয় টানা ও বড়, নাক বাঁশির মত লম্বা, সাদা গোঁফ ও সাদা লম্বা দাড়ি, দুগ্ধবৎ ধবল গাত্রবর্ণ। যখন গঙ্গাজলে প্রতিমা নিমজ্জিত হলো, তখন স্বর্গ থেকে দেবতারা নেমে শূন্যে থেকে প্রতিমা দেখছিলেন। স্বর্ণময় ময়ূরপংখী দিব্য নৌকা ঊর্দ্ধলোক থেকে নেমে এল। তাতে গঙ্গাদেবী বসে চলে গেলেন। তখন গঙ্গা-সত্ত্বার ত্রিভাগ হলো—পারমার্থিক মূলসত্ত্বা হিমালয়ে গেলেন, এক ভাগ পৃথিবীপালিনী সত্ত্বা গঙ্গাজলে মিশ্রিত হলেন এবং বাকী ভাগ মনুষ্য কর্মসত্ত্বা বিদ্যুৎবৎ জ্যোতিঃরূপে এসে আমার অন্তরে প্রবেশ করলেন। উক্ত গঙ্গা-সত্ত্বার

প্রবেশে আমি কিঞ্চিৎ গঙ্গাভাবে আবিষ্ট হলাম। শুক্রবার দশহরা মধ্য রাত্রে জহ্নু মুনি মহাগৌরীর কাছে এসে গঙ্গাপূজার বিধি ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। শুক্রবার দুপুরে গঙ্গাহোমান্তে যখন ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, তখন মহাগৌরীর অনুরোধে স্নেহের গোপালজী সুদর্শন চক্র হাতে নিয়ে ঝড়-জল থামাবার জন্য শূন্যে উঠে গেলেন, তথাপি দুর্যোগ কমল না। শনিবার পূর্বাহ্নে যখন গঙ্গাপূজার বিজয়াকৃত্য হইতেছিল, তখন ভৈরবানন্দ পূজামণ্ডপে বসে সমাধিস্থ হয়ে দেখলেন, মহাশূন্যে মাথাভাঙ্গার (কুচবিহার) কালীভক্ত রবীন ভৌমিককে কোলে নিয়ে কালীমাতা স্বর্গের মধ্যস্তরে রেখে এলেন। ঐ দিন গভীর রাত্রে আমিও দেখলাম, আমার শয্যায় রবীন ভৌমিক সূক্ষ্মদেহে উপবিষ্ট। সূক্ষ্মদেহে আমার কাছে আসার পূর্বে দীক্ষিত রবীন মহাগৌরীর কাছেও গিয়াছিলেন। গৃহস্থ রবীন ভৌমিক হঠাৎ কালীদর্শনে উন্মাদবৎ হয়ে পাঁচ বর্ষ যাবৎ শয্যাগত ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি স্থূলদেহত্যাগ করেছিলেন ও গুরুস্থানদর্শনে এসেছিলেন। ২৬ জুন সোমবার প্রাতঃকালে মন্দিরে আমি যখন জপমগ্ন ছিলাম, তখন কৌমারী এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন এবং বামাক্ষেপা আমার ডান দিকে দাঁড়িয়ে কৌমারী দেবীকে দেখছিলেন। আজ দুপুরে নাটমন্দিরে আমি আমার একটী দাঁত কোন কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে তোলালাম। ইহা তোলার পরে রক্ত পড়ায় মহাগৌরী ভয় পেয়ে দেবী কৌমারীকে এক ডাক দিতেই কৌমারী মন্দির থেকে ছুটে গিয়ে আমার সামনে দাঁড়ালেন। এবার সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ বললেন, আমার মন্দিরবাসী তপোনিষ্ঠ মাতাপিতা চতুর্বিংশতি সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকৃতিপীঠে সাধনা করছেন।

২৭ জুন মঙ্গলবার বৈকাল দুইটায় আমি ও মহাগৌরী যথাক্রমে মন্দিরের দক্ষিণ ও উত্তর বারান্দায় স্ব স্ব শয্যায় শুয়ে আছি। এমন সময়ে সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে সূক্ষ্মদেহে এলেন—সাদা ধুতি ও সাদা ফতুয়া পরা। আমাকে নমস্কার করেই তিনি মহাগৌরীর কাছে গিয়ে

চেয়ারে বসলেন ও একটু পরে চলে গেলেন। আজ তাঁকে দেখার পর তাঁর ইষ্টদেবী মা কালীকে আমি দেখলাম। এতাবৎ তিনি সূক্ষ্মদেহে এলে তাঁর ইষ্টদেবীকে প্রথমে দেখেছি। তাঁর সূক্ষ্মদেহকে এত স্পষ্ট ও পূর্ণ ভাবে পূর্বে কখনও আমি দেখিনি।

২৬ জুন সোমবার নৈশ আহারান্তে আমি দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় বসে মহাগৌরীর আহত বাম গোড়ালীতে গরম ঘৃত মালিশ করিতেছিলাম। তখন সূক্ষ্মদেহী সিদ্ধেশ্বরী ভৈরবী এসে আমার পাশে বিছানায় বসলেন। তাঁর মুখমণ্ডল দুগ্ধবৎ শুভ্রবর্ণ ও সুন্দর। দুই দিন যাবৎ ইনি ও বামাক্ষেপা আমাদের মন্দিরে আছেন।

২২ জুন বৃহস্পতিবার স্বামী ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে ধর্মচক্রে এলেন। তাঁকে ১৫ জুন বৃহস্পতিবার ভোরে দৃষ্ট সুশুভ্রা কৌমারী দেবীর কথা বলায় তিনি তাঁকে আহ্বান করলেন। অবিলম্বে সুশুভ্রা কৌমারী এসে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় আমার সামনে দাঁড়ালেন ও তাঁর নাম লিখে দিলেন—কৌমারী। শ্রীশ্রীচণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে আছে, কৌমারী অষ্ট মাতৃকার অন্যতমা ও কুমার-শক্তি।—

ময়ূর-কুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

ইহার অর্থ, ময়ূর ও কুক্কুট বাহনদ্বয়ে পরিবেষ্টিতা মহাশক্তিরূপিণী কৌমারী মূর্তিধারিণী নারায়ণীকে নমস্কার করি। গোপাল চক্রবর্তী কৃত 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নাম্নী টীকা অনুসারে "কৌমারী কুমার-শক্তিঃ। অরুণোদয়িতং পুত্রং তাম্রচূড়ং প্রদত্তবান্ ইতি মহাভারতদর্শনাৎ কুক্কুটোঽপি কার্তিকেয়স্য বাহনম্, অরুণ-গরুড়াভ্যাম্ কুক্কুটময়ূরয়োর্দত্তত্বাৎ।" কৌমারী কুমার বা কার্তিকের শক্তি। মহাভারতে আছে, অরুণ কার্তিককে কুক্কুট প্রদান করেন। ইহা দ্বারা জানা যায়, কুক্কুটও কার্তিকের বাহন। অন্যত্র আছে, গরুড় কুমারকে ময়ূর প্রদান করেন।

কৌমারী এই দুই বাহনে পরিবৃত থাকেন। ভাস্কর রায় কৃত গুপ্তবতী টীকাতে আছে, "বস্তুতস্তু ময়ূর-কুক্কুটশ্চেতি দ্বে অপি স্কন্দস্য স্তৃতীয়াবরণস্থদেবতে। তদুক্তং শিবার্চনচন্দ্রিকায়াং সুব্রহ্মণ্যমন্ত্রপ্রকরণে—

'দলাগ্রেষু চ পূর্বাদি যজেৎ দেবাননস্তরম্।
দেবসেনাপতিং শক্তিং বিঘ্নং কুক্কুটমেব চ।
মেধাং ময়ূরং বজ্রং চ দ্বীপং লোকেশ্চরাংস্তত ইতি।

স্কন্দেন হত শূরপদ্মাসুর এব ময়ূরকুক্কুটশ্চেতি রূপদ্বয়ং বিভ্রৎ স্বামিনো বাহনধ্বজন্তশ্চেতি ক্রমেণাভবদিতি স্কান্দে কথা চ।" শ্রীশ্রীচণ্ডীর টীকা শান্তনবীতে আছে, "কৌমারী নারায়ণীমূর্তিঃ। নারায়ণী ভগবতী। কৌমারী বিষ্ণুদ্বেষিঘাতিনী নারায়ণী। মহাশক্তিধরে মহতীশক্তিরায়ুধং মহাশক্তিঃ। ধরতীতি ধরা মহাশক্তের্ধরা। মীনাত্যহীন্ ময়ূরঃ। 'ময়ূরো বর্হিণো বর্হী কুক্কুটশ্চরণায়ুধঃ।' কুগুচ্চারণেন কুক্কুটঃ। ময়ূরা বাহনীভূতাঃ ক্রীড়ার্থাশ্চ বর্ধিতাঃ কুক্কুটাশ্চ যুদ্ধচাতুর্য্যদিদৃক্ষৌ চিত্যাদুপার্জ্জিতাঃ তৈর্ময়ূরৈঃ কুক্কুটৈশ্চ বৃতা বেষ্টিতা যত ইয়ং কৌমারী। তেন বাল্যোচিতা কুক্কুটকুতুক-ক্রীড়োক্তা। হে ময়ূরকুক্কুট ক্রীড়ারসরতে ইত্যর্থঃ। যদ্বা ময়ূরৈঃ কুক্কুটৈশ্চ বৃতিরাবরণং যস্যাঃ সা তথোক্তা। যদ্বা কৌঞ্চব্যূহচক্র ব্যূহাদিবৎ ময়ূরব্যূহ-কুক্কুটব্যূহৌ চ সংগ্রামোচিত সৈন্যসন্নিবেশৌ। যদ্বা বাহনীভূতত্বাৎ ময়ূরৈ কৌমারী পরিবেষ্টিতা। অথ চেয়ং কুক্কুটাখ্যালংকারৈরাবৃতত্বাৎ কুক্কুটবৃতা। কুক্কুটাখ্য স্বর্ণভূষণভূষিতেত্যর্থঃ। কুক্কুটঃ তাম্রচূড়েতি ভূষায়ামপি দৃশ্যতে।' যদ্বা ময়ূরাঃ কুক্কুটা ইব চিত্রপুচ্ছবিবর্জিতাঃ ময়ূরকুক্কুটাস্তৈরাবৃতা। 'আরক্তনেত্রপিচ্ছাগ্রো ময়ূরঃ কুক্কুটঃ। বর্হেণ বর্জিত বর্হী যঃ স ময়ূর-কুক্কুটঃ।' ইতি যাদবপ্রকাশঃ। কুমারঃ পুমান্ ময়ূরমারোহতি কৌমারী তু ময়ূরমারুহ্যতীতি ভাবঃ। কোকন্তে কৌমার্য্যাঃ আজ্ঞামাদদতে গৃহ্নন্তি।"

কোন কোন গ্রন্থমতে কৌমারী নবদুর্গার অন্যতমা ও কৌমারীপূজা

দুর্গাপূজার অঙ্গীভূতা। উল্লিখিত টীকাকারদের জ্ঞানচক্ষু খুলেনি বলে তাঁরা কৌমারীর বাহন সম্বন্ধে বুদ্ধিবলে পূর্বোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া মহাভ্রমে পড়েছেন। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী জ্ঞানচক্ষুতে সবাহনা কৌমারীকে দেখে বলেন, কৌমারীর বাহন কুক্কুট, ময়ূর নহে।

কৌমারী ময়ূর ও কুক্কুটে পরিবৃত থাকেন। ময়ূর কুমারের বাহন ও কুক্কুট কৌমারীর বাহন। কুক্কুট শ্বেতবর্ণ ওতার মাথায় লাল ঝুঁটি। আবির্ভূতা কৌমারীর বক্ষঃস্থলে লেখা ছিল তাঁর বীজমন্ত্র কীং। কৌমারীর দশাক্ষর পূর্ণমন্ত্র—ওঁ কীং কৌমারীদেব্যৈ নমঃ। তিনি এসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন এবং আমাদের অনুরোধে মন্দিরে গেলেন। দুপুরে আমিও মহাগৌরী মন্দিরে নিত্যপূজা করলাম। তখন আমি কৌমারীকে অর্ঘ্য দিলাম। তিনি সেই অর্ঘ্য হাতে করে নিলেন ও অর্ঘ্যের জবাটী মাথায় গুঁজলেন। যখন আমি তাঁর ধূপারতি করলাম, তখন তিনি বালিকা মূর্তিতে আমার বাম কোলে এসে বসলেন। আজ ফলমিষ্টির নৈবেদ্যের সঙ্গে একটু দই গোপালজীর জন্য নিবেদিত হলো একটি এ্যালুমিনিয়াম কৌটাতে। কৌমারী গোপালের কাছে দই চাওয়ায় গোপাল প্রথমে মাথা নেড়ে না বললেন। কৌমারী আবার হাত পেতে চাওয়ায় গোপাল একটু দই হাতে নিয়ে কৌমারীর মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। তখন স্নেহের কৌমারী আমার কাছে এসে তাঁর মাথা নীচু করে দই দেখালেন ও হাত নেড়ে অভিযোগ করলেন। আমি স্নেহভরে সান্ত্বনা জানাতে কৌমারী শান্ত হয়ে শিবের কাছে গিয়ে বসলেন। তখন শিব ঠাকুর তাঁর মাথার দই মুছিয়ে দিয়ে তাঁর হাতে একটী চমচম মিষ্টি দিলেন। তখন কৌমারী আশ্বস্ত হয়ে ঠাকুরের হাত থেকে ফলমিষ্টি প্রসাদ নিলেন। দেবীকবচে আছে, যেমন মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া হন, তেমনি কৌমারীও প্রয়োজনবশে শিখিবাহনা হন এবং কৌমারী সাধক বা সাধিকার দন্ত সমূহ রক্ষা করেন। দশহরার পরদিন শনিবার রাত্রে আমি যখন নৈশ

আহারান্তে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে আছি, তখন কৌমারী সুকুমারী বালিকা মূর্তিতে আমার শয্যায় বসেছিলেন। কয়েক দিন ধরে দেখছি, কৌমারী আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন জ্যোৎস্নাবৎ শুভ্র কন্যামূর্তিতে।

২৮ জুন বুধবার জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। ঐদিন শুভ প্রাতে মন্দিরে আমি একা বসে সূর্য্যমন্ত্র জপান্তে কৌমারী মন্ত্র জপ করলাম। অবিলম্বে অনঘা সুশুভ্রা কৌমারী এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর পাশে শুভ্র বাহন কুক্কুটকেও দেখা গেল। আজ নিঃসংশয়ে জানা গেল, কৌমারী কুক্কুটবাহনা। মহাগৌরীও উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে সবাহনা কৌমারী দেবীকে দেখলেন। গত দুই তিন রাত্রে আমার শয্যায় কৌমারী তাকিয়ার উপর দেওয়াল ঠেস দিয়ে বসে থাকেন প্রায় সারারাত্রি। তাঁর শুভ্রতম অঙ্গজ্যোতিঃতে আমার মশারী আলোকিত হয় এবং মশারীর তিন দিকে অগণিত সূক্ষ্মদেহী ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে তাঁকে দর্শন করেন। যেমন গোপাল এসেছেন মহাগৌরীর সঙ্গে লীলা করতেন, তেমনি কৌমারী এসেছেন আমার সঙ্গে লীলা করতে। তাই তিনি সর্বদা আমার সঙ্গে থাকেন। অম্বুবাচীর সাত আট দিন পূর্বে কৌমারী এসেছেন, ~~অম্বুবাচীর সাত আট দিন পূর্বে কৌমারী এসেছেন,~~ অম্বুবাচীর সময় কামাখ্যায় ও কন্যাকুমারী তীর্থদ্বয়ে শতশত কুমারীপূজা হয়ে থাকে।

গত জন্মে শেষ ভাগে আড়াই বৎসর কামাখ্যা তীর্থে তপস্যান্তে আমার দেহত্যাগ হয়েছিল। তাই প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে ১৯৩৭ খ্রীঃ বরিশাল থেকে যখন কামাখ্যা দর্শনে গিয়েছিলাম, তখন কামাখ্যা মন্দির ও পাহাড় প্রভৃতি আমার খুব ভাল লেগেছিল।

২৭ জুন মঙ্গলবার রাত্রে আহারান্তে আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ কোণে দাঁড়িয়ে আছি এবং মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শায়িত। এমন সময় আমিও মহাগৌরী উভয়ে দেখলাম,

বগলা দেবী বাহির থেকে এসে দক্ষিণ বারান্দায় মন্দিরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি সভক্তি প্রণাম করতে তিনি মন্দিরে গেলেন। মঙ্গল গ্রহের ইষ্টদেবী বগলামুখীকে গত বৎসর থেকে পূজা-ধ্যান করে আসছি। গত দোলপূর্ণিমায় ব্রহ্মা পূজার পর থেকে সেটি বন্ধপ্রায় হয়েছে, অথচ আমার প্রতি মঙ্গলগ্রহদোষ এখনও কাটেনি। তাই আমাকে স্মরণ করাতে ও অভয় দিতে মঙ্গলবার মঙ্গলময়ী মাতা বগলা এসেছিলেন।

২৯ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মহাগৌরী এলেন দুই দিন বালি বাসায় থেকে। সন্ধ্যার পরে আমরা উভয়ে ভ্রমণান্তে নাটমন্দিরে বিশ্রাম করছি। এমন সময় বিরজা দেবী এলেন। তিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চাইছিলেন। প্রথমে আমরা ভাবলাম তাঁর মাতৃমূর্তি দেখে, ইনি কি কোন মানবী সাধিকা? আমাদের মনোভাব বুঝে তিনি বাম পা তুলে তাঁর পায়ের পাতায় পায়জোড় দেখালেন। তখন আমরা নিঃসংশয়ে বুঝলাম, ইনি বিরজা দেবী ও তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি প্রসন্না হয়ে স্বস্থানে গেলেন। আজ মহাগৌরী বললেন, "দাদু, আপনি ধর্মচক্রে যে দেবীমূর্তিকে আমার সঙ্গে দেখেছেন, তাঁকে আজ দুপুরে বাড়ীতে দেখলাম। ইনি গৌরীশক্তি ও সপ্ত সখি পরিবৃতা। এই অষ্ট দেবীর আকৃতি প্রায় একই রকম ও একই বর্ণ। আট জনই আমার দিকে সর্বদা চেয়ে থাকেন।" আজ মধ্যরাত্রে আমি বিছানায় শুয়ে উল্লিখিত গৌরীশক্তিকে স্পষ্ট ভাবে দেখলাম। তিনি আমার পাশে শয্যায় বসেছেন আমার দিকে পাশ ফিরে। আমি তাঁর পীঠও মাথা দেখলাম—পাকা সোনার মত গায়ের রঙ ও পরিহিত শাড়ীর রঙ, অনেকটা মহাগৌরীর মত দেখতে; কিন্তু এটী মহাগৌরীর সূক্ষ্মদেহ নহে; কারণ একই রাত্রে উক্ত দর্শনের দুই ঘণ্টা পরে মহাগৌরীর সূক্ষ্মদেহকে আমি দেখেছি।

৩০ জুন শুক্রবার দুপুরে স্নানান্তে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর পূজা করলাম। মহাগৌরী স্বহস্তে সাদা ফুলের মালা গেঁথে ঠাকুরকে পরালেন। যখন তিনি দীপারতি করলেন আমার ডান দিকে বসে, তখন আমি দেখলাম, তাঁর মধ্য থেকে স্বর্ণবর্ণা গৌরীশক্তি (পাকা সোণার রঙের শাড়ী পরা) বেরিয়ে তাঁর সামনে বসলেন ও দিব্য দীপের আরতি করলেন। পূর্বরাত্রে যে গৌরীশক্তিকে আমি দেখেছিলাম, তিনি ও ইনি বর্ণে ও রূপে অভিন্না। স্থূলদেহী মহাগৌরী অপেক্ষা উক্ত গৌরীশক্তি শতগুণে অধিকতর সমুজ্জ্বলা ও সুরূপা।

কিছুদিন পূর্বে মহাগৌরী জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর পূর্বজন্মের বাস্তুভিটা কোথায়ও কিরূপ? অদ্য পূজান্তে নৈবেদ্য নিবেদন করে তিনি ঈষৎ আবিষ্ট হয়ে দেখলেন—যশোহর জেলার একটী গণ্ডগ্রামে গাছপালা ঘেরা বাস্তুভিটা ও বাসগৃহ। তার উলুখড়ের ছাউনি ও উঁচু মাটীর দেওয়াল, ছেঁচা বাঁশের বেড়া বাস্তুর চারি দিকে, দিবাভাগেও অন্ধকার ও জনশূন্য, একটী কাল বয়স্ক বামুন গৃহের সামনে দণ্ডায়মান ও তাঁর গলায় দুই ফের তুলসীমালা। বোঝা গেল, ইহাই মহাগৌরীর পূর্বজন্মের বা ভৈরবী ব্রাহ্মণীর শ্বশুরালয় এবং গৃহদ্বারে দৃষ্ট ব্যক্তি পূর্ব জন্মের স্বামী। মুর্শিদাবাদে তাঁর পূর্ব জন্মস্থান ছিল। নয় বৎসরে বিবাহ ও রজঃস্বলা হবার পূর্বেই মনোরমা বিধবা হন। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর পিতৃদত্ত নাম মনোরমা ও গুরুদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বরী বা যোগেশ্বরী। বিধবা হবার পর পিত্রালয়ে অবস্থান কালে তান্ত্রিক সাধক ব্রহ্মচারী হরিহরানন্দের নিকট তিনি মন্ত্রদীক্ষা ও ধর্মশিক্ষা ও চৌষট্টিখানা তন্ত্রোক্ত সাধন পদ্ধতি লাভ করেন। হরিহরানন্দকে তৎকালীন বঙ্গদেশের তান্ত্রিক সম্রাট বলা যায়। ভৈরবী ব্রাহ্মণী হরিহরানন্দের নিকট তান্ত্রিক সাধন জেনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তান্ত্রিক সাধনে সাহায্য করেন। গৃহত্যাগের পূর্ব পর্য্যন্ত ভৈরবী ব্রাহ্মণীর শ্বশুর ও শাশুড়ী বিধবা পুত্রবধূকে স্বগৃহে নিয়ে যেতেন ও স্নেহযত্ন করতেন।

৩০ জুন শুক্রবার পূর্বাহ্নে দশটায় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ কোণে মাদুরে শুয়ে বিশ্রাম করছি ও মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শায়িতা। আমার চক্ষুদ্বয় কিঞ্চিৎ তন্দ্রাযুক্ত হতেই দেখলাম, একটী সূক্ষ্মদেহী এসে কিছু বললেন, পরে বুঝলাম ইনি কোন দিব্যদেহীর আগমনের কথা জানালেন। অনন্তর দেখা গেল, আমার পার্শ্বে দিব্যদেহী দেবীমূর্তি এসে দাঁড়ালেন—ঘাগরা-পরা, যেমন বৃন্দাবনের মেয়েরা পরে, লাল ব্লাউজ ও আকাশী রঙের ওড়না গায়, গৌরবর্ণা, মাথার চুল বেণী বাঁধা ও পিঠে ঝুলান, নাকে তিলক, জোড়া ভ্রূদ্বয়, সুন্দর মুখ, মাঝারি টানা চক্ষুদ্বয় ও কপাল ছোট। মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় শুয়ে তাঁকে দিব্য চক্ষুতে দেখে এই বর্ণনা দিলেন ও বললেন, স্নেহের গোপাল মন্দির থেকে ক্ষুদ্র শিশু মূর্তিতে বেরিয়ে বারান্দায় পায়চারি করছেন। গোপালকে উক্ত মূর্তিতে দেখেই সদ্যাগতা দিব্যদেহী চলে গেলেন, মন্দিরেও ঢুকলেন না। ঐ দিন বৈকালে তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে এলেন। তাঁকে এঁর কথা বলায় তিনি যোগবলে জেনে বললেন, ইনি ললিতা, শ্রীরাধার প্রধানা সখি, মধুর ভাবের সাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ এখানে গোপাল মূর্তিতে বাৎসল্য ভাবের লীলা করছেন দেখে তিনি অচিরে প্রস্থান করলেন। বিদ্যাপতি শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহজনিত মুমূর্ষু অবস্থার উক্তি এইভাবে প্রকাশ করেছেন—

ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শুনে॥

১৪ জুন বুধবার ১৯৬১ দুপুরে পূজার পূর্বে আমি মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে প্রণাম করে বসে সূর্য্যমন্ত্র জপকালে দেখলাম, মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডবৎ দিব্যজ্যোতিঃ। তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর বারান্দাস্থ মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই জ্যোতিঃ কি? তখন মহাগৌরী বললেন, "দাদু, এই দিব্যজ্যোতিঃ ব্রহ্মলোক থেকে আসে ও প্রথমে কল্কির

মাথায় পড়ে ও তৎপরে শিব, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতাকে স্পর্শ করে। কল্কিজন্ম মহোৎসব দিবস ২৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার থেকে প্রায় সর্বক্ষণ এই জ্যোতিঃপ্রপাত মন্দিরে দেখা যায়।" বৈকাল ৪টায় আমি দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় বিশ্রাম করছি ও জাগ্রত আছি। তখন মানস নয়নে দেখলাম, পশ্চিম বারান্দায় আমার চেয়ারে একটী পরিচিতা দিব্য-দেহী নারীমূর্তি উপবিষ্টা। তখন মহাগৌরী উত্তর বারান্দা থেকে নীচে যাইতেছিলেন ও দেখিলেন, আমার চেয়ারে কল্কিকন্যা শ্যামাঙ্গিনী বসে আছেন ও আমার দিকে বড় বড় চোখে প্রীতিভরে তাকাচ্ছেন। তখন তিনি পনের ষোল বৎসরের বালিকা ও বৈকুণ্ঠে থাকেন ও মাঝে মাঝে এখানে বাপ, মা ও দাদুকে দেখতে আসেন। একটু পরেই স্নেহের শ্যামা চলে গেলেন।

২৯ জুন বৃহস্পতিবার দুপুরে আহারান্তে আমি দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে দেখছি, এক সিদ্ধ ঋষি দিব্যদেহে এসে আমাকে কিছু বললেন। আমি তাঁর লেখার শুধু আদি বর্ণ পড়লাম 'ত'। সেদিন মহাগৌরী এখানে ছিলেন। এই সম্বন্ধে স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, "মহর্ষি মেধাতিথি আপনাকে 'তপস্যা' ও সাধন বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু কি উপদেশ দিয়েছিলেন, তা, বললেন না।" প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে ৯ জুন শুক্রবার বৈকালে মেধাতিথি অন্য দুই ঋষি পুত্র ও অগ্নিবাহু সহ এখানে প্রথম এসে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

৮ই মে, ১৯৬০ রবিবার মহাগৌরীর তিন ছোট ভাই—বিজয়, অজয় ও স্বপন—এর শুভোপনয়ন আমাদের মন্দিরে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আমিও মহাগৌরী গায়ত্রীপূজা ও গায়ত্রীহোম করিলাম। পূর্ব পাঁচ দিন আমরা মন্দিরে প্রাতঃকালে গায়ত্রী আবাহন ও গায়ত্রী জপ করেছি। আজ পূজারম্ভে গায়ত্রীদেবী মন্দিরে আবির্ভূত হলেন। নৈবেদ্য নিবেদিত হলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসনে না বসে পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন

এবং জ্যোতির্ময়ী গায়ত্রীদেবী সকল দেবতাকে নৈবেদ্যের ফলমিষ্টি বিতরণ করলেন। যখন মহাগৌরী মানবক তিনটীকে নিয়ে গায়ত্রী হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন অনেক সূক্ষ্মদেহী জ্যোতির্ময় ব্রহ্মচারীকে তাঁদের সঙ্গে ঘুরতে দেখা গেল। আমার গুরুদেব ও স্বামিজী প্রমুখ সিদ্ধগণ উপস্থিত ছিলেন। হোমাগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদানকালে হোমশিখা প্রায় তিন হাত উঁচু হয়েছিল এবং গায়ত্রী দেবী বহ্নিমূর্তিতে দাঁড়িয়ে উঠে মহাগৌরীর হাত থেকে পূর্ণাহুতি নিলেন। অন্নভোগ নিবেদিত হলে উল্লিখিত সূক্ষ্মদেহী ব্রহ্মচারীবৃন্দ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও মহাবীর প্রভৃতিকে গায়ত্রীদেবী প্রসাদ বিতরণ করলেন। যখন তিনটী মানবককে সমবেত ভক্তবৃন্দ ভিক্ষা দিতেছিলেন, তখন আমার মন্দিরবাসিনী সূক্ষ্মদেহী গর্ভধারিণী তাহাদিগকে সর্বাগ্রে ভিক্ষা দিলেন এবং গায়ত্রী দেবী তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করলেন। সন্ধ্যায় মনসাডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাকীর্তন সমিতি আমাদের নাটমন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাকীর্তন গাইলেন। প্রায় তিন শত শ্রোতা ঐ কীর্তন শুনতে সমবেত হয়েছিলেন। মহাপ্রভু, আমার জননী প্রভৃতি কীর্তনকালে নাটমন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। আজ ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী ধর্মচক্রে রাত্রিবাস করলেন এবং রাত্রিকালে মহাগৌরী সমাধিস্থ হলেন।

১লা জুলাই, ১৯৬১ শনিবার বেলা দশটায় আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী গঙ্গাস্নানে গেলাম। ভৈরবানন্দ শ্মশানঘাটের কাছে গঙ্গায় স্নান করলেন। তখন আমরা দুইজন পাড়ে বসেছিলাম। ভৈরবানন্দ স্নানান্তে এসে বললেন, শ্মশানকালী হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছেন। তাই আমরা শ্মশানস্থ কালীমন্দিরে গেলাম ও মাকে প্রণাম করলাম। তখন শ্মশানকালী মানবী মাতৃমূর্তি ধরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াইলেন এবং মহাগৌরীকে স্পর্শ করলেন। উক্ত মন্দিরে ভয়ঙ্করী শ্মশানকালীর পট ও তিনটা মড়ার মাথা আছে। ঐ তিন মড়ার মাথার

সাথে তিন প্রেত বিগুমান ছিল। পূজা হোক, আর না হোক, প্রত্যেক শ্মশানে শ্মশানকালী থাকেন এবং সিদ্ধ সাধক বা সিদ্ধা সাধিকার প্রত্যক্ষ হন।

আমরা তিনজন ধর্মচক্রে ফিরে বিশ্রামান্তে একতলার বারান্দায় খেতে বসেছি। সেই দিন নিবেদিত আতপ চালের খিচুড়ি রান্না হয়েছিল। এমন সময় স্নেহের কৌমারী পূর্ণমূর্তিতে এসে হাসিমুখে আমার সামনে দাঁড়ালেন এবং আমি কৌমারী মন্ত্রজপ করতেই আমার কোলে গিয়ে বসলেন শুভ্রালোক ছড়িয়ে। আমি তাঁকে খিচুড়ি নিবেদন করতেই তিনি আমার হৃৎপদ্মে বসে সর্বভুক্ আত্মাগ্নিতে আরূঢ় হয়ে ঐ খিচুড়ি ও ব্যঞ্জনাদি খেলেন। ভৈরবানন্দজীর হৃৎপদ্মে মা কালী বসে উক্তরূপে আহার করলেন। আর গোপালজী মহাগৌরীর পাশে বসে খিচুড়ি আদি গ্রহণ করলেন।

৩রা সোমবার দুপুরে একতলার বারান্দায় বসে আমি রুটি খাচ্ছি এবং মহাগৌরী আহারান্তে মৎপ্রণীত 'যোগ' বইখানি খুলে যোগ-সূত্রকার মহামুনি পতঞ্জলিকে বার বার স্মরণ করছেন। এমন সময় আমি দেখলাম, আমাদের সম্মুখে এক দিব্যদেহী বিরাট পুরুষ এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ দুটী বড় বড়, সামনের কপাল চওড়া, মাথার পেছনে জটা ঝুলছে, সাদা কাপড় পরা, লম্বা প্রায় সাত হাত ও মাথা ছাদে ঠেক্‌ছে, গাত্র শুভ্র বর্ণ ও লম্বা নাক। প্রথমে আমরা তাঁকে চিনতে না পারায় ভাবলাম, ইনি কি ভগবান্ পতঞ্জলি? মহাগৌরী তাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আমরা তাঁকে সভক্তি প্রণাম পূর্বক মন্দিরে আসতে অনুরোধ করায় তিনি বিরক্তি সহকারে অনিচ্ছা জানিয়ে চলে গেলেন। মহাগৌরী যে সিদ্ধর্ষি, দেবর্ষি বা দেবতাকে দেখতে ইচ্ছা করেন, তাঁকে অচিরেই দেখতে পান। অনন্তর তিনি উক্ত গ্রন্থ পড়ে আমাকে শোনালেন, যোগবলে প্রারব্ধক্ষয় করা যায়।

পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের 'তত্ত্ব-বৈশারদী' টীকার প্রারম্ভে এই পতঞ্জলি-প্রণাম প্রদত্ত।—

যস্ত্যক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোঽনেকধানুগ্রহায়
প্রক্ষীণক্লেশরাশির্বিষমো বিষধরোঽনেকবক্ত্র সুভোগী।
সর্বজ্ঞানপ্রসূতির্ভুজগপরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যং
দেবোঽহীশ স বো ব্যাৎসীতবিমলতনুর্যোগদো যোগযুক্তঃ।

অনুবাদ—অহীশ্বর অনন্তদেবের অবতার পতঞ্জলি যোগদাতা সমাধিবান্ শুভ্রদেহ মহামুনি আমাদিগকে পালন করুন। ভগবান্ অনন্তনাগ বহুবক্ত্রযুক্ত বহুফণাবিশিষ্ট সর্বক্লেশমুক্ত সর্বজ্ঞানগুরু সর্পবেষ্টিত বিষধর আদি মূর্তি পরিত্যাগপূর্বক অনেক প্রকারে জগতের কল্যাণ করিবার জন্য পতঞ্জলিরূপে অবতীর্ণ। সেই ভগবান্ পতঞ্জলিকে সভক্তি প্রণাম করি।

৪ঠা মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে আমি নাটমন্দিরে ইজি চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে বিশ্রাম করছি। ত ন ওখানে অন্য কেউ ছিল না, মহাগৌরী বাড়ীতে গিয়েছিলেন। এমন সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখলাম, শ্যামবর্ণা দেবীমূর্তি দিব্যদেহী এসে আমার ডান দিকে মৎসমীপে বসলেন এবং দুই হাতে আমাকে স্পর্শ করে প্রীতিভরে কিছু বললেন। এক মিনিট পরে আর একটী গৌরবর্ণা দিব্যদেহী দেবীমূর্তি এসে পূর্বাগতার পাশে আমার বাহু স্পর্শ করে বসলেন ও মৃদুমধুর হাস্যে পরমাত্মীয়ার ন্যায় আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করলেন। হাস্যকালে মুক্তার মত সাদা ও উজ্জ্বল তাঁর ঊর্দ্ধ দন্তপংক্তি দেখা গেল। এইরূপ সুস্মিতবদনা নারীমূর্তি ইহলোকে সুদুর্লভ। একটু পরে আমার সম্মুখে অদূরে বিদ্যুদ্বর্ণ শুভ্র জ্যোতিঃমণ্ডলও তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্বিদল পদ্ম বিদ্যুৎবৎ ঝকমক করতে দেখা গেল। মনে হল, আমার ইষ্টদেবী আমাকে আমার আজ্ঞাচক্র দেখালেন। প্রায় এক মিনিট পরে উল্লিখিত দেবীদ্বয় ও গোলাকার জ্যোতির্মণ্ডল অদৃশ্য হলো।

রাত্রিকালে দুইটা থেকে তিনটার মধ্যে আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে দেখলাম, একটী পুরুষ দেবতা মদীয় শয্যার দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে আমার চক্ষুর্দ্বয় দেখলেন। তখন মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শায়িত ছিলেন। আমি তাঁকে ডেকে ঐ দেবতার কথা বললাম। তখন সেই দেবতা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ও প্রায় এক মিনিট থেকে চলে গেলেন। তাঁর চেহারা রক্তবর্ণ, গায় বিদ্যুৎজ্যোতিঃ, কপালে অর্ধচন্দ্র, নাভির নীচে কাপড় পরা, মাথার চুল ঝুঁটি করে এঁটে বাঁধা, ও নগ্ন গাত্র। মহাগৌরীর আহ্বানে তিনি উত্তর বারান্দায় গেলেন একটী দেবী সহ। ঐ দেবী লাল শাড়ী পরা ও সোণার সিংহাসনে উপবিষ্টা, মাথায় মুকুট নাই, সিংহাসনের দুই হাতলে দুই লাল পদ্ম ও ঐ পদ্মদ্বয়ের উপর দুই হাত রক্ষিত। কিঞ্চিৎ পরেই উভয়ে অন্তর্হিত হলেন। এই সম্বন্ধে যোগবলে জেনে যোগিরাজ ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে ৭ই জুলাই শুক্রবার লিখেছেন, "গত মঙ্গলবার দুপুরে নাটমন্দিরে যে শ্যামা দেবী দেখেছিলেন, তিনি আপনার রজোগুণী ইষ্টমূর্তি। তারপর যে গৌরবর্ণা দেবীমূর্তি দেখেছিলেন, তিনিও আপনার সত্ত্বগুণী ইষ্টমূর্তি। আর তৎপরে দৃষ্ট দ্বিদল রক্তপদ্ম আজ্ঞাচক্র এবং তার চারি দিকে জ্যোতিঃমণ্ডল আজ্ঞা চক্র বেষ্টনকারী জ্যোতিঃমণ্ডল। পূর্বোক্ত মানবীমূর্তি ইষ্টদেবী বলেন, এখন আপনি রজোগুণ ছেড়ে সত্ত্বগুণে আরূঢ় হয়ে ইষ্টদেবীর সত্ত্বমূর্তি বা আজ্ঞাচক্রের বিদ্যুদ্বর্ণ জ্যোতিঃমণ্ডল ধ্যান করুন। ঐ দিন রাত্রি তিনটায় যে পুরুষ দেবতা আপনার চক্ষু দেখেছিলেন, তিনি শিবের ধন্বন্তরি মূর্তি। আপনি সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে ডাকার জন্য তিনি তাঁর ক্রিয়া বন্ধ করতে বাধ্য হন। মা কালী বলছেন, আপনার প্রারব্ধ দেবতা এইটী করিয়েছেন। এই রকম স্থলে চুপ করে থাকতে হয়। তিনি যা করবার করুন। উপকার পেলে বা তিনি চলে গেলে লোককে জানান উচিত। তা না হলে সিদ্ধির হানি হয়। এঁকে আপনার ইষ্টই এনেছিলেন; কিন্তু

কাজ হলো না। আঁর সিংহাসনে বসা দেবীমূর্তিই আপনার ইষ্টদেবী। দুপুরে যিনি এসেছিলেন দুই মূর্তিতে, ইনিই তিনি। ইনি যে দুটী পদ্ম দেখিয়েছেন, তন্মধ্যে একটী আজ্ঞাপদ্ম ও অন্যটী আজ্ঞার উপরে নাদপীঠ। এই দুটীকে কেন্দ্র করে ইষ্টদেবী আপনাকে এখন সাধন করতে বলছেন।"

৫ই বুধবার মন্দিরে বিশ্বরূপানন্দ ঠাকুর-পূজা করলেন এবং মহাগৌরী আনারস ও নারিকেলী নাড়ুর নৈবেদ্য দিলেন। অধুনা মন্দিরে অনেক দেবতা বিরাজ করেন ও ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দ রোজই আসেন; অথচ আমাদের নৈবেদ্য অত্যল্প। তাই মহাগৌরী গোপালকে বললেন, নৈবেদ্য বাড়িয়ে দাও ত বাবা। মুহূর্ত মধ্যে স্নেহের গোপালজী এক বড় থালায় বড় বড় রাজভোগ ও সন্দেশ আনিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সামনে রাখলেন। তখন ঠাকুর সেই সব দিব্য দ্রব্য স্বপার্ষদবৃন্দ ও মন্দিরস্থ দেবতাগণকে দিলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, গোপালজীর সঙ্গে সর্বদা কামধেনু থাকেন ও তাঁর আদেশ পালন করেন ও ঈপ্সিত দ্রব্যাদি এনে দেন। তাই মহাগৌরী কামধেনুর কথা ভাবছিলেন। মধ্যাহ্ন আহারান্তে বিশ্রাম কালে তিনি কামধেনুকে দেখলেন—একটী এক বছরের সুন্দর বাছুর, গায়ের রঙ সাদা, কপালের মধ্যস্থলে তৃতীয় নয়নবৎ উজ্জ্বল তিলক। তিনি দুই তিন মিনিট তাঁর শয্যার চার পাশে ঘুরে তাঁর মুখপানে চেয়ে চেয়ে চলে গেলেন। মহাভারতে আছে, দেবাসুরগণ কর্তৃক সমুদ্রমন্থনে কামধেনু সমুদ্ভূত হন।

আজ ভোর সাড়ে চারটায় আমি নীচে গিয়ে নাটমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বসে হাত মুখ ধুইতেছিলাম। এমন সময় দেখলাম, ড্রেনের ওপারে দুই আড়াই হাত দূরে একটী প্রেত করুণ নয়নে আমার দিকে চাইছে! তাকে দেখে মহাগৌরী বললেন, ওটী পিতৃলোকের নিম্নস্তরবাসী ও সাধুর কৃপায় উর্দ্ধগতি প্রার্থী। বেলা আটটায় আমি পায়খানায় গেলাম। তখন আমি দেখলাম, ঐ প্রেত পায়খানার উত্তর ঘুলঘুলির

বাহিরে দাঁড়িয়ে পূর্ববৎ করুণ নয়নে আমার দিকে চাইছে!! তার কথা মহাগৌরীকে ডেকে বলায় মহাগৌরীর ধমক খেয়ে সে চলে গেল। প্রেতযোনিতে পাপভোগ হয় বলে প্রেতাত্মা সর্বদা যম-যন্ত্রণায় অস্থির হয়। একদিন ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী দেখলেন, ধর্মচক্রের দক্ষিণস্থ বাগানে যে সাধু কয়েক মাস যাবৎ আছে, সে—অশ্বত্থগাছের গোড়ায় মালি যে জল রোজ ঢালে—তাহা পান করে এবং অশ্বত্থতলায় রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে বসে থাকে।

৭ই শুক্রবার সন্ধ্যায় আমি ও মহাগৌরী শিবাপ্রিয়াকে গিরিশ ঘোষ রোডে বাসে তুলে দেবার পর রাজেন শেঠ লেনে বেড়াইতেছিলাম। এমন সময় আমি দেখিলাম, জ্যোৎস্নাবৎ শুভ্রা এক দেবী আমাদের দিকে মুখ করে পিছু হটছেন। তাঁর মাথার কেশদাম দুগ্ধবৎ শুভ্রবর্ণা ও সারা পিঠ ঢেকে ফেলেছে, মাথায় অল্প কাপড়, সাদা শাড়ী পরা ও বয়স্কা। প্রথমে আমরা তাঁকে চিনতে পারিনি এবং তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে ধর্মচক্রে ফিরলাম। ভ্রমণান্তে মহাগৌরী পশ্চিম বারান্দায় চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছেন। এমন সময় ঐ দেবী এসে তাঁকে বলে গেলেন, আমি সুরভি। আজ মধ্যাহ্ন ভোজন সময়ে একতলার বারান্দায় বসে আমরা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। সম্ভবতঃ তাই তিনি সন্ধ্যায় এসে আমাদিগকে দর্শন দিলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, সুরভি দেবী সূর্য্যকন্যা ও গোমাতা।

৮ই শনিবার প্রাতঃভ্রমণান্তে আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় বসে যবের ছাতু খাচ্ছিলাম ও মহাগৌরী অদূরে বসেছিলেন। এমন সময় আমি দেখলাম, অদূর দক্ষিণাকাশে একটী সূক্ষ্মদেহী সাধিকা ঊর্ধলোক-বাসিনী শূন্যে দাঁড়িয়ে জানালার মধ্য দিয়ে মন্দিরস্থ দেবগণকে দর্শন করছেন। তাঁর হাতে কমণ্ডলু ও মাথায় ঘোমটা ও সাদা শাড়ী পরা। মহাগৌরী তাঁকে দেখে বললেন, বোধ হয়, ইনি তীর্থস্নানে যাচ্ছেন। আমি

বললাম, "আগামী সপ্তাহে পুরীধামে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হবে। ইনি হয়ত পুরীযাত্রী।" তখন তিনি ঘাড় নেড়ে আমার মন্তব্য সমর্থন করে চলে গেলেন। এইরূপ অনেক সূক্ষ্মদেহী প্রত্যহ মন্দিরে আসেন।

১০ই সোমবার বৈকালে মহাগৌরী দুই দিন পরে বাড়ী থেকে এলেন। সাড়ে পাঁচটায় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে 'কল্কি গীতা'র প্রুফ দেখছিলাম ও মহাগৌরী নীচে গিয়েছিলেন। এমন সময় আমি তীব্র দিব্য গন্ধ আঘ্রাণ করলাম ও মহাগৌরী উপরে আসতে তাঁকে বললাম। পুনরায় আমরা উভয়ে পূর্ববৎ তীব্র দিব্য গন্ধ অনুভব করলাম, অনুকূল বায়ুপ্রবাহে ঐ গন্ধ মন্দিরের দরজা থেকে ভেসে এসে আমাদের নাসিকায় ঢুকছিল। তখন মহাগৌরী দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন, পুরীধামস্থ জগন্নাথদেবের ভগিনী সুভদ্রা দেবী মন্দিরে প্রবেশার্থ আমাদের অনুমতির অপেক্ষায় দরজায় দণ্ডায়মান একটী পুরুষ সঙ্গী সহ। সুভদ্রার গলায় শ্বেতপুষ্পের দিব্যমালা শোভিত ছিল ও উক্ত মাল্যের সুগন্ধই আমরা পেলাম। সুভদ্রা লাল শাড়ী পরা, মাথায় অল্প কাপড়, গৌরবর্ণ, গম্ভীর বদন এবং তাঁর সঙ্গী লাল আলখোল্লা পরা, মাথার চুল কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলছে, দীর্ঘকায়। সুভদ্রাকে আমরা ভক্তিভরে প্রনাম করে মন্দিরে যেতে বলায় তিনি মন্দিরে গেলেন ও তৎসঙ্গী বারান্দায় রইলেন। মন্দিরে সুভদ্রা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসলেন ও ঠাকুর তাঁকে খইচুরের মোওয়া খেতে দিলেন। তিনি ঠাকুরকে কিছু বলে চলে গেলেন। তিন দিন পরে শুক্রবার পুরীধামে জগন্নাথের রথযাত্রা হবে। তাই বোধ হয়, সুভদ্রা ঠাকুর ও কল্কি.ও. গোপাল প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করতে পুরী থেকে এসেছিলেন। উড়িষ্যায় নিম্নোক্ত প্রবাদ প্রচলিত—সমুদ্রের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে হয়েছিল। তাই সমুদ্র সুভদ্রাকে নিতে আসছিলেন। তখন সুভদ্রা সমুদ্র গর্জন শুনে ভয় পেয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে, গিয়ে লুকালেন, আর শ্বশুর-বাড়ী গেলেন না। স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, "পুরীধামের সুভদ্রা ও আমাদের মন্দির-

বাসিনী কল্কি-ভগিনী সুভদ্রা স্বরূপতঃ অভিন্ন। পুরীতে সুভদ্রার মূল সত্ত্বা আছে। ঐ মূল সত্ত্বার যে অংশ সত্ত্বা জন্মগ্রহণপূর্ব্বক কল্কিদেবের ভগিনীরূপে লীলা করবেন, সেই সত্ত্বাই আমাদের মন্দিরে থাকেন। যেমন রামাবতারে সৃষ্টিকর্তা দেবগণকে বলেছিলেন, রাবণ ধ্বংসের সাত শত বর্ষ পূর্বে তোমরা বানর-ভল্লুকাদি যো.নতে জন্ম নাও। নর ও. বানর ব্যতীত অন্যে রাবণ বিনাশে অক্ষম। তখন ইন্দ্রাংশ বালিরূপে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ইন্দ্রের পূর্ণ সত্ত্বা স্বর্গেই ছিলেন। যেমন রাম বা কৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশে জন্মালেও গোলোকে বিষ্ণুসত্ত্বা পূর্ণরূপে থাকেন; কারণ, বিষ্ণু পরমাত্মার বিমূর্ত প্রতীকরূপে বিশ্বপালন করেন। তিনি মানবরূপে জন্মালেও প্রকৃতির কার্য্য (বিশ্বপালন) বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয় না।”

১১ মঙ্গলবার বৈকাল ৫টার পর আমি মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে ‘কল্কি গীতা’র প্রুফ দেখছিলাম। এমন সময় একটী দিব্যদেহী ঋষিমূর্তি এসে আমার সম্মুখে শূন্যে বসলেন। তাঁর মাথায় সাদা পাকা চুল, বড় বড় চোখ, টিকল নাক, জ্যোতির্ময় চেহারা, বিরাট শরীর। তিনি আসতেই আমি মহাগৌরীকে ডাক দিয়ে বললাম ও তাঁকে সভক্তি প্রণাম করলাম। মহাগৌরী উত্তর বারান্দা থেকে জ্ঞানচক্ষুতে তাঁকে দেখে প্রণাম করে মন্দিরে যেতে বললেন। উক্ত অনুরোধ করায় তিনি বিরক্ত হয়ে বড় বড় চোখ দুটী লাল করলেন, কিন্তু মন্দিরে গেলেন না। আমি ভূমিষ্ঠ প্রণাম ও কাতর প্রার্থনা করায় তিনি প্রথমে স্বীয় ইষ্টনাম বক্রেশ্বর ও নিজ নাম ‘অষ্টাবক্র’ বাংলায় লিখে দেখালেন এবং কিছু উপদেশও লিখে দিলেন, কিন্তু আমরা সে সব পড়তে পারলাম না। আপনি কি লিখছেন, আমরা বুঝতে পারছি না, ভাল করে বুঝিয়ে দিন—মহাগৌরী তাঁকে এই অনুরোধ করায় তিনি তদ্রূপ বলতে হাত তুলে নিষেধ করলেন, এবং প্রায় এক মিনিট থেকে চলে গেলেন। আমি দেখলাম, অষ্টাবক্রের পদদ্বয় দুগ্ধবৎ শুভ্রবর্ণ। সম্প্রতি আমরা অষ্টাবক্র সম্বন্ধে আলোচনা

করছিলাম বলেই বোধ হয়, তিনি দয়া করে দর্শন দিলেন। ব্রহ্মবিদ্বর অষ্টাবক্রের আশীর্বাদে অস্থিহীন কুব্জদেহ ভগীরথ অস্থিবান্ শরীর লাভান্তে সোজা হয়ে চলতে সমর্থ হন। মহামুনি অষ্টাবক্র চলে যাবার পর প্রায় ছয়টার সময় আমি ও মহাগৌরী উভয়ে দেখলাম, মন্দির থেকে একটী দেবী (রক্তবর্ণ ও লাল শাড়ী পরা) বেরিয়ে বারান্দায় শূন্যে দাঁড়িয়ে আমাদিগকে দেখা দিয়ে চলে গেলেন। মনে হল, তিনি কিছুক্ষণ পূর্বে মন্দিরে এসেছিলেন। অষ্টাবক্র তিন লাইন লিখে আমাকে এই উপদেশ দেন—অদ্বৈত বেদান্ত সাধন করতে হলে সর্বাকাংক্ষা বিসর্জন করে ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হতে হয়। অষ্টাবক্র সংহিতায় উক্ত সাত্ত্বিক স্বাস্থ্যের কথা তিনি বার বার বলেছেন। উক্ত সংহিতা বেদান্ত সাধনের অমূল্য গ্রন্থ।

কিঞ্চিৎ পরে আমি দক্ষিণ বারান্দায় মন্দিরের জানালার পাশে এসে মন্দির থেকে পাকা কলা ও দধি প্রভৃতির সুগন্ধ পেলাম ও মহাগৌরীকে বললাম। মহাগৌরী দিব্যদৃষ্টিপাত করে বললেন, "গোপালাদি মন্দিরস্থ দেবগণ দই, চিঁড়ে, কলা প্রভৃতি সাদা পাথরের থালায় মেখে খাচ্ছেন। তাই আপনি এই দিব্য গন্ধ পেয়েছেন। আজ দুপুরেও আমাদের নৈবেদ্যে সামান্য আনারস ও নারিকেলী নাড়ু ছিল। তাই গোপাল তিন চার থালা মিষ্টি ও ক্ষীরের সন্দেশ আনিয়ে আমাদের নৈবেদ্য সহ দিয়েছিল। আমি স্নেহের গোপালজীকে বলে রেখেছি, বাবা, ভাল নৈবেদ্য বা অন্নভোগ দিতে পারি, আর না পারি, তুই রোজ তিনবার মন্দিরস্থ দেবগণকে খাওয়াবি। তদনুসারে গত তিন দিন থেকে গোপাল ঐরূপ করছে। সেদিন এখানে কামধেনু দেখেছিলাম। সম্ভবতঃ সেদিন থেকে কামধেনু এখানে আছেন ও গোপালজীর নির্দেশে পূর্বোক্ত ব্যবস্থা করছেন।"

১৫ই শনিবার সন্ধ্যায় মহাগৌরী তিন দিন পরে ধর্মচক্রে এলেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর জননীর সঙ্গে তাঁর মামাবাড়ীতে (রাণাঘাটের

কাছে গোপালনগরে) গিয়েছিলেন। মামাবাড়ীতে তিনি মাত্র এক রাত্রি ছিলেন। মহাগৌরী বলেন, "উক্ত রাত্রে প্রায় ৬০।৭০টী প্রেতাত্মা ও সূক্ষ্মদেহী নরনারী এসে আমাকে ঘিরেছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশ বহুদূরে—৩০।৪০ হাত দূরে ছিলেন এবং দুই চার জন পুণ্যাত্মা আমার কাছে—৫।৭ হাত দূরে ছিলেন। যখন মামা বাড়ীতে পৌঁছিলাম, তখন থেকে চলে আসার সময় পর্যন্ত সর্বক্ষণ শেষোক্ত কয়জন দিবারাত্রি আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।" উক্ত দিন শনিবার সন্ধ্যা ছয়টায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসেছিলাম এবং মহাগৌরী আমার চোখে ঔষধ প্রয়োগ করেছিলেন। এমন সময় একটী শুভ্রবর্ণা দেবীমূর্তি বারান্দায় এলেন দোলায় চড়ে—স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি, মাথায় মুকুট নাই, চুল খোলা, সাদা শাড়ী পরা ও দুই হাত, ডান হাতে একটী পাত্রে ছোট ছোট ফল ও মিষ্টি পিঠে। আমি তাঁর পায় মাথা রেখে প্রণাম করতে তিনি হস্তস্থিত সোণালী রঙের পিঠেও লাল্‌চে রঙের ফল আমার মুখে দিলেন। আমিও মহাগৌরী তাঁকে প্রণাম করে মন্দিরে যেতে বললাম। তিনি মন্দিরে হস্তস্থিত ফলমিষ্টি তত্রস্থ দেবগণকে খেতে দিলেন ও একটু পরে অপেক্ষমান স্বর্ণ দোলায় চড়ে চলে গেলেন। তৎসঙ্গে দোলাবাহক চারজন ছিলেন। ইনি বিপত্তারিণী দেবী। আজ বিপত্তারিণী ব্রততিথি বলে ঐ দেবী এখানে এসেছিলেন। অদ্য বৈকালে তিনটার সময় মহাগৌরী বালি বাসায় বিপত্তারিণীকে পূজা ও দর্শন করেছিলেন। মহাগৌরীর অনুরোধে স্নেহের গোপালজী নিম্নোক্ত উপচার সংগ্রহ করে উক্ত দেবীর পূজা করলেন। উল্লিখিত কল্যাণীমূর্তিতে তিনি বিনা দোলায় গিয়ে মহাগৌরীকে তথায় দেখা দিয়েছিলেন। তখন বালি বাসার অদূরে বিপত্তারিণীতলায় বিপত্তারিণীর মৃণ্ময়ী মূর্তি দর্শন করতে ও পূজা দিতে ছয় সাত হাজার নারী সমবেত হয়েছিলেন। বিপত্তারিণীব্রত ও পূজা নারীগণই করে থাকেন। বিপত্তারিণী ব্রতকথায় আছে, একদা

বিধিসুত নারদ মুনি কৈলাস শিখরে গিয়ে শংকর-শংকরীকে একাসনে দেখে প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ ব্রতাচরণে নারীগণ স্ববাঞ্ছিত ফল ও সর্ববিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে? ত্রিলোচন নারদকে বললেন, বিপত্তারিণী দুর্গাব্রত আচরণ করলে নারীগণ বিপৎমুক্ত হয়। বিদর্ভাধিপতিও তাঁর রাণী গুণবতী অবনীমণ্ডলে এই ব্রত প্রথম প্রচার করেন। গুণবতীর প্রতিবেশী চর্মকার-পত্নী তাঁর সখি ছিলেন। একদিন রাণী ঐ সখির নিকট গোমাংস দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুসারে চর্মকার নারী একটী পাত্রে গোমাংস এনে গোপনে রাজবাটীতে রাণীকে দিলেন। রাণী উক্ত গোমাংস গোপনে রাখা সত্ত্বেও ভৃত্য টের পেয়ে রাজাকে বলে দিলেন। এই কথা শুনে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে রাণীকে তিরস্কার করেন, ও কথা সত্য হলে তাঁকে মৃত্যুভয় দেখান। তখন গুণবতী ভয় পেয়ে এই কথা অস্বীকার করে বলেন, উক্ত পাত্রে ফুল-ফলই আছে, গোমাংস নাই। এই বলে রাণী ভক্তিভরে হৈমবতী দেবীপূজা করে কাতর প্রার্থনা করলেন, মা, এই বিপৎ থেকে ত্রাণ কর। রাণীর পূজায় সন্তুষ্টা হয়ে হৈমবতী তাঁকে বলেন, "সত্বর গোমাংস ফুল-ফলে পরিণত হবে ও বিদর্ভরাজ তব প্রতি প্রীত হবেন।" ইতোমধ্যে রাজা ভৃত্য সহ রাণী-রক্ষিত গোমাংস সন্ধানে গিয়া দেখেন, উক্ত পাত্রে গোমাংস নাই এবং বহু মিষ্টি ফল ও সুগন্ধি ফুল পূজার্থ রক্ষিত। এইরূপে গুণবতী ব্রতপালনে ধন্য ও বিপৎমুক্ত হন। আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষে দ্বিতীয়ার পরে তৃতীয়া থেকে নবমীর মধ্যে মঙ্গলবার বা শনিবার উক্ত ব্রত পালনীয়। আসনে পঞ্চ গুঁড়ি দিয়া আলপনা আঁকিয়া পূর্ণঘট বসাইবে। দূর্বা, বেলপাতা ও নানা ফুল এবং যথাসাধ্য ফল-মূলের নৈবেদ্য দিয়ে বিপত্তারিণী পূজা করিতে হয়। গোটা পান, গোটা গুয়া, গোটা কলা, ১৩ খণ্ড আনারস, ১৩ লবঙ্গ ও এলাচ, গোটা মুগ, দধি, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন দিয়া তের প্রকার ফল দিবে। হলুদে রঙের সুতা দূর্বা সহ তেরটী গ্রন্থি দিয়ে ঐ ডোর

স্মরণ করিবে। মিষ্টি পিঠে দেবীকে নিবেদন করে প্রসাদ খেতে হয়। বিপৎ থেকে ত্রাণ করেন বলে হৈমবতী দুর্গাদেবীর নাম বিপত্তারিণী।

শনিবার বৈকালে আমি ও বিশ্বরূপানন্দ লালবাজারে (কলিকাতায়) কোন ডাক্তারের নিকট চক্ষু দেখাতে গিয়েছিলাম। তথায় একটী শিবপুরনিবাসী বয়স্ক ব্রাহ্মণ এসে আমার কাছে সৎপ্রসঙ্গ করলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর মৃত মাতার প্রেতাত্মাকে স্পষ্টভাবে দেখলাম। উক্ত প্রেত থাকায় বৃদ্ধটী আবিষ্ট ভাবে কথা বলছিলেন। আমার সঙ্গে সেই প্রেত এসে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ গুদাম ঘরের টিন চালায় দাঁড়িয়েছিল—প্রেতটী বিধবা ও সুন্দরী। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে যাচ্ছে না দেখে মহাগৌরী তাকে শেষে মেরে তাড়ালেন।

১৬ই রবিবার প্রাতে মহাগৌরী কালিঘাটে শিবপ্রিয়ার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। তিনি তথায় অন্নভোগ নিবেদন করে ধর্মচক্রের মন্দিরস্থ দেবগণও কালিঘাটের মা কালীকে আহ্বান করলেন। আহূত দেবগণ এসে নিবেদিত অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করলেন। বৈকাল তিনটায় উক্ত বাড়ীতে চলে আসার সময় কালিঘাট মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মন্দির দর্শনার্থ তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। অনন্তর মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া ঐ মন্দিরে গিয়ে কালীপ্রতিমা দর্শন করলেন। তখন মা কালী দিব্যমূর্ত্তিতে দেখা দিলেন ও কালীবাড়ীর কটক পর্য্যন্ত তাঁদের সঙ্গে এলেন। মহাগৌরী দেখলেন, উক্ত সিদ্ধপীঠে অনেক সাধক-সাধিকা সূক্ষ্মদেহে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তন্মধ্যে একজন মহাগৌরীর সঙ্গে ধর্মচক্রে এসেছিলেন। তিনি এসে প্রথমে আমাকে দেখা দিলেন। সন্ধ্যায় আমি যখন মন্দিরে জপমগ্ন ছিলাম, তখন তিনি মন্দিরে ঢুকে দরজার কোণে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং আমি সভক্তি প্রণাম করতে তিনি বাম পদ বাড়িয়ে দিলেন। অনন্তর তিনি একটী বড় থালায় বিবিধ ফলমিষ্টি মন্দিরস্থ দেবগণকে খেতে দিলেন।

তিনি মহাগৌরীকে দেখালেন একটী লালরঙের বৃহৎ পাকা বাড়ী, পাঁচিল ঘেরা ও উহার শার্সিগুলি সবুজ রঙের। মনে হয়, তিনি সিদ্ধা সাধিকা, তাঁর মাথায় সাদা কাপড়, সাদা শাড়ীতে সর্বাঙ্গ আবৃত। মন্দিরস্থ দেবতাগণকে খাইয়ে তিনি চলে গেলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, "কালীঘাটের সূক্ষ্মদেহী সিদ্ধা সাধিকা দেবীলোক বাসিনী। ইনি মা কালীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তাঁর মানব নাম রামেশ্বরী দেবী। বঙ্গীয় ১১৫৬ সালে কালিঘাটেই রামেশ্বরী সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ বাড়ীর মেয়ে। কালীঘাটের সন্নিকটে তাঁর পিত্রালয় ছিল। তিনি কুলীন বিবাহ করেছিলেন, নামমাত্র পরিণয় হয়েছিল, বিবাহের পরে স্বামীর মুখ দর্শন হয় নি। বাম গোড়ালি খোঁড়া হয়ে তাঁর জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন ও স্বামীসুখে বঞ্চিত হয়ে সাধনে ডুবে যান ও সিদ্ধিলাভ করেন।"

১৭ই সোমবার বৈকাল পাঁচটায় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ দিকে চেয়ারে দক্ষিণ মুখে বসে 'কল্কিগীতা' প্রকাশের পূর্বেই উক্ত গ্রন্থের যে সকল অর্ডার এসেছে, সেগুলির উত্তর লিখাইতেছি এবং মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় চেয়ারে উপবিষ্টা। এমন সময় আমি দেখলাম, আমার সম্মুখে একটি পুরুষ দেবতা পশ্চিম মুখে ও তৎপার্শ্বে আমার কন্যা সুভদ্রা শুভ্রবর্ণ পূর্ণমূর্তিতে আমার দিকে চেয়ে দণ্ডায়মান। পুরুষ দেবতা কৃষ্ণবর্ণ ও তাঁহার মাথার কুঞ্চিত কেশদাম ঘাড় পর্য্যন্ত ঝুলছে ও চক্ষুদ্বয় টর্চের মত উজ্জ্বল। আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? মহাগৌরী দিব্য দৃষ্টিতে দেখে বললেন, ইনি কল্কি ঠাকুর। তৎক্ষণেই অদূরস্থ পশ্চিমাকাশে আমার দৃষ্টি পড়ায় দেখলাম, অতি শুভ্রা দেবী শূন্যে আবির্ভূতা ও কল্কিদেব তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন এবং সুভদ্রা তাঁর কথা জানাতে আমার দিকে চেয়ে আছেন। শূন্যস্থা দেবীকে মন্দিরে আসতে বলায় তিনি এলেন না। তখন কৌমারী আমার বাম দিকে

শূন্যে দাঁড়িয়ে ঐ দেবীকে দেখছিলেন। আমরা প্রণাম করতেই হৈমবতী চলে গেলেন। উক্তা দেবী মহামায়া হৈমবতী এবং কল্কী ভগবানের ইষ্ট। তাঁর মূর্তি যেন মাখন দিয়ে গড়া, জ্যোৎস্নাবৎ সুস্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোতিঃ তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে, স্নিগ্ধ ঘুমন্ত দৃষ্টি, সাদা শাড়ী পরা ও মাথার চুল খোলা। আজ সকালে মহাগৌরী আমাকে বিপত্তারিণী ব্রতকথা পড়ে শুনিয়েছিলেন। তাতে হৈমবতীর নামোল্লেখ ছিল। সম্ভবতঃ তাই হৈমবতী দয়া করে দর্শন দিলেন। সামবেদীয় কোনোপরিষদে হৈমবতীর উপাখ্যান বিবৃত।

১৮ই মঙ্গলবার সকালে দশটার কিছু পূর্বে আমি নাটমন্দিরে আরাম চেয়ারে বসে উত্তর মুখে বিশ্রাম করছি এবং কৌমারী ও কুমার বা কার্তিকের কথা ভাবছি। এমন সময় কিঞ্চিৎ তন্দ্রিত ও স্তিমিত নয়নে দেখলাম, আমার কোলে একটি সুন্দর স্বর্গীয় বালক পশ্চিম মুখে বসে আছেন ও স্নেহের কৌমারী আমার বাম কাঁধে চড়ে বসেছিলেন। তখন মহাগৌরী একতলার বারান্দায় ছিলেন। আমি তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কোলে এই দেব বালক কে? মহাগৌরী পূর্বোক্ত বারান্দা থেকে দিব্য দৃষ্টিতে দেখে বললেন, ইনি কুমার বা কার্তিক। তখন কৌমারী আমার বাম কাঁধ থেকে মহাগৌরীর দিকে তাকাইতে ছিলেন। কার্তিকের চেহারা সাত আট বৎসরের বালকমূর্তি—শুভ্রবর্ণ, বাম হাতে তীরধনু, দুই হাতে দুই গাছা সোণার বালা, গলায় সোণার হার, সাদা ধুতি কোঁচা দিয়ে পরা, মাথায় কুঞ্চিত কেশ, খালি পা, মাথায় মুকুট নাই। এই ধ্যানে কার্তিকেয় পূজা হয়ে থাকে—

ওঁ কার্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ুরোপরিসংস্থিতম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্॥
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালংকারভূষিতম্।
প্রসন্নবদনং দেবং কুমারং শক্তিদায়কম্॥

কার্তিক সংক্রান্তি দিবসে প্রতিমায় কর্তিকেয় পুজা হয়। কার্তিকেয় ঠাকুরকে এই মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।—

কার্তিকেয় মহাভাগ দৈত্যদর্পনিস্থদন।
প্রণতোঽহং মহাবাহো নমস্তে শিখিবাহন॥
রুদ্রপুত্র নমস্তুভ্যং শক্তিহস্ত-বরপ্রদ।
ষান্মাতুর মহাভাগ তারকান্তকর প্রভো॥
মহাতপস্বী ভগবান্ পিতুর্মাতুর্প্রিয়ঃ সদা।
দেবানাং যজ্ঞরক্ষার্থং জাতস্থং গিরিশেখরে॥
শৈলাত্মজায়াং দবতে তুভ্যং নিত্য নমো নমঃ॥

১৯শে বুধবার বৈকালে আমরা ননী মা ও ব্রহ্মচারী নগেন্দ্রনাথের কথা আলোচনা করেছিলাম। রাত্রি চারটায় আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে দেখলাম, আমার খাটের পশ্চিমে তিন চার হাত দূরে নগেন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন ও বললেন, তুমি ননীমার সঙ্গে থাকলে ভাল হতো ও এই বিপদ ঘটত না। নগেনদার চেহারা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; তিনি মহঃলোকে তপস্যা করেন। ভুবনেশ্বর সারদাধামে নগেনদাও ননীমার কাছে ১৯৩০—৩১ খ্রীঃ প্রায় এক বর্ষ ছিলাম সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে ও পরে। আজ মহাগোরীও সূক্ষ্মদেহী নগেন্দ্রনাথকে দেখলেন। তাঁর বিস্তৃত বাংলা জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আমি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলাম ও উহার প্রথম অধ্যায় 'প্রবর্তক' মাসিকে প্রকাশ করেছিলাম।

২২শে শনিবার বৈকালে মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া ধর্মচক্রে এলেন। আমরা তিন জনে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে পরদিনে সূর্য্যোৎসবের কথা বলছি ও পাকা পেয়ারা খাচ্ছি। এমন সময় সামনে আমি স্পষ্ট ভাবে দেখলাম, সুভদ্রা ও তৎপশ্চাতে কাল ভৈরব দণ্ডায়মান। তখন মহাগৌরী দেখলেন, আমার ডান দিকে মা কালীর শুভ্র সত্ত্বমূর্তি, বাম

পাশে কৌমারী ও পশ্চাতে যোগীরাজ পরমানন্দ পরমহংস। সান্ধ্য ভ্রমণান্তে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে বসে বিশ্রাম করছিলাম। আমি ইজি চেয়ারে ও অন্য দুইজন আমার সম্মুখে বেঞ্চে বসেছিলেন। তখনও ভৈরবানন্দ এবং মহাগৌরী উভয়ে দেখলেন, আমার ডান দিকে সত্ত্বমূর্তি মহাকালী বা মহামায়া, বাম দিকে কৌমারী ও মাথার পেছনে পূর্বজন্মের সিদ্ধগুরু পরমানন্দ পরমহংস। বলা বাহুল্য, আমিও অতি শুভ্র সত্ত্বময়ী কালীমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করলাম। ধ্যানোক্ত করাল-বদনা লোলজিহ্বা শবাসনা (বা শিবারূঢ়া) মুণ্ডমালা-বিভূষিতা কৃষ্ণবর্ণ কালীমূর্তি তামসী। সাধকের তমোগুণ ধ্বংসার্থ তমোময়ী কালীধ্যান বিধেয়। মূলাধারে পৃথ্বীতত্ত্বে এই মূর্ত ধ্যেয়। যখন মন মণিপুরে উঠে, তখন রজোগুণের তমোস্তরে সাধক দেখেন অগ্নিরূপী শিবপার্শ্বে নীলবর্ণা সর্বালংকারভূষিতা, অস্ত্রশস্ত্রবিহীনা চতুর্হস্তা রাকিনী শক্তি। ইহাই কালীর রজোমূর্তি। যখন মন অনাহতে উপস্থিত হয়, তখন সাধক দেখেন, মা কালীর রজো স্তরের সত্ত্বমূর্তি সুশুভ্র সুনীলবর্ণা, পৌষ মাসে মেঘশূন্য প্রাতঃকালীন নীলাকাশের বর্ণ। এখানে মা কালীর লোল জিহ্বা নাই। যখন সাধক সত্ত্বগণের তমোস্তরে (কর্মভূমিতে) উপনীত হন, তখন মা কালী সর্বালংকারভূষিতা রক্তবস্ত্রপরিধানা স্বর্ণবর্ণা খড়্গধারিণী চতুর্ভূজা কালীমূর্তি দেখেন। যখন মন সত্ত্বগুণের রজোস্তরে উঠে, তখন সাধক স্বর্ণজ্যোতিঃবর্ণা সর্বালংকারভূষিতা রক্তবস্ত্রপরিহিতা চতুর্ভূজা বা দ্বিভুজা মূর্তি দেখেন। যখন সাধক পূর্ণ শুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তিনি দেখেন, বিদ্যুদ্বর্ণা দ্বিভুজা সর্বালংকারভূষিতা রক্তবস্ত্রপরিহিতা মাতৃমূর্তি। উক্ত মূর্তিতে এত দিব্য জ্যোতিঃ যে, সময়বিশেষে অলংকার বা বস্ত্রাদি দেখা যায় না। সহস্রদল পদ্মের নীচে অবস্থিত দ্বাদশ দল পদ্মে এই মূর্তিদর্শন হয়। সত্ত্বাদি ত্রিগুণের প্রত্যেকের তিন স্তর আছে। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ভূমিতে যখন কালীমূর্তি লয় হয়, তখন ইনিই মহামায়া

হন। এই ভূমিতে সাধক উঠিলে তাঁরাও সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ লয় হয়।

২৩শে রবিবার আমি সূর্য্যপূজা ও সূর্যহোম করিলাম। ঠিক তিন মাস পূর্বে ২৩ এপ্রিল রবিবার সূর্য্যপূজান্তে দশহাজার সূর্য্যমন্ত্র পুরশ্চরণপূর্বক প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা ১০৮ বার সূর্য্যমন্ত্র জপ করেছি। ঋবিবর বিশ্ববসু পুরশ্চরণের দিন থেকে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা এসে ঋত্বিকরূপে আমার জপকালে থাকতেন। আজ সূর্য্যোৎসব করে এই সূর্য্য ব্রত পরিসমাপ্ত হলো। সূর্য্যাদি দ্বাদশ আদিত্য, মাতঙ্গী, শিবাদি দেবতার পৃথক্ পূজা করে সূর্য্য-হোম করলাম। উক্ত হোমে ৫০টী সাজা বিল্বপত্র সূর্য্যকে ও ৫৪টী মাতঙ্গীকে আহুতি দিলাম। হোমাগ্নিতে সূর্য্যাদি দ্বাদশাদিত্য, মাতঙ্গীপ্রমুখ দশমহাবিদ্যাদি সকলে বহ্নিমূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে আমাদের আহুতি নিলেন। হোমান্তে যখন মহাগৌরী পূর্ণাহুতি দিলেন, তখন সূর্য্য ও মাতঙ্গী এক সঙ্গে দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ও প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হইয়া পূর্ণাহুতি লইলেন। ইহার ফলে মহাগৌরী দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইলেন। হোমশিখা তিন হাতের অধিক উচ্চ হইয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। পূজা ও হোমকালে অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছিল। সূর্য্যদত্ত সূর্য্যমন্ত্রজপের ফল আশানুরূপ না হওয়ায় আমি ও মহাগৌরী মর্মাহত হয়েছিলাম। স্নেহের গোপাল আমাদের মর্মব্যথা বুঝে সমবেদনায় সূর্য্যকে শাস্তি দিলেন। সূর্য্যপূজান্তে যখন সূর্য্যকে নৈবেদ্য দেওয়া হলো, তখন সূর্য্য ঠাকুর আসনে বসলেন নৈবেদ্য গ্রহণার্থ। সেই সময় গোপালজী সূর্য্যের চুলের মুঠি ও হাত ধরে টেনে আসন থেকে নামাতে লাগলেন এবং মহাগৌরী নিষেধ করায় ক্ষান্ত হলেন। অন্নভোগ নিবেদিত হলে পূজিত ও অপূজিত অসংখ্য দেবতা অন্নভোগ গ্রহণ করলেন। সেই সময় বিশ্ববসু প্রভৃতি মুনিঋষি সহ মহামুনি দধীচিকে আমি দেখে চমকে উঠলাম এবং মহাগৌরীকে বললাম। মহাগৌরী তাঁকে চিনতে না

পেরে পরমহংস ভৈরবানন্দকে ডাকলেন। ভৈরবানন্দজী নীচ থেকে উপরে এসে তাঁকে দেখে বললেন, ইনি দধীচি। আমার অনুরোধে মহাগৌরী তৎপদে গন্ধপুষ্প দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি দয়া করে আমাদের অন্নভোগ নিয়েছেন? তিনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। দধীচির চেহারা বিদ্যুৎ বরণ, মস্তকে শ্বেত জটা, আকর্ণ বিস্তৃত আঁখি, অতি শীর্ণকায়, লম্বা ১৩।১৪ হাত—আমাদের মন্দিরের দেওয়াল বার ফুট উচ্চ, তিনি মন্দিরে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, সত্যযুগের মানুষ চৌদ্দ হাত লম্বা ছিলেন। ত্রেতাযুগে দধীচির অস্থিতে বৃত্রাসুর বধার্থ ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মিত হয়েছিল। মহাভারতে ও দেবী ভাগবতে দধীচির উপাখ্যান পাওয়া যায়। দধীচি সত্যযুগের ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। কিয়ৎক্ষণ থেকে তিনি চলে গেলেন। হোমাগ্নি গঙ্গাজলে নির্বাপিত হবার পর মাতঙ্গী দেবী একটি দিব্য মাল্য মহাগৌরীকে তিন বার দেখিয়ে আমার গলায় দিলেন—শ্বেত, লাল, নীল ও রুদ্রাক্ষবর্ণ ১০৮ উত্তম প্রস্তরগুটিকা যুক্ত। উক্ত দিন সন্ধ্যায় ও পরদিন পূর্বাহ্নে মহাগৌরী উক্ত দিব্য মাল্য আমার গলায় দেখেছেন। উহা সাধনমালা ও মোক্ষমার্গে প্রেরণাদায়ক। ওঁ গৌং গগনদেবায় নমঃ এবং ওঁ মৌং মাতঙ্গী দেব্যৈ নমঃ—এই দুই মন্ত্রে হোমে আহুতি দেওয়া হলো। অন্নভোগান্তে একজন তারাভক্ত ও দুই জন কালীভক্তের দীক্ষা হলো। তারাভক্তটী পূর্বজন্মে বামাক্ষেপার প্রিয় শিষ্য কালীরূপে তারাপাঠে সাধন করেছিলেন। তাই বামাক্ষেপা সূক্ষ্মদেহে এসে তাঁর পশ্চাতে দাঁড়ালেন তারা দেবী সহ। ইষ্টমন্ত্র গ্রহণান্তে যখন সেই ভক্ত ধ্যান করছিলেন, তখন মহাগৌরী দেখলেন, দীক্ষিতের পূর্বজন্মের মূর্তি এবং তিনি তারাপীঠে সিমুল গাছের বাঁধান তলায় নেংটী পরে বসে আছেন। যোগিরাজ ভৈরবানন্দ এক তলায় স্থূল দেহে থেকে পরিবেশন তত্ত্বাবধান করছিলেন এবং সূক্ষ্মদেহে দীক্ষাকালে মন্দিরে বিরাজ করছিলেন। উক্ত ভক্তের দীক্ষাকালে সত্ত্বমূর্তি তারা দেবীকে আমি স্পষ্ট ভাবে

দেখলাম—তিনি মাথায় মণিযুক্ত স্বর্ণ সিঁতি পরেছিলেন, যেখানে মেয়েরা সিঁদুর পরে থাকে। তারাদেবীর তমোমূর্তির ললাটে জ্ঞানচক্ষু দপ্ দপ্ করে জ্বলছিল। তিন জনের দীক্ষা সমাপনান্তে যখন আমি আমার ইষ্টদেবীকে প্রণাম করে উঠলাম, তখন দেখলাম আমার সম্মুখে বিরাট মহাকালী মূর্তি সমস্ত মন্দির জুড়ে আবির্ভূত। তখন ভৈরবানন্দ নীচে ছিলেন। আমি ঐ মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে মহাগৌরীকে বললাম ও মহাগৌরী ভৈরবানন্দকে ডাকলেন। ভৈরবানন্দ মন্দিরে এসে তাঁকে দেখে বললেন, ইহা মা কালীর অর্ধ বিশ্বরূপ। ইহা সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী পূর্ণমূর্তি—তাঁর মাথা দশ পনেরটী মানুষের মাথায় সমান, চতুর্ভুজা, খড়্গধারিণী, মুণ্ডমালা পরিহিতা, রক্তাম্বরা, সর্বালংকারে ভূষিতা ত্রিনয়না অগ্নিমূর্ত্তি। আমাদের মন্দির ক্ষুদ্র বলে ইষ্টদেবী তাঁর বিশ্বরূপের এই ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখালেন। সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে, ৺মা বললেন, ইহা আমার অর্ধবিশ্বরূপ বা মহাকালীমূর্তি। ভৈরবানন্দজী বললেন, ৺মায়ের এই মূর্তি পূর্বে দেখি নাই। উক্ত মূর্তি দর্শনে তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। সান্ধ্য আরতির পর মন্দিরের বারান্দায় গীত বাদ্যের অনুষ্ঠান হল। এইরূপে আমাদের সূর্যোৎসব সুসম্পন্ন হলো। সান্ধ্য আরতির পর মাতঙ্গী দেবীকে ফলমিষ্টি নিবেদনকালে মহাগৌরী দেখলেন, একটী সূক্ষ্মদেহী পুরুষভক্ত একটী কাঠের বারকোষপূর্ণ বড় বড় সন্দেশ এনে মাতঙ্গীকে নিবেদন করলেন। মাতঙ্গী দেবী সেই সব সন্দেশ স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক মন্দিরস্থ দেবগণ ও দধীচি প্রমুখ ঋষিবৃন্দকে দিলেন। মহাগৌরীর আহ্বানে দধীচি পুনরায় সান্ধ্য আরতির পূর্বে মন্দিরে এসে ফলমিষ্টি প্রসাদ নিলেন। মাতঙ্গী দেবীর এই ধ্যান পাওয়া যায়—

ধ্যায়েয়ং রত্নপীঠে শুককলপঠিতং শৃণ্বতীং শ্যামলাঙ্গীং
ন্যস্তৈকাংঘ্রীং সরোজে শশিসকলধরাং বল্লকীং বাদয়ন্তীং।
কহ্লারাবদ্ধমালাং নিয়মিতবিলসৎ চূড়িকাং রক্তবস্ত্রাং
মাতঙ্গীং শংখপাত্রাং মধুরমধুমদাং চিত্রকোদ্ভাসিভালাম্॥

যিনি রত্নময় বেদীতে অধিষ্ঠিতা ও শুক পাখীর কলরব শ্রবণে নিমগ্না, যাঁর এক পদ পদ্মোপরি প্রতিষ্ঠিত, যিনি শশীশেখরা, বীণাবাদিনী ও কহ্লারপুষ্প-মালাধারিণী, যিনি রক্ত-বস্ত্র পরিহিতা, শংখপাত্রধারিণী ও সুমিষ্ট অমৃতপানে উন্মত্ত', যাঁহার হাতে চুড়িকা সুষ্ঠুভাবে শোভিতা ও যাঁর কপাল বিশেষচিহ্ন দ্বারা উদ্‌ভাসিত, সেই শ্যামলাঙ্গী মাতঙ্গীকে আমি ভক্তিভরে ধ্যান করি।

পরদিন সোমবার আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর-পূজা করলাম। আজও পূজাকালে ঋষিবর বিশ্ববসু ও তারা দেবী এলেন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ তারা দেব্যৈ নমঃ—ইহাই তারা দেবীর বীজমন্ত্র। এই সিদ্ধমন্ত্র জপ করলে তারা দেবীআবির্ভূত হলেন। নিম্নোক্ত তারা ধ্যান তন্ত্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়।—

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ॥
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং॥
খড়্গাকর্তৃসমাযুক্ত-সব্যেতরভুজদ্বয়াং।
কৃপাণোৎপলসংযুক্ত-সব্যপাণিযুগান্বিতাং।
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েৎ মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাং॥
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রয়ভূষিতাং।
জ্বলৎচিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীং॥
স্বাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যালংকারবিভূষিতাং।
বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মপরিস্থিতাং॥

অনুবাদ—যিনি বামপদ অগ্রে ও ডানপদ পশ্চাতে রাখিয়া দণ্ডায়মান, দারুণস্বভাবা, মুণ্ডমালায় সুশোভিতা, খর্বাকৃতি লম্বোদরা ভয়ংকরা, কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্মে আবৃতা নবযৌবনসম্পন্না, ললাটদেশ পঞ্চ নরকপালে ভূষিতা, লোলজিহ্বা, মহাভয়ংকরা, বরপ্রদা, যাঁহার দুই ডান হাতে খড়্গা ও কাটারী

এবং দুই বাম হাতে নরকপাল ও পদ্ম, মস্তকে একটী পিঙ্গলবর্ণ উগ্রজটা ও সর্পত্রয়াকৃতি ভূষণ শোভিত, যিনি নবোদিত সূর্য্যবৎ রক্তবর্ণা, নয়নত্রয়সংযুক্তা, জ্বলন্ত চিতামধ্যে অবস্থিতা, বিকটদন্তপংক্তিবিশিষ্টা, নিজ ভাবে স্বয়ং সহাস্যবদনা, স্ত্রীজনোচিত ভূষণে ভূষিতা, এবং প্রলয়কালীন বিশ্বব্যাপী কারণসলিলে শ্বেতপদ্মে অবস্থিতা, সেই তারা দেবীকে ধ্যান করিবে।

ইহাই তারাদেবীর তমোমূর্ত্তি। প্রথমে দেবী তমোমূর্ত্তি দেখিয়ে পরক্ষণেই সত্ত্বমূর্তি দেখালেন। পূর্বদিন রবিবার বৈকালে রাম ঠাকুরের এক শিষ্য এসেছিলেন। রাম ঠাকুরের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁরা শতবার্ষিকী স্মারক পুস্তক প্রকাশ করবেন। ইহার জন্য একটী প্রবন্ধ লিখতে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন। তখন আমি, ভৈরবানন্দ প্রভৃতি অনেকে নাটমন্দিরে বসেছিলাম। পূর্ণপ্রজ্ঞ ভৈরবানন্দ দেখলেন, উক্ত শিষ্যের পেছনে রাম ঠাকুর দণ্ডায়মান। গত ফেব্রুয়ারী মাসে আমি ও মহাগৌরী টালিগঞ্জে কোন ভক্তের বাড়ীতে বিবেকানন্দ জন্মোৎসব উপলক্ষে গিয়াছিলাম। তথায় ঠাকুরঘরে আমরা সূক্ষ্মদেহী রাম ঠাকুরকে দেখেছিলাম। উক্ত গৃহে তাঁর এক শিষ্য থাকেন। আমি ছাত্রজীবনে ১৯২২।২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় বহুবাজার ষ্ট্রীটে একটী কাপড়ের দোকানে রাম ঠাকুরকে বহুবার দর্শন ও প্রণাম করেছি এবং তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছি। এখন রাম ঠাকুর স্বর্গবাসী ও তাঁর নামে বহু প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান।

২৪ শে সোমবার সন্ধ্যার পর আমি, মহাগৌরী ও বিশ্বরূপানন্দ মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় ছিলাম। তখন একটী দিব্যদেহী সিদ্ধঋষি এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার চুল বরফের মত সাদা, বাম হাতে কুশাসন ও ডান হাতে কমণ্ডলু ছিল। আমি ও মহাগৌরী তাঁকে সভক্তি প্রণাম করতে তিনি মৃদু হাস্য করলেন। মন্দিরে পাতা আমার আসনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি ইংগিতে আমাকে বললেন, আসনে বস ও সাধন শেষ কর। তখন মন্দিরে ধূপ, দীপ ও মোমবাতি

কয়েকটি জ্বলছিল। তিনি মহাগৌরীকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। তখন মহাগৌরী অনুভব করলেন, তাঁর ব্রহ্মতালু ফেটে যাচ্ছে ও মন সমাহিত হচ্ছে। ইনি ব্রহ্মলোকবাসী ও মর্ত্যের কোন তীর্থে সন্ধ্যা করে ফিরে যাচ্ছেন।

২৫ শে মঙ্গলবার বৈকাল পাঁচটায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যশোভা দেখছিলাম। এমন সময় আমি দেখলাম, একটি বিরাট পুরুষ মহর্ষি সূর্য্যদ্বার দিয়ে নেমে পশ্চিম বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বাম বগলে কুশাসন ও ডান হাতে কমণ্ডলু ছিল—মাথায় লম্বা জটা, বড় বড় চোখ, একখণ্ড সাদা কাপড় কোমরে জড়ান ও শুভ্রবর্ণ। আমি প্রণাম ও প্রার্থনা করতে তিনি ডান পদ বাড়িয়ে আমার মাথায় রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে যেতে চাইতে তিনি হাত উল্‌টে বললেন, এতে আমার হাত নাই। একটু পরেই তিনি চলে গেলেন। ইহার আধ ঘণ্টা বাদে আর এক ঋষি পশ্চিম বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন এবং আমি প্রণাম করতে তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন। তাঁর মাথায় জটা, বগলে কুশাসন ও গাত্র শুভ্রবর্ণ। এই পথ দিয়েই বহু ঋষি ঊর্দ্ধলোক থেকে মর্ত্যে যাতায়াত করছেন। ইহার কারণ, আমাদের মন্দিরে কল্কি প্রমুখ দেববৃন্দ ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ বিরাজ করছেন। প্রথম জনের নাম গীতার ভাষ্যকার হনুমৎ স্বামী ও দ্বিতীয় জনের নাম গীতার টীকাকার আনন্দ গিরি স্বামী। তাঁরা পাঁচ শত বর্ষ যাবৎ বিদেহ মুক্তি সাধন করছেন। সেইজন্য বিদেহমুক্তি সাধন কত কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ তাহা আমাকে জানাতে এসেছিলেন।

৭ই শুক্রবার মধ্যাহ্ন আহারান্তে মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় বিশ্রাম করছিলেন। বৈকাল তিনটার পূর্বে তিনি চোখ বুজে দেখছেন, মন্দিরমধ্যে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কোন ঊর্দ্ধলোকবাসী গম্ভীর ভাবে স্পষ্ট বাক্যে মহাগৌরীর দিকে চেয়ে কাউকে বলছেন, "ইনি

আশি বছর পূর্বে আমাকে অপমান করেছিলেন। আমি একজন গবেষক ও চিকিৎসক। ইনি আমাকে মানেন নি। এখনি ওঁকে দেখাচ্ছি, আমার কত শক্তি।" এই বলে তিনি মহাগৌরীর তলপেটের দিকে চাহিলেন, তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি যেন চর্মভেদ করল! সঙ্গে সঙ্গে মহাগৌরী তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা ও পায়খানার বেগ অনুভব করলেন। তিনি চোখ খুলে খুঁজে কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন তাঁর খুব পেটব্যথা হলো ও তিনি পায়খানায় গেলেন। এই ঘটনা ভৈরবানন্দকে লেখায় ভৈরবানন্দ উল্লিখিত উর্দ্ধলোকবাসীকে যোগবলে মাকড়দহে আহ্বান করেন। তিনি এসে বললেন, "আমি গোলোকবাসী, আমার নাম বৃন্দাবন ধর। আমার বাড়ী পাটনায় ছিল ইত্যাদি।" স্বামী ভৈরবানন্দ তাঁহার নিকট জানিলেন, ইনি বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ও উচ্চস্তরের বৈষ্ণব সাধক ছিলেন। তিনি জীবনের শেষার্ধে বৃন্দাবনে বাস করতেন ও উক্ত তীর্থবাসী সাধুসন্তদিগকে বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসাদি করতেন ও বিনামূল্যে ঔষধাদি দিতেন। একদা বৃন্দাবনে কলেরা মহামারী দেখা দেয়। কোন সাধু কলেরায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে ডাকতে যাওয়া হয়। উনি তখন জপধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তাই রোগী দেখতে আসতে একটু বিলম্ব হয়েছিল। যখন তিনি রোগীর নিকট এলেন, তার কিছুক্ষণ পূর্বে রোগী মারা যায়! সেই জন্য ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঐ ডাক্তারকে অশ্রাব্য ভাষায় তিরস্কার ও অপমান করেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ ডাক্তার বৃন্দাবন ধর এই জন্মে নিলেন। এই প্রতিশোধে মহাগৌরীর উপকার হলো; কারণ চার পাঁচ দিন ধরে তাঁর কোষ্ঠকাঠিন্য হয়েছিল। সেদিন তাঁর খুব পেট পরিষ্কার হলো। ভৃগু আদি ঋষিবৃন্দ অবতারাদিকে যে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন, তার ফলে তাঁরা মর্ত্যে নেমেছেন ও মর্ত্যের মঙ্গল করেছেন। শাপে বর হলো, যেমন হলধারীর শাপে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে রক্ত উঠছিল।

মহাগৌরী হরিহরানন্দের শিষ্যা ভৈরবী ব্রাহ্মণীরূপে মনোরমা, তৎপূর্ব

জন্মে রামেশ্বর শর্মার শিষ্যারূপে বিশ্বময়ী এবং তৎপূর্বজন্মে কালীকিংকরের শিষ্যারূপে শ্যামা নামে স্বগৃহে অভিহিত ছিলেন। ইহজন্মে তাঁর পিতৃমাতৃদত্ত নাম বেদানা।

১০ই সোমবার সকাল দশটার সময় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ কোণে মাদুর পেতে শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম। সকাল থেকে তিন চার ঘণ্টা অবিরাম লেখাপড়া করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিঞ্চিৎ তন্দ্রিত হয়ে দেখলাম, একটী দিব্যদেহী সন্ন্যাসী—গেরুয়া কাপড় পরা ও গেরুয়া চাদর গায়, গৌরবর্ণ, শীর্ণকায়—এসে আমাকে কিছু বললেন। এমন সময় আমার তন্দ্রা চলে গেল, কিন্তু সেই সাধু মূর্তির পুণ্য স্মৃতি আমার মনে কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। কিন্তু তাঁর কথা বুঝতে না পারায় তিনি আবার ২০শে বৃহস্পতিবার রাত্রে কৃপা করে ক্যাম্প খাটে শুয়ে এলেন ও পুনরায় একই উপদেশ দিলেন, তথাপি আমি তাঁর কথা বুঝতে পারলাম না। এই কথা স্বামী ভৈরবানন্দকে লেখায় ভৈরবানন্দ মাকড়দহে উক্ত দিব্যদেহী মহাপুরুষকে আহ্বান করেন। তিনি আসতেই ভৈরবানন্দ দেখলেন, ইনি পরমানন্দ গিরি পরমহংস, তাঁর ও আমার পূর্বজন্মের সিদ্ধ গুরু। তিনি দুইবার আমার কাছে এসে এই উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, এখন তুমি বেদান্তের প্রথম স্তরের সাধনা আরম্ভ কর অর্থাৎ পূর্ণ বেদান্ত সাধনে প্রবৃত্ত হও। ইহার অর্থ, ব্রহ্মমন্ত্রজপ ও ব্রহ্মজ্যোতিঃ ধ্যান কর : বেদান্তমার্গে শরীররূপ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সাধন কর। এখন তিনি কৌমারী ও ইষ্টদেবী কালী সহযোগে সর্বদা আমার সঙ্গে থাকবেন—খেতে, শুতে, নাইতে, বেড়াতে, শৌচে যাওয়া পর্য্যন্ত সর্বক্ষণ। পরমানন্দ পরমহংস ভৈরবানন্দের কাছে কয়েক মাস থাকার পর ধর্মচক্রের মন্দিরে এসেছেন ও আমার মোক্ষসাধনে বিপুল প্রেরণা দিচ্ছেন।

২৮শে শুক্রবার রাত্রে শয়নের পূর্বে মহাগৌরী আমার পূর্বজন্মের সিদ্ধগুরু মন্দিরবাসী পরমানন্দ পরমহংসকে জানিয়েছিলেন, "আপনারা সকলে

আমার দাদুকে তপস্যা করতে বলছেন, কিন্তু দাদুর শরীর ত আদৌ ভাল যাচ্ছে না। তাঁর শরীর ভাল রাখুন। তাহলে তিনি তপস্যা করবেন।" মধ্যরাত্রে পরমানন্দজী মহাগৌরীকে এই কথা যুক্তি দ্বারা বোঝাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি মহাগৌরীর সঙ্গে তর্কে না পেরে চুপ করে রইলেন। তিনি একটী চুপড়ীতে কতকগুলি গাছের পাতা (পলতা পাতা প্রভৃতি শাক জাতীয়) দেখালেন। চুপড়ীটা তাঁর হাত থেকে নামিয়ে রাখলেন ও তাঁর সিদ্ধশিষ্য ভৈরবানন্দজীর অঙ্গহানির কথা বলে চলে গেলেন। স্বামী পরমানন্দ গিরি মহাগৌরীকে বলেছিলেন, তোমার দাদুকে বই লেখা ছাড়িয়ে সাধনের আসনে বসাও। ওকে রোজ কিছু শাক খেতে দাও। তাহলে ওর কোষ্ঠকাঠিন্য সারবে।"

২৯শে শনিবার সকালে কয়েক ঘণ্টা লেখার কাজ করে ক্লান্ত হয়ে বেলা দশটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় মাদুরে শুয়ে আমি বিশ্রাম করছি। একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দেখলাম, একটী দিব্যদেহী সিদ্ধঋষি ছদ্মবেশে এসে আমার পাশে বসলেন ও আমাকে কিছু বললেন। তখন মহাগৌরী নীচতলায় রান্নাঘরে ছিলেন। উপরে আমার কাছে আসার পূর্বে নীচে মহাগৌরীকে অলক্ষ্যে থেকে তিনি বাংলায় কিছু লিখে দেখালেন। আমি মাদুর থেকে উঠার পর মহাগৌরী উপরে এলেন এবং আমি তাঁকে ঐ ঋষির কথা বলায় তিনি দেখলেন, ঐ ঋষি পশ্চিমমুখো হয়ে ঐ মাদুরে তখনও বসে আছেন--তাঁর চোখ দুটী ও নাক দেখা যাচ্ছিল ও দেহের বাকী অংশ লোমে ঢাকা, মুখ-চোখ সূর্য্যবৎ ভাস্বর, সর্বাঙ্গে বড় বড় কাল লোম, দুই হাত দীর্ঘ। তিনি কে জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই 'হাত নেড়ে জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করে চলে গেলেন। সম্ভবতঃ ইনি লোমশ মুনি। স্বামী ভৈরবানন্দও যোগবলে জেনে বললেন, ইনি মহাভারতোক্ত লোমশ মুনি। বেলা ১১টার পরে যখন আমি কুয়াতলায় কুয়া থেকে বাল্‌তিতে জল তুলে মহাগৌরীর মাথায় ঢালিতেছিলাম,

তখন উক্ত ঋষি আবার আসিলেন। আমরা তাঁকে সভক্তি প্রণাম করে মন্দিরে আসতে বলায় তিনি মন্দিরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন এবং মহাগৌরী স্নানান্তে উপরে আসতেই তাঁকে কিছু লিখে দেখালেন। তন্মধ্যে মহাগৌরী পড়লেন—আশীর্বাদ, লোমশ মুনি। মহাগৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে আশীর্বাদ করলেন? আমি তখন নীচে খেতে গিয়েছিলাম। তিনি নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে বললেন, ওকে। নিঃসংশয়ে উক্ত ঋষির নাম লোমশ। দুই বারেই তিনি একই মূর্তি ধরে এসেছিলেন। তাঁর দিব্য দেহ থেকে স্বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেন, "আমার বংশে তোমার প্রথম মনুষ্য জন্ম হয়েছিল। এই জন্ম নিয়ে তোমার এগার বার নরজন্ম হলো। তুমি এই জন্মেই সাধন শেষ ও জ্ঞান লাভ করবে। তোমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছিলাম।"

২৭শে বৃহস্পতিবার বৈকালে মহাগৌরী বাড়ী থেকে এলেন। সন্ধ্যার পরে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় আমার খাটে বসে আমি তাঁর আহত বাম পদের গোড়ালিতে কবিরাজী তেল মালিশ করিতেছিলাম। তখন বামাক্ষেপার পরিচিতা সিদ্ধেশ্বরী ভৈরবী দিব্য দেহে পূর্ণ মূর্তিতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন—তাঁর মাথার লম্বা কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পূর্বজন্মে মহাগৌরী তাঁর সঙ্গে পরিচিতা ছিলেন বলে সিদ্ধেশ্বরী প্রায়ই এখানে আসেন। পরদিন শুক্রবার মধ্যাহ্ন ভোজন সময়ে তিনি এসে একতলায় আমাদের সম্মুখে দাঁড়ালেন। তৎপরদিন শনিবার সন্ধ্যায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় আমি, মহাগৌরী, বিশ্বরূপানন্দ প্রমুখ কয়েকটী সাধু-ভক্ত একত্রে বসে ভজনাদি গাইতে ছিলাম। তখন তিনি এসে মহাগৌরীর কাছে বসলেন ও প্রায় ঘণ্টা খানিক রইলেন।

৩০শে রবিবার সকালে আমি ও মহাগৌরী গরিফায় একটী ভক্ত

গৃহে যাই। আমাদের সঙ্গে শিব, কৌমারী ও মা কালী গিয়েছিলেন। ওখানে গঙ্গাতীরে একটী রমণীয় বৃক্ষময় আশ্রমে বেড়াতে গেলাম ও দেখলাম, তত্রস্থ শিব মন্দিরসমূহে অনেক প্রেতাত্মা ও সূক্ষ্মদেহী বাস করে। পূর্বোক্ত ভক্তগৃহে আহারান্তে আমি একটী ঘরে খাটে বিশ্রাম করছিলাম। তখন উক্ত ভক্তের মৃত পিতা চশমা চোখে মৎ সমীপে এলেন অন্যান্য কয়েকটী প্রেত সহ এবং আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলেন। মহাগৌরী আহারের পূর্বে একটী অদূরস্থ পুকুরে গা ধুতে গিয়ে দেখিলেন, ঐ পুকুর থেকে কয়েকটী জলভূত তাঁকে দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল, তারা ঐ পুকুরে ডুবে মরে প্রেত হয়েছে। বৈকাল তুইটায় আমরা বাসে চড়ে কাঁচড়াপাড়া গেলাম। স্নেহের কৌমারী ও স্নেহের গোপাল যথাক্রমে আমার বাম ও ডান কাঁধে চড়ে বাসে যাচ্ছিলেন। পথে হালিশহরে একটী পোড়ো শিব মন্দিরে একটী সিদ্ধশৈব বাস করেন। গতবার আমরা যখন হালিশহর থেকে ফিরিতেছিলাম, তখন ঐ সিদ্ধশৈব ট্রেণে এসে দেখা দিয়েছিলেন। আজ তিনি বাসে আসামাত্র আমি তাঁর বড় বড় ক্রুদ্ধ চক্ষু দেখে চিনলাম। আমরা তাঁর মন্দিরে না যাওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের অসুবিধা সৃষ্টি করলেন, আমাদের বাস বিগড়ে দিলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, "ঐ বিকটমূর্তি পুরুষ অপদেবতা নন। তিনি একজন সিদ্ধশৈব সাধক ও তাঁর নাম প্রাণনাথ মিত্র। তিনি শিবের নন্দীভাব নিয়ে সাধন করে নন্দীত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। সেইজন্য শিবের সমীপেই আছেন। মহাগৌরী পূর্ব জন্মে ওখানে গিয়ে সাতবর্ষ কঠোর সাধন করেছিলেন। ঐ রাস্তায় মহাগৌরী তুইবার গেলেন, অথচ ঐ শিবমন্দির দর্শন করলেন না। তাই তিনি আপনাদের বাস মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতেই বিগড়ে দিলেন। আবার ওখানে গেলে ঐ শিব মন্দিরে যাওয়া উচিত।" তখন আমরা বাধ্য হয়ে অন্য বাসে উঠে কাঁচড়াপাড়া গেলাম। তথায় হাইওমার্শ ইনষ্টিটিউট হয়ে শীতলী সংঘের বৃহৎ

মৃণ্ময়ী শীতলা প্রতিমা দেখলাম। ওখানে চৈত্র মাসে শীতলা অষ্টমীতে প্রকাণ্ড শীতলা প্রতিমা গড়ে শীতলা পূজা হয়। তথায় দেবী শীতলা ছিলেন না। মহাগৌরীর আকুল আহ্বানে মা শীতলা এলেন—আকাশী রঙের কাপড় পরা লাল্‌চে চেহারা, নানা অলংকারে ভূষিতা, দ্বিভুজা, মাথায় মুকুট নাই। আমি শীতলার ধ্যানাদি আবৃত্তি করে তাঁকে প্রণাম করলাম ও গোপালজী বড় বড় পঞ্চমুখী রক্তজবা এনে শীতলার পায়ে দিলেন। উক্ত শীতলী সংঘের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যা ৫টায় হাইওমার্শ ইনষ্টিটিউটে ধর্মসভা হলো। সভার প্রারম্ভে মহাগৌরী একটী ভজন গাইলেন এবং প্রায় এক হাজার শ্রোতার কাছে পৌনে এক ঘণ্টা যাবৎ ভাষণে কল্কিদেবের আসন্ন আবির্ভাব আমি তার স্বরে ঘোষণা করলাম। তখন কল্কিদেব, ব্যাসদেব, পরমানন্দজী, গোপালজী ও কৌমারী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সভার পূর্বে ইনষ্টিটিউটের বিশ্রাম কক্ষে বসে চোখ বুজে আমি পরমানন্দজী পরমহংসকে যোগাসনস্থ দেখলাম। আমার ভাষণের পরে আমি ও মহাগৌরী শৌচার্থ বাহিরে এলাম। শৌচান্তে উঠানে দাঁড়িয়ে মহাগৌরী দেখলেন, ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা হাইওমার্শ সাহেব প্রেতদেহে পূর্বোক্ত বিশ্রাম কক্ষে দণ্ডায়মান—লাল ফর্সা চেহারা, মাথায় টাক, হৃষ্ট পুষ্ট ও দীর্ঘকায়। তৎপরে আমরা বাসে চড়ে নৈহাটী এলাম। বাসে একটী শিশু (৩।৪ বৎসর বয়স) মাতৃকোলে হঠাৎ বমি করতে লাগল। মহাগৌরী ঐ শিশুর মাতার পাশে বসেই দেখলেন, ঐ শিশুর পশ্চাতে একটী যমদূত দণ্ডায়মান। উক্ত শিশুর বমি থামল না ও বোঝা গেল, তার মৃত্যু আসন্ন। আমরা ষ্টেশনে যখন ট্রেণের অপেক্ষা করছিলাম, তখন দৈত্যাকৃতি বীর ভদ্রকে দেখা গেল। কাল ভৈরব ত্রিশূল উঁচিয়ে রাখায় তিনি শান্ত হয়ে একটী মন্ত্র মহাগৌরীকে দিতে চাইলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বল্লেন, ইনি বীরভদ্র। দক্ষযজ্ঞে শিবের জটা থেকে বীরভদ্র আবির্ভূত হন।

মহাগৌরী বাহিরে বেরোলে অনেকে চেয়ে থাকে ও কুদৃষ্টিপাত করে। সেজন্য তিনি সম্মোহন মন্ত্র দিতে এসেছিলেন। ঐ সিদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগ করলে কেউ কুভাব বা কুদৃষ্টি করতে পারবে না। অনন্তর আমরা ট্রেনে উঠলাম রাত্রি নয়টায়। সারাদিন ব্যস্ত থাকায় আজ মাতঙ্গীর ধ্যান ও জপ করার অবসর আমি পাইনি ; অথচ নয়টা বেজে যাচ্ছে। তাই মা মাতঙ্গী এসে দয়া করে স্মরণ করিয়ে দিলেন। অবিলম্বে আমি মাতঙ্গীর ধ্যান ও জপ করায়' তিনি প্রসন্ন হয়ে চলে গেলেন। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে এসে ট্রেণের জন্য আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তখন আমি প্ল্যাটফরমে বসে রামনাম কীর্তন করছিলাম। তখন কয়েকটি বিকট প্রেতাত্মা অদূরে দাঁড়িয়ে রাম নাম শুনছিল—তাদের কারুর পা নাই, কারুর হাত নাই, কারুর বা কোমর ভেঙ্গেছে। ট্রেণ দুর্ঘটনায় তাদের অপমৃত্যু হওয়ায় তারা এই ভয়ংকর প্রেতদেহ পেয়েছে। আমিও মহাগৌরী রাত্রি সাড়ে এগারটায় ধর্মচক্রে ফিরলাম।

৩০শে সোমবার আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়েছিল পূর্বদিনের পরিশ্রমে। তাহা সত্ত্বেও সকালে ৩।৪ ঘণ্টা নানা জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিলাম। করুণাময়ী অপরাজিতা দেবী এসে আমাকে শায়িত বা তন্দ্রিত না পেয়ে স্বীয় কর্ম করতে না পেরে চলে গেলেন। চলে যাবার সময় মহাগৌরী তাঁকে দেখলেন। বেলা ১০॥০ টায় আমি পশ্চিম বারান্দায় মাদুরে শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম। তখন আবার অপরাজিতা দেবী হাতে একটি পাত্রে দিব্য আহার্য্য নিয়ে আমার অদূরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সন্ধ্যার পরে আমিও মহাগৌরী নাটমন্দিরে বসে দুটি শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত গাইতেছিলাম। তখন কাল যবন এসে আমাদিগকে দেখা দিলেন। একটু পরে সিদ্ধেশ্বরী ভৈরবী দিব্য দেহে এসে মহাগৌরীর কাছে দাঁড়ালেন। যখন আমরা উঠে উপরে আসছিলাম, তখন দেখলাম, কাল ভৈরব তথায় বিদ্যমান। রাত্রি এগারটায় আমিও মহাগৌরী যথাক্রমে মন্দিরের দক্ষিণ

ও উত্তর বারান্দায় স্ব স্ব শয্যায় শুয়েছিলাম। তখন আমি দেখলাম, একটি স্বর্ণবর্ণ দেবশিশু আমার মশারীর মধ্যে ডিগ্‌বাজি খাচ্ছে ও খেলা করছে। তিনি নগ্নদেহ ও তাঁর মাথার ঘন কৃষ্ণ কেশদাম চকচক করছে ও চক্ষুদ্বয় পদ্মপলাশবৎ। আমি মহাগৌরীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই স্বর্ণ-মূর্ত্তি দেবশিশু কে? মহাগৌরী স্বীয় শয্যায় শুয়ে দিব্যদৃষ্টিতে দেখে বললেন, ইনি গোপাল। মহাগৌরী সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, তুই ওখানে কি করছিলি? তখন গোপাল আর দুইবার ডিগবাজি খেয়ে দেখালেন, তিনি খেলা করছিলেন। এত দিন গোপালজীকে শ্যামবর্ণ গ্রাম্য শিশুরূপে দেখেছি। আজই প্রথম তাঁর স্বর্ণবর্ণ দিব্যমূর্তি দেখে ধন্য হলাম। আহা! সেই মূর্তির কি অপূর্ব শোভা, কি মোহন সুষমা!

——

—এগার—

ধর্মচক্রে মোক্ষযজ্ঞ

সন ১৩৬৫ সালের বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে (অথবা ১৯৫৮ খ্রীঃ মে বা জুন মাসে) ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদা উভয়ে স্বামী ভৈরবানন্দকে বেলুড়মঠের এই দৃশ্য দেখালেন—শতাধিক সাধুপ্রেত উত্তর দিকের পুরাণ গঙ্গাঘাট থেকে দক্ষিণ দিকের শ্মশান ঘাট (পুরাণ গেস্ট হাউসের পূর্ব কোণস্থ পর্য্যন্ত গঙ্গাধারে বসে আছে। যাত্রীরা তাঁদের ঘাড়ে পড়ছে, আর তাঁরা সরে যাচ্ছেন, শিউরে উঠছেন, কেউ বলছেন হায়! কোন যাত্রী থুথু ফেলছেন তাদের গায়, কেউ বা পেচ্ছাব করে দিচ্ছে। কিন্তু এই দৃশ্য ভৈরবানন্দজী বিশ্বাস করলেন না। তখন ঠাকুর ও শ্রীমার সঙ্গে সূক্ষ্মদেহে এসে তিনি দেখে গেলেন, তবু ষোল আনা প্রত্যয় হল না।

ইহার দুই তিন দিন পরে তিনি ধর্মচক্রে এসে স্থুল শরীরে বিশ্বরূপানন্দের সঙ্গে বেলুড় মঠে গিয়ে দিব্য চক্ষুতে উল্লিখিত শতাধিক প্রেত সাধুকে দেখে বিশ্বাস করলেন।

২০শে অক্টোবর, ১৯৫৮ সোমবার শারদীয়া মহাষ্টমীর প্রাতঃকালে ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে ধর্মচক্রে এলেন ও পরদিন মঙ্গলবার মহানবমীর সকালে ৮॥০ টায় বেলুড়মঠে দুর্গাপ্রতিমা দর্শনে গেলেন। আমাদের মন্দিরে চণ্ডীপাঠ ও ভক্তিমূলক পূজা এবং বাতাসা ও নারিকেলী নাড়ুর ভোগ পেয়েও মহালয়া থেকে মহানবমী পর্য্যন্ত দশ দিন মা দুর্গা প্রত্যক্ষ বিরাজ করলেন; কিন্তু ভৈরবানন্দ দেখলেন, বেলুড় মঠে প্রতিমায় মা দুর্গার সূক্ষ্মাংশ মাত্র প্রকাশিত। স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়মঠে প্রথম দুর্গাপূজার সময় শ্রীমা সারদাকে 'জ্যান্ত দুর্গা' জ্ঞানে দুর্গাপ্রতিমার পাশে বসিয়ে পূজা করেছিলেন। তথায় সেদিন দুর্গাপ্রতিমার কাছে ভৈরবানন্দ ঠাকুর বা শ্রীমাকে দেখতে পেলেন না। আর ধর্মচক্রের ক্ষুদ্র মন্দিরে তাঁরা সর্বক্ষণ বর্তমান রইলেন অন্ততঃ দেবীপক্ষের দশদিন। স্বামী ভৈরবানন্দ ইহা প্রত্যক্ষ করে ভাবলেন, "এখন এমন কোন সাধক সন্ন্যাসী কি বেলুড় মঠে নাই, যিনি দুর্গাপ্রতিমার কাছে ঠাকুর ও শ্রীমাকে জাগ্রত রাখতে পারেন!" ভৈরবানন্দ ঠাকুরের মন্দিরে ঠাকুরকে নমস্কার করে দেখলেন, ঠাকুর একটু বিষণ্ণ। অনন্তর সারদা মন্দিরে গিয়ে ভৈরবানন্দ দেখলেন, তথায় নিত্যপূজা হচ্ছে ও শ্রীমা সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজমান। যে স্থানে শ্রীমার পার্থিব শরীর ভস্মীভূত হয়, তদুপরি সারদা মন্দির নির্মিত। তারপর ভৈরবানন্দ স্বামীজীর মন্দিরে গিয়ে দেখলেন, তথায় স্বামীজী নাই। স্বামীজীর মর্মর মূর্ত্তিতে ধ্যান করে তিনি তন্মধ্যে স্বামীজীর ভীষণ কালমূর্তি দেখলেন। স্বামিজীর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। তখন ভৈরবানন্দ স্বামিজীকে বললেন, আপনার এই মূর্তি দেখতে চাই না। তখন স্বামিজী ১৮৯৩ খ্রীঃ চিকাগো ধর্মমহাসভার মূর্তিতে এসে মর্মর বেদীর

সম্মুখে দাঁড়ালেন। তখন ভৈরবানন্দ তাঁর মানস পূজা ও নমস্কার করলেন। বলা বাহুল্য ঐ মন্দিরের তলায় স্বামিজীর স্থূলদেহ ভস্মীভূত হয়েছিল। স্বামিজীর মন্দিরে যে সাধু পূজা করছিলেন, তিনি অসাধু ও অযোগ্য পূজক। তাই তথায় আদৌ স্বামিজীর প্রকাশ ছিল না।

অনন্তর ভৈরবানন্দ বেলুড় মঠের শ্মশানে গেলেন। যখন তিনি শ্মশান-বেড়ার দশ বার হাত দূরে ছিলেন, তখন তত্রস্থ সমাধিস্থানের বৃক্ষতলে শ্বেত পদ্মোপরি মদীয় গুরুদেব মহাপুরুষজী উপবিষ্ট। ভৈরবানন্দ উক্ত বেড়ার নিকটে যেতেই মহাপুরুষজী বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তখন স্বামিজী (বিবেকানন্দ) কোথা থেকে ছুটে এসে বেড়ার বাহিরে দাঁড়ালেন। ভৈরবানন্দ উভয়ের মানস পূজাদি করলেন। অনন্তর তাঁরা দুইজনই তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তখন ভৈরবানন্দ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। কোন রকমে বেড়া ধরে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। তৎপরে তিনি ব্রহ্মানন্দ মন্দিরে গেলেন, কিন্তু সেখানে ব্রহ্মানন্দজীকে দেখতে পেলেন না! তথায় তিনি প্রণাম করে চলে এলেন। বেলুড় মঠ দর্শন কালেও ফেরবার সময় ঠাকুর ও ভৈরব তাঁর সম্মুখে চলছিলেন। ঐ দিনও ভৈরবানন্দ বেলুড়মঠস্থ সন্ন্যাসী সূক্ষ্মদেহীগণকে দেখিলেন এবং ইহার সত্যতা বুঝিলেন।

২৯ অক্টোবর বুধবার বৈকালে স্বামী ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে বেলুড় ধর্মচক্রে এলেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে আমি আরতি করলাম, ভৈরবানন্দ কাঁসর ও বিশ্বরূপানন্দ ঘড়ি বাজালেন। পাচিকা কমলা নীচে রান্নাঘরে রান্না করছিল। আরতি আরম্ভ হতেই কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠল। তখন মন্দিরের উত্তর বারান্দার কোণে বিদ্যমান কাল ভৈরব ও কালভৈরবী তাণ্ডব নৃত্য করলেন। পূর্ব শনিবার ২৫ অক্টোবর ভৈরবানন্দ মাকড়দহে স্বগৃহে দুপুর রাত্রে তাঁহাকে ধ্যানে দেখেছিলেন। তাণ্ডব নৃত্যকালে ভৈরব ও ভৈরবী স্ব স্ব ত্রিশূল স্বহস্তে মাথার উপরে তুলে ধরে ও পা তুলে



সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী সরস্বতী

নানা ভঙ্গীতে নাচলেন। তখন নীচে পূর্বোক্তা পাচিকা ঐ ভয়ংকর নৃত্য-শব্দ শুনে ভয় পায় ও আমাদিগকে জানায়। আরতির পরে ভৈরব ও ভৈরবী বসে আমাদের সঙ্গে ভজন ও জপাদি করলেন। জপকালে তাঁদের মূর্তি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। ভৈরব ও ভৈরবী গাঢ় নীল বর্ণ, সাড়ে তিন চার হাত উচ্চ, স্থূলকায়, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, ঠোঁট দুটি লাল, বড় বড় চোখ, উন্নত নাসিকা, কপালে সিঁদুরের টিপ, মাথায় জটা, কনুই ও কব্জীতে রুদ্রাক্ষমালা, ভৈরবের ডান হাতে ও ভৈরবীর বাম হাতে ত্রিশূল, উভয়ে নগ্নমূর্তি। তাঁরা তথায় সর্বক্ষণ মন্দির রক্ষকরূপে বিরাজমান। উক্ত দিন ভৈরবানন্দ একতলায় বড় খাটে শুলেন ও গভীর রাত্রে দেখলেন, পনের ষোল জন অশরীরী গেরুয়াধারী সাধুমূর্তি—কারো মাথায় টুপী আছে, কারো মাথায় টুপি নাই—পশ্চিম ও উত্তর বারান্দায় দুই সারিতে বসে ১২॥০ থেকে ৩॥০টা পর্য্যন্ত তিন ঘণ্টা জপধ্যান করে সরে গেলেন। অন্য সময়ে ভৈরবানন্দ ধ্যানে দেখেছেন, মন্দিরের উত্তর ও পশ্চিম বারান্দায় দুই পাঁচ জন সূক্ষ্মদেহী সাধুমূর্তি বিদ্যমান। দিনে ও রাত্রে বহু সাধু সূক্ষ্মদেহী এখানে সাধন করতে আসেন এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব আসন বগলে করে আনেন।

১লা নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় আমি ভৈরবানন্দ, বিশ্বরূপানন্দ প্রভৃতি মন্দিরে সান্ধ্য আরতি করতে গেলাম। আমি মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে প্রণাম করে চন্দন ধূপের দিব্য গন্ধ স্পষ্ট ভাবে আঘ্রাণপূর্বক জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ চন্দন ধূপ দিয়েছে কি ? এই জিজ্ঞাসার কারণ, তখন মন্দিরে চন্দন ধূপ ছিল না। ভৈরবানন্দ উত্তর জানালার বাহিরে তাকিয়ে দেখলেন ও বললেন, "তিনজন অশরীরী সর্বক্ষণ তথায় আছেন। তাঁদের এক জনের হাতে জ্বালা চন্দন ধূপ কাঠি একটী দেখা যাচ্ছে।" আমরা পঞ্চ প্রদীপের আরতি করলাম। তদন্তে আমি পঞ্চ প্রদীপের আগুনের তাপ নেবার জন্য তাঁদের দিকে পঞ্চ প্রদীপ বাড়ালাম। উল্লিখিত

তিনজন সূক্ষ্মদেহী আমাদের পঞ্চ প্রদীপের তাপ নিলেন। যখন আমরা ভজন ও জপ করলাম, তখন তাঁরাও ভজন ও জপ করলেন। অনন্তর আমরা নাড়ু ও মিষ্টির সান্ধ্য নৈবেদ্য ঠাকুরকে নিবেদন করলাম। তখন ঠাকুর, মা সারদা, হরগৌরী ও মা কালী পাশাপাশি আমাদের সম্মুখে আসনে বসলেন। তাঁদের সম্মুখে ভোগপাত্রে ওপাশে সারি বেঁধে প্রীতিভরে ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দ (দ্বাদশ শিষ্য, কোন শিষ্যা নহে) উপবিষ্ট। তখন ঠাকুর এক একটী নাড়ু মা কালী, শিব, গৌরী ও সারদাকে দিয়ে নিজে একটি নাড়ু গালে দিলেন। উত্তর বারান্দায় যে কাল ভৈরব ও কাল ভৈরবী ছিলেন, তাঁরা মন্দির মধ্যে এসে ঠাকুরের কাছে হাঁটু গেড়ে প্রসাদের জন্য হাত পাতলেন। ঠাকুর তাঁদের দুই জনের হাতে মৃদু হাস্যে দুটী নাড়ু দিলেন। অনন্তর ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দ প্রসাদ পেলেন। সেই সময় যে তিনজন সূক্ষ্মদেহী সাধক জানালার বাহিরে ছিলেন, তাঁরাও হাঁত বাড়ালেন, কিন্তু ঠাকুর বা সারদা বা কালী বা হরগৌরী তাঁহাদিগকে এককণা প্রসাদও দিলেন না। পার্ষদগণ প্রসাদ গ্রহণ করবার পর স্বামীজী ও মহাপুরুষজী তিনজন সূক্ষ্মদেহীর দিকে কটমট করে চাইলেন। তখন তাঁরা হাত গুটিয়ে জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগলেন।

২রা নভেম্বর রবিবার সান্ধ্য আরতির পর নৈশ ভোগ নিবেদিত হলে, তাঁরা তিনজন প্রসাদের জন্য হাত বাড়ালেন—মন্দিরস্থ দেবগণ তাহা কেউ গ্রাহ্য করলেন না, কেউ ফিরেও চাইলেন না। আরতির সময় তাঁদের একজনের হাতে জ্বালা চন্দন ধূপের গন্ধ আমি পেলাম ও তাঁরা আমাদের পঞ্চ প্রদীপের তাপ নিলেন। আমি আরতি করলাম। তাঁরা আমাদের সঙ্গে ভজন গাইলেন ও জপ করলেন। অনন্তর আমি সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের জন্য কালীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলাম ও চারটী কালী সঙ্গীত গাইলাম। তখন ভৈরবানন্দ দেখলেন, উল্লিখিত তিনজন সূক্ষ্মদেহীর পশ্চাতে মা কালী

রুদ্র মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন। এই থেকে বোঝা গেল, তাঁদের ইষ্ট দেবী কালী। মনে হয়, এই সাধুত্রয় পতিত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট। পার্থিব মানব দেবতা দর্শনে মুক্তি পায়, কিন্তু সূক্ষ্মদেহী দেবদর্শনেও মুক্তি পায় না।

৩রা নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায়ও পূর্বোক্ত তিনজন অশরীরীকে ঠাকুর প্রসাদ দিলেন না। অন্য বার জন সূক্ষ্মদেহী সাধু রাত্রি এগারটায় এবং সোমবার রাত্রি নয়টায় এসে তিনটা পর্য্যন্ত জপধ্যানে ডুবে রইলেন উত্তর বারান্দায়। সোমবার ছয় ঘণ্টা জপধ্যানে তাঁরা এত তন্ময় ছিলেন যে, তাঁদের মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। সোমবার সন্ধ্যায় আমরা মন্দিরে কর্পূরারতি করলাম এবং পূর্বোক্ত সূক্ষ্মদেহী সাধুত্রয় পঞ্চ প্রদীপে আরতি করলেন। প্রত্যহ দেখা যাচ্ছে, ঠাকুর, মা সারদা, মা কালী, হরগৌরী রক্তমাংসের দেহধারীবৎ রক্তপদ্মোপরি মন্দিরে বিরাজমান। এখন ধর্মচক্র মুক্তিক্ষেত্রে, মোক্ষতীর্থে পরিণত হয়েছে।

৪ঠা নভেম্বর মঙ্গলবার প্রাতে মন্দিরে জপধ্যানকালে আমি, ভৈরবানন্দ ও বিশ্বরূপানন্দ প্রমুখ চারিজন সাধু মগ্ন আছি। মন্দিরের উত্তর বারান্দায় সর্বক্ষণ-বিদ্যমান তিনজন সূক্ষ্মদেহীর মন (কুণ্ডলিনী) মণিপুরে উঠেছিল। ভৈরবানন্দের সূক্ষ্মদেহ মা কালীর ইংগিতে তাঁদের মনকে মণিপুর থেকে আজ্ঞাচক্রে টেনে তুলিল। ইহার ফলে সকাল সাতটা থেকে তাঁরা দুপুর সাড়ে বারটা পর্য্যন্ত ৫॥ ঘণ্টা ধ্যানমগ্ন রহিলেন। তখন তাঁদের তিন জনের পশ্চাতে তিনটি কালীমূর্তি ফুটে উঠল। বেলা ১২॥ টায় ঠাকুরকে অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগ নিবেদিত হলে মা গৌরী আমার কাতর প্রার্থনায় এই তিনি সূক্ষ্মদেহীকে অন্নপ্রসাদ দিলেন, এবং তাঁরা উঠে হাত বাড়িয়ে প্রসাদ নিলেন। এত দিন তাঁরা হাত বাড়িয়েছেন, কিন্তু একবারও প্রসাদ পান নি। আজ দুপুরে মা গৌরী দয়া করে ঐ তিনজনকে প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ গ্রহণান্তে তাঁরা আবার ধ্যানমগ্ন হলেন, সান্ধ্য আরতির সময়ও উঠেলেন না, ভজনও গাইলেন না! সারারাত গভীর

ধ্যানে তাঁরা কাটালেন। বুধবার সকাল পর্য্যন্ত সূক্ষ্মদেহী সাধুত্রয়কে ধ্যানমগ্ন, সমাহিত দেখা গেল। মঙ্গলবার দুপুরে অন্নভোগ নিবেদনকালে আমি ঠাকুরকে কাতর প্রার্থনা জানালাম, ঐ পনেরজন সূক্ষ্মদেহীকে কৃপা করতে ও প্রসাদ দিতে। পনের জনের মধ্যে তিনজন সর্বক্ষণ বিদ্যমান ছিলেন, তখন অন্য বার জন কোথা থেকে দ্রুত গতিতে এসে জানাল দিয়ে হাত বাড়িয়ে সকলে প্রসাদ নিলেন এবং মহানন্দে প্রসাদ খেয়ে দরজা ও জানালার ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। অনন্তর তাঁরা সকলে উত্তর বারান্দায় পুনরায় ধ্যানে বসলেন। সারা রাত্রি ধ্যান করে ঐ বার জন চলে গেলেন, কিন্তু প্রথমোক্ত তিনজন ধ্যানমগ্ন রহিলেন। মন্দিরে অন্নভোগ নিবেদিত হলে ঠাকুর যথাক্রমে কালী, শিব ও গৌরীকে দিয়ে নিজে খেলেন। তৎপরে তিনি মা সারদা এবং কাল ভৈরব ও কালভৈরবীকে দিলেন। তৎপরে পনের জন সূক্ষ্মদেহীকে মা গৌরী প্রসাদ দিলেন। তৎপরে ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যীশু খ্রীষ্ট প্রভৃতি অনেক দেবতা প্রসাদ নিতে বসলেন, যেন জ্যোতির্ময় নক্ষত্রপুঞ্জের মেলা বসল! তখন শ্বেত পাথরের থালায় অন্নপ্রসাদ হাতে নিয়ে ঠাকুর, সারদা ও কালী আমার ও ভৈরবানন্দ প্রভৃতির মুখে দিলেন। আজ মা কালী স্বয়ং মহাপ্রসাদ বিতরণ করলেন। মঙ্গলবার সান্ধ্য আরতির পর আমি মন্দিরে বসে এই গান গাইলাম—

রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পায় মুঠো মুঠো।
দে না মা সাধ হয়েছে পরিয়ে দে না মাথায় দুটো॥

তখন মা কালী দুটী দিব্য গোলাপী জবা স্বহস্তে আমার মাথায় তুলে দিলেন। বুধবার সকাল পর্য্যন্ত ঐ দিব্য জবাদ্বয় আমার মস্তকে যেন স্থূল ভাবে অনুভব করলাম। মনে হচ্ছে, ইষ্টদত্ত জবাদ্বয় এখনও মদীয় মস্তকে শোভা পাচ্ছে। মঙ্গলবার সান্ধ্য আরতির পর আমি ও ভৈরবানন্দ

নাটমন্দিরে বেড়াইতেছিলাম! তখন ভৈরবানন্দ দেখলেন, ধর্মচক্রের পশ্চিম ফটকের উপরে মা কালী দণ্ডায়মান—সৌম্য মূর্তি, কৃষ্ণবর্ণ, দশ বার বৎসরের বালিকাবৎ, সর্বালংকারে বিভূষিত, কোমরে নরহস্ত-কাঞ্চী! তখন আমি ভৈারবানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম, বেলুড়মঠের বড় ফটকে মা কালী আছেন কি? ভৈরবানন্দ দিব্যদৃষ্টিতে দেখে বললেন, বেলুড় মঠের বড় গেটে ভীষণ রুদ্রমূর্তি কালী—বিরাট আকার, কৃষ্ণবর্ণা যেমন কালীধ্যানে আছে, তেমনি সাত আট হাত লম্বা, মুখ ১৫।১৬ টা মানুষের মুখাপেক্ষা বড় এবং ১৸০।২ হাত লম্বা ও চওড়া, জিভটা কুলোর মতো, দাঁতগুলি বেশ বড়, মুখ থেকে রক্ত পড়ছে, উলঙ্গিনী, মাথার চুল মাটিতে ঠেকেছে,—ফটকটি জুড়ে দুর্নিরীক্ষ্য সংহারমুর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন। গভীর রাত্রিতে ভৈরবানন্দ ধ্যানে দেখলেন, বেলুড়মঠের বড় মন্দিরের বড় দরজায় মা কালী সিংহদ্বার জুড়ে দণ্ডায়মান। এঁর রঙ নীল, উলঙ্গিনী, বহিঃফটকের মূর্তি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সৌম্যতর।

৩রা নভেম্বর সোমবার থেকে বুধবার পর্যান্ত ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রে বসে যে দিকে চাইতেন, সেই দিকেই দেখতেন, মা কালী দাঁড়িয়ে আছেন। রাস্তায় যত লোক যাচ্ছে, তাঁদের হৃদয়েও মা কালীকে দেখছেন, সর্বভূতে সর্বস্থানে কালীদর্শন হচ্ছে। ৮ই নভেম্বর শনিবার দুপুরে ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে ধর্মচক্রে এলেন ও দেখলেন, পনের জন সূক্ষ্মদেহী সন্ন্যাসী ৫ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার থেকেই চব্বিশ ঘণ্টা মন্দিরের উত্তর বারান্দায় ধ্যানমগ্ন। পরদিন রবিবার সন্ধ্যায় ধর্মচক্রে ছায়াচিত্রে চৈতন্য, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিত্র দেখান হলো। আমি সাড়ে চারটায় ঘুসুড়ি কালীপূজা মণ্ডপে ধর্মসভায় কালীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গেলাম ভৈরবানন্দকে ধর্মচক্রের ভার দিয়ে। তখন ভৈরবানন্দ মন্দিরে এসে ঠাকুর ও শ্রীমাকে প্রাণভরে প্রার্থনা করলেন। ছায়াচিত্র আরম্ভ হতেই ঠাকুর, শ্রীমা, মা কালী ও হরগৌরী মন্দির থেকে নাটমন্দিরে গিয়ে ছায়াচিত্রের পর্দার তলায় সারি বেঁধে

দাঁড়ালেন। এই ছায়াচিত্র দেখতে ও বক্তৃতা শুনতে প্রায় পাঁচ শত নরনারী সমবেত হয়েছিল এবং ধর্মসভা খুব জমেছিল, কোন গোলমাল বা বাধাবিঘ্ন হয়নি। পরদিন সোমবার কালীপূজা দিবসে সকালে আমরা মন্দিরে জপে বসলাম—আমি, ভৈরবানন্দ, কালিকানন্দ, বিশ্বরূপানন্দ প্রভৃতি। আমি ও ভৈরবানন্দ কয়েক দিন যাবৎ প্রার্থনা করেছি ঠাকুর, শ্রীমা ও কালী মাকে, ঐ পনের জন সূক্ষ্মদেহী সাধুর উদ্ধার ও উর্দ্ধগতির জন্য। সোমবার সকালে জপে বসে শিবধ্যানকালে সকল সূক্ষ্মদেহী সাধক দক্ষিণ পশ্চিম দরজা দিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন ও শিবধ্যান উচ্চারণ করলেন। অনন্তর তাঁরা কালীপ্রতিমা ও মর্মর মূর্তির পেছনে গোলাকারে দাঁড়ালেন। যখন আমরা রামকৃষ্ণ নামকীর্তন গাইলাম, তখন তাঁরা আমাদিগকে এবং পূর্বোক্ত প্রতিমা ও মূর্তিকে প্রদক্ষিণ করলেন। যতক্ষণ এই কীর্তন চলিল, ততক্ষণ তারা প্রদক্ষিণ করলেন। অনন্তর তাঁরা দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে ভজন গাইলেন ও জপধ্যান করলেন। তাঁদের প্রদক্ষিণ কালে দিব্য গন্ধ আমি আঘ্রাণ করলাম। সেই সুগন্ধ মধুর ও মাদক। তৎপরে তাঁরা মন্দিরমধ্যে উত্তর পূর্ব কোণে বসলেন। দুপুরে মন্দিরে অখণ্ড চণ্ডীপাঠ ও ঠাকুর-পূজা হলো। সন্ধ্যায় আমাদের নাটমন্দিরে বালির আনন্দ সম্মিলনী কালীকীর্তন করলেন। তখন আমি নাটমন্দিরে আসরে বসে দুই ঘণ্টা কালীকীর্তন শুনলাম। কীর্তনান্তে রাত্রি নয়টায় আমি মন্দিরে কালীপূজায় বসলাম। প্রায় ৫০।৫৫ জন নরনারী আমাদের কালীপূজায় ও কালীহোমে যোগদান করলেন এবং কালীসঙ্গীত গাইলেন। মহানিশায় মহাকালীর পূজাকালে নৈবেদ্য নিবেদিত হলে মা কালী নৈবেদ্যের থালা স্বহস্তে নিয়ে প্রথমে ঠাকুরকে, তারপর সারদা মাকে, তারপর হরকে, তারপর গৌরীকে ও তারপর নিজ মুখে দিলেন। অনন্তর তিনি ভৈরব-ভৈরবীকে দিলেন। তৎপরে পূর্বোক্ত পনের জন বিদেহী সন্ন্যাসী মা কালীর সম্মুখে গিয়ে যুক্ত করে প্রসাদ প্রার্থনা করলেন।

কালীমাতা কৃপা করে তাঁদের সকলকে প্রসাদ দিলেন। তাঁরা ইষ্টদত্ত প্রসাদ গ্রহণ ও ভক্ষণ মাত্রই জ্যোতির্ময় হোমশিখাবৎ অগ্নিমূর্তি ধরে বিদ্যুদ্বেগে উর্দ্ধলোকে চলে গেলেন। তাঁরা চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, স্বর্গলোক পার হয়ে এক বিরাট জ্যোতির্মণ্ডলের সম্মুখে গিয়ে ধ্যানে বসলেন। সেটী নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোক। তৎপরে আমাদের কালীহোম হলো। হোমান্তে বিরাট অন্নভোগ নিবেদিত হলে মা কালী, হরগৌরী, ঠাকুর ও শ্রীমা খেলেন, ভৈরব-ভৈরবীকে দিলেন। অনন্তর ঠাকুরের পার্ষদ-বৃন্দ খেতে বসলেন। সেই সময় বহু দেবদেবী এলেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র প্রভৃতি। ব্রহ্মার সঙ্গে চার জন মুনিঋষি ছিলেন। তন্মধ্যে দুইজন রক্তবস্ত্র পরিহিত, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, গলায় উপবীত, লম্বা সাদা দাড়ী ও মাথার চুল লম্বা। অন্য দুইজন গেরুয়াপরা, সাদা দাড়ি ও মাথার চুল, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ। কালীপূজা কালে অধিক সময় প্রতিমার সম্মুখে ঘটের উপরে রক্তপদ্মাসনে জ্যোতির্ময়ী কালীমূর্তি দেখা গেল। পূজার প্রারম্ভে মা কালী কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন, স্নানান্তে জ্যোতির্ময়ী হলেন। সারা রাত্রির মধ্যে দুইবার মাত্র দেখা গেল, মৃণ্ময়ী প্রতিমা নাই, তৎস্থানে জ্যোতির্ময়ী কালীমূর্তি। ১৯৫৮খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে আমাদের মন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মর্মর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয় ও ঐ বৎসরের শেষভাগে প্রায় তিন মাস তথায় মোক্ষযজ্ঞ চলে।

১২ই নভেম্বর বুধবার আমাদের কালী প্রতিমাকে রিক্সাতে নিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হলো। পশ্চিম ফটকের উপরে যে কালীমূর্তি এত দিন ছিলেন, তিনিও সরে গেলেন। ভৈরবানন্দ প্রতিমা বিসর্জন দিতে গেলেন। যখন গঙ্গা কিনারে প্রতিমা নামান হলো, তখন ভৈরবানন্দ গঙ্গাধ্যান করতেই মধ্যগঙ্গাবক্ষে মকরবাহনে রক্তপদ্মে গঙ্গাদেবীর জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দেখা গেল। ঐ মূর্তি উপবিষ্টা ও চতুর্ভুজা, বাম উর্দ্ধ হস্তে চক্র ও নিম্ন হস্তে ঘট ও ঘট থেকে গঙ্গাবারি, ব্রহ্মবারি

পড়ছে, দুই দক্ষিণ হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা, সর্ব অঙ্গে নানা আভরণ, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, মাথায় মুকুট ও মাথার কেশদাম সুন্দর ও কুঞ্চিত ও চুলের রঙ কালোর উপর সোণালী আভাযুক্ত। ক্রমে ক্রমে গঙ্গা দেবী তীরের দিকে এগিয়ে এলেন। তখন বাহকরা কালী প্রতিমাকে এক বুক জলে কাঁধ থেকে নামালেন। এই দেখে কালীভক্ত ভৈরবানন্দের চোখে জল পড়িল, তিনি কাঁদলেন ও বললেন, "মা, তুই কি সত্যি চলে গেলি? আমি কী ন থাকবো" তখন বাহকগণ প্রতিমাকে গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করলেন। সেই প্রতিমা থেকে জ্যোতির্ময়ী কালীমূর্তি ভৈরবানন্দের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন ও হেসে ভক্তদেহেই লীন হলেন। আমাদের কালীপূজা সুসম্পন্ন হলো। এই সাফল্যের শুভ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল সাত আট দিন পূর্বে—পশ্চিম ফটকে পোষ্টার টাঙ্গানর পর মা কালীকে সেখানে দেখা গেল ও তথায় বিসর্জন দিবস পর্য্যন্ত কালী বিরাজ করলেন। আমরা বলতে পারি, এইরূপ কালী পূজা আধুনিক বঙ্গদেশে কোথাও হয় কি না সন্দেহ।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ধর্মচক্রে প্রতিমায় জগদ্ধাত্রীপূজা হয়। জগদ্ধাত্রী শ্রীমা সারদার ইষ্টদেবী বলে আমরা জগদ্ধাত্রী পূজা আরম্ভ করি। ১৯৫৮ খ্রীঃ ১৯শে নভেম্বর বুধবার তৃতীয় বার্ষিক জগদ্ধাত্রীপূজা হলো। ১২ই নভেম্বর বুধবার মহানিশায় মা জগদ্ধাত্রী সিংহবাহনে আমাদের মন্দিরে আবির্ভূতা হলেন। আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় ও ভৈরবানন্দ এক তলায় বড় খাটে শুয়ে ইহা অনুভব করলেন। প্রাতঃকালে মন্দিরে এই কয়দিন জগদ্ধাত্রীধ্যান ও মাতৃসঙ্গীত হয়েছিল। ১৩ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে আমরা যখন মন্দিরে জপধ্যানে বসেছি, তখন ভৈরবানন্দ দেখলেন, চারজন পুরুষ সন্ন্যাসী ও একজন নারীভক্ত মোট পাঁচজন সূক্ষ্মদেহী উত্তর বারান্দায় এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে চলে গেলেন। পুনরায় বেলা ৯-৯৷টায় তাঁরা আবার এসে তথায় জানালার কাছে

বসলেন এবং সারা দিন ও রাত্রি জপধ্যান করে পর দিন শুক্রবার সকাল পাঁচটায় চলে গেলেন এবং আমরা জপে বসার আগেই ফিরে এলেন। ঐদিন দুপুরে ভৈরবানন্দ এক তলার খাটে শুয়ে স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর মৃত ছোট ভাই তপেন্দ্রকুমার শ্রীমানীকে। ১৩৪১ সালে ভাদ্রমাসে বিশবর্ষাধিক পূর্বে টায়ফয়েড রোগে তপেন্দ্র মারা যায় ও ভৈরবানন্দ সতের দিন ঐ অসুখে তার সেবা করেন এবং তাঁর মুখাগ্নি ও শবদাহ করেন। তপেন্দ্রের প্রেতাত্মা এসে বললেন, মেজদা, তোমার কাছে এলুম। ভৈরবানন্দ তাকে বললেন, তুই বাড়িতে যা। প্রেতাত্মা অনুনয় করে বলল, "আমি বাড়ী যাবো না, প্রেতদেহে বড় কষ্ট, বড় কষ্ট, মেজদা বড় কষ্ট।" এই কথা শুনে ভৈরবানন্দের ঘুম ভেঙ্গে গেল। উক্ত দিন রাত্রে ভৈরবানন্দ পুনরায় একই স্বপ্ন দেখেন—তপেন্দ্র প্রেত দেহে বলছে, বড় কষ্ট, বড় কষ্ট মেজদা বড় কষ্ট। ভৈরবানন্দের ঘুম ভেঙ্গে গেল। শুক্রবার পূর্বাহ্ণে এগারটায় ভৈরবানন্দ আমাকে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বললেন। আমি বললাম, উক্ত প্রেত নিশ্চয়ই ধর্মচক্রের আশেপাশে এসেছে। বৈকালে আমি পায়খানায় গিয়ে পেঁপে গাছ তলায় হাতমাটী করতে করতে দেখলাম, উত্তর দিকে পাঁচিলের ওপার একটী রোগা লম্বা ছেলে দাঁড়িয়ে উঁকি মারছে; অথচ আমি রাস্তার দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখলাম না। সান্ধ্য জপের পর ভৈরবানন্দ বললেন, "আমি দুপুরে আহারান্তে বসে দেখলাম, উক্ত প্রেত পেঁপে গাছের কাছে পাঁচিলের বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখে ভৈরবানন্দ তার কাছে গিয়ে স্থূলদেহে বললেন, তিনবার বল—জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ। সে তাই বলল ও তিনবার বলার পর তার প্রেতদেহ পরিবর্তিত ও উর্ধ্বগত হলো। রাম-কৃষ্ণ মহানামের এত শক্তি ও মহিমা! শুক্রবার সান্ধ্য আরতির পর আমরা জপে বসে দেখলাম, দোতলায় মন্দিরের উত্তর বারান্দায় পূর্বোক্ত পঞ্চ সূক্ষ্মদেহীর পেছনে পারাপেটের গায়ে তপেন্দ্র জোড় হাত করে

দাঁড়িয়েছে ও তাঁর ঠোঁট নড়ছে। মনে হল, সে রামকৃষ্ণ নামজপ করছে। উক্ত সারা রাত্রি সে তথায় দাঁড়িয়ে জপে কাটাল এবং অন্য পাঁচজন সূক্ষ্মদেহী বারান্দায় উপবিষ্ট ছিলেন। শনিবার সকালেও দেখা গেল, তপেন্দ্র যুক্ত করে দণ্ডায়মান ও জপমগ্ন। ভৈরবানন্দ পাঁচজন সূক্ষ্মদেহীকে বললেন, "ওকে একটু সাহায্য করুন, যাতে ও উর্দ্ধগামী হয়। ও ছেলে মানুষ।" তারপর দেখা গেল, তপেন্দ্র এই পাঁচজনের পেছনে বসে আছে। শুক্রবার সকালে মন্দিরে আমরা রামকৃষ্ণ নামকীর্তনান্তে জপ করলাম। সেই সময় মন্দির মধ্যে দিব্য সৌগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, উহা পুষ্পগন্ধ নয়। তখন দেখা গেল, যে পনের জন সূক্ষ্মদেহী কালীপূজার রাত্রে উর্দ্ধগামী হয়েছিলেন, তাঁরা জ্যোতির্ময় মূর্তি ধরে হাততালি দিয়ে রামকৃষ্ণ নামকীর্তন করতে করতে দরজা দিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন এবং ঠাকুরের মর্মর মূর্তি ও আমাদিগকে প্রদক্ষিণ করলেন। যতক্ষণ রামকৃষ্ণ নামকীর্তন চলিল, ততক্ষণ তাঁরা প্রদক্ষিণ করলেন। অনন্তর পূর্ব দিকের দেওয়ালের কাছে তাঁরা সকলে বসলেন। তাঁদের দিব্যদেহে ও প্রত্যেকের মাথার পেছনে বিদ্যুদ্বর্ণ ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। বোঝা গেল, তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে ফিরেছেন। যখন আমরা জপধ্যানান্তে ইষ্টপ্রণাম করছি, তখন মন্দিরে বিরাজিত ঠাকুরের দ্বাদশ পার্ষদকে তাঁরা প্রণাম করতে গেলেন, কিন্তু পার্ষদবৃন্দ এই সদ্যমুক্ত ব্রহ্মবিদ্গণকে পায় হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিলেন না। পার্ষদবৃন্দ তাঁদের সকলকে আলিঙ্গন ও দাড়ি ধরে চুম্বন করলেন। এখন তাঁরা সর্বক্ষণ মন্দিরে রইলেন বেলুড় মঠের অবশিষ্ট সাধু সূক্ষ্মদেহীবৃন্দের মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই মাস।

১৪ই নভেম্বর শুক্রবার রাত্রি সাড়ে এগারটায় সময় ভৈরবানন্দ এক তলায় বড় খাটে শুয়ে জাগ্রত আছেন। তখন এক বিশ্রী দুর্গন্ধ তিনি পেলেন এবং জানালা খুলে দেখলেন, পাঁচিলের বাহিরে উত্তর রাস্তায় একটী প্রেত দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স চল্লিশ বা বিয়াল্লিশ বৎসর, ব্রাহ্মণ,

পেটকাটা, নাড়ীভুঁড়ি ঝুলছে, কাল মূর্তি। শনিবার সকালে আমরা ঠাকুরকে, শ্রীমাকে ও জগদ্ধাত্রীকে জপধ্যানকালে প্রার্থনা করায় ও গঙ্গা-জলের ছিটা দেওয়ায় ঐ প্রেত দোতলা পর্য্যন্ত উঠল। তখনও তার প্রেত দেহ থেকে একটু পচা গন্ধ আমরা পেলাম মন্দিরে বসেই। তিন চার মিনিট পরে ঐ প্রেত আবার নেমে গেল ও পূর্ব স্থানে দাঁড়াল। ১৬ই নভেম্বর রবিবার সকাল ৭।৮ টায় আরও নয়জন প্রেত এসে পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণের পাশে রাস্তায় দল বেঁধে দাঁড়ালেন। তাঁদের নাম যোগেশ ও দেবেশ শ্রীমানী দুই ভাই, হাবু চাটুজ্জে, ননীগোপালও গৌরগোপাল শ্রীমানী দুই ভাই এবং তাদের মাতা, যোগেশ শ্রীমানীর স্ত্রী, রাধাকান্ত ও অবিনাশী শ্রীমানী। এঁরা সকলেই মাকড়দহবাসী ও ভৈরবানন্দের পরিচিত ছিলেন। তন্মধ্যে হাবু চাটুজ্জে ভৈরবানন্দের পুরোহিত ছিলেন এবং গলায় ক্যানসার রোগে মারা যায়। মৃত্যুর পর প্রেত হয়ে সে ভৈরবানন্দের কাছে আসত। ভৈরবানন্দ ব্রহ্মচারী অবস্থায় তাঁকে স্বপ্নে দীক্ষা দেন। উক্ত ঘটনা দেখে ভৈরবানন্দ আমাকে বললেন এবং আমিও উত্তর রাস্তায় দশ প্রেতের অবস্থিতি অনুভব করলাম। আমরা উভয়ে স্ব স্ব ইষ্টদেবতাকে প্রার্থনা জানালাম, কৃপাপূর্বক ঐ দশ প্রেতকে ঊর্দ্ধগামী করুন। ঐ দিন রাত্রি ৭॥০ টায় দেখা গেল, শূন্য থেকে নামলেন একটী বিদেহী ব্রহ্মজ্ঞ তান্ত্রিক—রক্ত বস্ত্র পরিহিত, গাত্রবর্ণ রক্তাভ, গলায় উপবীত, মাথায় কাঁচা পাকা চুলের জটা, পিঠের দিকে ৭।৮ গাছি মোটা জটা লম্বমান, দুই পাশে ২।৩ গাছা করে জটা ঝুলছে, এক গাছা জটা মাথায় জড়ান, খালি গা, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, কনুয়ের উপরে রুদ্রাক্ষমালা। তিনি শূন্য থেকে নেমে পূর্বোক্ত পেটকাটা বামুনকে কালীর বীজমন্ত্র বললেন ও তার বুকে বীজমন্ত্র লিখে দিলেন। ইহার ফলে তৎক্ষণেই তার পেট ভাল হয়ে গেল ও সে স্বাভাবিক প্রেতমূর্তি ধারণ করলন। তিনি হাবুকে গায়ত্রী মন্ত্র, রাধাকান্তকে কালীমন্ত্র, ও বাকী সাতজন নরনারীকে বিষ্ণুমন্ত্র দিলেন। আমাদের

ধ্যানে ঐ সব সিদ্ধমন্ত্র দেখা গেল। সকল প্রেতের বুকের উপরেই তিনি ইষ্ট-মন্ত্র লিখেছিলেন। ইষ্টমন্ত্রের বর্ণগুলি অগ্নিবর্ণ, জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। মন্ত্র-দীক্ষা দিয়ে ঐ দিব্যদেহী সিদ্ধপুরুষ স্বস্থানে চলে গেলেন। আর দশ দীক্ষিত প্রেত রাস্তায় জপমগ্ন হয়ে বসে রহিল। সারারাত্রি তারা এইভাবে কাটাল। স্বামী ভৈরবানন্দ ১৯৬১ খ্রীঃ ১৯ আগষ্ট শনিবার ধর্মচক্রে বসে উক্ত সিদ্ধ সাধুকে যোগবলে আহ্বান করে আনেন। তিনি আবির্ভূত হয়ে বললেন, "আমার নাম শর্বানন্দ ঘোষাল ও বেলুড়বাসী তান্ত্রিক সাধক। গঙ্গাতীরস্থ বেলুড় শ্মশানে শতবর্ষ পূর্বে আমি সিদ্ধি লাভ করি। এখন আমি শিবলোকের অধিবাসী ব্রহ্মজ্ঞানী। বেলুড়ের রথতলায় শিবমন্দিরের পেছনে আমার বসতবাটী ছিল ও বেলুড় শ্মশানে তান্ত্রিক সাধন করতাম। আমার বংশধর এখন কেউ নাই।" সুতরাং শর্বানন্দ ঘোষাল রামপ্রসাদ বা কমলাকান্তের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী।

১৭ই নভেম্বর সোমবার সকালে আমরা—ভৈরবানন্দ, কালিকানন্দ ও বিশ্বরূপানন্দ প্রভৃতি মন্দিরে জপধ্যান কালে শিবধ্যান ও শিব সঙ্গীত "জয় বিশ্বেশ্বর বিশ্বপাবন ভব ভবভয়ভঞ্জন" গাইলাম। যখন আমরা সকলে মহানন্দে গাইছিল ঐ গানের অংশ ভূতগণ সনে নাচিছে, তখন দেখা গেল, মন্দিরে নটরাজ মহাদেব নৃত্য করছেন, উত্তর বারান্দায় ভৈরব ও ভৈরবী নাচছেন এবং ঐ দশ প্রেত রাস্তায় নাচছে। তাঁরা নাচতে নাচতে উত্তর বারান্দায় কার্নিশে এসে দাঁড়ালেন। সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্য্যন্ত তাঁরা বার ঘণ্টা জপমগ্ন রইলেন। ১৮ই নভেম্বর মঙ্গলবার সকালে পূর্বোক্ত আমরা পাঁচজন যখন শিব সঙ্গীত 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা' গাইতে-ছিলাম, তখন দেখা গেল, উক্ত দশ প্রেত ঐ গান গাইতে গাইতে কার্নিশ থেকে নেচে নেচে এসে উত্তর বারান্দায় পূর্বোক্ত ছয়জন ধ্যানমগ্ন সূক্ষ্মদেহীর পশ্চাতে বসলেন ও জপমগ্ন হলেন। তাঁদের দেহ পূর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর হয়েছে। এখন উত্তর বারান্দায় ষোলজন বিদেহী জপরত আছেন। ১৬ই

নভেম্বর রবিবার সকালে আমরা পাঁচজন সাধু মন্দিরে জপধ্যানকালে শ্রীগুরু সঙ্গীত 'সত্য শিব সুন্দর তুমি' প্রাণ ঢেলে গাইছিলাম। তখন দেখা গেল, পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী সাক্ষাৎ শিবরূপে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন ও আমাকে আশীর্ব্বাদ করলেন—প্রথমে মাথায় ও পরে বুকে পীঠে হাত বুলালেন, তারপর চিবুক ধরে স্নেহময় পিতৃতুল্য চুমু খেলেন। অনন্তর তিনি ভৈরবানন্দের কাছে গিয়ে তাঁকেও আমার মতই আদর ও আশীর্ব্বাদ করে তাঁর মাথায় ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে মধ্যম ও বৃদ্ধ অঙ্গুলি দিয়ে টোকা মারলেন। ইহার ফলে রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ নির্বিকল্প সমাধির আভাস পেলেন। রবিবার বৈকালে আমি ভৈরবানন্দকে মোহন ঘোষের সম্মুখে সমাধি ও সুষুপ্তির পার্থক্য বলছিলাম; কারণ মোহন ঘোষ আমাকে মনে মনে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুযোগ পান নি। সোমবার সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ গভীর সমাধিতে মগ্ন হয়ে দেখলেন, তাঁর শুদ্ধ মন জ্যোতিঃরাজ্য পার হয়ে নিরাকার ব্রহ্মসত্তায় ডুবিল। আমি পরে তাঁকে স্বামিজীর সমাধি সঙ্গীত,'নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাংক সুন্দর' শোনাতেই তিনি বললেন, "আমারও ঠিক ঐ অবস্থাই হয়। ঐ অবস্থায় ইষ্টনাম বা ইষ্টরূপ থাকে না ও নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।" রবিবার সন্ধ্যায় আমরা জগদ্ধাত্রীর ধ্যানান্তে গান গেয়ে জপ করছিলাম। তখন জগদ্ধাত্রী, ঠাকুর, সারদা, কালী ও হরগৌরী আমার সম্মুখে এলেন। সর্বাগ্রে ছিলেন জগদ্ধাত্রী হাতে একটি জবাফুল নিয়ে ও আমার মাথায় হাত দিলেন। ঠিক তখনই আমার মাথায় সুড় সুড় করল ও আমি মাথায় হাত দিলাম। ১৯শে নভেম্বর বুধবার ধর্মচক্রে তৃতীয় বার্ষিক জগদ্ধাত্রী পূজা মৃন্ময়ী প্রতিমায় হলো। জনৈক বয়স্ক কুমার ব্রাহ্মণ পূজক ছিলেন। ঐ দিন জগদ্ধাত্রী পূজোৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। প্রথম (সপ্তমী) পূজাকালে প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর ছয়জন সূক্ষ্মদেহী (চার জন সাধু, একটি সাধিকা

ও একটী ভক্ত) মন্দিরের উত্তর বারান্দায় ছিলেন। তাঁরা নীচে নেমে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার পেছনে দাঁড়ালেন। আর যে দশ প্রেত তাঁদের পশ্চাতে ছিলেন, তাঁরা বারান্দার উত্তর দিকস্থ জাফরির উত্তরে দাঁড়ালেন। যখন পূজক অন্নভোগ নিবেদন করলেন, তখন মা জগদ্ধাত্রী সেই অন্ন থালা হাতে তুলে নিয়ে প্রথমে রামকৃষ্ণদেব, পরে শ্রীমা সারদা ও তৎপরে হরগৌরীকে দিলেন ও সর্বশেষে স্বয়ং খেলেন। অনন্তর প্রতিমার পশ্চাতে বিদ্যমান ছয়জন সূক্ষ্মদেহী সাধক-সাধিকা সম্মুখে এসে হাত পাতিলেন। মা জগদ্ধাত্রী তাঁদের হাতে প্রসাদ দিলেন। তাঁরা প্রসাদ খেয়ে হাত চাটতে চাটতে দেবীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। জাফরির উত্তরে অবস্থিত দশ প্রেত প্রসাদ পেলেন না, পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন ভৈরবানন্দ আমাকে এই কথা বলায় আমি বললাম, "পূজক তান্ত্রিক, ব্রহ্মমন্ত্রের জাপক নন। তাই সূক্ষ্মদেহীরা দেবীর হাত থেকে প্রসাদ খেয়েও উর্দ্ধগামী হলেন না।" তৎপরে আমাদের দোতলার মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বিরাট অন্নভোগ—খিচুড়ী, তরকারী পায়সাদি দেওয়া হলো। তখন উক্ত দশ প্রেত উত্তর বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন ও ছয়জন সূক্ষ্মদেহী মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমিই অন্নভোগ নিবেদন করলাম ও ঠাকুরকে প্রার্থনা জানালাম, ঐ ষোল জনকে প্রসাদ দিতে ও উর্দ্ধগামী করতে। যে থালাতে অন্নভোগ নিবেদিত হলো, উহাতে সর্ববিধ অন্নব্যঞ্জনাদি অল্প পরিমাণে পরিবেশিত হয়েছিল। সেটী মা জগদ্ধাত্রী হাতে করে নিয়ে প্রথমে ঠাকুরকে, পরে শ্রীমা সারদাকে, তৎপরে মাঁ কালীকে ও পরে হরগৌরীকে দিলেন ও শেষে নিজে খেলেন। অনন্তর তিনি ভৈরব-ভৈরবীকে প্রসাদ দিলেন। তখন মন্দিরস্থ ছয়জন সূক্ষ্মদেহী প্রসাদের জন্য হাত পাতিলেন ও বারান্দায় বিদ্যমান দশ প্রেত জানালার ভেতর দিয়ে হাত বাড়ালেন। মা জগদ্ধাত্রী প্রথমোক্ত ছয় জনকে ও পরে দশপ্রেতকে প্রসাদ দিলেন। মা জগদ্ধাত্রী স্বয়ং প্রসাদ

খাবার পর পনের জন সিদ্ধ সাধু ও ঠাকুরের বার জন পার্ষদ ও বহু দেবদেবী এসে প্রসাদ খেতে বসলেন। অনন্তর মন্দিরস্থ ছয়জন সাধু বিদ্যুদ্বেগে দিব্য দেহে চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, স্বর্গলোক, শিবলোক প্রভৃতি পার হয়ে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মলোকে হাজির হলেন। তন্মধ্যে সাধিকাটী উত্তর বারান্দাস্থ দশ জনের মধ্যে তপেন্দ্রকুমারের হাত ধরে ভৈরবানন্দের অনুরোধে তুলে নিয়ে গেলেন। তপেন্দ্র সমুজ্জ্বল ব্রহ্মজ্যোতির তেজ সহ্য করতে না পেরে স্বর্গলোকে পড়ে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করে। ঋষি বিশ্বামিত্র রাজা নহুষকে স্বশরীরে স্বর্গে পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন স্বীয় শক্তিবলে, কিন্তু তিনি তাতে কৃতকার্য্য হন নি। ইহার কারণ, তৎসঙ্গে দৈব-শক্তি সংযুক্ত ছিল না। দেব শক্তি ও মানব সাধক শক্তি ও সূক্ষ্মদেহীর সাধন শক্তি তিনশক্তি একসঙ্গে মিলিত না হলে কোন সাধক (স্থূলদেহী বা সূক্ষ্মদেহী) কদাপি ঊর্দ্ধগামী হয় না, বা করা যায় না। অবশিষ্ট নয় প্রেত জগদ্ধাত্রীর প্রসাদ ভক্ষণপূর্বক স্বর্গলোক পর্যন্ত উঠলেন উজ্জ্বল অগ্নিবর্ণ দেহে। বৈদিক সন্ন্যাস ও প্রেষমন্ত্র গ্রহণ এবং সাধন না করা পর্য্যন্ত কোন স্থূলদেহী বা সূক্ষ্মদেহী সাধক বা কোন দেবশক্তি তাঁকে ব্রহ্মলোকে স্থিতি করতে পারে না তাঁদের শক্তি প্রয়োগ করেও। শুধু তাহাই নহে, কোন সূক্ষ্ম দেহী ব্রহ্মমন্ত্রের সাধক বা প্রেত সাধক বা কোন সূক্ষ্মদেহী যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব সাধকও কোন স্থূলদেহী ব্রহ্মযোগীর সিদ্ধ শক্তির সাহায্য ব্যতীত ঊর্দ্ধলোকে যেতে পারে না। ২০শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে জগদ্ধাত্রীপূজার বিজয়াকৃত্য অনুষ্ঠানকালে যখন আমিও ভৈরবানন্দ প্রতিমার সম্মুখে একতলার পশ্চিম বারান্দায় জপমগ্ন ছিলাম তখন দেখা গেল, ঠাকুর, সারদা, ও হরগৌরী প্রতিমার দুই দিকে দণ্ডায়মান। সেই সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবানন্দকে দেখালেন তাঁর পায়ের দিকে আঙ্গুল নির্দেশে, তাঁর পায় চন্দন লেগে লেগে শুকিয়ে ফেটে গেছে! তিনি স্বীয় মুখ বিকৃত করে ইংগিতে জানালেন, তাঁর পায় কষ্ট হচ্ছে।

ভৈরবানন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই কাণ্ড কে করেছে? তখন ঠাকুরের পশ্চাতে নীহারিকা মজুমদারের মূর্তি ফুটে উঠল। পরে আসন থেকে ভৈরবানন্দ দীক্ষিতা নীহারিকাকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, পূজাকালে তিনি ঠাকুরের পায় পটে যে চন্দন লাগান, তাহা পরে মুছেন না। তাঁকে বলা হলো, রোজ ঠাকুরের পায় চন্দন দিয়ে সন্ধ্যায় মুছে ফেলতে। অনন্তর ভৈরবানন্দ ঠাকুরকে প্রার্থনা করলেন, এই ধর্মচক্র ব্রহ্মলোকে পরিণত হউক। এই বলে তিনি ব্রহ্মজ্যোতিঃধ্যানে মগ্ন হলেন। তখন দেখা গেল, ঠাকুরের ডান দিকে দশ বার জন সুপুরুষ ভদ্রভক্তের শান্তমূর্তি। ঠাকুর তাঁদের দিকে ভৈরবানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বুড়ো আঙ্গুল নেড়ে জানালেন, "যদি ধর্মচক্র ব্রহ্মলোকে পরিণত হয়, তাহলে বর্তমান ভক্তদল থাকবে না, দুই চার জন ব্রহ্মসাধকই আসবে।" বিজয়াকৃত্য কালে যখন পুরোহিত শেষমন্ত্র উচ্চারণ করলেন, তখন দেখা গেল, মা জগদ্ধাত্রী আমার সম্মুখে এলেন এবং তাঁর চিন্ময় বিগ্রহ থেকে জ্যোতিঃরশ্মি নির্গত হয়ে আমার শরীরে প্রবেশ করল ও জগদ্ধাত্রী মূর্তি ভৈরবানন্দের হৃদয়ে এসে বসলেন। তখন ভৈরবানন্দ শিবধ্যানে সমাহিত হলেন। পূজক ব্রাহ্মণ সংহারমুদ্রায় দেবীকে আকর্ষণপূর্বক হৃদয়ে টানার পূর্বেই ৺মা জগদ্ধাত্রী সরে পড়লেন। তৎপরে দেবীঘট নাড়া ও তীরকাঠির সূতো কাটা প্রভৃতি নিরঞ্জনকর্ম অনুষ্ঠিত হলো।

১৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আমাদের মন্দিরস্থ ঠাকুরের মর্মরমূর্তির দাড়ি ধরে জিজ্ঞাসা করছি—প্রভু, তুমি কি সত্যই এখানে আছ? তখন ঠাকুর খুব চটে গিয়ে আমার গালে এক চড় মেরে বললেন, "শালা! আমাকে রোজ দেখছ, তা সত্ত্বেও আবার সন্দেহ করছ?" তখন দুই দীর্ঘকায় কৃষ্ণমূর্তি রাক্ষস (কপালে সিঁদুর টীপ) সূক্ষ্মদেহে এসে আমার খাটের কাছে দাঁড়ালেন। আমি ঠাকুরকে বললাম, এঁদের সরিয়ে দিন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে যেতে বলা

সত্ত্বেও তাঁরা গেলেন না। পরদিন প্রাতে ভৈরবানন্দকে বলতেই তিনি ধ্যানে দেখলেন, সত্যই মন্দিরের উত্তর বারান্দায় জানালার কাছে ঐ দুই রাক্ষস দণ্ডায়মান। তাঁহাদের গাত্রবর্ণ খুব কাল, বলিষ্ঠ চেহারা, প্রায় বার ফুট দীর্ঘ, পরণে কাল কাপড়, উভয়ে পুরুষ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কাল দাড়ি, বড় বড় চোখ ও নাক মুখের অনুপাতে, আমার তিন মাথার সমান বড় তাঁদের মাথা। ২১শে নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় মন্দিরে আমি আরতিকালে তাঁহাদিগকে আরতি করায় তাঁরা দুই জন হাত তুলে হাসলেন ও আনন্দ প্রকাশ করলেন। যখন আরতির পরে আমরা জপে বসলাম, তাঁরাও জপে বসলেন এবং আমাদের সঙ্গে ভজন গাইলেন। যখন তাঁরা বসলেন, তাঁদের দাড়ি জানালার মধ্যম কাঠে ঠেকিল ও মাথা আরও উপরে রইল। ভৈরবানন্দ যোগশক্তি প্রয়োগ করায় তাঁদের মন তৃতীয় ভূমি বা মণিপুর ছাড়িয়ে উঠল। তাঁরা এখনও জপমগ্ন। মনে হয়, এই দুই রাক্ষস দীক্ষাপ্রাপ্ত রামভক্ত।

২৬ শে নভেম্বর রবিবার প্রাতে আমি মাকড়দহে গিয়াছিলাম। সেদিন ভোর রাত্রে (সোমবার প্রাতে) মাকড়দহের ললিত মোহন কালুলী মারা গেল। ২৪ শে নভেম্বর শুক্রবার সকালে ভৈরবানন্দ দেখলেন, ললিত কালুলি স্বগৃহের বাহিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তার পেছনে একটি যমদূত ফিরছে। তখন ভৈরবানন্দ বুঝলেন, ললিতের মৃত্যু আসন্ন। মৃত্যুর পর তিন দিন ললিত স্বগৃহের উঠানে প্রেতমূর্তিতে দাঁড়ায়েছিল। ২২শে নভেম্বর শুক্রবার রাত্রে ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রে শয়নকালে স্বপ্নে দেখলেন, মাকড়দহ বাজারে কালীপদ আঢ্যের চায়ের দোকানে (মেছো হাটের সন্নিকট) তিনি চা খাচ্ছেন এবং ললিতের প্রেতাত্মা সেই দোকানের সম্মুখে কালী আঢ্যকে বলছে, কি গো কেমন আছ? তখন কালী আঢ্য ভৈরবানন্দকে বললেন, দাদা এ ত মরে গেছে, এ ত প্রেত! কালী আঢ্য ভয়ে দোকান ফেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। আর যে দুই চার জন

লোক আশ পাশে ছিল, তারাও 'ভূত' 'ভূত' বলে ভয়ে সরে গেল।
তখন ভৈরবানন্দ প্রেতের হাত ধরে দৃঢ়তা সহকারে বললেন, বল—

ওঁ হরেকৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রথমে প্রেত এই নাম বলতে চায় না ও ভৈরবানন্দের হাত ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করল। তখন ভৈরবানন্দ দৃঢ়ভাবে তাঁকে ঝাকানি দিতেই সে ঐ নাম বলল। ভৈরবানন্দ তাঁকে ছুঁয়ে দ্বাদশ বার সেইমন্ত্র বলালেন। আরও তিনি ঐ প্রেতকে বললেন, রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় এই মহানাম ১০৮ বার জপ করবি। তখন সে ঈষৎ অগ্নিবর্ণ মূর্তি ধরে উর্দ্ধগামী হলো। ইহার চিহ্নস্বরূপ মেছো হাটস্থ অশ্বত্থগাছের ডাল ভেঙ্গে গেল ও তৎসঙ্গে একটা কলা-কান্দিও পড়ল। বোধ হয়, ঐ প্রেতের কর্মক্ষয় বা পাপক্ষয় হলো। অনন্তর সেই প্রেত সাধকের মূর্তি ধরে ২৫ নভেম্বর শনিবার প্রাতে ধর্মচক্রের মন্দিরে উত্তর বারান্দায় আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল, ভয়ে বারান্দায় ঢুকতে পারছিল না। তথায় রাক্ষস সাধক প্রেতদ্বয় বসে থাকায়, সে আসছিল ও ভয়ে পালাচ্ছিল।

২২ নভেম্বর শুক্রবার রাত্রে আমি ধর্মচক্রে শুয়ে স্বপ্নে দেখলাম, ভুবনেশ্বর সারদাধামের ব্রহ্মচারী নগেন্দ্রনাথকে, তাঁর সূক্ষ্ম শরীর স্পষ্ট ভাবে দেখলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন আছ? আমি বললাম, "অনেক দিন পরে আপনাকে দেখলাম। আগে প্রণাম করি।" প্রণামান্তে আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিতেই তিনি অন্তর্হিত হলেন, আমারও ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধর্মচক্রে আসার পর তাঁকে আরও দুই এক বার স্বপ্নে দেখেছিলাম। প্রথম বার তাঁকে স্বপ্নে দেখার পর ধর্মচক্রে তাঁর একটি ফটো রেখেছিলাম। তাঁর সঙ্গে পুরা এক বর্ষ কাটিয়েছি এবং ভুবনেশ্বর সারদাধামে থেকেছি ও তাঁর কথা মৎপ্রণীত 'শ্রীগুরুপ্রসঙ্গে' 'তাপস প্রসাদ, শীর্ষক অধ্যায়ে লিখেছি। তাঁর বিস্তৃত জীবনী 'অনেক দূর লিখে প্রথম অধ্যায় 'শুভজন্ম' 'প্রবর্তক'

মাসিকে প্রকাশ করেছি। তার পরে আরও দুই তিনবার তিনি ধর্মচক্রে এসেছিলেন। এখন তিনি মহর্লোকে তপস্তামগ্ন।

২৩ শে নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দেওয়া হলো। যখন রিক্সাতে প্রতিমা নিয়ে গঙ্গাতীরে নামান হলো, তখন ভৈরবানন্দ তথায় গঙ্গাধ্যান করতেই গঙ্গাদেবী মধ্যগঙ্গায় মকরবাহনে আবির্ভূতা হলেন—বাম ঊর্দ্ধ হস্তে চক্র, নিম্ন বাম হস্তে ঘট, ঘট থেকে ব্রহ্মবারি পড়ছে, দক্ষিণ ঊর্দ্ধ হস্তে অভয় মুদ্রা ও দক্ষিণ নিম্ন হস্তে বর মুদ্রা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, নানা অলংকারে সুভূষিতা, মস্তকে সুবর্ণ কিরীট, কেশদাম রক্তাভ কৃষ্ণবর্ণ। তিনি ক্রমশঃ তীরাভিমুখে এক বুক জল পর্য্যন্ত এগিয়ে এলেন। তখন প্রতিমা নিরঞ্জন করতে বলা হলো। চিণ্ময়ী দেবী গঙ্গা জলের উপর নিম্ন দুই হস্ত বাম ও ডান পেতে বসলেন এবং তাঁর কোলেই প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হলো। তখন মৃন্ময়ী প্রতিমা হতে জ্যোতির্ময়ী জগদ্ধাত্রী ভৈরবানন্দের হৃদয় মন্দিরে এসে বসলেন। এইরূপে নিরঞ্জন সুসম্পন্ন হলো। যখন ধর্মচক্রের বাহিরে প্রতিমা গিরিশ ঘোষ রোডে নেওয়া হলো, সেই সময় দেখা গেল, পশ্চিম ও উত্তর দুই গেট থেকে জগদ্ধাত্রী মূর্তি অন্তর্হিত হলেন। ১৩ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে এই দুই দিব্যমূর্তি পূর্বোক্ত ফটকদ্বয়ের উপরে বিরাজমান ছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় বিসর্জনান্তে মন্দিরে আরতি হলো। আমি, ভৈরবানন্দ, বিশ্বরূপানন্দ, কালিকানন্দ প্রমুখ পাঁচ সাধু আরতিতে ছিলাম। যখন আমি ধূপারতি করছিলাম, তখন উত্তর বারান্দায় রাক্ষস ভক্তদ্বয়ের পশ্চাতে জটা-বল্কল পরিহিত ধনুর্বাণধারী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দেখা গেল। ইহাতে বোঝা গেল, ঐ রাক্ষস ভক্তদ্বয়ের ইষ্টদেব রামচন্দ্র। তাই আমরা রামকৃষ্ণ নামের পরিবর্তে রামনাম সংকীর্তন ও রাম সঙ্গীত করলাম। তখন ঠাকুর ও শ্রীমা যথাক্রমে রাজবেশে রামসীতার মূর্তিতে পরিণত হলেন ও আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করলেন। রামজীর

সঙ্গে মহামায়া কালীরূপে ছিলেন। মনে হয়, রামচন্দ্রের ইষ্টদেবী মহামায়া। রাক্ষসযুগলও হেলে দুলে মহানন্দে আমাদের সঙ্গে রাম ভজন করলেন। তখন তাঁদের পাশে মাড়োয়ারী ভক্ত বিজ্জুকে দেখা গেল ও তার হৃদয়ে রামমূর্তি ফুটে উঠল। গত ২০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিজ্জু আমাদের কোন দীক্ষিত বাঙ্গালী ভক্তের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন।

২৪ নভেম্বর রবিবার মন্দিরে আমরা তিন সাধু—আমি, ভৈরবানন্দ ও বিশ্বরূপানন্দ প্রাতঃকৃত্য অনুষ্ঠানকালে রামনাম সংকীর্তন ও রামসঙ্গীত করলাম। জপকালে দেখা গেল, পূর্বোক্ত রাক্ষস সাধকদ্বয়ের হৃদয়পদ্মে ইষ্টদেব রামসীতার যুগল মূর্তি প্রত্যক্ষ উদয় হলো এবং তাঁরাও গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। ধ্যানান্তে ভৈরবানন্দ তাঁহাদিগকে মানস মিনতি জানালেন, "তোমরা এখানে ইষ্টসিদ্ধিলাভ করলে। যেমন আমরা এই ধর্মচক্রকে দেবভূমিতে পরিণত ও সমুন্নত করতে সচেষ্ট হয়েছি, তোমরাও তদ্রূপ এই স্থানে তপস্যা করে ব্রহ্মজ্ঞ হও।" ২৩শে রবিবার বৈকালে ভৈরবানন্দ মাকড়দহে গেলেন এবং ৩০শে রবিবার সকালে ধর্মচক্রে ফিরলেন। ২৭শে বৃহস্পতিবার সান্ধ্য আরতির সময় আমি মন্দিরে দিব্য গন্ধ পেলাম ও বিশ্বরূপানন্দকে বললাম, নিশ্চয়ই কোন দেবতা মন্দিরে এসেছেন। পরে বোঝা গেল, সাক্ষাৎ ধর্মরাজ যমদেব মন্দিরে আগমন করেছেন ও ঠাকুরের মর্মর প্রতিমার পাশে অবস্থান করছেন। ৩০শে নভেম্বর রবিবার সকালে এসে ভৈরবানন্দ নৈশ ভোজনান্তে আমাকে বললেন, ২৪ নভেম্বর সোমবার সকালে সাড়ে পাঁচটার সময় স্বগৃহে স্বকক্ষে ধ্যানকালে যমরাজকে দেখলাম। যখন গভীর সমাধিতে আমি ডুবে গেলাম, বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হলো, তখন দেখলাম, আকাশের নিম্নে অন্তরিক্ষে প্রেতলোকে বহু যমদূতমধ্যে যমরাজ। তাঁর দুই দিকে দল বেঁধে যমদূতরা দাঁড়িয়েছে। যমদূতগণ কেউ ঘনকাল, কেউ ঘননীল, কেউ বা পাংশুটেবর্ণ। যারা নীলবর্ণ তাদের মুখ লম্বাটে, কান দুটি খাড়া, দুই পাশ থেকে দুটো লম্বা দাঁত (৮।১০ আঙুল) বেরিয়ে

আছে গণেশের মত, চোখ বড় বড়, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কারো মাথায় চুল জটা বেঁধেছে, পরনে মহিষ চর্ম। যমরাজ মহিষবাহন হলেও এখন কোন বাহন ছিল না। যে যমদূতগণ পাংশুটে বর্ণ, তাদের মুখ চোখ মানুষের মত, খুব লম্বা ৭।৮ ফুট। যমদূতরা সকলে মহিষচর্ম পরিহিত। যে যমদূতরা কালবর্ণ ও যাদের মাথায় জটা ঝুলছে বা পাকান আছে, তারা এত কৃশ ও কুৎসিৎ, যেন কংকাল। যমরাজ নীলবর্ণ সুপুরুষ, পটলচেরা চোখ, নিটোল নাক মুখ, বাবরি চুল ঘাড় পর্য্যন্ত পড়েছে পাকিয়ে পাকিয়ে, মাথায় কিরীট, দুই কর্ণে কুণ্ডল, হাতে যমদণ্ড (মুখের দিকে গোল, বাঁটের দিকে সরু ও লম্বা এবং বিদ্যুৎবর্ণ), গলায় মুক্তাহার ও কণ্ঠহার, হাতের কব্জি ও কনুইতে আভরণ, পায়ে জুতো। যমদূতেরা অঙ্গুলি নির্দেশে আমাকে দেখাচ্ছে রাজবেশী যমকে। তখন যমরাজ পায়ের জুতো খুলে আমার দিকে এগিয়ে এলেন এবং যমদূতরা হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে নমস্কার করলেন। যমরাজ ক্রমশঃ আমার নিকটে এসে প্রথমে মাথার উপরে হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। তার পর হাঁটু গেড়ে বসে পায়ের ধুলো নিয়ে পিছু হেঁটে দুই দূতদলের মধ্যে গেলেন। এই অদ্ভুত দর্শন সোমবার দুপুরে ও সন্ধ্যায় সাধন কালে আবার আমি লাভ করেছি। মঙ্গলবার সকালে ও দুপুরে আবার এইরূপ দর্শন হলো। দুপুরে যখন আমি স্নানার্থে পুকুর ঘাটে বসেছিলাম, তখন ঐ দর্শন হয়।" ইহাতে ভৈরবানন্দ যমরাজকে যোড়হাতে নমস্কার করে বললেন, "আমি আপনার সন্তানতুল্য। আপনি অনুচরবর্গ সহ নমস্কার করেছেন ও যখন তখন দেখা দিচ্ছেন কেন? আপনি কি চান বলুন।" তখন যমরাজের সম্মুখে এক কাল প্রেত এসে হাজির হলো। যমরাজ উক্ত প্রেতের মূলাধার চক্রে হাত দিয়ে বরাবর ঐ হাত আজ্ঞাচক্রের উপরে নিয়ে গেলেন। যখন সেই প্রেত অগ্নিবর্ণ মূর্তিধারণ করল, তখন এক অনুচর যমরাজের হাতে কিছু ফল মূল ও মিষ্টান্ন দিলেন। যমরাজ সেই মিষ্টান্নাদি কিছু খেয়ে

একটু প্রসাদ স্বহস্তে অগ্নিবর্ণ প্রেতকে দিলেন। সেই প্রেত উক্ত প্রসাদ খেয়েই বিদ্যুদ্বর্ণ হয়ে ঊর্দ্ধগামী হলেন। ভৈরবানন্দকে যমরাজ ঊর্দ্ধে হাত তুলে ঐ দিব্যদৃশ্য দেখালেন। ইহার মমার্থ বুঝে ভৈরবানন্দ তাঁকে নমস্কার করে বললেন, "এর উত্তর আমি এখন দিতে পারবো না। আমি এই শনিবার বা রবিবার ধর্মচক্রে যাবো ও বাবাকে সব বলবো। তিনি যা বলবেন, তাই হবে। ৩০ শে নভেম্বর রবিবার সকালে ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রে এলেন এবং ঐ দিন দুপুরে ও সন্ধ্যায় দুইবার যমরাজের দর্শন পেলেন। রবিবার সান্ধ্য আরতির পরে আমি সমবেত ভক্তবৃন্দের কাছে রাসলীলা ব্যাখ্যা করলাম ঝাঁটরা থেকে একটী বৈষ্ণব ভগবান দাস ঐ পাঠ শুনতে এসেছিলেন। আধ ঘণ্টা পাঠ হলো ও পাঠ খুব জমে গেল এবং রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ও গোপিকাদের রাসলীলা মন্দিরে দেখা গেল। গোপীরা যুগল মূর্তিকে ও ফুল ও ফলের মালা ছুড়ে চারি দিকে ঘুরে ঘুরে গান করে রাসোৎসব করলেন। তৎকালীন মন্দিরস্থ পঞ্চদেবতা হর্ষোৎফুল্ল নয়নে এই দিব্য রাসলীলা দেখলেন।

পয়লা ডিসেম্বর সোমবার সকালে আমরা মন্দিরে জপধ্যানে বসলাম। পূর্বরাত্রে মহানিশায় জপকালে ভৈরবানন্দ একতলায় কক্ষস্থিত খাটে শুয়ে অনুভব করলেন, যমরাজ আমাদের মন্দিরে মর্মর মূর্তির ডান দিকে দণ্ডায়মান। সোমবার প্রাতঃকালে জপসময়েও যমরাজকে তথায় দেখা গেল। ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দ ও সিদ্ধ সাধুদের সঙ্গে তিনিও ভজন গাইলেন। অনন্তর আমরা জপারম্ভ করলাম। তখন যমরাজ যুক্ত করে আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কারণ আমরা ব্রহ্মমন্ত্র জপ করছিলাম। আমদের জপ যখন মধ্যপথে চলেছে, তখন মন্দিরস্থ অধিষ্ঠাত্রী পঞ্চদেবতা—হরগৌরী, ঠাকুর ও শ্রীমা এবং কালী সহ যমরাজ আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। অনন্তর উক্ত পঞ্চদেবতা আমার মাথায়, পিঠে, বুকে হাত বুলিয়ে দাড়ি ধরে চুমু খেলেন ও আশীর্বাদ করলেন। তারপর যমরাজ আমার মাথায়, পিঠে,

বুকে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তৎক্ষণাৎ আমার চারি পাশ থেকে দিব্য অগ্নি জ্বলে উঠল ও আমি আগুনের মধ্যে বসে জপ করতে লাগলাম। অনন্তর যমরাজ পূর্বোক্ত পঞ্চ দেবতা সহ ভৈরবানন্দের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন ও উক্তরূপে আশীর্বাদ করলেন। তারপর যমরাজ পূর্ববৎ তাঁকে আশীর্বাদ করতেই তাঁরও চার দিক থেকে দিব্য অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং তিনি তন্মধ্যে বসে ধ্যান করতে লাগলেন ও স্বশরীরে তাপ অনুভব করলেন। তারপর বিশ্বরূপানন্দ ও ব্রহ্মবোধানন্দের সম্মুখে গিয়ে যমরাজ দূরে থেকে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। তৎপরে যমরাজ মন্দিরের উত্তর বারান্দায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন রামভক্ত রাক্ষসদ্বয়ের মন আজ্ঞাচক্র থেকে একেবারে ব্রহ্মমার্গে তুলে দিলেন। ইহার ফলে তাঁরা সম্পূর্ণ সমাধি প্রাপ্ত হলেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় তাঁরা ওখান থেকে সরে গিয়ে ধর্মচক্রের দক্ষিণে উন্মুক্ত স্থানে মন্দির থেকে ৩০।৪০ হাত দূরে মন্দিরাভিমুখে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। সান্ধ্য আরতির পর মন্দিরে ভোগ নিবেদিত হলে, তাঁরা পূর্বদিকস্থ জানালার বাহিরে থেকে হাত বাড়িয়ে ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে পূর্ব স্থানে চলে গেলেন। দোসরা ডিসেম্বর মঙ্গলবার দেখা গেল, তাঁরা উক্ত ফাঁকা স্থানে পূর্ববৎ দুই জন পাশাপাশি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট। পূর্বদিন সোমবার ভোরে দেখা গেল, চারজন বিদেহী সাধু মন্দিরের উত্তর বারান্দার কাছে এসেই চলে গেলেন ঠাকুরকে হাত জোড় করে বাহির থেকে নমস্কার করে। বোধ হয়, রামভক্ত রাক্ষসদ্বয় থাকায় তাঁরা বারান্দায় এলেন না। সন্ধ্যায় আমি ও ভৈরবানন্দ নাটমন্দিরে পায়চারি করতে করতে সুধুপের সুগন্ধ পেলাম। তখন মন্দিরে বা নীচে কোথাও ধূপ জ্বালা হয়নি। অনন্তর আমরা মন্দিরে সান্ধ্য আরতি করতে এসে দেখলাম, রামভক্ত রাক্ষসদ্বয় বারান্দা থেকে সরে গেছেন ও দশজন বিদেহী সাধু জপমগ্ন অবস্থায় বসে আছেন। সোমবার ভোরে রাত্রি চারটার সময় দেখা গেল, আরও পনেরজন বিদেহী

সাধু এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। উত্তর বারান্দায় মোট পঁচিশজন বিদেহী সন্ন্যাসী জপমগ্ন রইলেন, প্রত্যেকে স্ব স্ব আসন বগলে করে এসেছেন—কারো কুশাসন, কারো মৃগচর্ম, কারো উলের আসন। তন্মধ্যে একজন দামী সুন্দর উলের আসনে উপবিষ্ট—রাজপুত্রবৎ সুপুরুষ, গৌরবর্ণ ও হৃষ্টপুষ্ট। তিনি বাগবাজার রাজবাটীর বংশধর ও শ্রীমা সারদার মন্ত্রশিষ্য।

২রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে আমরা চারজন মন্দিরে জপে বসেছিলাম। যখন আমরা ভজন গাইলাম, তখন মন্দিরস্থ বার জন পার্ষদ ও পনের জন সিদ্ধ সাধু এবং বাহিরের পঁচিশ জন বিদেহী সাধু কীর্তন ভজন গাইলেন। যখন আমরা জপারম্ভ করলাম, পূর্বোক্ত পঁচিশ জনও জপ করতে লাগলেন। মনে হল, ঐ পঁচিশ জনের ইষ্টদেবী মা সারদা। তাঁদের মন তৃতীয় ভূমি মণিপুর ছেড়ে উপরে উঠেনি, মাথায় টুপি, গায় উত্তরীয় ও পরণে গেরুয়া কাপড়। আমাদের জপশেষে দেখা গেল, মন্দিরস্থ পঞ্চ দেবতার আসন হতে ঠাকুর, শ্রীমা সারদা, স্বামিজী ও মহাপুরুষজী উত্তর জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তখন শ্রীমা স্বামিজীকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখালেন, ঐ সব ছ্যাখ! তাহা দেখে স্বামিজীর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। শ্রীমার চোখেও দুই এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। ঠাকুরও মহাপুরুষজী গম্ভীরাননে তাঁদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্বামিজীর সেবাধর্মের আদর্শ ভুল বুঝে পরলোকে এঁদের এই দুর্দশা হয়েছে! তারপর জানালার নিকট হতে পূর্বোক্ত চারিজন আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। স্বামিজী আমার মাথায় পিঠে মুখে ও দাড়িতে হাত বুলাতেই আমার মূর্তি শিব মূর্তিতে পরিণত হলো। তখন স্বামিজী আমার শিব মূর্তিকে অঙ্গুলি নির্দেশে ইসারায় বারান্দাস্থ পঁচিশজনকে দেখিয়ে বললেন, এঁদের দুরবস্থা বিমোচন কর। তারপর ঠাকুর, শ্রীমা, মা কালী, স্বামিজী ও মহাপুরুষজী সকলে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। অনন্তর তাঁরা ভৈরবানন্দের

কাছে গিয়ে তাঁর গায় পিঠে মাথায় বুকে দাড়িতে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে ঐ পঁচিশ জনকে আঙ্গুল নেড়ে দেখালেন ও তাঁদের উর্দ্ধগতির জন্য প্রার্থনা করতে বললেন। আজ হরগৌরী এলেন না, কারণ শিবাবতার বিবেকানন্দ এলেন। অন্য কোন দিন স্বামিজী আমাদের কাছে আসেন নি বা আমাদিগকে পঞ্চদেবতাবৎ আশীর্বাদ করেন নি। সাধারণতঃ মহাপুরুষজী বৃহস্পতিবার উঠে এসে পঞ্চদেবতার সঙ্গে আমাদিগকে, আশীর্বাদ করেন। আজও ধর্মরাজ আমাদের মন্দিরে বিরাজমান। বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণের দুই তিন মাস পূর্বে ভৈরবানন্দ আমাকে নারায়ণরূপে দেখেছিলেন ১৩৬৪ সালে ফাল্গুন মাসে। সন্ন্যাস নেবার চার পাঁচ মাস পর ভৈরবানন্দের কৌপিনত্যাগ হলো। আমিও বললাম, আর আপনাকে কৌপিন পরতে হবে না। ২রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার সান্ধ্য আরত্রি ও ভজনান্তে রামনাম সংকীর্তন ও রাম সঙ্গীত গাইলাম, পার্শ্ববর্তী বাগানের হিন্দুস্থানী দ্বারবান্ উপস্থিত ছিল বলে। রাম সঙ্গীতের সময় যখন ভৈরবানন্দ শ্রীমার ইচ্ছায় শক্তি প্রয়োগ করতে গেলেন, তখন যমরাজ রুদ্রমূর্তিতে তাঁর দণ্ড উঁচু করে ভৈরবানন্দকে আঘাত করতে উদ্যত হলেন, তাঁর যমদণ্ড অগ্নি উদ্‌গীরণ করছিল। ঐ অগ্নি প্রাকৃত অগ্নি অপেক্ষা শত গুণে সমুজ্জ্বল ও সমুত্তপ্ত, তাঁর আলোকে চোখ ঝল্‌সে যায়। সেই অগ্নি ভৈরবানন্দের দিকে ধাবমান হলো। তখন ভৈরবানন্দ গুরু ও ইষ্ট স্মরণ করতেই সিদ্ধযোগীর তৃতীয় নয়ন থেকে বিদ্যুৎশিখাতুল্য অগ্নিশিখা বহির্গত হয়ে যমরাজের উপর পড়িল। তখন মন্দিরস্থ পঞ্চদেবতা হো হো করে হাসছিলেন। যমরাজ বেঁকে কুঁকড়ে আধ হাত পরিমিত পিণ্ডাকার হয়ে গেলেন। অনন্তর তিনি যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন ভৈরবানন্দের রুদ্রজ্যোতিঃতে যমরাজের মূর্তি বিদ্যুদ্বর্ণ হয়েছিল, যমরাজের নীলবর্ণ অন্তর্হিত, মাথায় মুকুট নাই, চুলগুলি উস্কখুস্ক, সুন্দর কেশরাশি নাই। তিনি করুণ নয়নে ভৈরবানন্দের দিকে

চেয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। তখনও ভৈরবানন্দের রোষ-বহ্নি তৎপ্রতি প্রজ্জলিত ছিল। সেই সময় যমরাজের বক্ষঃস্থল হতে এক জ্যোতিঃস্রোত ভৈরবানন্দের হৃদয়ে প্রবেশ করল দুই চার মিনিট ধরে। ইহাতে ভৈরবানন্দ স্বদেহে তীব্র তেজ অনুভব করলেন ও যমশক্তি ক্ষীণ হলো। অনন্তর যমরাজ ভৈরবানন্দের কাছে এসে নমস্কার করে পদধূলি নিলেন। ইহার ফলে ভৈরবানন্দের ক্রোধানল নির্বাপিত ও যমরাজ স্বকীয় নীলমূর্তিতে পরিণত হলেন, কিন্তু তাঁর মাথায় মুকুট ছিল না, মুকুট শূন্যে ঘুরছিল। আমাদের জপশেষে যমরাজ ঐ পঁচিশ বিদেশী সাধুর রুদ্রগ্রন্থি বা মণিপুর ভেদ করে দিলেন। তখন তাঁদের কুণ্ডলিনী শক্তি চতুর্থ ভূমি অনাহতের তলায় এসে ঠেকিল। আমাদের মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী পঞ্চ দেবতা প্রথমে আমার মাথায় পিঠে বুকে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। অনন্তর ভৈরবানন্দের সম্মুখে গিয়ে উক্তরূপে আশীর্বাদ করার সময় ভৈরবানন্দ মা কালী ও মা সারদার পা এক এক হাতে ধরে তাঁদের পায় মাথা রেখে বললেন, "মাগো, তোমাদের কাজ করতে এসে লড়াই করতে পারবো না। এই যমরাজকে সরিয়ে দিন।" ইহাতে পঞ্চদেবতা হাসতে লাগলেন ও ভৈরবানন্দের ক্রোড়ে বসলেন এবং ভৈরবানন্দ আশ্বস্ত হলেন। নৈশ ভোজনান্তে আমরা উভয়ে আলোচনা করে স্থির করলাম, যমকে মন্দির থেকে সরাতে হবে। যমের ইষ্ট রুদ্র ও রুদ্রবীজ রং। তেসরা ডিসেম্বর বুধবার সকালে মন্দিরে জপধ্যানকালে দেখা গেল—যমরাজ মন্দিরে নাই, তিনি পূর্বাকাশে অন্তরিক্ষে বসে ক্ষুব্ধ ভাবে জোড় হাত করে আমাদের দিকে চেয়ে আছেন, তাঁর মাথায় মুকুট নাই। জপধ্যান কালে ভৈরবানন্দ পঁচিশজন বিদেশী সাধুর উপর সিদ্ধশক্তি প্রয়োগ করে তাঁদের মন বিশুদ্ধ চক্রে তুলে দিলেন ও তাঁরা সিদ্ধি লাভ করলেন। তখন তাঁদের সকলের হৃদয়ে মা সারদাকে দেখা গেল। আমাদের জপশেষে যমরাজ মন্দির মধ্যে পূর্ব স্থানে এলেন।

তখন আমি ব্রহ্মমন্ত্র জপ করে গঙ্গাজলের ছিটা তাঁর গায় দিলাম। মানুষের গায় গরম জল পড়লে যেমন ছটফট করে, তেমনি যম ছটফট করে পালালেন ও তাঁর সর্বাঙ্গে ফোস্কা পড়ল। তখন তিনি মন্দির ছেড়ে অন্তরিক্ষে পূর্ব স্থানে গিয়ে বসলেন। তথায় দেখা গেল, তাঁর সর্বাঙ্গে ফোস্কা হয়েছে, তাঁর মুকুট শূন্য মার্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুপুরে দেখা গেল, যমরাজ অন্তরিক্ষে গৈরিক গরদ ও গলায় চাদর ও উপবীত পরে শুধু গায় রুক্ষ চুলে ধ্যানে উপবিষ্ট, আমাদের মন্দিরের দিকে মুখ করে। ৪ঠা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে দেখা গেল, যমরাজ উত্তর মুখো বসে ধ্যান করছেন। আমাদের দিকে চেয়ে তার ধ্যান করার উদ্দেশ্য ছিল যোগবলে আমাদের অনিষ্ট সাধন। যখন আমাদের প্রতি তাঁর ক্রুদ্ধ ভাব চলে গেল, তখন তিনি উত্তর মুখে বসলেন।

৩রা ডিসেম্বর বুধবার সান্ধ্য আরতির পর ভৈরবানন্দ পঁচিশ জন বিদেহীর উপর যোগশক্তি প্রয়োগ করলেন। ইহার ফলে তাঁদের চারি দিকে আগুন জ্বলে উঠল, সারা উত্তর বারান্দায় দিব্য অগ্নি জ্বলতে লাগল। যখন ভৈরবানন্দ ব্রহ্মধ্যানান্তে সমস্ত ব্রহ্মজ্যোতিঃতে বিলীন করলেন, তখন সেই জ্যোতিঃ সহায়ে তাঁদের মনগুলি স্বীয় মন একীভূত করে সিদ্ধ শক্তি প্রয়োগের ফলে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হলো এবং তাঁরা আরও গভীর ধ্যানে ডুবে গেলেন। সম্ভবতঃ ঐ সাধুগণ নিম্ন মার্গের সাধক ছিলেন, তাঁদের পুঞ্জীভূত পাপরাশি ব্রহ্মাগ্নিতে পুড়ে গেল। তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে দীক্ষা ও সন্ন্যাসাদি নিয়েছিলেন বলে যমের কবলে পড়েন নি, প্রেত হন নি।

বুধবার বৈকালে দেখা গেল, উল্লিখিত রামভক্ত রাক্ষসদ্বয়, যাঁরা দক্ষিণ দিকস্থ জমিতে ছিলেন, তথায় নাই। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগদৃষ্টিবলে অনুসন্ধান করে জানলেন, তাঁরা কলিকাতায় বড়বাজারে সোণাপটীর পূর্বে চিৎপুর ষ্ট্রীটের কাছে এক বড় ছয়তলা বাড়ীর ছাদে দণ্ডায়মান।

বুধবার সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ নাটমন্দিরে বেড়াতে বেড়াতে আমাকে বললেন, "আমার গায়ে শুধু চামড়াটা আছে, ভেতরে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্যোতিঃ পরিপূর্ণ, আপাদ মস্তকে ব্রহ্মমন্ত্র বা প্রেষমন্ত্র লিখিত নামাবলীর মত। এখন আমার মন্ত্রজপ একেবারে বন্ধ হয়েছে, জপ বন্ধ হলে সারা দেহে, সর্বাঙ্গে ইষ্টমন্ত্র বা ব্রহ্মমন্ত্র লিখিত হয়। তোতাপুরী প্রদত্ত তান্ত্রিক ব্রহ্মমন্ত্র—ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম—জপ বন্ধ হলে দেখা গেল, উহা আমার হৃদয়ে লিখিত হয়েছে।" ২রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ মন্দিরে ধ্যানকালে দেখলেন—আমি ডান হাতে ব্রহ্ম'বাধানন্দ ও বাম হাতে বিশ্বরূপানন্দকে ধরে ব্রহ্মজ্যোতিঃর দিকে চলেছি। কখনও ওরা দুইজন আমার কোমর জড়িয়ে ধরছে; আবার কখনও বা আমি তাদের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলছি। তখন ভৈরবানন্দ আর হ্রদ পার হয়ে বিরজা নদীতীরে বসে ধ্যান করছিলেন। যখন এই দর্শন হল, তখন ভৈরবানন্দের ইষ্টলয় হয়েছে ব্রহ্মজ্যোতিঃতে, শুধু ব্রহ্মধ্যান চলছিল।

কেউ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অনিষ্ট করতে পারে না। তবে প্রেত বা অপদেবতা ঐরূপ করতে সাহসী হলেও সমর্থ হয় না। ৮ই ডিসেম্বর সোমবার রাত্রে ধর্মচক্রে শুয়ে ভৈরবানন্দ স্বপ্ন দেখছেন, তিনি মাকড়দহে নিজস্ব পুরাণ বাটীতে গেছেন। ঐ বাড়ীর সদর রকে বসে একটী মেয়ে (প্রায় তিন বৎসর বয়স ও টুকটুকে সুন্দর) কাঁদছে। তাকে দেখে ভৈরবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি হয়েছে, তুমি কাঁদছ কেন?" তখন তিনি স্বীয় সদর পুকুর ঘাটে দেখলেন, দুটী মেয়ে স্নান করছে—একজন ৫০।৬০ বৎসর ও অন্য জন ২৪।২৫ বৎসর বয়স্ক। তিনি পরবর্তী নারীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ বাচ্চা মেয়েটি কি তোমাদের? তাঁরা কোন কথা বললেন না। তখন ভৈরবানন্দ ঐ ছোট মেয়েকে কোলে নিলেন ও দেখলেন, তার ডান পাশে কোমর থেকে গলা পর্য্যন্ত

পচা ঘা হয়েছে। তখন সেই মেয়ে ভৈরবানন্দের গলা টিপে শ্বাসরোধ করতে চেষ্টিত হলো। ইহাতে সিদ্ধযোগী বুঝলেন, এটা মানুষ নয়, নিশ্চয়ই প্রেত। যখন তিনি সেই বালিকা প্রেতের কবল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন, তখন আর একটা বালিকা প্রেত এসে তাঁর পা দুটো ধরে টানতে লাগল। সত্বর ভৈরবানন্দ সর্বশক্তি প্রয়োগপূর্বক প্রেত দুটাকে লাথি মেরে ফেলে তাদের ঠ্যাং ধরে দুই চার আছাড় দিলেন বাঁধান সানের উপর। যেমন ধোপারা কাপড় কাচে, তেমনি তিনি তাহাদিগকে ক্রোধভরে আছাড় মেরে পুকুরে ফেলে দিলেন। তারপর তিনি পুকুরে স্নান করতে গেলেন। যখন তিনি পুকুরে এক বুক জলে নামলেন, তখন জলের তলা থেকে দুটো জলভূত তাঁর দুটো পা ধরে তাঁকে বেশী জলে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করল। সেই সময় তিনি সমগ্র স্বশক্তি প্রয়োগে তাদের কবল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা জোর করে বেশী জলে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল। যখন ভৈরবানন্দ আত্মরক্ষায় অক্ষম হলেন, তখন তিনবার ইষ্টমন্ত্র—ওঁ মা কালী—জপ করতেই তারা ছেড়ে দিয়ে পালাল। যে দুটো মেয়ে পুকুরে চান করছিল, তারাই ভৈরবানন্দকে টানছিল ও তারা ঐ পুকুরের জলে ডুবে মরা প্রেত। তন্মধ্যে বয়স্ক প্রেতটী বহু বর্ষ পূর্বে ঐ পুকুরে ডুবে মরেছিল—এই কথা ভৈরবানন্দ স্মরণ করলেন। উক্ত রাত্রে ভৈরবানন্দ সূক্ষ্মদেহে স্বগৃহে গিয়ে এই কাণ্ড করলেন। সোমবার রাত্রে বেলুড় ধর্মচক্রের দক্ষিণ মাঠে ঐ দুই নারী প্রেতকে দেখে আমি ভৈরবানন্দকে বললাম ও তাঁর মুখে পূর্বোক্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনলাম।

৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার বৈকালে ভৈরবানন্দ মাকড়দহে গেলেন ও পরদিন শনিবার বৈকালে ফিরে এলেন। শুক্রবার দুপুরে মন্দিরে ঠাকুরকে অন্নভোগ ও বৈকালে লুচি-হালুয়া নিবেদন করা হলো। অন্নভোগ নিবেদিত হলে ভৈরবানন্দ নীচতলায় বসে ধ্যানে দেখলেন, মন্দিরে ঠাকুর, শ্রীমা, হরগৌরী ও মা কালী নাই! তাঁরা ভৈরবানন্দের

স্বগৃহে স্বকক্ষে বিরাজমান। মন্দিরের বাহিরে সকাল থেকেই ধর্মরাজ ছিলেন। ঠাকুর সরে যেতেই যমকিংকরগণ মন্দিরে ঢুকল। তারাই দুপুরে অন্নভোগ ও বৈকালে লুচি-হালুয়া খেল। সন্ধ্যায় ও রাত্রে আমরা তাদের উপদ্রব অনুভব করলাম। বৃহস্পতিবার রাত্রে কালী ও হরগৌরী ভৈরবানন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যমকে তার শক্তি ফেরৎ দাও। শুক্রবার সকালে যমকে শক্তি ফিরিয়ে দিতেই যম তাঁর মুকুট ফিরে পেলেন, পূর্বপদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলেন ও মন্দিরের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। ৬ই ডিসেম্বর শনিবার ঠাকুর, শ্রীমা ও অন্য তিন দেবতা মন্দিরে ফিরে এলেন। কোন মন্দিরে কোন দেবতা প্রতিষ্ঠিত হলেও সব সময় সেখানে থাকেন না। সাধন ভজন ও পূজারতি ভক্তিভরে করলে দেবতা মন্দিরে বিরাজ করেন, নচেৎ নয়। পূজাদি নিয়মিত ও ভক্তিপূত হলে দেবতা আসেন, অন্য সময় স্বধামে থাকেন।

৮ই ডিসেম্বর সোমবার মন্দিরের উত্তর বারান্দায় পঁচিশজন সূক্ষ্মদেহী সন্ন্যাসী জপধ্যানে মগ্ন আছেন। ১০ই বুধবার তাঁরা সকলে অগ্নিবর্ণ দিব্য মূর্তি ধারণ করলেন এবং তাঁদের মন আজ্ঞাচক্রের উপরে উঠিল। আজ আমি নিজে উত্তর বারান্দা জল দিয়ে মুছে গঙ্গাজল ও অগুরু ও চন্দন জল ছিটালাম, ফুল ছড়ালাম ও ধূপ দিলাম। গত সপ্তাহেও তথায় আমি ঐরূপ করেছিলাম। ঐ পঁচিশ বিদেহীর মধ্যে একজন সাহেব ও দুইজন মাদ্রাজী সাধু ছিলেন। নিত্য ধ্যানে বসার কিছুক্ষণ পরে দোতলায় মন্দির ও একতলার ঘর—সমগ্র ভবন ব্রহ্মজ্যোতিঃতে উদ্‌ভাসিত হলো, শুধু জ্যোতিঃই অনুভূত হল, ভবনের অস্তিত্ব উপলব্ধ হল না; মনে হল, জ্যোতিঃরাজ্যে বসে আছি। কোন কোন দিন শুধু দোতলা জ্যোতিঃতে ভেসে যায়। পঁচিশজন বিদেহী সন্ন্যাসীকে ভৈরবানন্দ শক্তিদানান্তে যমকে বলেছিলেন, ঠাকুর, তোমার কাজে আর বাধা দিব না। তাই উল্লিখিত ব্রহ্মজ্যোতিঃতে যখন পঁচিশ

বিদেহী আবৃত হলেন, তখন ভৈরবানন্দ সেটী গুটিয়ে নিলেন। সেই জ্যোতিঃরাজ্যে আমি, ভৈরবানন্দ ও পঞ্চ দেবতা থাকি, পশ্চাতে উপবিষ্ট বিশ্বরূপানন্দ ও ব্রহ্মবোধানন্দ বাদ যায়। বহু দিন দেখা গেছে, শেষোক্ত সাধুদ্বয় ঐ শক্তি সহ্য করতে পারছে না, তাদের শরীরে অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তাই ভৈরবানন্দ ঐ দুইজনকে বাদ দিলেন। দুই দিন ধ্যানকালে পঁচিশ বিদেহী সাধক থেকে ব্রহ্মজ্যোতিঃ অপসারণের পর মঙ্গলবার সকালে শ্রীমা সারদা একা পঞ্চ দেবতার মধ্য থেকে এসে ভৈরবানন্দের দাড়ি ধরে ঐ জ্যোতিঃ দেখিয়ে পঁচিশ বিদেহীকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ইসারায় বললেন, ওদের ওপর থেকে জ্যোতিঃ সরিয়ে নিও না। তখন ভৈরবানন্দ যমরাজকে প্রদত্ত পূর্বোক্ত প্রতিশ্রুতির কথা বলায় শ্রীমা অদূরে অন্তরিক্ষে আঙুল তুলে দেখালেন, ধর্মরাজ দাঁড়িয়ে আছেন। ধর্মরাজ ইসারায় ভৈরবানন্দকে বললেন, আপনি ঐ কাজ করতে পারেন। তখন ভৈরবানন্দ শ্রীমাকে জানালেন, তাহলে করবো। ঠিক সেই সময় আমরা মন্দিরে সারদা সঙ্গীত গাইতেছিলাম। ধ্যানশেষে পঞ্চ দেবতা যখন আমাদিগকে আশীর্বাদ করতে এলেন, তখন মা সারদা পুনরায় ভৈরবানন্দকে ইংগিত করলেন। ইহাতে ভৈরবানন্দ সমাহিত অবস্থায় হাসতে লাগলেন এবং ধ্যানান্তে নীচে গিয়েও পনের মিনিট যাবৎ মহানন্দে হাসলেন।

যদি ব্রহ্মমার্গের সাধক বাহ্য পূজা না করেন, ইষ্ট দেবতা ভাবরাজ্যে তাঁকে দিয়ে পূজারতি করিয়ে নেন এবং ইষ্টও তাঁকে পূজারতি করেন। ভৈরবানন্দ বলেন, "যখন আমি শিবমূর্তি ধরে সাধন করলাম, তখন গৌরী আমাকে পূজা করলেন, যেমন লোকে শিবপূজা করে। যখন আমি রামকৃষ্ণস্বরূপে সমারূঢ় হয়ে সাধন করেছি, তখন মা সারদা আমাকে পূজা করেছেন এবং আমিও তাঁকে পূজা করেছি। বিশ্বরূপ দর্শনের পর আমার পূজা, জপ ও স্তবপাঠাদি সব চলে গেছে। এখন

শুধু ওঙ্কার আছে। তাও জপে বসে ৪।৫ বার ওঙ্কার জপ করলেই জপ বন্ধ হয়, মানস জপ কিছুক্ষণ চলে।" ৯ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার কলিকাতায় সোণাপটীতে পূর্বোক্ত প্রাসাদে মন দিয়ে ভৈরবানন্দ ধ্যান কালে দেখলেন, একটী জ্যোতির্বর্ত্ম খুলে গেল। তাঁর আজ্ঞাচক্র বা তৃতীয় নয়ন থেকে এক জ্যোতিঃস্রোত বেরিয়ে সেই বাড়ীতে গিয়ে পড়ল ও তাহা দিবাবৎ আলোকিত হলো। তিনি দেখলেন, "রক্ষপুত্রত্রয় চার তলার ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। ঐ প্রাসাদের দক্ষিণ পশ্চিমে মাঝখানের দিকে একটী কক্ষে ছোট রৌপ্যময় সিংহাসনে (এক হাত লম্বা-চওড়া) স্বর্ণমূর্তি সীতাদেবী ও নীলমূর্তি রামচন্দ্র ও শ্বেত পাথরের মহাবীর মূর্তি বিরাজমান। তথায় এই তিন দেবতা জাগ্রত। ভৈরবানন্দ সূক্ষ্ম দেহে হনুমানকে ভক্তিভরে নমস্কার করতে তাঁরা আশীর্বাদ করলেন। ভৈরবানন্দ সীতারাম ও হনুমানকে প্রার্থনা করলেন, আমাদের ধর্মচক্রের একটু স্থান বাড়িয়ে দিন। এই কথা বলতে হনুমান ভৈরবানন্দের সূক্ষ্ম শরীরকে প্রেমানন্দে জড়িয়ে ধরলেন। সেই সময় একটী রমণী কিছু দ্রব্য হাতে করে ঐ কক্ষে ঢুকিল। তাই ভৈরবানন্দ উক্ত কক্ষ থেকে চলে এলেন।

৯ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকালে মন্দিরে জপধ্যান কালে ভৈরবানন্দ আমার সূক্ষ্মদেহ কাঁধে করে ব্রহ্মমার্গে নিয়ে আর হ্রদ পার হয়ে বিরজা নদীর মাঝে যেতেই আমি কাঁধ থেকে পড়ে গেলাম! যখন আমি দুপুরে কুয়াতলায় হিপবাথ নিতেছিলাম, তখন ভৈরবানন্দ আমাকে এই কথা বললেন। পূর্বদিন ও আজ, ১০ই ডিসেম্বর বুধবার আমি ভাত খাই নাই; অথচ জপ ধ্যান খুব করছি এবং বই লেখাও দ্রুত বেগে চলছে। তাই আমার শরীর অত্যন্ত দুর্বল। বুধবার সকালে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় ভৈরবানন্দ আমার সূক্ষ্ম শরীরকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান নির্বিঘ্নে বিরজা নদী পার হয়ে। তথায় আমি ও ভৈরবানন্দ উভয়ে

ব্রহ্মে লীন হলাম। ঐদিন সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ আমার সূক্ষ্মদেহকে কাঁধে নিয়ে আর হ্রদ পার হতেই আমি নেতিয়ে পড়লাম। সেখান থেকে বিজয়া নদী পার হয়ে আমরা ব্রহ্মবেদিকা সমীপে উপস্থিত হলাম। আমি অতিশয় অবসন্ন ছিলাম ও ভৈরবানন্দ শুধু 'তু' (মি) বলেই ব্রহ্মে লীন হলেন। এই যৌগিক প্রক্রিয়া মন্দিরে উভয়ের দেহস্থ চক্রমধ্যে সম্পন্ন হলো। আবার কিঞ্চিৎ পরে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় ভৈরবানন্দ আমার সূক্ষ্মদেহকে নিয়ে চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে, স্বর্গলোকে, শিবলোকে ও ব্রহ্মলোকে গেলেন। আর হ্রদ পার হতেই আমি নেতিয়ে পড়লাম। আর হ্রদ পার হবার সময় আমার ইষ্টদ্বয় রামকৃষ্ণ ও মা কালী আমার বাম উর্দ্ধে এবং ভৈরবানন্দের পঞ্চ ইষ্ট—কালী, হরগৌরী ও রামকৃষ্ণ-সারদা তাঁর বাম দিকে ছিলেন। বিজয়া নদীর দিকে যাবার সময় স্ব স্ব ইষ্ট স্বদেহে লীন হলেন। আর হ্রদ পার হতেই ব্রহ্মের নির্দেশে অপ্সরাগণ আমাদিগকে পূজা করলেন, ব্রহ্মতুল্য মর্য্যাদা দিলেন, ইষ্টের প্রসাদ খাইয়ে দিলেন। ১১ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকালে ধ্যানকালেও ভৈরবানন্দ আমার সূক্ষ্মদেহকে নিয়ে ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মলীন করলেন। ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ বুধবার সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে পায়চারী করতে করতে ননীমার কথা উঠল। যখন আমি সদ্য সমাগত একটী ভক্তের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন ভৈরবানন্দ একটু আড়ালে গিয়ে সূক্ষ্মশরীরে বাঘা যতীন পল্লীতে ননীমার আশ্রমে গিয়ে দেখলেন, ননীমার কুণ্ডলিনী হৃদয়পদ্মে স্থিতিলাভ করেছে ও উহার উর্দ্ধগতি আজ্ঞাচক্রের তলা পর্য্যন্ত, তদুপরি নহে। ব্রহ্মমার্গ আজ্ঞাচক্রের উপরে অবস্থিত। সুতরাং ননীমার সাধনা ব্রহ্মমার্গে নহে। সন্ধ্যায় ধ্যানযোগে ভৈরবানন্দ দেখলেন, ননীমার একই অবস্থা ও তিনি ব্রহ্মমার্গের সাধিকা নহেন, চরম ইষ্টসিদ্ধির সাধিকা ও তাঁর ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রী। স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, ননীমা পূর্বজন্মে শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুরবাসিনী ভিক্ষামাতা ধনি কামারনি ছিলেন।

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ বৃহস্পতিবার ভৈরবানন্দ বলেছিলেন, "যখন মন্দিরে সান্ধ্য আরতি হয়, তখন মন্দিরস্থ দ্বাদশ পার্ষদও পনেরজন ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তৎপরে তাঁরা আমাদের কীর্তনে ও ভজনে যোগ দেন এবং আমাদের সঙ্গে বসে জপধ্যানও করেন। মনে হয়, বেলুড় মঠস্থ বিদেহী সন্ন্যাসীরা সকলে মুক্তিলাভ করলেই পূর্বোক্ত পনের ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী স্বধামে যাবেন। ১১ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ বৃহস্পতি-বার দশ বার জন বিদেহী সন্ন্যাসী এসে দূর থেকে শূন্যে দাঁড়িয়ে মন্দিরস্থ ঠাকুর প্রভৃতিকে নমস্কার করে চলে গেলেন। তাঁরা আবার বৈকালে এসেছিলেন। তখন আমি একতলার বারান্দার উত্তর দিকে উত্তর পাঁচিলের কাছে একটা Flash of light (আলোকস্ফুরণ) আমি দেখে ভৈরবানন্দকে বললাম। আজ মধ্যরাত্রে ভৈরবানন্দের সূক্ষ্মদেহের সঙ্গে আমার কথা হলো। ভৈরবানন্দ একতলায় ও আমি দোতালায় মন্দির বারান্দায় শুয়েছিলাম। ভৈরবানন্দ রাত্রি ১২॥ । ১টার সময় সূক্ষ্মদেহে আমার খাটের কাছে এসে বললেন, বাবা অদ্বৈত তত্ত্বই সত্য, আর সব মিথ্যা। পরদিন প্রাতে তাঁকে ঐ কথা বলায় তিনি তাহা সহাস্যে স্বীকার করলেন। ১২ই ডিসেম্বর শুক্রবার মধ্যাহ্ন দেড়টায় একবার ছত্রিশ জন বিদেহী সাধু সকলে উত্তর বারান্দার কার্নিশে এলেন। আবার বৈকাল সাড়ে তিনটায় তাঁরা এলেন। তখন ভৈরবানন্দ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "উত্তর বারান্দায় পঁচিশ জন আছেন, আমাদের মন্দিরে আর স্থান নাই। এঁরা চলে গেলে আপনারা আসবেন।" এই কথা বলায় তাঁরা চলে গেলেন। আবার তাঁরা সন্ধ্যায় এলেন ও পূর্বোক্ত কার্নিশে দুই সারিতে দাঁড়ালেন ও আমাদের সান্ধ্য আরতি দেখলেন। সান্ধ্য আরতির পরও তাঁরা ছিলেন। নীচে নৈশ আহার কালে আমি একটা দুর্গন্ধ পেলাম। ভৈরবানন্দ ও বিশ্বরূপানন্দ আমার কাছে খেতে বসেছিলেন। আমি ভৈরবানন্দকে উক্ত

দুর্গন্ধের কথা বলায় তিনি রুটি খেতে খেতে যোগদৃষ্টিতে দেখে বললেন, একটা নেড়ে প্রেত (লুংগীপরা ও দাড়িযুক্ত মুসলমান) আমাদের দক্ষিণ পাঁচিলের বাহিরে পুরাণ গুদামের কাছে দাঁড়ায়েছে। তার বাম পাশ পচা ক্ষতে ঢাকা। কয়েক দিন পূর্বে উক্ত প্রেত এসে ঐরূপ দুর্গন্ধ ছেড়েছিল। ব্রহ্মধ্যানকালে শুদ্ধমন ব্রহ্মলোকে গমন করে। ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মধ্যানীর মন ভূরাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সপ্ত ঊর্দ্ধলোকে সর্বত্র যথেচ্ছ বিচরণ করে, সপ্ত ঊর্দ্ধ ও সপ্ত নিম্ন লোকের কোন বিষয় তাঁর কাছে অবিদিত থাকে না। বামন পুরাণে আছে, বামন-জন্মের পূর্বে ব্রহ্মবিৎ প্রহ্লাদ প্রজ্ঞানেত্রে চৌদ্দ লোক অনুসন্ধান করে দেখলেন, কশ্যপপত্নী অদিতির গর্ভে ভগবান বিষ্ণু পূর্ণশক্তি নিয়ে বামন মূর্তিতে অবতীর্ণ।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ শনিবার সকালে ভুবনেশ্বরের ব্রহ্মচারী নগেন্দ্র নাথের ফটো হাতে নিয়ে ভৈরবানন্দ বললেন, "এর মন আজ্ঞাচক্রের তলা পর্য্যন্ত উঠেছে, আজ্ঞাচক্র ফোঁড়েনি। স্বর্গলোকের উপরে মহঃলোকে তিনি তপস্যারত। তাঁর ইষ্ট এখন রামকৃষ্ণ হলেও আসল ইষ্ট কালী।" শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবার 'অমৃতবাণী' বই দুইখানি আমার কাছে সমালোচনার্থ এসেছিল এবং আমি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' মাসিকদ্বয়ে যথাক্রমে বাংলায় ও ইংরাজীতে উহা রিভিউ করেছিলাম। ঐ 'অমৃতবাণী' একখানি আমি ভৈরবানন্দের হাতে দিলাম। উহাতে সিদ্ধবাবার একটি ভাল ছবি ছিল। উক্ত ছবি দেখে ভৈরবানন্দ বললেন, ইনি পাকা আম, ব্রহ্মজ্ঞানী ও এঁর ইষ্ট শিব। ওঙ্কারপ্রকাশ প্রণীত 'অমিয়বাণী'তে ব্রহ্মচারী বিশ্বরঞ্জনদেবের প্রতিকৃতি দেখে ভৈরবানন্দ বললেন, "এর চরম ইষ্টসিদ্ধি হয়েছে, এর মন চতুর্থ চক্র হৃদয় ছেড়ে বিশুদ্ধচক্রের তলায় ঠেকে আছে ও এর ইষ্ট গৌরী। মন বিশুদ্ধ চক্রে উঠিলে বৈদিক সন্ন্যাসে অধিকার জন্মে। তৎপূর্বে বৈদিক সন্ন্যাস নিলে অধঃপতন অনিবার্য।"

২০ ডিসেম্বর শনিবার বৈকালে আমি, ভৈরবানন্দ ও বলারম

বড়বাজারে সোনাপটীতে আলকার ষ্ট্রীটে Jhawarr Palace (ঝাওয়ার প্যালেস) দেখতে গেলাম। উহা সাততলা অট্টালিকা। ভৈরবানন্দ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যোগদৃষ্টিতে দেখলেন, উল্লিখিত রামভক্ত রাক্ষসদ্বয় সপ্তম তলার ছাদে বিদ্যমান। মনে হল, ঐ বিশাল প্রাসাদে কোন মুমূর্ষু রোগী আছেন।

তান্ত্রিক সাধনার চরমসিদ্ধি সহস্রারে শিবশক্তির মিলন। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তেও রাধাকৃষ্ণ বা সীতা-রামের যুগল মিলন সর্বশেষ অনুভূতিরূপে স্বীকৃত। শিবশক্তির মিলনে শিবে শক্তির লয় হয়। শক্তি শিবে লীন হলে সাকার সগুণ শিবের নিরাকার নির্গুণ স্বরূপ প্রকটিত হয়। বৈষ্ণব দর্শনে রাধা-কৃষ্ণের মিলন অচিন্ত্য ভেদও অভেদ রূপে বর্ণিত। তন্ত্রমতে শিবশক্তির মিলন স্বসংবেদ্য। ইহাই তন্ত্রের শেষ কথা। তৎপরে বেদান্ত সাধন আরম্ভ হয়। তন্ত্র ব্রহ্মধামের ইংগিত দিয়েই সরে পড়ে ও বেদান্ত ব্রহ্মধামে স্থিতিলাভের সুনির্দেশ দেয়। অদ্বৈতানুভূতি বাক্যমনাতীত স্বসংবেদ্য অবস্থা। তমোপ্রধান রজোগুণের প্রাবল্যে জীবন-নদীতে কর্মস্রোত বহিতে থাকে। আর সত্ত্বপ্রধান রজোগুণ প্রাদুর্ভূত হলে জীবন-গঙ্গায় তপঃস্রোত প্রবাহিত হয়। যত দিন রজোগুণ প্রবল থাকে, ততদিন কর্ম কমে না, তপস্যা হয় না। নিরুক্তকার যাস্কঋষি বলেন, লোকাঃ রজাংসি উচ্যন্তে। ইহার অর্থ, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সপ্তসর্গ রজোজাত। রজোগুণের দৌড় ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত চলে। রজো ক্ষীণ ও সত্ত্ব সংবৃদ্ধ হলে প্রকৃত তপস্যা আরম্ভ হয়। ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ইহলোকে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর-ত্রয় পৃথক্ করিতে পারেন, তিনি ত্রিবিধ শরীরে এককালে কার্য করেন। ইহলোক থেকে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সপ্তলোকে তাঁর সূক্ষ্মদেহ বা কারণ শরীর যেতে পারে। ব্রহ্মলোকের আর হ্রদের গোড়া হতে বিজয়া নদী ও তদূর্দ্ধ সাধকগণ তাহা করতে পারেন। যে সাধক সূক্ষ্মদেহের সঙ্গে

ইষ্টকে নিতে না পারে, সে উচ্চতর সাধকের পাল্লায় পড়লে মারা যাবে। সাধারণতঃ প্রেতাত্মার সূক্ষ্মদেহ সাড়ে তিন হাত হয়, আর সিদ্ধসাধকের সূক্ষ্মদেহ ছোট বা বড় হতে পারে। যোগ শাস্ত্রে আছে, সমাধিতে মনোনাশ হয়। ইহার অর্থ, অশুদ্ধ মনের নাশ হয়, কিন্তু শুদ্ধমন থাকে। তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ আত্মা অভিন্ন। পয়লা জানুয়ারী ১৯৫৯ বৃহস্পতিবার শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু উৎসব দিবসে শ্রীমা সারদার ১০৬তম জন্মতিথি পড়েছিল। আমরা এক মাস পূর্ব থেকে মন্দিরে প্রত্যহ সারদা স্তোত্র ও সারদা সঙ্গীত করেছি। এবার বৃহস্পতিবার শ্রীমার জন্মদিনেই জন্মতিথি পড়েছে। ঐদিন মন্দিরে আমি শ্রীমার পূজা ষোড়শ উপচারে করলাম। শিব, কালী, রামকৃষ্ণ, নবগ্রহাদির পূজান্তে শ্রীমার পূজারম্ভ হতেই উত্তর বারান্দায় এক মাসের অধিক কাল ধ্যানমগ্ন পঁচিশ জন বিদেহী সন্ন্যাসী মন্দিরমধ্যে প্রবেশপূর্বক ঠাকুরাদি দেবতা, পূজক প্রভৃতিকে তিনবার প্রদক্ষিণান্তে ঠাকুরকে প্রণামান্তে উত্তর পূর্ব কোণে পনেরজন বিদেহী ব্রহ্মজ্ঞের কাছে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। তখন যে ৩৬জন বিদেহী সন্ন্যাসী কার্ণিশে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁরা উত্তর বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। পূজান্তে নৈবেদ্য নিবেদিত হলে মা সারদা প্রথমে তাঁর ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রী, পরে ঠাকুরকে, মা কালীকে, হরগৌরীকে ও নারায়ণকে দিয়ে নিজে খেলেন এবং পঁচিশ বিদেহীকে স্বহস্তে প্রসাদ দিতে লাগলেন। তখন ঠাকুর আসন থেকে উঠে শ্রীমাকে ইসারা করলেন, ঐ ছত্রিশ জনকে প্রসাদ দাও। আর তিনি নিজে পায়সের বাটী নিয়ে খেতে লাগলেন। ঐ ছত্রিশ বিদেহীর ইষ্টদেব শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমাকে নৈবেদ্য নিবেদনান্তে গান ধরতেই শ্রীমা আমার মাথায় দুই হাত দিলেন। সেই স্নেহসিক্ত জ্যোতির্ময় হস্তযুগল সারাদিন ও সারারাত্রি আমি অনুভব করেছি। আমি শ্রীমাকে প্রার্থনা করেছিলাম, মা, তোমার

দুই পাদপদ্ম আমার মাথায় দাও; কিন্তু শ্রীমা স্নেহভরে তাঁর মঙ্গলহস্তদ্বয় আমার মাথায় দিলেন। আমরা, সন্ন্যাসীরা চতুর্ভুজ নারায়ণের হাতে আত্মপিণ্ড দান করেছি বলে তিনি দয়া করে পুত্রবৎ সদা এই মন্দিরে আছেন। শ্রীমার পূজারম্ভে ও হোমারম্ভে দুইবার সংকল্প করা হয়েছিল, বারান্দাস্থ পঁচিশ বিদেহী ও কার্নিশে বিদ্যমান ছত্রিশ বিদেহী উর্দ্ধগামী হউন। যদি ইষ্টসিদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মমার্গের সাধক ও বিজয়া নদীর তীরগামী (বিজয়ানদীতে যে সাধকের কুণ্ডলিনী পঞ্চ প্রাণবায়ু সহ হাজির হয়) প্রেতাত্মা বা সূক্ষ্মদেহী বা নিম্নযোনিপ্রাপ্ত কাহারও উর্দ্ধগতির জন্য সংকল্পপূর্বক পূজা-হোম করলে সঙ্কল্পসিদ্ধি ও সঙ্কল্পিত সূক্ষ্মদেহীর উর্দ্ধগতি হয়। ইহা এই মন্দিরে ইতঃপূর্বে তিনবার পরীক্ষিত হয়েছে। হোমকালে শ্রীমা অগ্নিরূপে হোমকুণ্ডে বিরাজ করলেন। হোমান্তে বিরাট অন্নভোগ নিবেদিত হলো। উল্লিখিত প্রকারে নৈবেদ্য বিতরণবৎ শ্রীমা সারদা অন্নভোগ বিতরণ করলেন। মন্দিরে প্রবিষ্ট পঁচিশ বিদেহী প্রসাদ পেলেন ও বারান্দাস্থ যে ছত্রিশ বিদেহী জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ছিলেন। তাঁহাদিগকে শ্রীমা, প্রসাদ দিলেন। বারান্দাস্থ ছত্রিশ জন প্রসাদ খেতে খেতে স্বর্গলোক পর্যন্ত উর্দ্ধগামী হলেন। প্রেতরূপে এখানে ইষ্টসাধনায় সিদ্ধিলাভের পর তাঁরা স্বর্গগামী হলেন। বাকী পঁচিশ বিদেহী মন্দিরে বসেই প্রসাদ খেলেন ও ব্রহ্মলোকের আর হ্রদ পর্যান্ত গেলেন শ্রীমা ইন্দ্র, চন্দ্র-বরুণ, সূর্য্যাদি দেবগণকে তাঁহাদের শক্তি সহ প্রসাদ দিলেন।

পূর্বদিন বুধবার ৩১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রে এলেন ও বৃহস্পতিবার থেকে ২রা জানুয়ারী শুক্রবার বৈকালে মাকড়দহে ফিরলেন! শুক্রবার সকালে আমি ভৈরবানন্দ, বিশ্বরূপানন্দ প্রভৃতি পাঁচ সাধু রামকৃষ্ণ নামকীর্তনান্তে গান ধরলাম, পোহাল দুঃখ রজনী। তখন আমাদের ছয় দেবতা—ঠাকুর, শ্রীমা, হরগৌরী, কালী ও বিষ্ণু স্বস্ব

আসন থেকে উঠে প্রথমে আমাকে আশীর্বাদ করলেন আমার বুকে, পিঠে ও মাথায় হাত দিয়ে। অনন্তর ভৈরবানন্দের কাছে গিয়ে পূর্ব্ববৎ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। শ্রীমা সারদা প্রসন্না হয়ে হাসলেন ও ঠাকুর ভৈরবানন্দের মাথায় আঙ্গুলের টোকা মেরে হেসে কৌতুক করলেন। তখন ভৈরবানন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর, বেলুড় মঠের অবশিষ্ট সূক্ষ্মদেহী তের সাধু ও দুই ব্রহ্মচারী আছে, তাদিগকে এখানে আনুন! তখন ঠাকুর দেখালেন, বেলুড়মঠে ব্রহ্মানন্দ মন্দির থেকে পুরাতন গঙ্গাঘাট পর্যান্ত ভ্রাম্যমান আটজন সূক্ষ্মদেহীর কার্য্য দেখিয়ে বললেন—যখন ভোগ-ঘর থেকে সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় ভোগাদি মন্দিরে আনা হয়, তখন মঠের প্রাঙ্গণে ঐ আটজন সাধুপ্রেত খেয়ে ফেলে মন্দিরে আনার পূর্বেই। ঠাকুর ঘৃণায় নাক সিটকিয়ে বললেন- ওরা ভোগাদি খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি মোটা করছে, ওরা আসবে না এখন। তবে অন্য পাঁচজন—যারা দক্ষিণ পূর্ব কোণে সমাধি স্থানের সমীপে অবস্থিত—আসবে।" ধর্মচক্রের মন্দিরে ইতোমধ্যে ২৫ + ৩৬ + ১৫ + ৬ + ১০ =৮২ সাধু + ১১ ভক্তপ্রেত =৯৩ জন উর্দ্ধগামী হলেন ; ধর্মচক্র মোক্ষপীঠে পরিণত হয়েছে।

৪ঠা জানুয়ারী রবিবার, ১৯৫৯ বেলুড় মঠ থেকে পাঁচজন সূক্ষ্মদেহী উত্তর বারান্দায় এসে বসলেন। যে আটজন সূক্ষ্মদেহী বেলুড় মঠে ঠাকুরের অন্নভোগাদি নিবেদনের পূর্বে মন্দিরে যাবার রাস্তায় ভোগ খেতেন, তাঁহাদিগকে ঠাকুরের নির্দ্দেশে ভৈরবানন্দ লাল বাবার আশ্রমে তাড়িয়েছেন। ওখানে তাঁরা বেশ জব্দ হয়েছেন। ওখানে এক সিদ্ধ সাধু ধুনি জ্বেলে বসে আছেন। তিনি ওদের দিকে ধুনির আগুণ ছুড়ছেন। তিনি সরতে বলছেন, কিন্তু অষ্ট প্রেত সরছেন না। ৪ঠা জানুয়ারী রবিবার বেলুড় মঠের পুরাণ ট্রাস্টি স্বামী প্রবোধানন্দ (সনৎ মহারাজ) দেহরক্ষা করেন। পরদিন রাত্রে তিনি আমার কাছে তিনবার এসেছিলেন। আজ তিনিও এসে আমাদের উত্তর বারান্দার কার্নিশে

দাঁড়িয়েছেন। মোট ছয় জন সাধু এখন মন্দিরের বারান্দায় অবস্থিত। বেলুড় মঠে এখন আর সাধু প্রেত নাই। ১৭ই জানুয়ারী শনিবার, ১৯৫৯ আমি কৃষ্ণনগরে যাই এবং পরদিন রবিবার উত্তর বারান্দায় লাল বাবা আশ্রম থেকে আটজন সূক্ষ্মদেহী এলেন এবং মোট চৌদ্দজন হলো। বেলুড় মঠে আর সাধু সূক্ষ্মদেহী রহিল না। তখন স্বামী ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রে ছিলেন এবং ঐ চৌদ্দ জন সূক্ষ্মদেহীর মন বিশুদ্ধ চক্রে তুলে দিলেন। ২০শে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেখা গেল, ঠাকুরের দ্বাদশ পার্ষদ দীর্ঘকাল পরে বেলুড় মঠে গেলেন এবং আরতির সময় ফিরে এলেন। তাঁরা এই কয়দিন যাওয়া আসা করলেন। কালীপূজার সময় থেকে ধর্মচক্রের দুই ফটকে মা কালী ছিলেন জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত। ২৪শে শনিবার ভৈরবানন্দ হঠাৎ মাকড়দহে চলে যান এবং ২৬শে সোমবার সকালে ধ্যানে দেখেন, ঠাকুর ধর্মচক্র মন্দিরের উত্তর বারান্দায় অবস্থিত চৌদ্দজন সূক্ষ্মদেহীকে দেখিয়ে ইসারায় তাঁকে বলছেন, এদের কাজ শীঘ্র শেষ করে দাও। তখন ভৈরবানন্দ বললেন, "ঠাকুর, ঐ সব বিদেহী ভক্ত তোমার, আর এই বাবা আছেন। যা করবার তুমি কর। আমি এখন পারবো না। হয় শিবরাত্রি, না হয় তোমার জন্মোৎসবে হবে।" আমি ২৫শে রবিবার কৃষ্ণনগর থেকে ধর্মচক্রে ফিরিলাম।

তখন ঠাকুর রুদ্র মূর্তি ধরে ভৈরবানন্দকে বললেন, না, তোমায় এখুনি করতে হবে। ভৈরবানন্দ বললেন, না, বাবার জায়গা। বাবা না বললে আমি করবোই না। সোমবার দুপুরে যখন ভৈরবানন্দ স্বগৃহে সমাধিস্থ ছিলেন, তখন ঠাকুর জোর করে তাঁর সূক্ষ্ম শরীরকে টেনে বাহির করে ধর্মচক্রে নিয়ে এলেন। তখন আমি দক্ষিণ বারান্দায় স্বশয্যায় সুনিদ্রিত ছিলাম। ঠাকুর ভৈরবানন্দের সূক্ষ্ম দেহকে উত্তর বারান্দায় নিয়ে গিয়ে তাঁর মাথায় হাত দিলেন। ইহার ফলে ভৈরবানন্দ

চতুর্ভুজ শিবমূর্তি হলেন। ঠাকুর ইসারায় তাঁকে বললেন, এই চৌদ্দ জনের মাথায় হাত দাও। ভৈরবানন্দ সূক্ষ্মদেহে চৌদ্দজন সূক্ষ্মদেহীর মাথায় হাত দিলেন। তখন তাঁরা উঠে ভৈরবানন্দকে নমস্কারান্ত প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন এবং তদনন্তর মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করলেন। ভৈরবানন্দও মন্দিরে ঢুকে দেখলেন, শ্রীমা সারদা এক থালা অন্নব্যঞ্জন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের প্রদক্ষিণান্তে ছয় দেবতা, দ্বাদশ পার্ষদ ও পনের ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসী শ্রীমা প্রদত্ত অন্নব্যঞ্জন খেলেন এবং তৎপরে শ্রীমা চৌদ্দজন সূক্ষ্মদেহীকে দিলেন। এই চৌদ্দজন শ্রীমার প্রসাদ খেয়ে শিবলোক পর্য্যন্ত গেলেন। ভৈরবানন্দ ঠাকুরকে ও আমাকে নমস্কার করে মাকড়দহে ফিরলেন। উল্লিখিত মোক্ষযজ্ঞে মোট ৯৩+১৪ = ১০৭ জন বিদেহী ঊর্দ্ধগতি লাভ করলেন এবং তন্মধ্যে প্রায় এক শত সাধু ব্রহ্মজ্ঞ হলেন। এঁরা সকলে ১৯৬০ খ্রীঃ ১১ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীমার জন্মোৎসব সময়ে ধর্মচক্রের মন্দির কার্নিশে একত্রে বসে সারদা লীলা কীর্তন শুনলেন। তন্মধ্যে যে পনের জন সর্বপ্রথম মুক্তিলাভ করেন, তাঁরা ও ২৫ শে জানুয়ারী ১৯৫৯ সন্ধ্যায় ঠাকুরের দ্বাদশ পার্ষদ সহ বেলুড় মঠে চলে যান। ইহার পর প্রায় চৌদ্দ মাস ভৈরবানন্দ মাকড়দহে স্বকীয় উদ্যানে পারমহংস্য ও তত্ত্বজ্ঞান সাধনে ব্যাপৃত থাকেন ও ধর্মচক্রে আসেন নাই।

যেমন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সব্যসাচী নিমিত্তমাত্র ছিলেন, তেমনি আমিও এই মোক্ষযজ্ঞে নিমিত্তমাত্র বা উপলক্ষ্যমাত্রই ছিলাম। কিন্তু ভৈরবানন্দ উক্ত মোক্ষযজ্ঞে পৌরোহিত্য করিলেন কেন? ইহার সংশয়শূন্য সদুত্তর সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী দিয়াছেন।—"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরে এত কাল অন্য কেহ নির্বিকল্প সমাধি লাভান্তে পারমহংস্য ও তত্ত্বজ্ঞান সাধনে সিদ্ধি লাভ করেন নাই, এমন কি স্বামিজীও নহে। ভৈরবানন্দ নির্বিকল্প সমাধি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর সমগ্র ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পারমহংস্য ও তত্ত্বজ্ঞান

সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন। পারমহংস্য সাধনকালে তিনি ঠাকুরের মত গুরুদত্ত গেরুয়া ত্যাগ করে পরমহংসের পরিধান শ্বেতবস্ত্র গ্রহণ করেন। তাই ঠাকুর তাঁহাকে দিয়া এই অভূতপূর্ব মোক্ষযজ্ঞ করাইলেন। ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণস্থিতি লাভ বা ব্রহ্মজ্ঞানকে পাকা করার জন্য পরমহংসপদ ও তত্ত্বজ্ঞান সাধন করিতে হয়—ইহা আধুনিক বেদান্তবাদীরা বিশ্বাস করেন না। ইহা ছাড়া স্থূলদেহী তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংস ব্যতীত কেহ কোন স্থূলদেহী বা সূক্ষ্মদেহীকে জ্ঞানলাভে সাহায্য করিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংস জগতে বিরল, দুই তিন শতকে ভারতে একটী আবির্ভূত হয়। উল্লিখিত মোক্ষযজ্ঞপাঠে এই অদ্ভুত রহস্য অবগত হওয়া যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু পরমংসমাত্র বলে জীবকে মুক্তি বা জ্ঞান দানে অসমর্থ। তাই তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দের সাহায্যে তিনি বহু জীবকে মুক্ত করলেন।

———

—বার—

ধর্মচক্রে গোপাললীলা

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারীতে অথবা ১৩৬৫ সালে পৌষ মাসের শেষে এক রাত্রে স্বামী ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে সূক্ষ্মদেহে যাদবপুর বাঘা যতীন পল্লীতে ননীমার আশ্রমে গমন করেন ও দেখেন, ননীমা বিক্ষুব্ধ ও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বসে আছেন। তাঁর সম্মুখে ভৈরবানন্দ গিয়ে দাঁড়াতে তিনি বুঝতে পারলেন না। ইহাতে বোঝা গেল,এখন ইনি সাধারণ সাধিকামাত্র। ভৈরবানন্দ তাঁর ঠাকুর-ঘরে যেতেই ননীমার গোপাল তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলেন। ভৈরবানন্দ তাঁকে নামিয়ে দিতে চাইলেন, তখন গোপালজী

করুণভাবে বললেন, "তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল। আমি আর এখানে টিকতে পারছি না।" ভৈরবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? তখন গোপালজী ননীমাকে দেখিয়ে বললেন, ও আমার নাম করে অন্যায় ভাবে ঠকিয়ে ভক্তদের কাছ থেকে বহু টাকা নিয়েছে ও নিচ্ছে। গোপাল ভৈরবানন্দজীর কাঁধে চড়ে ধর্মচক্রে এলেন। ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রের মন্দিরে মা কালীর কোলে গোপালকে রেখে গেলেন এবং যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন, বাবা, স্নেহের গোপাল রইল, তার যথোচিত পূজো-সেবা করবেন। ইহার দুই এক দিন পরে ভৈরবানন্দজী গোপালকে মাকড়দহে স্বগৃহে নিয়ে যান। তথায় গোপালজী দুই বর্ষ তিন মাস যাবৎ অর্থাৎ ১৩৬৭ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ছিলেন! সন ১৩৬৭ সালের আশ্বিন মাস থেকে গোপাল ধর্মচক্রে ভৈরবানন্দজীর সঙ্গে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আসতে ও যেতে থাকেন এবং চৈত্র মাস থেকে স্থায়ী ভাবে এখানে বিরাজ করছেন প্রায় এক বৎসর। এখানে গোপালজী মহাগৌরীকে মাতৃবোধে দেখেন ও তাঁর সঙ্গে সুমধুর স্নেহ-লীলা করেন। মৎপ্রণীত 'হিন্দুধর্ম' ও 'শ্রীগুরুপ্রসঙ্গ' পুস্তকদ্বয়ে যথাক্রমে বাৎসল্য তত্ত্ব ও 'গোপাললীলা' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় অবশ্য দ্রষ্টব্য।

পয়লা আগষ্ট সোমবার ১৯৬০ ঝুলন পূর্ণিমার পূর্বদিনে রাত্রিকালে দেখা গেল, শিব ঠাকুরের কোলে বসে বালগোপাল মিট মিট করে তাকালেন ও শিবকে নিবেদিত পায়সাদি নিজ হাতে তুলে খেলেন। পরদিন মঙ্গলবার রাত্রে যখন শিবকে সুজির পায়স নিবেদিত হলো, তখন দেখা গেল, গোপালজী শিবের বুক জড়িয়ে ছিলেন ও স্বয়ং নিবেদিত পায়স নিলেন। তেসরা আগষ্ট বুধবার দুপুরে আমি ও মহাগৌরী ঠাকুর-পূজা করলাম ও অন্নভোগ দিলাম। তখন মহাগৌরী দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণই বাল গোপাল হলেন, আবার তিনিই বিষ্ণুমূর্তি ধরলেন। তখন অনন্তনাগ তাঁর মাথায় ছত্রবৎ বৃহৎ ফণা বিস্তার করলেন। পুনরায় তিনিই শিশু গোপাল

হয়ে নৈবেদ্য নিবেদিত হবার পূর্বেই প্রসাদ খেতে হাত বাড়ালেন ও সরল শিশুবৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন! ভগবানের কি মধুরলীলা!! আজ সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। স্নানান্তে পূজায় বসবো ও অন্নভোগ দেব। স্নানে যাবার পূর্বে এই ডায়েরী লিখতে বসেছি। পূজায় যেতে আমার দেরী হচ্ছে দেখে গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং গোপালজী এসে আমার কাছে দাঁড়িয়েছেন। প্রথম চারি শিশু দেবতা আমাকে'দাদু' বলেন। তাই তারা চুপ করে শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে বলছেন, "দাদু, আর কত লিখবে? পূজায় বসতে দেরী করছ কেন?" আর দুষ্ট শিশু গোপালজী খাবারের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন ও বোকার মত চাইছেন। মহাগৌরী অদূরে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে ঐ সব দিব্য দৃশ্য দেখছেন। এইরূপে গোপালজী আমাদের মন্দিরে প্রেমলীলা আরম্ভ করেন ও প্রায় এক বৎসর স্থায়ী ভাবে থাকেন। ১৯ মে শুক্রবার ১৯৬১ সকাল নয়টায় আমি খুব ক্লান্ত হয়ে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ কোণে মাদুর পেতে শুয়েছি ও মহাগৌরী একই মাদুরে বসে আমার সঙ্গে কথা বলছেন। আমি চোখ বুজে বিশ্রামের চেষ্টা করছি। এমন সময় দেখলাম, একটী শ্যামল শিশু আমার দক্ষিণে বসে পশ্চিম আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তাঁর মাথায় কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ। তাঁকে দেখে আমি পার্শ্বস্থা মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য শিশু কে? তখন মহাগৌরী তাঁকে দেখেই বললেন, "ইনি আমাদের গোপালজী। গত সাত দিন আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে বাম পায়ের গোড়ালী মচকান হেতু অসুস্থ ও শয্যাগত হওয়ায় গোপাল অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে ও আমার কাছে আসে না, আমার দিকে চায়ও না, দূরে দূরে থাকে। আজ আপনার কাছে বসে সে আমার দিকে আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে।" অনন্তর মহাগৌরী আমার মাদুর থেকে উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় গেলেন, ও দেখলেন, স্নেহের গোপাল তাঁর ছোট ছোট হাত দুটি দিয়ে আমার সারা গা—মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত প্রীতিভরে

হাত বুলাচ্ছেন ও চুলকে দিচ্ছেন। ইহার ফলে আমি অচিরে ঘুমিয়ে পড়লাম ও ঘুম থেকে উঠে ক্লান্তি-মুক্ত হলাম। গত ছয় রাত্রি মহাগৌরীর অসুখের জন্য দুশ্চিন্তা নিমিত্ত আমার সুনিদ্রা বা বিশ্রাম হয় নি। সুন্দর শিশুমূর্তি নারায়ণের সস্নেহ সরল আচরণ মানব জগতে অতুলনীয় ও গোপাললীলার মাধুর্য্য অবর্ণনীয়।

১০ জুন. ১৯৬১ শনিবার সকালে আমরা মন্দিরে নামকীর্তনান্তে গঙ্গাধ্যান, গঙ্গাস্তোত্র, গঙ্গাসঙ্গীত ও গঙ্গানাম জপ করিলাম। তখন গঙ্গাদেবী সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। একটু পরে দেখা গেল, স্নেহের গোপালজী মা গঙ্গার বাম কাঁধে চড়ে বসলেন ও তাঁর ডান পা আমার দিকে বাড়িয়ে রাখলেন। যতক্ষণ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত গঙ্গা সঙ্গীত 'এসো পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' চলিল, ততক্ষণ গোপাল তাঁর ছোট পাটী বাড়িয়ে রাখলেন, গঙ্গাদেবী নারায়ণের পাদোদ্ভূতা ও গোপাল স্বয়ং নারায়ণ। আজ থেকে ঠিক এক পক্ষ পরে আমাদের নাটমন্দিরে মৃন্ময়ী প্রতিমায় তৃতীয় বার্ষিক গঙ্গাপূজা হবে। গত পরশ্ব বৃহস্পতিবার গোপালজী সুভদ্রার বাম কাঁধে চড়ে তিন বৎসরের শিশুমূর্তিতে মন্দিরের বারান্দায় বেড়াইলেন।

৯ই জুন শুক্রবার দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপূজা করলাম এবং আম ও নাড়ুর নৈবেদ্য দিলাম। নৈবেদ্য নিবেদিত হলে দেখা গেল, ঠাকুর নৈবেদ্যের দিকে তাকালেন, কিন্তু হাত দিলেন না। সম্ভবতঃ নৈবেদ্যের আম প্রেতদৃষ্টিদুষ্ট ছিল। তাহা দেখে মহাগৌরী স্নেহের গোপালকে বললেন, বাবা, সত্বর ফল বা মিষ্টি এনে দেবার ব্যবস্থা কর। তখন গোপাল আনালেন এক চ্যাঙ্গারি বড় বড় মালপোয়া এবং স্নেহের সুপর্ণা আনলেন চিনি মাখান চমচম, আম ও পেঁপে এক এক থালায়। এই সব দিব্য দ্রব্য ঠাকুর পরম তৃপ্তি সহকারে দেবদেবী ও মুনিঋষিগণকে দিলেন ও নিজে নিলেন। ১১জুন রবিবার

সকালে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে আমি ও মহাগৌরী উভয়ে ভৈরবানন্দের স্বহস্তলিখিত ডায়েরী শুনছিলাম ও অন্য একজন পড়ছিলেন। তখন স্নেহের সুপর্ণা মন্দিরের বাহিরে এসে পূর্ণ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে শুনলেন এবং তৎপরে অনেকক্ষণ আমার কাছে রইলেন। আমি স্নেহভরে তাঁকে বললাম, মা আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো, আমার মেয়েদের ছেড়ে যেতে পারবো না। তখন তিনি মাটীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাকে জানালেন, বাবা আমরা ত মর্ত্যে দেহ ধারণ করবো।

বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত মহাবিষ্ণুর স্থান আজ্ঞাচক্রে। তন্নিম্নে অবস্থিত ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্ত হৃৎপদ্ম থেকে গোপাললীলা বা গোপাল শক্তির ভূমি, তদূর্দ্ধে নহে। জ্ঞানচক্ষু খুললে গোপাললীলা দেখা যায়।

১৩ই আগষ্ট, ১৯৬০ শনিবার জন্মাষ্টমীর পূর্বদিন বেলা এগারটায় আমি, মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া ঠাকুর-পূজায় বসলাম। পূজাকালে জননী যশোদা, নন্দ ঘোষ, গোপীগণ ও আটজন পুরুষ ভক্ত ও বহু দেবতা এলেন। নন্দ ঘোষের মাথায় পাগড়ী ও হাতে লাঠি। তিনি বেশ লম্বা ও খুব ফর্সা, কপালে সাদা চন্দন ফোঁটা। মা যশোদা বেশ মোটা, মুখমণ্ডল স্নেহরঞ্জিত, হলদে খোল লালপাড় শাড়ী পরা। যশোদা দুই হাতে বালকৃষ্ণের কোমর ধরে আছেন, আর দুরন্ত গোপাল মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে ছটফট করছেন। ফলমিষ্টির নৈবেদ্য অন্নভোগ নিবেদিত হবার পূর্বেই গোপাল ঐসব খাদ্যদ্রব্য নিজ হাতে নিয়ে খেতে লাগলেন। প্রথমে ঠাকুর গোপালকে একটু প্রসাদ দিলেন, পরে যশোদা তাঁকে খাওয়ালেন। শ্রীমাও সূক্ষ্মদেহী ভক্তবৃন্দ কর্তৃক আনীত মিষ্টি গোপালকে দিলেন। রাত্রিকালে লুচি হালুয়া ও তরকারি মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরকে নিবেদন করলেন। ঐ তরকারী খুব গরম ছিল। গরম ব্যঞ্জনে গোপাল হাত বাড়াতে যশোদা গোপালের হাত ধরে টেনে কোলে বসালেন। তরকারী শীতল হতে নিবেদিত হলো।

তখন ঠাকুর গোপালকে খাইয়ে দিলেন। শনিবার শেষ রাত্রে বা পরদিন রবিবার জন্মাষ্টমীর ভোর রাত্রে মহাগৌরী ধ্যানে দেখলেন, "শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিলেন, দেবকীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন, মন্দির দিব্য জ্যোতিতে আলোকিত হলো, দেবগণ এসে সদ্যোজাত দেবশিশুকে ঘিরে আনন্দে নাচলেন এবং আটজন সিদ্ধভক্ত খোল বাজিয়ে শিশুকে ঘিরে কীর্তন করলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যবৎ এই আট জনের চেহারা জ্যোতির্ময়, নেড়া মাথা ও খালি গা, কারোর পা মাটীতে ঠেকছে না।" দক্ষিণ বারান্দায় স্বশয্যায় শুয়ে আমি ভক্ত-কবি বিশ্বরূপ বিরচিত গোপাল সংগীত গাইলাম—

মেরে পীতম্ প্যারে বংশীওয়ারে,
তু-আযা কানাইয়া আযা।
লেই গোয়াল বাল নন্দলাল
মোহন মূরলি ধ্বনি ধুন শুনা যা॥

চোখের জলে আমার কপোল যুগল প্লাবিত হল। তখন স্নেহের গোপাল পেছন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ডান কাঁধ দিয়ে উঁকি মারতে লাগলেন। তৎকালে তিনি প্রায় তিন বছরের শিশুমূর্তি, তাঁর মাথায় দুই পাশ থেকে চুলের বিনুনী করে বাঁধা আছে। শনিবার সান্ধ্য সভায় অধ্যাপক ত্রিপুরাশংকর সেন ভাষণ দিলেন এবং গীতবাদ্যের অনুষ্ঠান হল। মন্দিরস্থ দেবগণ অনেক সময় নাটমন্দিরে সভাস্থলে ছিলেন। শেষ রাত্রে মহাগৌরী দেখলেন, মন্দিরে অনন্তনাগও কৃষ্ণমূর্তি ধরেছেন; আবার কৃষ্ণ অনন্তনাগ হলেন। অনন্ত নাগের অন্ত নাই, শেষ নাগের শেষ নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ও ফণার সংখ্যা ধারণা করা যায় না।

১৪ আগষ্ট রবিবার জন্মাষ্টমী। দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর পূজায় বসলাম, অন্নভোগও দেওয়া হলো। পূজাদিতে ৯৷৷০টা থেকে ১২৷৷টা

পর্য্যন্ত তিন ঘণ্টা কাটল। কৃষ্ণাপূজাকালে বহু গোপী ও অষ্ট বৈষ্ণব সাধক এলেন ও গোপালকে সাজালেন সাদা ফুলের মালা দিয়ে—গলায় মাথায় উপর ও নীচ হাতে। গোপালের কোমরে সোণার বোল, পায় নুপুর, দুই হাতে সোণার মোটা বালা, মাথায় চুলের চূড়া বাঁধা, সোণার সিংহাসনে গোপালকে বসান হলো। একজন তাঁকে ধরে রেখেছেন। তখন রাজবেশে কংস এলেন—মাথায় মুকুট, দাড়ি নাই, গোঁফ আছে, চোখ বড়, বড় রাজাদের মত হাতে বাজু, পোষাক চকচকে। সকলের সঙ্গে তিনিও গোপালকে প্রণাম করলেন ও নারদ বীণা বাজালেন। তথায় বিষ্ণুমূর্তিতে কল্কিদেবও ছিলেন, একটী ফুলের মালা তাঁর গলা থেকে পা পর্য্যন্ত ঝুলছিল। শিব ঠাকুরকে সূক্ষ্মদেহী ভক্তবৃন্দ একটী মালা দিলেন! মঙ্গলগ্রহ কবচ পাঠান্তে মঙ্গল ঠাকুরকে গন্ধপুষ্প দেওয়া হলো এবং তাঁর ইষ্টদেবী বগলামুখীর ধ্যানান্তে পূজা করলাম। মা বগলা এলেন—তাঁর মাথায় কাপড় পূর্বদিন অপেক্ষা অল্প, মুখ পুরা দেখা যাচ্ছে। তিনি এসেই আমাকে তাঁর আগমন জানালেন। সূর্য্যার্ঘ্য নিবেদন ও নবগ্রহকে পূজা করতেই নবগ্রহ এলেন সূর্য্যমণ্ডল থেকে—সর্বাগ্রে শনিগ্রহ, আকাশে যেরূপে থাকেন, সেইভাবে, স্ব স্ব মূর্তি ধরে নয়। ব্রহ্মলোক থেকে বহু দেবতা নামলেন, দেবতাদের অদ্ভুত চেহারা—কারো কপালে একটী চোখ, কারো সর্বাঙ্গে চোখ, কারো চার হাত, কারো দশ হাত, কারো দুই হাত। দশ-ভুজা দুর্গা, ছিন্নমস্তা, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবী এলেন। আর পাঁচটী দেবী এলেন—অতি শুভ্রা, কোন আভরণ নেই, সাদা শাড়ী পরা, মাথার চুল খোলা। এঁদের দুই চক্ষু ও দুই হাত, বোধ হয় এঁরা সিদ্ধা সাধিকা। ঠাকুর, কল্কি, গোপাল ও সূর্য্যকে অর্ঘ্য দেওয়া হলো। প্রত্যেক দেবতা স্বীয় অর্ঘ্য দিব্য দেহে ধারণ করলেন! প্রথমে গোপাল অর্ঘ্য ফেলে দিলেন,তাতে শিবের দৃষ্টি পড়ায় অর্ঘ্যটী তুলে তিনি আবার মাথায় নিলেন।

ব্রজপ্রিয় গোপালজী পূজান্থলে ছুটোছুটি করছিলেন বলে তাঁকে ঠাকুর ধরে রেখেছিলেন। নৈবেদ্য নিবেদিত হতে গোপাল নিজেই আগে নিলেন এবং ঠাকুর ঐ নৈবেদ্য দুর্গা, যশোদা প্রভৃতি দেবতাকে দিলেন। শ্রীমাও গোপালকে খাওয়ালেন তাঁর শুভজন্ম দিনে। ঐদিন একটি ব্রাহ্মণ তরুণ দীক্ষা নিলেন। দীক্ষাকালে গোপালজী দীক্ষার্থীর ইষ্টদেবীর মাথায় উঠে বসে রইলেন এবং দেবীর মুকুটের উপর দিয়ে আমাকে ও মহাগৌরীকে উঁকি মেরে দেখছিলেন। মহাগৌরীর অনুরোধে গোপালজী মা কালীর মাথা থেকে নামলেন ও মা কালী দীক্ষার্থীর কাছে এলেন। অন্নব্যঞ্জনাদি গরম থাকায় আমরা তালপাখা দিয়ে হাওয়া করছিলাম। অন্নভোগ নিবেদন করতে দেরী হচ্ছে বলে গোপালজী ছটফট করছিলেন। তাই শিব ঠাকুর তাঁকে কোলে ধরে রেখেছিলেন। বৃন্দাবন থেকে মন্দির সহ অনেক দেবতা এলেন। প্রসাদ পাবার আশায় উত্তর বারান্দায় বহু বৈষ্ণব সূক্ষ্মদেহী এসেছিলেন। অন্নভোগ সমাপনান্তে আমি সমবেত দেবতাগণকে সভক্তি প্রণাম করলাম। তখন স্নেহের গোপালজী নিজ হাত দুটী জোরে নেড়ে আমাকে প্রণাম করতে নিষেধ করছিলেন। যখন আমি ও মহাগৌরী এই গান গাইলাম, 'মেরে পীতম্ প্যারে বংশীওয়ারে,' তখন আমার সামনে গোপাল চুপ করে দাঁড়িয়ে গান শুনছিলেন। নাটমন্দিরে সান্ধ্য সভায় আমি শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা ও বাল্যলীলা বর্ণনা ও গোপাল সঙ্গীত করলাম। তখন গোপালজী তথায় হাত তুলে নাচছিলেন। অনন্তর রাত্রে মন্দিরে গোপালজীকে লুচি-হালুয়া নিবেদন করতেই শিব ব্যতীত মন্দিরের দেবগণ হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। শিবের অঙ্গুলি নির্দেশে গোপালও চুপ করে অপরাধী শিশুবৎ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা বুঝলাম, আজ নৈসর্গিক দুর্যোগ এড়ান অসম্ভব। সান্ধ্য সভায় যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী মাইকযোগে শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে

কৃষ্ণজন্ম সম্বন্ধে কথকতা করলেন। প্রায় আড়াই শত শ্রোতা এই সুমধুর কথকতা শুনলেন। কথকতার আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত কাল ভৈরব মুণ্ডমালা গলায় পরে বৈষ্ণব কথকের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। মহাগৌরী জ্ঞানচক্ষুতে দেখলেন, প্রায় একশত সূক্ষ্মদেহী কৃষ্ণভক্ত ও শাক্তভক্ত নরনারী সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন স্থূলদেহীদের সঙ্গে। কৃষ্ণভক্তের গলার সাদা ফুলের মালা ও শাক্ত ভক্তের গলায় রুদ্রাক্ষ মালা ছিল। মন্দিরস্থ দেবগণও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাগৌরী শ্রোতৃবৃন্দের সংখ্যা গণনা করতে গিয়ে স্থূলদেহী ও সূক্ষ্মদেহীদের ভেদ করতে না পেরে গণনা বন্ধ করলেন। কলিকাতার বয়োবৃদ্ধ সলিসিটার ভুবনমোহন দাস এসেছিলেন। তাঁর প্রথমা পত্নী বিষ খেয়ে মরে ছিলেন। সেই পত্নীর প্রেতকে তাঁর দীক্ষাগুরু হাওড়ার পরলোকগত বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সভাস্থলে এনেছিলেন। কয়েক দিবস পরে স্বামী ভৈরবানন্দের অমোঘ আহ্বানে বিজয়কৃষ্ণ এলেন। তখন জানা গেল, তিনি পিতৃলোকবাসী। রবিবার নাটমন্দিরে সান্ধ্য সভায় মহাগৌরী হারমোনিয়াম বাজিয়ে চারটী ভজন গাইলেন। তখন তিনি দেখলেন, স্নেহের গোপালজী হারমোনিয়ামের সামনে বসে আছেনও তাঁর দিব্য দেহ থেকে পদ্মগন্ধ বাহির হচ্ছে। উক্ত দিন সন্ধ্যায় ঠাকুরকে যে লুচি-হালুয়া (দালদা দিয়ে তৈরী) মন্দিরে ভোগ দেওয়া হলো, লুচি শক্ত ও দালদা দিয়ে তৈরী বলে ঠাকুর নিবেদিত লুচি-হালুয়া সকল দেবতাকে দিলেন, কিন্তু নিজে খেতে চাইলেন না। তিনি লুচি হাতে তুলে দেখাতে লাগলেন। মহাগৌরী অনেক অনুনয় করায় তিনি একটু খেলেন। ঐ রাত্রে মহাগৌরী শুয়ে জপ করছেন ও বলছেন, মঙ্গলগ্রহ দাদুকে ছেড়ে চলে যান। তখন গোপালজী মহাগৌরীকে ঐ কামনা ভুলিয়ে দেবার জন্য স্বর্গের নন্দনকানন দেখালেন। মহাগৌরী বলেন, "নন্দন কাননের কোন বর্ণনা প্রদান

অসম্ভব। উহার গাছগুলিও অদ্ভুত, ফুলগুলিও অদ্ভুত। বিচিত্র বর্ণের বিবিধ পুষ্প রাশি রাশি ফুটে আছে। কতকগুলি প্রজাপতি একত্রে রাখলে যেমন দেখায়, কোন কোন ফুল সেরূপ বিচিত্র দেখতে।"

১৫ই আগষ্ট সোমবার প্রাতঃস্নানান্তে মহাগৌরী মন্দিরে ঢুকে দেখলেন, লক্ষ্মীদেবী সমাসীনা। পূর্বদিন রবিবার দুপুরে মন্দিরের উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় বিশ্রামান্তে মহাগৌরী দেবী লক্ষ্মীকে ডেকেছিলেন। তাই পরদিন লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হলো। সোমবার দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপূজা করলাম ও অন্নভোগ দিলাম। মঙ্গলকবচ পাঠ ও মঙ্গল গ্রহের মন্ত্রজপান্তে পূজা ও মঙ্গলের ইষ্টদেবী বগলার ধ্যানশেষে গন্ধ-পুষ্প দেওয়া হলো। মঙ্গল-কে সচন্দন ফুল দিবার সময় শিব স্বীয় পদে ঐ ফুল দিতে বললেন। বগলার পূজা সারদার প্রতিকৃতিতে করা হোল। তখন বগলামুখী মাথার কাপড় ফেলে মাতৃবৎ দর্শন দিলেন। তৎপূর্বে মঙ্গল গ্রহ পূজাস্থলে সাধুবেশে এসেছিলেন। আমরা তাঁর ছদ্মবেশ চিনে ফেলতেই তিনি সরে পড়লেন। অনন্তর মঙ্গলগ্রহ গুপ্তভাবে এলেন ও তার মোটা গদা (কাঠের) মহাগৌরীর দিকে ছুঁড়লেন। তখন মহাগৌরী ভয় পেয়ে শিবকে স্মরণ করতেই শিব ঠাকুর সাত্ত্বিক' রাজসিক ও তামসিক তিন মূর্তিতে দাঁড়িয়ে উঠলেন। তখন মঙ্গলের গদা ফিরে গেল, মহাগৌরীর দিকে আসতে পারল না, মঙ্গল তাঁর কিছু অনিষ্ট করতে পারলেন না বগলা প্রসন্না থাকায়। পূজাকালে আমি অনুভব করলাম, আজ নন্দোৎসব দিবসে ননীমা বাঘা যতীন কলোনিতে স্বীয় ঠাকুর-ঘরে গোপালকে না দেখে ও তৎপরিবর্তে যমদূতত্রয় দেখে কাঁদছিলেন। এই কথা মহাগৌরীকে বলায় গোপাল শুনে দুই হাতের বুড়া আঙ্গুল তুলে দেখালেন ও জানালেন, তিনি ওখানে এখন যাবেন না। ঐ দিন পূজার পূর্বে আমি মন্দিরের বারান্দায় বসে লিখাইতেছিলাম। তখন স্নেহের

গোপালজী আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ছিলেন ও আর লিখিতে নিষেধ করলেন। তাঁর দিব্যস্পর্শে বৈকালে আমার শরীর অসুস্থ হলো। যখন আমি সন্ধ্যার পূর্বে মন্দির থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলাম, তখন গোপালজী আমার পীঠে চড়ে নীচে নামলেন। বৈকালে আমি দুই গ্লাসে মিছিরির পানা (নেবুরস যুক্ত) দুইহাতে নিয়ে মহাগৌরীকে উত্তর বারান্দায় এক গ্লাস দিলাম। মহাগৌরী সরবতের গ্লাসটী স্বীয় মুখে ধরতেই গোপালজী ছুটে এলেন। তখন তাঁকে অন্য সরবতের গ্লাসটী দেওয়া হলো। পূজাকালে মহাগৌরী ঠাকুরকে দুটী ফুলের মালা দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটী কুঁড়ি ফুলের মালা ছিল। সেটী ঠাকুর স্বয়ং নন্দোৎসব বলে গোপালের গলায় পরিয়ে দিলেন। পরদিন পর্য্যন্ত সেই মালা গোপালের মাথায় চুলের ঝুঁটিতে দেখা গেল। পূজাকালে ঠাকুরকে ও শিবকে স্নান করাবার পর গোপালকে স্নান করান হলো। অনন্তর সমবেত ভক্তবৃন্দ গোপালকে ফুলের মালা দিয়ে সাজালেন। সেই সঙ্গে কল্কীদেবকেও সূক্ষ্মদেহী ভক্তবৃন্দ বিবিধ প্রকারে সাজালেন। আজও গোপালকে পৃথক্ নৈবেদ্য (ফলমিষ্টির) দেওয়া হলো। গোপালজী সেটী নিয়ে সকলকে প্রসাদ দিলেন। গোপালাদি দেবগণকে যে অর্ঘ্য দেওয়া হয়েছিল, তাহা তাদের মাথায় দেখা গেল। মহাগৌরী দেখালেন, একটী বিহারী ভক্ত সূক্ষ্মদেহী এলেন—তাঁর চোখে কাল ফ্রেমের চশমা, মাথায় গান্ধী টুপী, গায় গলাবন্ধ কোট ও ফুল প্যাণ্ট পরা, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশীয়। ইনি কল্কিদেবের অন্তরঙ্গ সহচর ও দ্বারভাঙ্গায় জন্মেছেন। মহাগৌরী ঠাকুরের পায়ে ফুল দিতে যেতে ঠাকুর সেই ফুল হাতে করে নিলেন, পায় দিতে দিলেন না। যখন মহাগৌরী মন্দিরে আরতি করেন, তখন দেখা যায়, ঠাকুর দাঁড়িয়ে ওঠেন, বসে থাকেন না। ঠাকুর মহাগৌরীর প্রণামও নেন না, তাঁকে মা বলে ডাকেন। সোমবার প্রাতে মহাগৌরী শ্বেত পাথরের বাটীতে

কয়েকটী নাড়ু স্নেহের গোপালকে ভোগ দিলেন। তখন গোপালজী নিজে একটি নাড়ু গালে পুরে ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবতাকে প্রসাদ দিলেন। সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে পূর্বোক্ত কথক ভাগবতাদি শাস্ত্র থেকে নন্দোৎসব ব্যাখ্যা করলেন। তৎপূর্বে মহাগৌরী হারমোনিয়াম বাজিয়ে সাতটী ভজন গাইলেন। তখন মঙ্গলগ্রহ আটজন প্রহরীকে পাঁচিলে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন ও নিজে নাটমন্দিরে ছাদের কোণে অলক্ষ্যে ছিলেন। সূক্ষ্মদেহী কৃষ্ণভক্তগণকে নাটমন্দিরে আসতে না দেবার জন্যই মঙ্গলগ্রহ এই অষ্ট প্রহরী নিযুক্ত করেছিলেন। তাই মহাগৌরী গান গাইতে পারছিলেন না। তখন গোপালকে স্মরণ করায় তিনি এসে সামনে বসলেন গোলাকার বসুন্ধরার উপরে। তখন মহাগৌরী গান করতে পারলেন। রাত্রি সাড়ে সাতটায় মহাগৌরী মন্দিরে গোপালকে ভোগ দিলেন এবং আমরা আসনে বসে আমার জপমালায় চুয়াম বার গোপাল মন্ত্র জপ করলেন ও গোপালকে বললেন, “বাবা, যখন আমাকে মা বলেছ, তখন মায়ের অনুরোধ রাখ। আজ তোমার জন্মোৎসব এখানে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক।” গোপালজী প্রসাদ নিয়ে উঠে গেলেন ও সুদর্শন চক্র হাতে ধরে শূন্যে চললেন—গোপাল ন্যাংটা, কোমরে সোণার বোল, পায়ে নূপুর, হাতে বালা, মাথায় চূড়া বাঁধা। এই শিশু মূর্তিতে তিনি জ্যোতির্ময় সুদর্শন নিয়ে আকাশে উঠলেন। আধ ঘণ্টা পরে মহাগৌরী মন্দিরের বাহিরে এসে দেখলেন, আকাশ পরিষ্কার ও তারা উঠেছে। তাই নির্বিঘ্নে আমাদের সান্ধ্য সভা সম্পন্ন হলো। গণেশ ঠাকুর সভামধ্যে বসে কথকতা শুনছিলেন, কখনও কথকের দিকে, আর কখনও বা শ্রোতৃবৃন্দের দিকে তাকিয়ে। যখন তিনি শ্রোতার দিকে তাকাতে ছিলেন, তখন তিনি স্বীয় শুণ্ড তুলছিলেন। তাঁর বাহন মূষিক তৎপার্শে চুপ করে বসেছিল। গোপাল স্বয়ং সভায় বসতে মঙ্গল পালিয়ে গেলেন এবং প্রায় একশত সূক্ষ্মদেহী ও প্রেতাত্মা

সভায় গোপাল দর্শনে ও গোপাল মাহাত্ম্য শুনতে এলেন। সূক্ষ্মদেহীরা নাটমন্দিরে এবং প্রেতগণ দক্ষিণ গুদামের দেওয়ালে ও উত্তর মিলের প্রাচীর গাত্রে দাঁড়িয়েছিল। পদ্মাদেবীও সভায় প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন।

১৪ই আগষ্ট রবিবার জন্মাষ্টমী দিবসে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল ও দুর্যোগ চলেছিল। বৈকালে সাড়ে তিনটার সময়ও দেখা গেল, মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছিল ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মহাগৌরী স্বীয় শয্যায় ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শায়িত, গোপালজী তাঁর বিছানায় খেলা করছিলেন। পৌনে চারটায় উঠে তিনি দেখলেন, বৃষ্টি একটু কমেছে ও আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েছে, কিন্তু মেঘ রয়েছে, বৃষ্টি আসতে পারে। তখন তিনি গোপালকে বললেন, "বাবা আজ আমরা এখানে তোর জন্মোৎসব করছি। যদি জল হয়, লোকজন কি-করে আসবে? উৎসব কি করে হবে? আকাশ পরিষ্কার করে দে।" সঙ্গে সঙ্গে দুই দশ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে কটকটে রৌদ্র উঠেছে। তারপর দেখা গেল, ভগবান বালকৃষ্ণ পায় নূপুর, কোমরে গোট, নীচ হাতে বালা, উপর হাতে নীল সমন্তক মণি যুক্ত তাবিজ, গলায় সমন্তক মণির মালা ও বনফুলের মালা, মস্তকের চূড়ায় শিখি পাখা, হাতে শ্বেতপুষ্পের মালা বাঁধা ও সুদর্শন চক্র ডান হাতে ধরে দাঁড়িয়েছেন। তখন বেলুড়, বালি, লিলুয়া, ঘুসুড়ি ও গঙ্গার ওপার পর্য্যন্ত মেঘশূন্য আকাশ, চারিদিক সূর্য্যালোকে ঝলমল করছে। আবার সূর্য্যাস্ত সময়ে অত্যদ্ভুত অঘটন ঘটিল। মাস খানেক পূর্বে মধ্যে মঙ্গলগ্রহ আমাকে গ্রাস করতে এসেছেন ও আড়াই বৎসর তাঁর প্রবল প্রভাব আমার উপর পড়বে। কিছুদিন পূর্বে মন্দিরে মঙ্গলগ্রহ এসেছিলেন। তখন তাঁকে দিব্য অগ্নি জ্বালিয়ে তাড়ান হয়। সেইদিন থেকে তিনি মূর্তিশূন্য হয়ে ক্ষেপে আছেন। তখন থেকে তিনি মন্দিরের দশ বার হাত দূরে ও ভূমি থেকে ২৫।৩০ হাত উপরে সর্বক্ষণ বর্তমান রয়েছেন ও আমার অসতর্ক মুহূর্তে গ্রাস করতে ছুটে আসছেন। মহাগৌরী তিন

চার দিন পূর্ব থেকেই বলছেন, "দাদু, একটা কাল ছায়া দূর থেকে পড়ছে। ইহা অমঙ্গলসূচক মনে হচ্ছে।" আজ সন্ধ্যা সমাগমে সূর্য্যদেব পাটে বসলেন, তখন স্থূল চোখে সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ দেখলেন, গোপালরূপী সনাতন পরমাত্মাকে মঙ্গলগ্রহ ব্রহ্মা সহ পূজান্তে নমস্কার করে বললেন, "আপনি আমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন ও আমাদের কর্মে অধিকার দিয়েছেন। আবার আপনি আমাদের কর্মাধিকারে হস্তক্ষেপ করেছেন। তাহলে সৃষ্টিরক্ষা হবে কি করে? জীবের কর্মক্ষয় কিরূপে করা যাবে?" তখন বালকৃষ্ণরূপী পরমাত্মা বললেন, "এরা আমাকে খুব ভালবাসে ও আমার জন্মোৎসব করেছে।" ভৈরবানন্দকে দেখিয়ে গোপালজী আরও বললেন, "ও আছে, বাধা দিবে যথাসাধ্য। তোমরা কি ওকে রুখতে পারবে?" তখন তাঁরা বললেন, "আপনি সরে যান। আমরা আমাদের কাজ করি। তখন যাহা হয় হবে।" ইহার উত্তরে গোপালজী বললেন, "না, তা হয় না। আমি গৌরীমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি; যদিও আমি সরে যাই, মা আমাকে ছাড়বে না। তখন ব্রহ্মা মঙ্গল সহ বললেন, "তাহলে জীবের প্রারব্ধক্ষয় কিরূপে হবে? ইহার কারণ, মঙ্গল জগদীশ্বরানন্দের শরীরে আঘাত করতে পারছে না। যখনই সে যাচ্ছে, তখনই ভীষণ প্রত্যাঘাত খেয়ে ফিরে আসছে। সেজন্য মঙ্গল মূর্তিহীন হয়েছে ভৈরবানন্দের যোগাগ্নিতে। যদি ওর সংকল্পগত ক্রিয়াকলাপে আঘাত করে মনস্তাপ সৃষ্টি না করা যায়, কিরূপে ওর প্রারব্ধ ক্ষয় হবে?" পিতামহের প্ররোচনায় গোপালজী মহাশূন্য থেকে সুদর্শন চক্রের প্রভাব স্তিমিত করে মন্দিরে ফিরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ মেঘাবৃত হয়ে বৃষ্টি পড়ল। সেই সময় উক্ত ঘটনা জানতে পেরে সন্ধ্যা থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ভৈরবানন্দ বাহিরে দাঁড়িয়ে সমস্ত বৃষ্টি স্বশরীরে ধারণ করলেন। প্রবল ঝড় ও মেঘগর্জন আরম্ভ হল, পৃথিবীতে ২।৫ মিনিটের জন্য গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ল। এই

ভাবে চার ঘণ্টার মধ্যে ছয় বার ভৈরবানন্দ বৃষ্টি ধারণ করলেন। শেষ সময় দেখা গেল, মঙ্গলগ্রহ যথাশক্তি রুদ্রমূর্তি ধরে ভৈরবানন্দের দিকে ছুটে এল। তখন ভৈরবানন্দের দেহ থেকে অগ্নিতুল্য মহাজ্যোতিঃ বেরিয়ে মঙ্গলের উপরে গিয়ে পড়ল। ইহাতে মঙ্গলের সর্বাঙ্গ শরীর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। মঙ্গল জ্বলতে জ্বলতে গিয়ে গঙ্গায় পড়লেন। তখন মা গঙ্গা মঙ্গলকে কোলে নিলেন। ইহাতে মঙ্গলের গাত্রাগ্নি নির্বাপিত হলো, তিনি একটা কাল লম্বা রেখায় পরিণত হলেন। যেমন ক্রুদ্ধ মঙ্গলের কাল গোল জ্যোতিঃ ও লম্বা রেখা দেখাগেল, তেমনি সর্বগ্রহ বা সর্বদেবতার রুদ্র মায়া শক্তি প্রকটিত হয়। ভৈরবানন্দ মাথায় সমস্ত বৃষ্টি ধারণ করলেন, কিন্তু তাঁর গাত্র বা গাত্রবস্ত্র ভিজিল না, শুধু মাথার চুল ভিজে গেল। তাঁর গা টিপে দেখা গেল, যে শরীর লৌহবৎ কঠিন, তাহা নরম হয়েছে, তলতল করছে। ভেতরে জলধারণ করায় তিনি রাত্রে ছয় বার পেচ্ছাব করলেন। বিধাতার বিধানে কপালে যা লেখা আছে, ইষ্টশক্তি বা যোগশক্তি দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ রোধ করা যায় না। খানিকটা ভোগ করতেই হবে। তাতে সাধকের বিশেষ ক্ষতি হবে না। আমাদের জন্মাষ্টমী মহোৎসব সুশৃঙ্খলভাবে সমাপ্ত হল। জন্মাষ্টমীর দুই তিন দিন পূর্ব থেকে ননীমার শ্বাশুড়ী ও তৎগুরু (উভয়ে সূক্ষ্মদেহী বিষ্ণুভক্ত) এখানে এসে মন্দিরের চার দিকে ঘুরছিলেন, মন্দিরে ঢুকতে পারছিলে না। তাঁরা উভয়ে স্বর্গলোকের রজোস্তরের অধিবাসী। আমি ও মহাগৌরী উভয়কে স্পষ্ট ভাবে দেখলাম এবং ভৈরবানন্দও উক্ত দিন এসে দেখলেন ও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি উদ্দেশ্যে আপনারা এসেছেন ? তাঁরা উভয়ে আসল উদ্দেশ্য গোপন করে বললেন, আমরা এখানে সাধন ভজন করতে চাই। তখন আমরা তিনজন মিলিতভাবে বললাম, "আমাদের মন্দিরে স্থানাভাব। আপনারা এখানে থাকতে পারবেন না।" তাঁরা জোড় হাত করায় তাঁহাদিগকে বলা হলো, "গুদামের টিনের চালে থেকে সাধন ভজন করুন।"

ইহাতে গুরু ও শিষ্য উক্ত স্থানে পাশাপাশি বসে জপধ্যান করলেন। রবিবার জন্মাষ্টমী দিবসে তাঁদের উদ্দেশ্য বোঝা গেল। তাঁরা তাঁদের ঠাকুর-ঘর থেকে তিন যমদূত সরাতে ও গোপালকে নিয়ে যেতে এসেছেন। আমরা বললাম, "আপনারা পারেন ত গোপালকে নিয়ে যান, কিন্তু আমরা গোপাল ঠাকুরকে আপনাদের হাতে তুলে দেবো না। তিনি দয়া করে এসেছেন ও এখানে প্রেমলীলা করছেন।" তখন তাঁরা গম্ভীর হয়ে রইলেন ও হাত নেড়ে বললেন, "আমাদের সাধ্য নাই, গোপালকে এখান থেকে নিয়ে যেতে, আপনারা না দিলে।" তখন তাঁরা উপদ্রব করতে লাগলেন। রবিবার রাত্রি বারটায় জন্মাষ্টমী উৎসব সমাপ্তির পর ভৈরবানন্দ সূক্ষ্মশরীরে টিনের চালায় তাঁদের কাছে গেলেন ও মিনতি করে বললেন, "আপনারা অন্যত্র যান।" তখন তাঁরা ক্রোধভরে বললেন, "আমরা যাব না, আমাদের গোপালকে দিতে হবে।" ভৈরবানন্দ তাঁহাদিগকে বললেন, "আপনাদিগকে যা বলবার তা কাল বলেছি। দ্বিতীয় কথা নাই। আপনারা দয়া করে সরে যান।" তখন সেই সাধুগুরু রুদ্রভাব দেখালেন। ইহাতে ভৈরবানন্দ সূক্ষ্মদেহে যোগ শক্তি প্রয়োগ করতে দাউ দাউ করে অগ্নি জ্বলে উঠল। তাঁরা তা দেখে ভয় পেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে ননীমার ঠাকুর-ঘরে গেলেন। যখন আমরা গোপালকে দিলাম না, ওঁরাও স্বীয় ভক্তিবলে গোপালকে নিতে পারলেন না, তখন তাঁরা বললেন, তবে ননীমার ঠাকুর-ঘর থেকে যমদূত তিনটি সরিয়ে দিন। ভৈরবানন্দ তাঁহাদিগকে বললেন, আপনারাই সরিয়ে দিন। তাঁরা জানালেন, আমাদের সাধ্য নাই। ইহাতে ভৈরবানন্দ বললেন, ননীমা বাবার কাছে এলেই তারা সরে যাবে, নচেৎ নয়।

১৪ই আগষ্ট রবিবার জন্মাষ্টমীর সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে ধর্মসভায় চেয়ারে শ্রীকৃষ্ণের ছবি সাজান হয়েছিল ফুল ও মালাদি দিয়ে। মন্দিরস্থ

দেবগণও আমাদের সপ্রেম আহ্বানে সভাস্থলে উপস্থিত হলেন। শুভ জন্মাষ্টমী বলে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে গোপাল মূর্তিতে বসলেন অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে। যখন কথক গুরু ও ইষ্ট বন্দনান্তে পাঠারম্ভ করলেন, তখন গোপালজী মদনমোহন (রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন) মূর্তি ধারণ করলেন। কেন গোপালজী উক্ত মূর্তি ধরলেন—বুঝতে না পেরে আশ্চর্য্যান্বিত হলাম। তখন ভৈরবানন্দ পরমহংস দিব্যদৃষ্টি বলে জানলেন, মদনমোহন কথকের ইষ্টদেব। ঐ কথক অধম স্তরের ইষ্টসিদ্ধ সাধক, কিন্তু তিনি নিজে তাহা জানেন না। ঐ বিষয় বুঝতে হলে আরও বহু উর্দ্ধে উঠতে হবে। পরদিন উক্ত কথক জিজ্ঞাসিত হয়ে সহাস্যে স্বীকার করলেন, আমার ইষ্টদেব মদনমোহন। রবিবার বৈকালে অবিরাম বৃষ্টিপাত দেখে তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ গোপালকে বললেন, যদি বিকাল তিনটা থেকে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হয় এবং তোমার জন্মোৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তোকে সন্দেশ খাওয়াবো। তখন স্নেহের গোপালজী আবদার করলেন, শুধু সন্দেশ নয়, মাখন ও মিছরি দিতে হবে। ভৈরবানন্দ গোপালের আবদার সানন্দে স্বীকার করলেন। পূর্বোক্ত দৈব কারণে গোপালজী আমাদের প্রার্থনা পূরণ করতে পারেন নি। তিনি সোমবার তাহা পূর্ণ করেছিলেন। উহা পূরণ করার পরই সোমবার রাত্রি এগারটায় গোপালজী ধরে বসলেন, আমাকে সন্দেশ ও মাখন মিছরী দাও। ভৈরবানন্দ স্নেহভরে বললেন, "বাবা, রাত্রি এগারটায় ঐ সব দ্রব্য পাব কোথায়? কাল সকালে দেবো।" মঙ্গলবার সকালে বিছানা থেকে উঠতে না উঠতেই গোপালজী হাত বাড়িয়ে বললেন, মাখম-মিছরি ও সন্দেশ দাও। অবিলম্বে বাজারে লোক পাঠিয়ে মাখম ও মিছরি আনিয়ে গোপালজীকে নিবেদন করা হল। গোপাললীলা সর্বাপেক্ষা সুমধুর ও আনন্দবর্দ্ধক।

১৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার সকালে মন্দিরে মহাগৌরী কয়েকটী নাড়ু

গোপালকে ভোগ দিলেন ও বললেন, বাবা, তুমি নিজে খাও ও অন্যান্য দেবতাকে দাও। গোপালজী নিজে নাড়ু খেলেন কিন্তু কাউকে দিতে চাইলেন না। আমাদের পুনঃপুনঃ অনুরোধে অন্যান্য দেবতাকে একটু একটু দিলেন, কিন্তু কল্কিকে দিলেন না। দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর-পূজা করলাম ও অন্নভোগ দিলাম। তখন ঠাকুরকে ও গোপালকে পৃথক নৈবেদ্য দেওয়া হলো। ঠাকুরের নৈবেদ্য থেকে গোপাল পেয়ারা নিয়ে খেতে লাগলেন নিবেদনের পূর্বেই। গোপালের নৈবেদ্যে ভৈরবানন্দ-প্রদত্ত মাখন, মিছরি ও সন্দেশ ছিল। গোপালজী সেটী নিয়ে খেলেন এবং মঙ্গল-গ্রহকে দিতে বলায় প্রথমে দিতে চাইলেন না, পরে একটু প্রসাদ দিলেন। শিবস্নানকালে গোপালকেও স্নান করান হলো। মঙ্গলকবচ পাঠ ও মঙ্গলমন্ত্র জপ করে মঙ্গলকে গন্ধপুষ্প দেওয়া হলো। মহাগৌরী ঠাকুরকে মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ফুল দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় গোপালজী পা দুটি ঝুলিয়ে বসলেন ও ঐ ফুল নিজ পায় নিলেন। বগলামুখীর জপ ও ধ্যান করে তাঁকে সচন্দন ফুল দেওয়া হলো। তখন সেই ফুল শিব ঠাকুর স্বীয় পদে নিলেন। বৈকালে আমি মন্দির খুলে মহা-গৌরীর জন্য মিছরির সরবৎ লেবু রস সহ গেলাসে নিয়ে যেতেই গোপালজী গিয়ে দাঁড়ালেন। মনে হল, পূর্ব দিনবৎ মন্দির খোলার পরই তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে গেলেন। মহাগৌরী তাঁকে সরবৎ নিবেদন করতেই তিনি দুই হাতে গ্লাস ধরে সরবৎ খেলেন। পূর্বদিন ভাগবত ব্যাখ্যাকালে কথক বললেন, বসুদেব গভীর নিশীথে বাসুদেবকে কোলে নিয়ে যমুনা পার হচ্ছেন। যমুনাজী দুই ফাঁক হয়ে গেলেন, কিন্তু উত্তাল তরঙ্গ নাচতে নাচতে এসে দেব শিশুকে বসুদেবের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মাথায় রাখলেন। মহাগৌরী নাটমন্দিরে সভাস্থলে বসে স্পষ্টভাবে দেখলেন, সুনীল যমুনার তরঙ্গ-শীর্ষে সদ্যজাত দেবশিশু শায়িত ও দুটী হাত জোড় করে কাত হয়ে

আছেন। সন্ধ্যায় মহাগৌরী মন্দিরে ধূপ-দীপ ও মোমবাতি জ্বালিলেন এবং আমরা নামকীর্তনান্তে দুটি গোপাল সঙ্গীত—(১) সুন্দর লালা নন্দদুলালা ও (২) পীতম্ প্যারে বংশীওয়ারে—গাইলাম। এমন সময় গোপালজী এসে আমার বাম কোলে বসলেন ডান দিকে পা ছড়িয়ে। তখন মা কালী সামনে আসায় অনন্তনাগ কালীকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। আজ সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ মাকড়দহে গেলেন। অথচ মন্দিরে সান্ধ্য আরতির সময় তিনি সূক্ষ্মদেহে এসে বসলেন ও মা কালীকে আমার সামনে রাখলেন। তাই অনন্ত নাগ তাঁকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। এত স্পষ্টভাবে অনন্তনাগকে আমি ইতোপূর্বে দেখিনি। স্নেহের গোপাল আমার কোলে বসায় তাঁর দয়ায় অনন্তনাগকে স্পষ্টভাবে আমি দেখতে পেলাম। নামকীর্তনকালে অনন্তনাগ হেলে দুলে নাচছিলেন। কোমরে ব্যথা হওয়ায় সন্ধ্যার পর আমি স্বীয় শয্যায় শুয়েছিলাম। কোন ভক্ত গরম ঘি আমায় কোমরে মালিশ করছিল। তখন মহাগৌরীর অনুরোধে গোপালজী এসে তাঁর দুটি ছোট নরম হাত আমার কোমরে বুলাতে ছিলেন। তাই আমার কোমর বেদনা অচিরে কমে গেল।

১৭ই আগষ্ট বুধবার সকালে মহাগৌরী সন্দেশ ও নাড়ু গোপালকে ভোগ দিলেন ও বললেন, বাবা, এই অল্প মিষ্টি তুমি একা খাও, কাউকে দিতে হবে না। গোপালজী এত অবাধ্য যে, তাঁকে যেটা বলা হবে, তার উল্টোটা তিনি করবেন! তাই তিনি আমাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে সকল দেবতাকে প্রসাদ দিতে চাইলেন। তখন মা যশোদা চোখ পাকিয়ে গোপালকে কোলে নিয়ে জোর করে ঐ মিষ্টি খাইয়ে দিলেন। সকাল ৯৷৷০ টায় আমি এক গ্লাস গরম দুধ মহাগৌরীকে খেতে দিলাম। তখন গোপালজী এসে কাছে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে ঐ দুধ নিবেদন করতেই তিনি সানন্দে ঐ দুধ খেলেন।

আজকাল গোপালজী সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন। তাঁর অঙ্গবাস পেয়ে আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। পদ্ম ও চম্পকের মিলিত সুগন্ধ তাঁর দিব্যদেহ থেকে বিনিঃসৃত হয়। আজ সকালে লিলুয়া স্টেশন পর্যন্ত বেড়াতে গিয়েছিলাম রেলওয়ে কলোনি দিয়ে। গোপালজী কৃপা করে আমার কাঁধে চড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। একুশে আগষ্ট রবিবার সকালে আমরা মন্দিরে নামকীর্তন করলাম ও মহাগৌরী হারমোনিয়াম বাজিয়ে দুটী ভজন গাইলেন। মন্দিরে আমি দেখলাম, সেই সূক্ষ্মদেহী বয়োবৃদ্ধ বৈষ্ণবকে। তিনি মাঝে মাঝে এই মন্দিরে আসেন। এক দিন তিনি খড়ম পায় দিয়ে মন্দিরে আসায় মহাগৌরী তাঁকে দেখে ভয় পেয়েছিলেন। দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর পূজা করলাম ও অন্নভোগ দিলাম। শিবপ্রিয়া ফুলের মালা গেঁথে ঠাকুরকে ও মহাগৌরী শ্রীমাকে পরালেন। গোপালকে মালা দেওয়া হয়নি। তাই তিনি ঠাকুরের গলার মালা খানি দুই হাতে ধরে টান দিলেন। সেজন্য ঠাকুর নিজ গলার মালাটী গোপালের গলায় পরিয়ে দিলেন।

২২ আগষ্ট সোমবার সকালে আমরা মন্দিরের নামকীর্তনান্তে শিব সঙ্গীত ও শিবস্তোত্র পাঠ করলাম। সকালে যখন মহাগৌরী দুধ খেলেন, তখন গোপালজী এসেই দুধ খেলেন। শনিবার রাত্রে যখন আমরা নীচে ভাত খাচ্ছিলাম, তখন আমি ঠাকুরকে অন্নব্যঞ্জন নিবেদন করতেই গোপালজী মা দুর্গার কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে আমার অন্নাদির দিকে চাইছিলেন। সেজন্য মা দুর্গা ঐ নিবেদিত অন্নাদি খাওয়ালেন। সোমবার শিববার বলে পূজাকালে দেখা গেল, শিব আসনে বসলেন ও ঠাকুর শিবের মাথায় ফুল দিলেন এবং কল্কি-ভক্তবৃন্দ এসে কল্কিদেবকে সাজালেন।

আজ মন্দিরে আমি ও মহাগৌরী ঠাকুরপূজা করলাম ও অন্নভোগ দিলাম। পূজাকালে মা যশোদা হলুদে শাড়ী পরে এলেন। বগলা ও

মঙ্গলের পূজা হলো। সূর্য্য, কল্কি, গোপাল ও ঠাকুরকে অর্ঘ্য দেওয়া হলো এবং তাঁদের দিব্যদেহে ঐ সব অর্ঘ্য স্পষ্ট দেখা গেল। আজ বৈকালে মন্দিরে আমি মা যশোদাকে দেখলাম। মিছরির সরবৎ তৈরী করে বৈকালে আমি মহাগৌরীকে দিতেই গোপালজী ছুটে এলেন। তখন মা যশোদা গোপালকে ধরতে এলেন মহাগৌরীর বিছানার কাছে উত্তর বারান্দায়। তখন গোপালজী দুই হাতে গ্লাস ধরে সরবৎ খাচ্ছিলেন। মা যশোদা এসেই তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। বৈকালে কোন ভক্ত ভাল সন্দেশ কাগজের বাক্সে এনেছিল। তন্মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ পাথরের বাটীতে মন্দিরে গোপালকে নিবেদন করা হলো। নিবেদনের পূর্বে গোপালজী সন্দেশ বাক্সের কাছে বসেছিলেন দুষ্ট শিশুতুল্য। মহাগৌরী তাঁকে সন্দেশ নিবেদন করতেই তিনি মা যশোদার কোলে বসে খেলেন। আমি তাঁকে অনুনয় করলাম, বাপধন, গণেশ ও কার্তিক প্রভৃতিকে একটু করে মিষ্টি দাও। তখন তিনি মা যশোদার কোল থেকে নেমে মা কালী প্রভৃতি সকলকে সন্দেশ দিলেন। গোপালজী আমাদের দুরবস্থা দেখে স্বকীয় আহার্য্য স্বয়ং সংগ্রহ করেন, মন্দিরের তিন বারান্দায় ঘুরে বেড়ান ও মন্দির আলো করে আছেন। দুপুরে পূজার সময় গোপালকে জবা ফুল সহ যে অর্ঘ্য মহাগৌরী দিয়েছিলেন, বৈকালে মহাগৌরী দেখলেন, সেই জবাফুল মাথায় নিয়ে গোপাল মা যশোদার কোলে বসে আছেন।

২৪ আগষ্ট বুধবার সন্ধ্যায় আমাদের নাটমন্দিরে আমেরিকান সিনেমা প্রদর্শিত হলো দেড় ঘণ্টা ধরে। আকাশ নির্মল থাকায় ছয়-সাত শত লোক সিনেমা দেখতে এসেছিল। মহাগৌরী বৈকালে বালি বাসা থেকে এসে বললেন, স্নেহের গোপাল বাসে আমার সঙ্গে অর্দ্ধেক রাস্তা থেকে এলেন। মহাগৌরী এসে মন্দিরে গোপালকে সন্দেশ নিবেদন করলেন। ঠাকুর ও স্বামিজীর মাঝে বসে গোপালজী একই সন্দেশ খেলেন, যশোদা তখন তাঁর কাছে বসেছিলেন। গোপালজী অন্য কোন দেবতাকে সন্দেশ

দিলেন না। মহাগৌরী গোপালকে সন্দেশ নিবেদন করেই ভয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, ঠাকুর ও স্বামিজী মানুষের মত বড় ও স্পষ্ট হয়ে বসে আছেন ও আলাপ করছেন। তখনও ঠাকুরের বগলে অন্ধকার সিনেমার বিজ্ঞপ্তিটী ছিল, যেটী দুই তিন সপ্তাহ পূর্বে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। সিনেমার সময় মন্দিরবাসী গোপালাদি দেবগণ নীচে সিনেমার স্ক্রীণের গায়ে বিরাজ করছিলেন। সেই জন্য অসংখ্য সূক্ষ্মদেহী নাটমন্দিরের ছাদে ও চারি দিকে ভিড় করেছিলেন।

২৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার সকালে গোপালকে মহাগৌরী মন্দিরে সন্দেশ নিবেদন করতেই গোপাল একাই খেলেন। আবার বেলা নয়টার সময় দুধ ও মুড়কি মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় গোপালকে নিবেদন করতে গোপাল তা খেলেন। আজ মহাগৌরী তিনটী পুষ্পমাল্য গেঁথে ঠাকুর, শিব ও শ্রীমাকে পরিয়ে দিলেন। আমিও মহাগৌরী আজ দুপুরে মন্দিরে ঠাকুর-পূজা করলাম ও অন্নভোগ দিলাম। ফল-মিষ্টির নৈবেদ্যে পাকা মিষ্টি পেয়ারা ছিল। নিবেদন করার পূর্বেই গোপাল পেয়ারা তুলে খেয়ে ফেললেন। তখন ঠাকুর গোপালকে ধরে রাখতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। তখন গোপালজীকে শিব ঠাকুর ধরে রাখলেন। গোপালকে মালা দেওয়া হয়নি বলে তিনি ঠাকুরের মালা নিয়ে নিজ গলায় পরেছিলেন। ঠাকুর, গোপাল, সূর্য্য ও কল্কীকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়েছিল। এই চারি দেবতার দিব্য অঙ্গে দেখা গেল, ঐ সব অর্ঘ্য শোভা পাচ্ছে। দুরন্ত গোপালও অর্ঘ্যের জবাটী মাথায় রেখেছিলেন। অন্নভোগ নিবেদনের পূর্বেই গোপাল ডালের বাটীতে হাত দিলেন। তখন মা দুর্গা গোপালের হাত ধরে সরিয়ে নিলেন।

২৮ শে আগষ্ট রবিবার সকালে মহাগৌরী ধর্মচক্রে এলেন ও বললেন, "গত পরশু শুক্রবার রাত্রে স্বগৃহে সমাধিতে আমি দেখেছি, আমার দুই স্তন থেকে দুধ বেয়ে আমার পরিহিত বস্ত্র ভিজিয়ে মেজেতে ঝরে পড়ছে।

গোপাল আমার বুকে উঠে ঐ দুধ পান করছে ও আমি অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।” বাৎসল্য ভাব সাধনে মহাগৌরী পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন অঘোরমণি দেবীতুল্যা। রবিবার রাত্রি আটটায় ঠাকুরকে মন্দিরে পায়স ও ব্যঞ্জন নিবেদন করা হোল। ঠাকুর পায়স গ্রহণ করে গোপালকে দিলেন ও পরে মহাগৌরীকে দিতে চাইলেন, কিন্তু মহাগৌরী তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন মহাগৌরী মনে পূর্বজন্মের পুণ্যস্মৃতি উদিত হল এবং ঠাকুরকে পূর্বজন্মে এইরূপে খাওয়াতেন ভেবে তাঁর চোখে জল এল ও তিনি মেজেতে শুয়ে কাঁদতে লাগলেন। যথা সময়ে বাৎসল্যভাব সংবরণ পূর্বক তিনি বাহিরে এসে নিবেদিত পায়স ও ব্যঞ্জন গ্রহণ কালে দেখলেন, শিশু গোপাল অনন্ত শয্যায় শায়িত ও সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁর পদসেবা করছেন ও নারায়ণের নাভিকমলে ব্রহ্মা বিরাজিত।

২৯শে আগস্ট সোমবার দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপূজা করলাম ও অন্নভোগ দিলাম। পূজাকালে ব্যাসদেব এলেন—তাঁর বড় মাথা ও বড় চোখ। ব্রহ্মলোক থেকে ওঙ্কার দেবতা এলেন ও পূজাদি নিলেন। তিনি জ্যোতির্ময় জীবন্ত ওঙ্কার মূর্তি ও ব্রহ্মলোকে তাঁর অবস্থিতি। তখন গোপালজী বিশাল সমুদ্রে একটী তালের ডোঙ্গায় হাল ধরে বসেছিলেন। ঐ অপার সমুদ্রের পরপার দেখা যাচ্ছিল না যে কুলে গোপাল ডোঙ্গা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে অনেক সাধক ও দেবতা উপস্থিত ছিলেন। গোপালজী মহাগৌরীকে সেই ডোঙ্গা দেখিয়ে বলছিলেন, মা, তোমাকে এই ডোঙ্গায় ভবসাগর পার করে দেব। মহাগৌরী তাঁকে বললেন, “তুই আমাকে কি পার করবি? শিব ঠাকুরই আমাকে ভবপারে নিয়ে যাবেন।” তখন ভবপারের কাণ্ডারী গোপালজী পূর্বোক্ত সাধকবৃন্দ ও দেবগণকে দেখিয়ে জানালেন, তিনিই ভবসাগরের পারকর্তা। গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি মৃত্যু-সংসার-সাগরের সমুদ্ধর্তা। ৩০শে আগষ্ট বুধবার বৈকালে মহাগৌরী বাড়ী

থেকে এসে বললেন, "আমার বাবা রাণাঘাট থেকে ছানার গজা এনেছেন। গোপাল আমাকে বলছে, এই গজা আমাকে খেতে দাও; আর আমার জন্য তাল বড়া করে আন। তাই ছানার গজা ও তালের বড়া এনেছি গোপালের জন্য।" মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণামান্তে ঐ গজা ও বড়া গোপালকে নিবেদন করলেন। স্নেহের গোপাল সহাস্য বদনে এই সব দ্রব্য গ্রহণ করলেন ও অন্যান্য দেবতাকে দিলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর রবিবার বৈকালে মন্দিরের উত্তর বারান্দায় মহাগৌরী গোপালকে নিবেদন করতেই গোপালজী মা দুর্গার কোলে বসে এসে ঐ সরবৎ নিলেন এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক ও গণেশকে দিলেন। আমি ভেবেছিলাম, আমার মন্দিরবাসিনী সূক্ষ্মদেহী জননী বুঝি গোপালকে কোলে নিয়ে এলেন, কারণ তখন মা দুর্গা দ্বিভুজা মানবী মূর্তিতে ছিলেন গোপালকে কোলে করে। আমার সন্দেহ ভঞ্জনার্থ দুর্গাদেবী দশভুজা হলেন। সন্ধ্যার পূর্বে আমিও মহাগৌরী অল্প দূর ভ্রমণান্তে নাটমন্দিরে বসে বিশ্রামকালে দেখলাম, শংকরাচার্য্য, শিব ঠাকুর ও দুর্গার কোলে গোপালজী দাঁড়িয়েছিলেন। তখনও গোপালের মাথায় মধ্যাহ্ন পূজায় প্রদত্ত অর্ঘ্যের জবাটী শোভা পাচ্ছিল। ৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার চূড়ামণিযোগ পড়েছিল। সকালে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় মহাগৌরী বসে গরম দুধ গোপালকে নিবেদন করলেন। ঐ দুধ গরম ছিল বলে গোপাল আঙ্গুল দিয়ে দেখছিলেন! তখন মা দুর্গা দুধ ও মুড়কি গোপালকে খাইয়ে দিলেন। অনন্ত নাগ গোপালের সঙ্গে ছিলেন ও প্রসাদ নিলেন। আজ সন্ন্যাসিনী শিবপ্রিয়া এসে আমাকে বললেন, "বাবা, আমি আজকাল খুব জপধ্যান করছি। গায়ত্রী জপ করতে করতে চতুর্ভুজা জ্যোতির্ময়ী গায়ত্রী দেবীকে দেখতে পাই। তাঁর চারি হাতে বেদ, শংখ, বর ও অভয় মুদ্রা বিদ্যমান এবং তিনি ব্রহ্মার সম্মুখে ব্রহ্মাকে আড়াল করে বিরাজ করছেন। আজকাল ধ্যানকালে ঠাকুর

ও শ্রীমাকে স্পষ্টভাবে দেখি। তাঁরা উভয়ে স্নেহভরে আমার মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।"

৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যা সমাগমে আমি ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে বেড়াইতেছিলাম। এমন সময় গোপাল ছুটে এসে আমার কাঁধে চড়ে বসলেন এবং গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহ দুর্গা দেবী এলেন। গণেশাদি কেউ আমার ইজি চেয়ারে, কেউ বা আমার টুলে বসে খেলা করতে লাগলেন। তা দেখে মহাগৌরী বললেন, "দাদু আপনার চেয়ার, টুল, কাপড়াদি অন্য কেউ যেন ব্যবহার না করে।" সান্ধ্য নামকীর্তনকালে মহাগৌরী মন্দিরে আসনে বসে সমাধিস্থ হয়ে দেখলেন, মা যশোদা গোপালকে কোলে করে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। যশোদার পরণে ঘাগরা, পকেটযুক্ত ব্লাউজ ও মাথায় ওড়না। তাঁর পেছনে চার সখি। গোপাল যশোদার কোল থেকে মহাগৌরীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তা দেখে মহাগৌরী গভীর সমাধিতে নিমগ্না হলেন। যশোদা একটু দাঁড়িয়ে গোপালকে মহাগৌরীর হাতে সঁপে দিয়ে অন্তর্হিতা হলেন। রাত্রিকালে মহাগৌরী ঠাকুরকে পায়স নিবেদন করলেন। ঠাকুর সেই পায়স নিজে নিলেন এবং গোপাল, গণেশ, কাল ভৈরবাদি সমস্ত দেবতাকে দিলেন। আমার মন্দিরবাসী তপস্যারত মাতাপিতা ঠাকুরের হাত থেকে প্রসাদ পেলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। তখন আমি ও মহাগৌরী মন্দির মধ্যে উত্তর দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। তৎকালে গোপালজী আমার কাছে এসে আমার কাপড় ধরে দাঁড়ালেন এবং বাম হাতে বাম চোখ বন্ধ করে ডান চোখে মহাগৌরীর দিকে তাকালেন ও তাঁর কোলে উঠতে চাইলেন। শিশু মাতৃক্রোড়ে বসতেই ভালবাসে, অন্যের ক্রোড়ে নহে। গোপালকে কোলে নিতে বলায় মহাগৌরী বললেন, "দাদু, আমি গোপালকে কোলে নিলে ও আমার কোল থেকে নামতে চাইবে না এবং আমার বাসা পর্য্যন্ত যাবে।

আমি চাই ও আপনার কাছ-ছাড়া না হয়।" এই কথা বলে মহাগৌরী বাসায় চলে গেলেন ও আমি গোপালের শাশ্বত সান্নিধ্য অনুভব করে স্তম্ভিত হলাম। ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার সকালে গোপালজী আমাদের চা-পানের অপেক্ষায় ছিলেন। মহাগৌরী তাঁকে চা ও মুড়ি-মুড়কি নিবেদন করতেই তিনি বাম বগলে দেবীবাহন পশুরাজ সিংহের গলা ধরে নিয়ে এলেন এবং নিবেদিত দ্রব্য নিজে খেলেন ও সিংহকে দিলেন। ঐ সিংহ সাদা ধবধবে ও বৃহৎকায় ছিল। গত রাত্রে ঐ সিংহ মন্দিরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ও ঠাকুরের হাত থেকে প্রসাদ নিয়ে খেল। ১১ই সেপ্টেম্বর সকাল নয়টায় আমি ও মহাগৌরী গঙ্গাস্নানে গেলাম। আজ মহাগৌরী গঙ্গাজলে গলা ডুবিয়ে দশ পনর মিনিট বসলেন ও বললেন, আমি সামনে মকরবাহনে গঙ্গাদেবী ও শিব ঠাকুরকে দেখছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, গোপালজী আসেন নি? তিনি উত্তর দিলেন, চপল গোপাল এসে মকরের মাথায় বসে আছে ও আমার দিকে মিট মিট করে তাকাচ্ছে। গঙ্গাদেবী গোপালের গলায় সাদা ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছেন। ঐদিন দুপুরে আমি মন্দিরে পূজার আসনে বসার একটু পরেই গোপাল এসে আমার কোলে বসলেন। তাই আমি পূজার মন্ত্র ভুলে যাচ্ছিলাম ও পূজার ক্রম ওলট পালট করছিলাম। গন্ধপুষ্প হাতে নিয়ে আমি যখন বগলামুখীর ধ্যান করছিলাম, তখন আমার ক্রোড়স্থ গোপালের কৃপায় আমার মধ্য থেকে শুভ্রবর্ণ জ্যোতির্ময় দিব্যদেহ বেরিয়ে বগলার শুভ্রবর্ণ জ্যোতির্ময় পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিল। আমি স্পষ্টভাবে দেখলাম, বগলামুখীর শুভ্রবর্ণ পাদদ্বয়ে মৎপ্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলির লাল ফুলগুলি শোভা পাচ্ছে। প্রায় তিন মিনিট আমার দিব্যদেহ দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। উহা সূক্ষ্মদেহ অপেক্ষা জ্যোতির্ময় ও ব্রহ্মজ্যোতিঃবৎ সমুজ্জ্বল। পূর্বে উহা কখনও দৃষ্ট হয় নাই। সন্ধ্যার পূর্বে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকার হওয়ায় বিশ্বরূপানন্দ আলো জেলে আমার শ্রুতিলিপি

লিখছিলেন। এমন সময় চতুর্ভুজ ব্রহ্মা এলেন পদ্মফুলের উপরে পদ্মাসনে বসে। তিনি এসেই ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে গোপালকে ধরতে গেলেন; কিন্তু ভক্তবৎসল গোপালজী সরে এসে আমার কোলের কাছে দাঁড়ালেন; একটু পরে ব্রহ্মাজী অন্তর্হিত হলেন। গোপাল ধরা না দিলে দেবতারাও তাঁকে ধরতে পারেন না।

স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, "মধ্যম ও চরম ইষ্টসিদ্ধির মধ্যে গোপাল ভাব সাধন আরম্ভ হয়। যাদের ইষ্ট গোপাল, তাদের ইষ্টসিদ্ধি পর্য্যন্ত হবে। আবার জ্ঞানীর কাছেও গোপাল আসবেন—শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বেদান্ত সাধনে তত্ত্বজ্ঞান বা পরমহংসত্ব লাভ করলেও গোপাল আসবেন সকল পরমহংস তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে। কারো রুদ্রমূর্তি, কারো উদাসভাব, করো বা একক ভাব প্রভৃতিকে সরস সুমিষ্ট করার জন্য গোপালরূপী ভগবান আসেন, যেমন শিশু আত্মীয়স্বজনের রুক্ষ-রুদ্র ভাব উপশম করেন মিষ্টি বাক্যে ও সুমধুর ব্যবহারে।" সন্ধ্যা পাঁচটায় চা ও বিস্কুট মহাগৌরী গোপালজীকে নিবেদন করলেন। তখন গোপাল বাঁশি হাতে করে কৃষ্ণরূপে দাঁড়িয়ে রইলেন, নিবেদিত চা-বিস্কুট নিলেন না। তিনবার বলা সত্ত্বেও বংশীধারী বাসুদেব নিচ্ছেন না দেখে মহাগৌরী বললেন, তবে বাবা, তুমি খেও না, আমিই খাই। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপাল-মূর্তি ধরে চা ও বিস্কুট সানন্দে খেলেন। স্বরূপ বিস্মৃত না হওয়া পর্যন্ত গোপালজী নিবেদিত দ্রব্যদ্বয় নিলেন না। সন্ধ্যার পূর্বে আমি ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে বসে আছি—আমি ইজি চেয়ারে ও মহাগৌরী পার্শ্বস্থ টুলে। তখন গোপালজী এসে প্রথমে আমার কোলে, পরে আমার মাথায় বসে খেলা করতে লাগলেন। তখন তপোলোক থেকে এক অধিবাসী (বেশ মোটা সোটা ও স্বাস্থ্যবান্) এসে আমার মাথার দিকে চাইছিলেন। একটু পরে গোপালজী আমার মাথায় বসে অনন্ত নাগ হলেন, কিছুক্ষণ পরে আবার গোপাল মূর্তি ধরলেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার বেলা এগারটায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপূজা করলাম ও অন্নভোগ দিলাম। পূজার প্রারম্ভ থেকেই গোপালজী এসে আমার কোলে বসলেন। তাই আমি মন্ত্রাদি ভুলে যাচ্ছিলাম। মহাগৌরীর অনুরোধে গোপালজী নেমে গেলেন ও শিবের কোলে উঠলেন, কিন্তু আমার কোলে আসার জন্য ডান হাত বাড়াতেছিলেন। তাঁর হাতের চেটো তারকার ন্যায় জ্বল জ্বল করছিল। সেটী সুদর্শন নয়, হাতের জ্যোতিঃ। নৈবেদ্য নিবেদন করিতে দেরী হওয়ায় গোপাল নৈবেদ্যের সন্দেশ নিয়ে খেতে লাগলেন এবং গণেশ, কার্তিক প্রভৃতি দেবতাকে দিলেন। যখন আমি দীপকাঠি জ্বেলে আরতি করছিলাম, তখন গোপালজী অধীর হয়ে হাতের হাওয়া করে দীপকাঠি নিভিয়ে দিলেন। অবিলম্বে নৈবেদ্য নিবেদিত হলো। পূজার পূর্বে যখন আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে তেল মাখছিলাম, তখন গোপালজী আমার বাম দিকে একটা বড় বাঘের উপর দাঁড়িয়ে মহাগৌরীর মুখপানে চেয়েছিলেন। নৈবেদ্য নিবেদনকালেও কৃষ্ণভক্ত বিদুর এসেছিলেন—লম্বা নাক, মাথার চুল শণের মত লালচে, গোঁফ দাঁড়ি নাই, খালি গা, ফরসা রং, কপালে সাদা চন্দনের ফোঁটা, চোখ বড় বড়। অন্নভোগ নিবেদন কালে দেখা গেল, রাম ও লক্ষ্মণ সহ রাজর্ষি বিশ্বামিত্র এলেন। রামের পেছনে তীরপূর্ণ তূণ বাঁধা, হাতে ধনু, বয়স পনের বৎসর। যখন তাড়কাবধের পূর্বে বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে দশরথের কাছ থেকে নিয়ে গোমতী নদী পার হন, তখনকার দৃশ্য প্রকটিত হলো। বিশ্বামিত্র গেরুয়া-পরা, মাথায় জটা জড়িয়ে বাঁধা, একটু লম্বা, একহারা চেহারা, তেজস্বী বদন। আমি স্থূল দেহে প্রণাম করতে তিনি দুই হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন এবং আমার কোলে গোপালকে দেখে তিনি অবাক্ হয়ে ভাবছিলেন, মর্ত্যলোকে কি এইরূপ ঘটনা সম্ভব? আমি পূজান্তে দাঁড়িয়ে সূক্ষ্মদেহে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পায় হাত দিয়ে প্রণাম করিতে

চাইলাম, কিন্তু তিনি তাহা নিলেন না। তাই আমি তাঁকে করজোড়ে শ্রদ্ধা জানালাম।

২০সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মহালয়ার সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে শালকিয়া বীণাপাণি কালীকীর্তন সমিতি ভক্তিভরে কালীকীর্তন করলেন। কীর্তনের আসরে মা কালীর বড় ছবি চেয়ারে রেখে মালা দিয়ে সাজান হয়েছিল। ঠাকুর, কল্কী, গোপাল, শ্রীমা, মা কালী, আমার মাতা-পিতা প্রভৃতি মন্দিরস্থ সকলেই নাটমন্দিরে কীর্তনকালে ছিলেন। গোপাল মাঝে মাঝে আমার কাছে বসেছিলেন বা দাঁড়িয়ে ছিলেন. কখনও আমার টাক মাথায় কীর্তনের তাল দিতেছিলেন। আজ দুপুরে পূজান্তে অন্নভোগের সময় যত দেবতা এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই সন্ধ্যায় প্রসাদ নিলেন। নরসিংহ, বরুণ, বামন, পরশুরাম প্রভৃতি বিষ্ণুর সব অবতার এলেন। গোপালজী দেখালেন, সর্বদেবী ও দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি ঘূর্ণায়মান গোলাকার কালচক্রে বিদ্যমান ও গোপাল তন্মধ্যে দণ্ডায়মান। পরে গোপাল অনন্ত নাগের মাথায় দাঁড়ালেন। অনন্তনাগের অনন্ত বা সহস্র ফণা। গোপাল তাঁর দুই বড় ফণায় দুই পদ রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। অনন্তর উক্ত ঘূর্ণায়মান গোলচক্র থেকে দেবীগণ অন্তর্হিত হলেন ও গোপাল শত শত বালমূর্তি ধারণ করলেন।

২৫ সেপ্টেম্বর রবিবার দুপুরে পূজাকালে যখন আমি মা-দুর্গাকে ধূপারতি করলাম, তখন গোপাল সরস্বতীর বাহন হংসকে এনে কোশার জলে চুবিয়ে রাখলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি, যশোদা প্রভৃতি অনেকে মন্দির মধ্যে পূজাকালে উপস্থিত হলেন। গত দুই দিন মহাগৌরী না থাকায় গোপালকে সকালে দুধ বা রাত্রে পায়স দেওয়া হয় নি। তাই আজ মা যশোদা একটী থালায় মিষ্টান্ন ও ছোট জলের গ্লাস নিয়ে এলেন এবং মহাগৌরীকে জানালেন। অনন্তর তিনি আমার ক্রোড়স্থ গোপালকে ডাকলেন। গোপাল যশোদার কাছে গিয়ে বংশীধর শ্রীকৃষ্ণ হয়ে

দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন মা যশোদা একটু থমকে দাঁড়ালেন। কিঞ্চিৎ পরে শ্রীকৃষ্ণ গোপাল মূর্তি ধরে সমস্ত মিষ্টান্ন খেলেন। আজ সকালে মহাগৌরী এসেই নিজে দুধ গরম করে ঠাকুরকে দিয়েছিলেন। তখন গোপাল সেই দুধ খেয়েছিলেন। যশোদার হাতে যে থালা ছিল, সেটী কাঁসার ও কাঁধা উঁচু। যশোদা সাদা শাড়ী পরা ও সামনে আঁচল দেওয়া। ২৮শে সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে মহাগৌরী বাড়ী থেকে এলেন। আজ শারদীয়া মহাষ্টমী। মহাগৌরী মন্দির মুছে ঠাকুর ও শ্রীমার জন্য মন্দিরে বসে ফুলের মালা গাঁথছিলেন ও ভাবছিলেন, গোপাল এসে কাছে বসুক, আর আমি মালা গাঁথি। তখন আমি নীচে নাটমন্দিরে টুলে বসে শিশি থেকে তেল নিয়ে মাখছিলাম স্নানের জন্য। মহাগৌরী মন্দিরে বসেই দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন, গোপাল আমার কাছে বসে শিশি থেকে তেল নিয়ে ছিটাচ্ছেন ও গায় মাখছেন। যখন আমি কুয়া তলায় কাঠের টুলে বসে বালতি থেকে মগে জল নিয়ে নিজ মাথায় ঢালছিলাম, তখন গোপাল আমার পিঠে চড়ে গলা জড়িয়েছিলেন। আমার স্নানের সঙ্গে গোপালের স্নান হয়ে গেল। তাই পূজাকালে শিবস্নানের সময় মহাগৌরী গোপালকে স্নানার্থ ডাকতে তিনি এলেন না! সুস্নাত গোপাল কি আর স্নান করেন? ২৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পূজার পূর্বে ভুবনেশ্বরের ব্রহ্মচারী নগেন্দ্রনাথ এসেছিলেন ও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে দেখছিলেন, গোপাল আমার কাঁধে চড়ে বেড়াচ্ছেন। কারণ গোপাল পূর্বে নীনমার কাছে ভুবনেশ্বর সারদাধামে ছিলেন। সন্ধ্যার পরে মহাগৌরী আমার শয্যায় বসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বিশ্রাম করছিলেন। গোপাল আমার শয্যায় গিয়ে অঙ্গুলিনির্দেশে মহাগৌরীকে সরে যেতে বললেন। মহাগৌরী না চলে যাওয়ায় গোপাল এসে আমার টেবিলে বসলেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর শারদীয়া বিজয়া দশমীর সকালে গোপাল এসে আমাকে বললেন, ছাখ, আমি কেমন সুন্দর সাদা ফুলের

মালা পরেছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাপধন আজ তোমাকে এই মালা কে দিয়েছেন? গোপাল আমার কথার জবাব না দিয়ে খেলতে লাগলেন। তখন মহাগৌরী বললেন, মা দুর্গাই দিয়েছেন। ৮ই অক্টোবর শনিবার পূজাকালে জলশুদ্ধির সময় গঙ্গাদেবী স্বহস্তস্থিত কমণ্ডলু থেকে সপ্ততীর্থের পূতবারি কোশায় ঢেলে দিলেন। শিবস্নানান্তে গোপালকে স্নান করান হলো। তখন দেখা গেল, গোপালই ঠাকুর হলেন, আর গোপাল হলেন না। ইহা দ্বারা গোপাল জানিয়ে দিলেন, তিনি ও ঠাকুর অভিন্ন। পুষ্পশুদ্ধি কালে গোপাল পুষ্পশুদ্ধি করলেন। পূর্ব দিনে গোপাল পূজার ফুলের উপর দাঁড়িয়েছিলেন বলে আমরা একটু বিরক্ত হয়েছিলাম। তাই আজ তিনি পুষ্পপাত্রে পুষ্পোপরি বসে পুষ্পশুদ্ধি করলেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার দুপুরে এগারটায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপূজা করলাম। জলশুদ্ধির পর কোশার শুদ্ধজল ফুল দিয়ে চারি দিকে 'মা-গঙ্গা' 'মা-গঙ্গা' বার বার বলে ছিটিয়ে দিবার সময় মা গঙ্গা স্বীয় কমণ্ডলু থেকে ব্রহ্মবারি মন্দিরে চারি দিকে ছিটিয়ে দিলেন। পুষ্পশুদ্ধির পূর্বেই গোপাল পুষ্পপাত্রে পূজার ফুলগুলির উপরে এসে দাঁড়ালেন। মহাগৌরী তাঁকে বকতে তিনি এক পা নামালেন, অন্য পাটি ফুলের উপর রাখলেন। এই কথা মহাগৌরী আমাকে বলে আবার তাঁকে মৃদু তিরস্কার করতে তিনি আমার কোলে এসে বসলেন। আমি বললাম, যাঁর পাদস্পর্শে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাঁর পাদস্পর্শে পুষ্পশুদ্ধিও হয়। আমার মনোভাব গোপালকে জানাতে তিনি তাঁর সাদা ধবধবে পাটি তুলে আমাকে দেখালেন। আজ গোপালজী মন্দিরমধ্যে জ্যোতির্ময় শুভ্রমূর্তি আর মন্দিরের বাহিরে সাধারণ শিশুবেশ ধরলেন। দুর্গা, বগলা, মঙ্গল প্রভৃতিকে তৎতৎ ধ্যানপাঠান্তে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হলো। মহাগৌরী ফুলের মালা দুটি গেঁথে ঠাকুর ও শ্রীমাকে পরিয়ে দিলেন।

শিবস্নানান্তে শিবের মাথায় অগুরু দেওয়া হলো। গোপালের মাথায় অগুরু দিতে মহাগৌরীকে বলা মাত্র গোপাল তাঁর মাথায় হাত দিয়ে দেখালেন, এখানে দাও। ৩রা অক্টোবর সোমবার সকালে আমরা মন্দিরে নামকীর্তন ক'লে গোপাল এপা ওপা তুলে নাচছিলেন। বেলা এগারটার পূর্বেই আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপূজায় বসলাম। ইহার দুই ঘণ্টা পূর্বে মহাগৌরী নানা রঙের ফুলের মালা গেঁথে ঠাকুর ও শ্রীমাকে পরিয়েছিলেন। আমি পূজার পূর্বে ঠাকুরকে প্রণাম করার সময় দেখলাম, গোপাল ঠাকুরের গলা থেকে মালা খুলে স্বীয় বগলে পুরে রেখেছেন, মালা বড় বলে গলায় পরতে পারেন নি। নৈবেদ্য নিবেদনের পূর্বেই গোপাল মা মাকড়চণ্ডীর পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে নৈবেদ্যের রুমাল তুলে সন্দেশ খেতে লাগলেন। ৭ই অক্টোবর শুক্রবার দুপুরে পূজান্তে অন্নভোগের সময় গোপালের জন্য যে দইটুকু কিনে আনা হয়েছিল, তা ভুলে অন্নভোগের সঙ্গে দেওয়া হয় নি, মন্দির মধ্যেই হারমনিয়াম বাক্সের উপর রাখা ছিল। অন্নব্যঞ্জনাদি নিবেদিত হতেই দেবতারা এসে পড়লেন। তখন গোপাল হারমোনিয়াম বাক্সের উপর মাটীর খুরীতে রাখা দইটুকু খেতে যাচ্ছিলেন। তা দেখে মহাগৌরী তাড়াতাড়ি উঠে ঐ দই এনে অন্নভোগের কাছে রাখলেন ঠাকুরের ছয়-সাত জন পার্ষদ পূজাকালে এসেছিলেন। ঠাকুর স্বহস্তে তাঁহাদিগকে কাঁচের ডিসে প্রসাদ দিলেন। গঙ্গাদেবীর ডান দিকে যে সখি থাকেন, সম্ভবতঃ জয়া, তাঁর মাথায় কোঁকড়ান কোঁকড়ান লম্বা কাল চুল গোপাল বাম হাতে টানছিলেন ও ডান হাতে দই খাচ্ছিলেন। এই কথা আমাকে মহাগৌরী বলায় আমি বিরক্ত হয়ে গোপালকে বারণ করতে গোপালজী জয়ার চুল ছেড়ে দিলেন। ৮ই অক্টোবর শনিবার সকালে আমরা মন্দিরে নামকীর্তন করলাম ও মহাগৌরী হারমোনিয়াম বাজিয়ে দুটি শ্যামা সঙ্গীত গাইলেন। নামকীর্তনকালে বালগোপাল হাততালি দিয়ে পা তুলে তুলে নাচছিলেন। পূর্বদিন মহাগৌরী ধ্যানযোগে উপলব্ধি

করলেন, "মন মোক্ষমুখী বা সমাধিপ্রবণ হলে, মানুষের শুধু শুদ্ধ ভাব দেখা যায়, অশুদ্ধ ভাব দেখা যায় না।" সন্ধ্যার পরে আমি ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে বসেছিলাম। তখন গোপালজী এসে দিব্য দোলায় দোল খেতে লাগলেন। তিনি ওখান থেকে সরে আমার কাছে আসার পর সেই স্থলে জ্যোতির্ময়ী শ্বেতকালী অন্যান্য মহাবিদ্যা সহ আবির্ভূতা হলেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় আমরা উভয়ে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় ছিলাম। তখন মহাগৌরী দেখলেন, শিব ঠাকুর গোপালকে কোলে নিয়ে সিঁড়ির চাতালে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার সমীপে দাঁড়িয়ে আছেন ও গোপালের মাথা শিবের কাঁধে রয়েছে। গোপাল কোন না কোন দেবতার কোলে বা কাঁধে চড়েন। তিনি সুমনোহর ও সর্বদেবদেবীপ্রিয় দেবশিশু। ৯ই অক্টোবর রবিবার ১৯৬০ সকালে আমরা মন্দিরে নামকীর্তন, কালীধ্যান ও কালী সঙ্গীত করলাম। আট দশ দিন ধরে এইরূপ চলছে ও ১৯ তারিখে কালীপূজা পর্যান্ত চলবে। সকালে শিবপ্রিয়া তাঁর অষ্টধাতুময় গোপাল মূর্তি নিয়ে এলেন। ঐ মূর্তির গলায় সোনার হার ও মাথায় রূপার মুকুট ছিল। আজ আমরা মন্দিরে পঞ্চোপচারে গোপালের পূজা করলাম। মহাগৌরী দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন, আমাদের গোপালই ঐ মূর্তি আশ্রয় করে পূজা নিলেন। অগুরু-বিন্দু গোপালের মুকুটে পড়ায় তিনি হাত দিয়ে মুছে ফেললেন ও তাঁর মাথায় অগুরু দিতে বললেন। তাই মুকুট তুলে গোপালের মাথায় অগুরু দেওয়া হলো। গোপালের পায় পুষ্পাঞ্জলি দিতে যাওয়ায় তিনি হাত নেড়ে মানা করলেন ও হাত পেতে আমার পুষ্পাঞ্জলি নিলেন। মহাগৌরী গোপালকে ধূপারতি করছিলেন। তখন গোপাল মহাগৌরীর হাতে থাবা মেরে নিষেধ করলেন। নৈবেদ্য নিবেদিত হলে গোপালজী স্বয়ং নিলেন ও শিবাদি দেবগণকে দিলেন। ১৮ অক্টোবর মঙ্গলবার বৈকালে আমার কোমর ব্যথা ও জ্বরভাব হওয়ায় আমি স্বশয্যায় শুয়েছিলাম। মহাগৌরী এসে আমার

গায় ও কোমরে হাত বুলিয়ে দিলেন। তাতেও আমার অসুস্থতার উপশম হলো না। তখন তিনি গোপালকে ডেকে বলতেই গোপাল তাঁর ছোট দিব্য হাত দুটি তিনবার আমার আপাদমস্তকে বুলিয়ে দিলেন. ইহাতে আমি অচিরে সুস্থবোধ করলাম এবং ঘুসুড়ী ও শিবপুর কালীপূজা মণ্ডপদ্বয়ে মহাগৌরীর সঙ্গে গিয়ে কালীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলাম। মহাগৌরীর আহ্বানে গোপাল ও শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে গেলেন।

২৮শে অক্টোবর শুক্রবার আমাদের বিবেকানন্দ নাটমন্দিরে মৃণ্ময়ী প্রতিমায় পঞ্চম বার্ষিক জগদ্ধাত্রীপূজা হলো। মন্দিরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মর মূর্তিতে মহাগৌরী স্থলপদ্মের মালা গেঁথে পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মালা পরে ঠাকুর দিব্যদেহে নাটমন্দিরে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সম্মুখে বসলেন। যখন অন্নভোগ দেওয়া হল, তখন মা জগদ্ধাত্রী এসে অন্নব্যঞ্জনাদির উপর যে শালপাতাগুলি ঢাকা দেওয়া ছিল, সেগুলি স্বহস্তে সরিয়ে দিলেন ও আসনে বসে সকল দেবতাকে প্রসাদ বিতরণ করলেন। প্রতিমার গলায় রজনীগন্ধা ও জবাফুলের মালা মহাগৌরী পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মালাদ্বয় মা জগদ্ধাত্রীর দিব্যদেহে দেখা গেল। একটি ক্ষুদ্র রৌপ্য আসন জগদ্ধাত্রী দেবীকে পূজাকালে দেওয়া হলো প্রথম উপচাররূপে। সেই ক্ষুদ্রাসন বৃহদাকার হলো ও দেবী আলতা পরা পাদুটী ঐ আসনে স্থাপন করলেন। দেবীর ডান দিকে রক্তদন্তিকা দাঁড়িয়ে লালবর্ণ প্রবালমালা জপছিলেন। তাঁর দেহ ও বস্ত্রালঙ্কারাদি রক্তবর্ণ। তিনি চতুর্ভুজা ও জ্যোতির্ময়ী এবং তাঁর অঙ্গজ্যোতিঃও রক্তবর্ণ। গণেশপূজার সংকল্প হয়েছিল, কিন্তু শেষে মা কালীকে ঐ নৈবেদ্য দেওয়া হলো। গোপালকেও পঞ্চোপচারে পূজা করে নৈবেদ্য দিয়ে বলা হলো, বাবা, গণেশ ও কার্তিককে নৈবেদ্যের অংশ দাও। তখন গোপাল নারায়ণ মূর্তি ধরে বসলেন এবং তাঁর গলায় সাদা ফুলের মোটা মালা ছিল। ঐ মালার এক এক ফুলের মধ্যে গণেশ ও কার্তিকাদি এক এক দেবতা বিরাজিত

দেখা গেল। অনন্তর গোপাল স্বীয় মালামধ্যস্থ গণেশ, কার্তিক প্রভৃতি দেবতাবৃন্দকে প্রসাদ দিলেন। নারদ, অঙ্গিরা ও অগস্ত্যাদি চারি ঋষি সহ তাঁর কাছে করজোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। গোপাল নারদাদি পঞ্চ ঋষিকে প্রসাদ দিলেন। ঋষি অঙ্গিরা সর্বপ্রথমে জগদ্ধাত্রীপূজা করেন। নাটমন্দিরে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সামনে সান্ধ্য আরতির সময় উল্লিখিত ঋষিবৃন্দ ও নারদাদি মুনিগণ ও মন্দিরস্থ দেবগণ উপস্থিত ছিলেন। আরতির সময় যখন আমি নেচে নেচে করতাল বাজিয়ে নামকীতন করছিলাম, তখন গোপাল এবং সিদ্ধযোগীরাও তৎসঙ্গে নাচছিলেন। আমি দাঁড়িয়ে নামকীর্তন করছিলাম। তখন গোপাল শূন্যে থেকে আমার সম্মুখে নাচছিলেন এবং একবার আমার ডান কাঁধে, আবার আমার বাম কাঁধে মাথা রেখে নাচছিলেন। অনন্তর ভবানীপুর রামকৃষ্ণ কালীকীর্তন সংঘ 'মহিষমর্দিনী' পালাগান করলেন। ২৯ শে অক্টোবর শনিবার পূর্বাহ্নে বিজয়াকৃত্যের প্রারম্ভেই অপরাজিতা দেবী এলেন—অপরাজিতা পুষ্পবর্ণের বেনারসী শাড়ীপরা, চতুর্ভুজা, মাথায় সোণার মুকুট ও হাতে-পায়ে সোণার অলঙ্কারাদি। সিংহপূজার সময় সিংহ জ্যান্ত হয়ে পূজা ও নৈবেদ্য নিলেন। তখন স্নেহের গোপালকে বললাম, বাবা, সিংহের মাথায় চড়ত। অবোধ অবাধ্য গোপাল তা না করে সিংহের মুখের দুই বড় পাটি ধরে ফাঁক করতে চাইলেন। আর সিংহ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মহাগৌরী বারণ করতে গোপাল সিংহকে ছেড়ে দিলেন। সন্ধ্যায় আন্দুল কালীকীর্তন সমিতি দুইঘণ্টা কালীকীর্তন করলেন।

৩০ অক্টোবর রবিবার সকালে আমরা মন্দিরে নামকীর্তন করিলাম ও মহাগৌরী হারমনিয়াম বাজিয়ে দুটি শ্যামা সঙ্গীত গাইলেন। যখন মহাগৌরী গান গাইছিলেন, তখন শ্বেতবর্ণ মাকালী এসে হারমোনিয়ামের ডালার উপর দাঁড়ালেন ও মহাগৌরী সমাধিস্থ হলেন। দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপূজা করলাম ও অন্নভোগ দিলাম। আজ

পূজান্তে কুলটির দুটি মেয়ে দীক্ষা নিল। তন্মধ্যে একটি বানরী যোনি থেকে এই তৃতীয় মানব দেহ পেয়েছে ও দীক্ষাগ্রহণের অনধিকারিণী। মন্দিরে মা কালীর সাথে যে যোগিনী থাকেন, তিনি ভয় দেখাতেই মেয়েটি মন্ত্র ভুলে গেল এবং বার বার বলা সত্ত্বেও মন্ত্র মনে রাখতে পারল না। জগদ্ধাত্রীধ্যান পাঠান্তে আমি পুষ্পাঞ্জলি দিতে সিংহারূঢ়া জগদ্ধাত্রী পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা মূর্তি ধারণ করলেন এবং আমার পুষ্পাঞ্জলি হাতে নিলেন, পায় নিলেন না। অনন্তর তিনি আমার কোলে এসে বসলেন। জগন্মাতাকে কন্যারূপে চিন্তা করি বলেই তিনি কৃপা করে আমার কন্যাত্ব স্বীকার করলেন। মহামুনি কাত্যায়নের কন্যাত্ব স্বীকার করায় জগন্মাতার একনাম কাত্যায়নী তখন গোপালজী এসে আমার ডান কোল জুড়ে বসেছিলেন। তাই আমি পূজার মন্ত্রও ক্রমে ভুলে যাচ্ছিলাম এবং পার্শ্বস্থা মহাগৌরীর কথাও বুঝতে পারছিলাম না। মহাগৌরী তিনবার বলতে কন্যারূপী জগদ্ধাত্রী ও গোপালজী আমার কোল থেকে নেমে গেলেন। ফুলের অভাবে গোপালকে অর্ঘ্য দেওয়া হল না। তাই আমি গোপালকে বললাম, "বাবা, আজ আর কিছুই নাই। এই দুটী ফুল নাও।" তখন গোপাল নৈবেদ্যের নাড়ু-সন্দেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে গম্ভীরভাবে জানালেন, এই ত আছে। চপল গোপাল ফুলের চেয়ে নাড়ু বেশী ভালবাসেন! পূজাকালে নারদের সাথে চারটী সিদ্ধ বৈষ্ণব এলেন। গোপাল তাঁদের মাথায় এক একটী চাঁটি মেরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

১১ই নভেম্বর শুক্রবার প্রাতে আমরা মন্দিরে নামকীর্তনান্তে গীতাপাঠ করলাম পূর্ব তিন দিনের মত। তখন গোপালজী ঠাকুরের কোলে বসে আমার দিকে পা দুটী ছড়িয়ে রেখেছিলেন। মনে হল, গোপালই গীতা বলছেন, আমাদের পাঠ শুনছেন না। ২৬শে নভেম্বর শনিবার গীতার জয়ন্তীর প্রথম দিবস দুপুরে পূজাকালে মন্দিরে গোপাল মহাগৌরীর কোলে

তাঁর বাঁশী দুইবার ফেলে প্রথমে ফলমিষ্টির নৈবেদ্য ও পরে অন্নভোগ খেতে গেলেন। গোপাল বাঁশিটী মহাগৌরীর কোলে দুইবার ফেলা মাত্রই মহাগৌরী পর পর দুইবার সমাধিস্থ হলেন। গত জন্মাষ্টমী থেকে মহাগৌরী 'গোপালের মা' হয়েছেন বলে গোপাল তাঁর মায়ের সঙ্গে খেলতে ভালবাসেন। আজ শিবপ্রিয়ার গোপাল মূর্ত্তিকে মন্দিরে আনা ও পূজা করা হয়েছিল। ঠাকুর, শিব, বগলা ও কল্কিকে ধ্যানান্তে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হলো, কিন্তু গোপালের ধ্যান পাঠ না করে তাঁকে গন্ধপুষ্প দেওয়ায় তিনি খাতা দেখিয়ে তাঁর মাকে জানালেন, মা, ঐ খাতায় আমার ধ্যান পড়ে আমাকে ফুল দাও। আজ মন্দিরে ও নাটমন্দিরে গোপাল কৃষ্ণমূর্তি ধরে বিশ্বরূপ দেখালেন। সন্ধ্যার পরে মন্দিরে লুচি, হালুয়া, তরকারী, সন্দেশ প্রভৃতি মহাগৌরী ঠাকুরকে নিবেদন করতে যাচ্ছিলেন। তখন গোপাল জানিয়ে দিলেন, "সেদিন দাদু বলেছিল, আজ দুপুরে আমাকে অন্নভোগ নিবেদন করবে, কিন্তু তা করেনি। মা, এখন এই সব আমাকে নিবেদন কর।" মহাগৌরী গোপালের কথা না শোনায় গোপাল কৃষ্ণমূর্তি ধরে বিশ্বরূপ দেখালেন। তখন মহাগৌরী তাঁকে উল্লিখিত দ্রব্যসমূহ নিবেদন করলেন। এই সব তাঁকে নিবেদন করতে গোপাল মহাগৌরীর গলায় দিব্য ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন এবং অঙ্গুলি নির্দেশে দেখালেন, ঠাকুরের গলায় যে গোড়ে মালাটী আছে, সেটী আমাকে দিতে হবে। তখন মহাগৌরী ঠাকুরের গলা ফুলের থেকে মালা খুলে নিয়ে নাটমন্দিরে গোপাল মূর্তিতে পরিয়ে দিলেন।

৩০শে নভেম্বর বুধবার দুপুরে আহারান্তে বিশ্রাম কালে মহাগৌরী যোগদৃষ্টিতে দেখলেন, "আমি পায়খানা থেকে এসে হাতে ছাই মেখে ধুইতেছি। আমার পাশে গোপালও দুই হাতে কনুই পর্যান্ত ছাই মেখেছেন। তা দেখে আমি রেগে গিয়ে গোপালকে বকছি। গোপাল আমার বকুনি অগ্রাহ্য করে ছাই ঘাটছেন। গোপাল আমার কথা না

শোনায় আমি তাঁকে মারতে যাচ্ছি। তখন গোপাল আমার দিকে এমনভাবে চাইলেন যে, আমি তাঁকে মারতে পারলাম না, স্নেহভরে কোলে নিয়ে আদর করলাম।" ৪ঠা ডিসেম্বর রবিবার রাত্রে যখন ঠাকুরকে পায়স নিবেদন করা হল, তখন গোপাল একটী সূক্ষ্মদেহী ভক্তকে প্রসাদ দিলেন। যখন উক্ত সূক্ষ্মদেহী আমার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন গোপালজী আমার বাম কাঁধে ডান হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন—নেড়া মাথা, বাম হাতে দণ্ড, বাম কাঁধে ঝুলি, গলায় মালা, ছোট গেরুয়া কাপড় পরা বামনমূর্তি। সত্যই রাম ও কৃষ্ণ তুল্য বামনদেব পূর্ণশক্তি অবতার। বামন পুরাণ দেখুন। ভক্ত-কবি জয়দেব গেয়েছেন—

ছলয়সি বিক্রমেণ বলিমদ্ভুত বামন
পদনখনীরজনিত জন পাবন
কেশবধৃত বামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥

১০ই ডিসেম্বর শনিবার শ্রীমা সারদার জন্মোৎসব দিবসে দুপুরে পূজান্তে পায়স ও মিষ্টান্ন সহিত অন্নভোগ শ্রীমাকে নিবেদিত হলো। আসনে বসতে শ্রীমার একটু দেরী হওয়ায় গোপাল শ্রীমার হাত ধরে টেনে নিয়ে আসনে বসালেন ও শ্রীমার কোলে বসে সানন্দে আহার করলেন। ১১ই ডিসেম্বর রবিবার সকালে মন্দিরে গোপালকে মিষ্টি ভোগ দিয়ে বলা হলো, বাবা, নিজে খাও ও সমস্ত দেবতাকে প্রসাদ দাও। কিন্তু গোপাল নিজে নিবেদিত সন্দেশগুলি খেলেন এবং সূক্ষ্মদেহী ভক্ত কর্তৃক প্রদত্ত আলুর চপ দেবগণকে দিলেন। গোপিকানন্দন সন্দেশ ভালবাসেন, আলুর চপ পছন্দ করেন না।

২৫শে ডিসেম্বর রবিবার বড়দিন ১৯৬০ দুপুরে মন্দিরে পূজান্তে অন্নভোগের সময় গোপাল ঠাকুরের হাত ধরে রইলেন ও আব্দার করলেন, আমাকে আগে খাইয়ে পরে অন্যকে দাও। ঠাকুর স্বীয় দিব্য কমণ্ডলু থেকে ব্রহ্মবারি ছিটিয়ে অন্নভোগ বিশুদ্ধ করলেন ও প্রথমে গোপালকে খাইয়ে

নিলেন। আজ খ্রীষ্টজন্মদিন বলে মন্দিরে জীশুখ্রীষ্ট, মেরীমাতা প্রভৃতিকে দেখে গোপাল ভয় পেয়ে আমার কোলে এসে বসে রইলেন পূজার সমাপ্তি পর্য্যন্ত। পূর্বদিন মহাগৌরী কুয়াতলায় নিত্যস্নান করছিলেন ও আমি তাঁর মাথায় বাল্‌তি বাল্‌তি জল ঢেলে দিতেছিলাম। তখন গোপাল আমার পীঠে লুকিয়ে থেকে কাঁধ দিয়ে উঁকি মেরে তাঁর মা মহাগৌরীকে দেখছিলেন। তৎপূর্বদিন সন্ধ্যায় আমি ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে বসেছিলাম। তখন গোপাল রাগ করে মেজেতে শুয়েছিলেন; কারণ গোপাল কিছুক্ষণ পূর্বে যখন তাঁর মার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন মহাগৌরী তাঁকে কোলে না নিয়ে অন্যের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এইজন্য গোপাল মায়ের উপর রাগ করেছেন।

৩১ শে ডিসেম্বর শনিবার ভোরে মন্দিরে পশ্চিম বারান্দায় একা বসে আমি চা খাচ্ছিলাম। তখন মহাগৌরী নীচে ছিলেন। আমি মনে মনে গোপালকে বলছিলাম, বাবা ও এই চা তোমাকে দিতে ইচ্ছা হয় না। তখন আমি মন্দির থেকে দিব্য সন্দেশাদির তীব্র গন্ধ পেলাম ও মহাগৌরীকে ডেকে বললাম। মহাগৌরী উপরে এসে দেখলেন, নন্দ ঘোষ বা তদ্বংশীয় কোন পুরুষ (লম্বা চেহারা, হলদে কাপড় পরা ও মাথায় পাগড়ী) একটি বড় পাথরেরর থালায় সন্দেশ ও ছানা এনে গোপালকে খাওয়াচ্ছেন। তারপর মন্দিরস্থ দেবগণকে দিলেন। গোপাল আমার সঙ্গে সিউড়ি যাবার জন্য সেজেগুজে তাড়াতাড়ি করে খেলেন ও আমার সঙ্গে পূর্ণ শক্তিতে সিউড়ি গেলেন।

১৫ ই জানুয়ারী ১৯৬১ রবিবার দুপুরে মন্দিরে আমি ও মহাগৌরী ঠাকুরপূজা করলাম ও অন্নভোগ দিলাম। ঠাকুরকে বড় বেলপাতার অর্ঘ্য দেওয়া হলো। পরে গোপালকে দেবার জন্য তুলসী পাতার অর্ঘ্য তৈরী হচ্ছিল। তখন গোপাল বললেন, "তুলসী পাতা বেলপাতার চেয়ে ছোট। তাই আজ তুলসী পাতার অর্ঘ্য নেবো ন বেলপাতার

অর্ঘ্য আমাকে দাও।" তাই মহাগৌরী গোপালকে বেলপাতার অর্ঘ্য দিলেন। অথচ তুলসী অর্ঘ্যই নারায়ণের প্রিয়। ২৪ জানুয়ারী মঙ্গলবার সকালে আমি ও মহাগৌরী চা পানান্তে গিরিশ ঘোষ রোড দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছিলাম বেলুড় মঠের অভিমুখে। কিয়ৎ দূর অগ্রসর হতেই আমরা উভয়ে টাট্‌কা গোলাপের তীব্র গন্ধ পেলাম। রাস্তার দুই পাশে কোন দোকানে টাট্‌কা গোলাপ বিক্রয়ার্থ রক্ষিত ভেবে আমরা এ দোকানে, ও দোকানে তাকালাম কিন্তু কোন দোকানে কোন ফুলই দেখলাম না, গোলাপ ত দূরের কথা! আঘ্রাত গোলাপ গন্ধ এত তীব্র ছিল যে, আমাদের কাছে সদ্য তোলা গোলাপ আছে ভেবে পথচারীরাও সেই গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের দিকে চাইছিল। তখন মহাগৌরী দিব্য চক্ষুতে দেখলেন, গোপাল ঠাকুর আমার মাথায় চড়ে বেড়াতে যাচ্ছেন ও গোলাপ গন্ধ বিকীর্ণ করছেন। একটু পরে গোপাল দিব্য ধূপের সুগন্ধ বিকীর্ণ করতে লাগলেন। আমরা বুঝলাম, পুষ্পগন্ধ ও ধূপগন্ধ গোপালের দিব্য দেহ থেকে বিনিঃসৃত। ২৬ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত্রে আমার জ্বর ও হাঁপানি হওয়ায় আমি শয্যায় শুয়ে সর্বদা জাগ্রত ছিলাম মহাগৌরীও উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শায়িত ছিলেন। মন সময় আমি স্পষ্টরূপে আঘ্রাণ করলাম টাট্‌কা পায়স ও ছানার সন্দেশের তীব্র মিষ্ট গন্ধ। এই কথা বিছানায় শুয়েই মহাগৌরীকে আমি উচ্চৈঃস্বরে বললাম ও দেখলাম, মন্দিরে একটী পাথরের গামলায় উক্ত দ্রব্যদ্বয় সযত্নে রক্ষিত। মা যশোদা ঐ সকল দ্রব্য গোপালকে ও অন্যান্য দেবতাকে খাওয়াচ্ছেন। অবশ্য গোপালকে একটী আলাদা পাত্রে ঐ দুই দ্রব্য দেওয়া হয়েছিল ও তিনি মহানন্দে এই সব খাচ্ছিলেন। আরও ২।১টী বৈষ্ণব সাধক এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে। শ্রীরাধা নীলাম্বরী শাড়ী পরে মন্দিরে সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দুগ্ধবৎ শুভ্রবর্ণ পদদ্বয় আমি স্পষ্টভাবে দেখলাম ও তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলাম। নীলাম্বরী

শাড়ী ভেদ করে তাঁর শুভ্র কান্তি অচলা দামিনীবৎ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। মহাগৌরী দেখলেন, তাঁর শুভ্র জ্যোতিঃতে মন্দিরের একাংশ আলোকিত। তখন আমরা নিশ্চয় করলাম, আজ কোন বৈষ্ণব সাধকের শুভজন্মতিথি। পরদিন সকালে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা খুলে দেখলাম, আজ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গুরু কেশব ভারতীর জন্মতিথি। পূর্বোক্ত বৈষ্ণব সাধক কেশব ভারতী ব্যতীত অন্য কেহ নহে। পরদিন শুক্রবার দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর-পূজায় বসলাম এবং শিবপূজা, ঠাকুরপূজাদি সমাপনান্তে কেশব ভারতীর উদ্দেশ্যে গন্ধ-পুষ্প দিলাম। আমাদের সভক্তি আহ্বানে কেশব ভারতী মন্দিরে এলেন এবং আমাদের পূজারতি নিলেন। তাঁর হাতে কাঠের কমণ্ডলু, চোখ দুটী তারকাবৎ উজ্জ্বল ও বিশাল, নেড়া মাথা ও ছোট টিকি, শ্যামবর্ণ ও মধ্যমাকৃতি, গেরুয়াপরা ও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স, ও গলায় শ্বেত চন্দন কাঠের মালা। মহাগৌরী অনেক সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে তাঁকে চিনতে না পেরে ভাবছিলেন, এঁদের মধ্যে কেশব ভারতী কে? এমন সময় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাঁর গলায় সাদা ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। তখন নিঃসন্দেহে জানা গেল, ইনি কেশব ভারতী। আমি তাঁকে প্রণাম করতে তিনি আমাকে সপ্রেম নিষেধ জানিয়ে ভগবান কল্কিদেবের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। তখন গোপাল আমার কোলে বসেছিলেন ও আমি তাঁর প্রেম-প্রভাবে মন্ত্র-ধ্যানাদি ভুলে যাচ্ছিলাম ও পূজার ক্রম ওলট পালট করছিলাম। গোপালের নির্দেশে কেশব ভারতী আমাকে প্রণাম করলেন। তিনি আমাকে প্রণাম করতে মন্দিরে পূজাকালে যে সিদ্ধ মুনিঋষিরা এসেছিলেন, তাঁরা আমাকে শ্রদ্ধা জানালেন। কেশব ভারতীর চোখ ও চেহারা দেখে মনে হল, তিনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। কেশব ভারতী গোপালকে প্রণাম করতে গোপাল তাঁর মাথায় চাটি মেরে আশীর্বাদ করলেন। গোপাল সমবেত দেবগণ এবং মুনিঋষিবৃন্দ ও সিদ্ধপুরুষগণকে অতিষ্ঠ

করছিলেন বলে শিব ঠাকুর তাঁকে বাম কাঁধে নিয়ে বসলেন। তখন মহাগৌরী গোপালকে বললেন, বাবা, তুমি দাদুর কোল থেকে নেমে যাও। গোপাল আমার কোল থেকে নেমে গিয়ে দেখালেন, তিনি নেমে গেলেও আমার কোলে আর এক গোপাল রইলেন। ভগবান বালকৃষ্ণ বহুমূর্তি ধারণে সমর্থ। অন্নভোগ নিবেদিত হলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজও দিব্য কমণ্ডলু থেকে ব্রহ্মবারি ছিটিয়ে অন্নব্যঞ্জনাদি শুদ্ধ করলেন।

তখন ঠাকুর কেশব ভারতী ও লাউৎজেকে প্রসাদ দিলেন এবং শিব ঠাকুর কাল যবনকে প্রসাদ দিলেন। কাটোয়ায় কেশব ভারতী কর্তৃক প্রায় সাড়ে চার শত বর্ষ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মন্দির মহাগৌরী আজ দিব্যদৃষ্টিতে স্পষ্টভাবে দেখলেন ও আমার কাছে উহার বর্ণনা দিলেন। বলা বাহুল্য, আমি তিনবার কাটোয়া গিয়ে ঐ প্রাচীন মন্দির দর্শন করেছি। ২৮ জানুয়ারী শনিবার সকালে আমরা যখন মন্দিরে তিন বার নামকীর্তন করলাম, তখন ঠাকুরের কাঁধে গোপাল বসেছিলেন পাদুটী ঝুলিয়ে এবং মন্দিরস্থ দেবগণকে আমার সম্মুখে বসিয়ে রাখলেন। দুপুরে মন্দিরে গোপালকে পৃথক্ পাত্রে ঘুগ্‌নি নিবেদন করা হলো। তিনি ঘুগ্‌নি খেতে আরম্ভ করেই বললেন, বড় ঝাল হয়েছে। তাই তিনি বার বার জল খেতে লাগলেন। পরে আমরা ঘুগ্‌নি প্রসাদ খেয়ে দেখলাম, সত্যই ঘুগ্‌নিতে আদার মৃদু ঝাল অধিক হয়েছে। গোপালজী সদা সত্যই বলেন। তিনি সত্যস্বরূপ ভগবান্। ঘুগ্‌নি নিবেদনকালে মহাগৌরী ভুলে 'ইদং অন্নভোগং নিবেদয়ামি' বলে ফেলেছিলেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখলেন, পঞ্চ ব্যঞ্জন সহ দিব্য অন্ন থালায় করে এক সূক্ষ্মদেহী কৃষ্ণভক্ত নিয়ে এলেন। তখন ঘুগ্‌নির কথা মনে পড়ল। ইহাকেই সূক্ষ্ম অন্নাদি নিবেদন বলে। মহাগৌরী বাক্‌সিদ্ধা সন্ন্যাসিনী। ৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার প্রাতে আমি মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতেই স্নেহের গোপাল আমার

গলা ধরে ঝুলে পড়লেন এবং আমি প্রণামান্তে উঠতে আমার গলা ধরে দুই গালে গাল দিয়ে আমাকে আদর করলেন। অনন্তর আমার কোলে বসে কল্কিকন্যা শ্যামাঙ্গিনীকে মারতে লাগলেন। তখন ব্যাসদেব গোপালকে ধরে নিজ পাশে বসালেন। সেই সময় আমার পাশে পদ্মা দেবী বিদ্যমানা ছিলেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সকালে মন্দিরে নামকীর্তনান্তে আমরা শিবধ্যান, শিবাষ্টক ও শিব সঙ্গীত করলাম। শিব ঠাকুর গৌরী সহ বৃষভবাহনে এসে সামনে বসলেন। শিবের কোলে গোপাল বাঁশি হাতে করে খেলছিলেন। এমন সময় ভীষণ দুর্গন্ধ পেয়ে মহাগৌরীকে আমি বললাম, দেখ ত মন্দিরের অদূরে কোন প্রেত আছে কিনা? মহাগৌরী দিব্যদৃষ্টিতে দেখে বললেন, পূর্বদিকে পাঁচিলের ওপারে একটী প্রেত —কাল কম্বল গায়, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—মাথা নীচু করে করযোড়ে কৃপাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পূর্বেও সে দুই তিন বার আমার কাছে এসেছিল। তাঁর দুর্গন্ধ থেকে আমি তার সান্নিধ্য টের পেয়েছিলাম। আমি গোপালকে বললাম, বাবা, ঐ প্রেতের উপর একটু ব্রহ্মবারি ছিটিয়ে প্রেতোদ্ধার কর। আমার কাতর প্রার্থনায় কোন পুরুষ সূক্ষ্মদেহীকে গোপালজী উক্ত প্রেতের উপর ব্রহ্মবারি ছিটিয়ে দিতে বললেন। ঐ গোপাল ভক্ত তদ্রূপ করায় প্রেতের কাল চেহারা উজ্জ্বল হল ও সে আনন্দে দুই হাত তুলে নাচতে লাগল ও উর্দ্ধগামী হলো! সে গোপালের কৃপায় প্রেতলোক থেকে উর্দ্ধগতি লাভ করল। ১৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার ভূতচতুর্দশী শিবরাত্রি। এরূপ শুভ যোগ বহু বর্ষ পড়েনি। সকালে আমরা মন্দিরে নামকীর্তনান্তে শিবধ্যান করলাম ও শিবসঙ্গীত গাইলাম। তখন শিব-গৌরী বৃষভবাহনে আবির্ভূত হলেন। দুপুরে সওয়া এগারটায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর-পূজায় বসলাম এবং শিবের স্নান ও পূজা করে পৃথক নৈবেদ্য দিলাম। ঠাকুরকে পূজান্তে

পৃথক নৈবেদ্য নিবেদিত হলে তাঁর এগার পার্ষদ এলেন প্রত্যেকে হাতে বড় বড় পদ্ম (কোনটী সাদা, কোনটী বা গোলাপী) নিয়ে ও শিবকে দিলেন। শিবকে ও ঠাকুরকে গোলাপের অর্ঘ্য দিতে গোপাল গোলাপের অর্ঘ্য চাইলেন। গোলাপ সহ অর্ঘ্য আমি হাতে নিয়ে ধ্যানমন্ত্র পড়ছিলাম। এমন সময় গোপাল অর্ঘ্যের গোলাপটী মাথায় নিয়ে আমার দাড়ি ধরে টানতে লাগলেন। শ্যামল সুন্দর গোপালের মাথায় সেই গোলাপ অপূর্ব সুষমা বিস্তার করল। পূজান্তে আমি শিবকে প্রণাম করার সময় শিব ঠাকুর অভয় পদ বাড়িয়ে দিলেন এবং আমি তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলাম।

১৪ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বৈকাল দুইটায় আহারান্তে ক্লান্ত দেহে দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় দেওয়ালের দিকে মুখ করে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আমি দেখছি, গোপাল ঠাকুর শিশু মূর্তিতে আমার পাশে কোলের কাছে শুয়ে আছেন। আমি তাঁকে স্পষ্ট দেখে ভয় পেয়ে অন্য কোন ছদ্মবেশী দুষ্ট গ্রহ ভেবে মহাগৌরীকে ডাকলাম। মহাগৌরী এসে দেখলেন, শিশুমূর্তি গোপালজী শুয়ে আছেন ও হাসছেন। মহাগৌরী বললেন, স্নেহের গোপাল নীচে আপনার সঙ্গে অন্নব্যঞ্জনাদি আহার করে বিশ্রাম করছেন। ইহাই সুমধুর গোপাললীলা। স্বামী ভৈরবানন্দ পরমহংস জ্ঞানচক্ষুতে জেনে বলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের মা যশোদার ইষ্টদেবী কাত্যায়নী। কাত্যায়নী ব্রজধামের ইষ্টদেবী ও নবদুর্গার অন্যতমা; আর দেবকীর ইষ্টদেবী মহামায়া। পূর্ণশক্তি অবতারকে অবতারের ইষ্টশক্তিসম্পন্না সিদ্ধা নারী ব্যতীত কেউ তাঁর গর্ভধারিণী বা পালিকা মাতা হতে পারেন না। মহাশক্তির আধারকে লালন পালন সাধারণ নারী দ্বারা সম্ভব নহে। দোলপূর্ণিমা দিবসে যখন শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপী ও রাখাল বালকাদি নিয়ে ক্রীড়া করছিলেন, সেই সময় কংস কর্তৃক নিযুক্ত প্রলম্বাসুর গোপগোপী, কৃষ্ণ ও বলরামাদিকে ধ্বংস করতে

আসে। সেই সময় উক্ত স্থলে বালকৃষ্ণ প্রলম্বাসুরকে নিহত করেন।" ১৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার দুপুরে মন্দিরে পূজাকালে মহাগৌরী দেখলেন, "প্রলম্বাসুর অর্ধাকাশ জুড়ে শূন্যে ভেসে এলেন। তিনি বরাহাকৃতি পশুমূর্তি, মুখের দুই পাশে বড় লম্বা বক্র দুটা দাঁত হস্তী দন্তবৎ বহির্গত, সামনের হাত দুটী প্রসারিত, শূন্যে সাঁতার কেটে আসছে বায়ু-সমুদ্রে, হাতের নখ গুলি ছোঁচাল ও বৃহৎ, গায়ের লোম সজারুর মত খাড়া ও মোটা, ক্রূর ক্রুদ্ধ ধূসর মূর্তি।" ভাগবতে আছে, প্রলম্বাসুরের নখাঘাতে উত্থিত ধূলি-রাশিতে মথুরা অন্ধকার হতো। প্রলম্বাসুর নিহত হলে মৃত্যুভয়ে ভীত গোপগোপীরা আনন্দোৎফুল্ল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের গায় প্রলম্বের রক্ত মাখান ও নিজেরা মাখেন। এইরূপে দোলোৎসব আরম্ভ হয়। এখন রক্তের বদলে লাল রঙ লোকে ব্যবহার করে। এই বৈষ্ণব পার্বণ অহিংসামূলক ও প্রেমমূলক নহে। যশোদা দিতির অংশে ও দেবকী অদিতির অংশে আবির্ভূ্তা। অদিতি ও দিতি কশ্যপের দুই পত্নী। বামন অবতারে অদিতির গর্ভে বামন জন্মগ্রহণপূর্বক যখন বলিকে ছলনা করে স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল ত্রিভুবন অধিকার করলেন, ও জানালেন, আমি স্বয়ং বিষ্ণু, তখন দিতি মনে মনে কামনা করেন ও প্রকাশ্যে বামনকে বললেন, বাবা, তুমি আমার পুত্র হও। তখন বামন বললেন, "মাগো, তুমি অসুর-জননী। তোমার সন্তান হতে পারি না। তোমাকে মা বলে ডাকতে পারি। তাই তুমি দ্বাপরে আমার পালিকা মাতা হবে। তখন তোমাকে আমি বার বৎসর মা বলে ডাকবো ও জগৎ জানবে, তুমি আমার জননী।" বার বৎসর বয়সে উপনয়নান্তে বামন বলিকে ছলনা করেছিলেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী রবিবার আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী প্রভৃতি দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ রামকৃষ্ণ ভজনাগারে ১২৬তম রামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে যোগ দিতে গেলাম। আমাদের সঙ্গে গোপাল, শিব ঠাকুর ও কালযবন গেলেন। যখন আমাদের ট্রেণ মাকড়দহের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল,

ভৈরবানন্দ তখন মহাগৌরীকে বললেন, মা, দেখ, মাকড়চণ্ডী দেবী মন্দিরের পেছনে পুকুরের ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছেন। মহাগৌরী অনায়াসে তাঁকে জ্ঞানচক্ষুতে দেখলেন। উক্ত ঘাট থেকে ট্রেণ লাইন প্রায় পাঁচ শত গজ দূরে। আমি এই ঘটনা চোখ বুজে স্পষ্টভাবে দেখলাম—চণ্ডীদেবী দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালিকা মূর্তি, গলায় লাল জবার মালাও পায় পঞ্চমুখী বড় জবা। মহাগৌরী গোপালকে জিজ্ঞাসা করলেন, দাদুকে চণ্ডীমূর্তি কি বাবা (ভৈরবানন্দ) দেখালেন? গোপাল হেসে নিজ বুকে হাত দিয়ে বললেন, আমি বাবা দেখিয়েছি, তোমার বাবা নয়। তখন গোপাল আমার কোলে বসেছিলেন আমার বুকে মাথা রেখে।

২১ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার রাত্রি থেকে গৌরবর্ণ গেরুয়াধারী মুণ্ডিতমস্তক শ্রীচৈতন্যের শিশুমূর্তি মন্দিরে দেখা যাচ্ছে। ২রা মার্চ বৃহস্পতিবার মহাপ্রভুর জন্মতিথি বা গৌরাঙ্গ পূর্ণিমা। ২৩ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দুপুরে মন্দিরে আমি ও মহাগৌরী ঠাকুরপূজা করলাম ও অন্নভোগ দিলাম। আজও মন্দিরে শ্রীচৈতন্যকে পূর্বদৃষ্ট মূর্তিতে দেখা গেল। গোপালজী শ্রীচৈতন্য-রূপেই আমাদের অর্ঘ্য নিলেন। আজ পুষ্পপাত্রে দুটী গোলাপ ফুল ছিল—একটি লাল ও একটু ছেঁড়া এবং অন্যটি গোলাপী ও উত্তম। দ্বিতীয় গোলাপটি ঠাকুরের অর্ঘ্যে দিতে যাওয়ায় গোপাল শ্রীচৈতন্য মূর্তিতে জানালেন, সেই ভাল গোলাপটি তাঁর অর্ঘ্যে দিতে হবে। ঠাকুরের অর্ঘ্য হাতে নিয়ে আমি মন্ত্রপাঠ করছিলাম। মন্ত্রপাঠ শেষ হবার পূর্বেই ঠাকুর অর্ঘ্যটি মাথায় নিলেন। গোপালকে অর্ঘ্যদানের সময়েও ঐরূপ ঘটিল। অন্নভোগ নিবেদিত হলে মন্দিরস্থ দেবগণও ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দ সানন্দে অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথি পড়েছিল। ঐদিন ঠাকুর নিজে হাতে নিয়ে কিছু খেলেন না, পিতা ক্ষুদিরাম ও মাতা চন্দ্রমণি তাঁকে খাইয়ে দিলেন। রঙ্গপ্রিয় গোপালজী নৈবেদ্যের থালা থেকে

নারিকেল এক টুকরা নিয়ে ঠাকুরের মুখে বাম হাতে করে তুলে দিলেন ও ডান হাতে নৈবেদ্যের পানতোয়া খেতে ব্যস্ত রইলেন। অন্নভোগের সময় ঠাকুরকে ডাবের জল দেওয়া হলো, কিন্তু গোপালকে দেওয়া হয়নি। তাই গোপাল ডাবজলপূর্ণ গ্লাসটি ধরে বসে রইলেন ও ঠাকুরকে দিলেন না। তাঁকে অনেক মিনতি করার পর তিনি ঠাকুরকে একটা বড় রাজভোগ বাম হাতে করে দিয়ে নিজে ডাবের জল খেলেন। তা দেখে গোপালকে পৃথক্ পাথর বাটীতে পায়স দেওয়া হয়েছিল আহারান্তে আমি স্বীয় শয্যায় শুয়েছিলাম ও মহাগৌরী আমার পাশে বসেছিলেন। তখন প্রাণপ্রিয় গোপালজী আমার শিয়রে বসেছিলেন। আমি মহাগৌরীকে বলছিলাম, কাল গোপালকে ডাবের জল প্রভৃতি পৃথক্ দিতে হবে। তা শুনে গোপালজী খুব খুসী হলেন। মহাগৌরী আদর করে যেই বললেন, গোপালকে কিছু দেওয়া হবে না, তখন গোপাল আমার মোটা লাঠি নিয়ে শিবের ঘাড়ের উপর রাখলেন ও বললেন, মারবো। তখন মহাগৌরী বললেন, বাবা, তোমাকেই সব দেওয়া হবে। তখন গোপাল খুসী হলেন ও লাঠি সরিয়ে নিলেন। মহাগৌরী শুতে যেতে গোপালও চলে গেলেন এবং আমিও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম মন্দিরের দিকে মুখ রেখে। অনন্তর আমি চোখ বুজে দেখলাম, কল্কিকন্যা শ্যামাঙ্গিনী এসে আমার শিয়রে বসে আছেন—অতি সুন্দরী বালিকা মূর্তি, সাত আট বৎসর বয়স। তাঁর পাশে মা পদ্মা ছিলেন। শ্যামাকে গোপাল মারেন বলে, শ্যামা ভয়ে আমার কাছে আসতে পারেন না। যেই গোপাল চলে গেলেন, অমনি শ্যামা এসে বসলেন প্রিয় দাদুর কাছে।

পয়লা সেপ্টেম্বর ১৯৬১, ১৬ই ভাদ্র ১৩৬৮ শুক্রবার শুভ জন্মাষ্টমী। পূর্বদিন বৃহস্পতিবার দুপুরে নীচে আহারকালে আমি ও মহাগৌরী উভয়ে গর্গমুনিকে দেখলাম। ভৈরবানন্দ বৈকালে মাকড়দহ থেকে এলেন ও বললেন, গোপালের জন্মোৎসবে এখানে কুলগুরু গর্গ মুনি,

শিক্ষাগুরু সন্দীপনী মুনি ও বাল্যসখা সুবল এসেছেন। মহাগৌরী সুবলকে মন্দিরে দেখে বললেন, সুবলের সুন্দর চেহারা ও মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধা। বৈকালে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় চেয়ারে বসে আমি দেখলাম, বহু বৈকুণ্ঠবাসী গোপালভক্ত ও মুনিঋষি গোপালের জন্মোৎসবে যোগদানার্থ দলে দলে এলেন। তন্মধ্যে গোপালের সৎমা রোহিনী এসে পশ্চিমাকাশে শূন্যে থেকে হাত নেড়ে আমাকে কিছু বললেন। দুপুরে আহারান্তে আমি যখন স্বীয় শয্যায় শুয়েছিলাম, তখন মহাগৌরী দেখলেন, সুবল ও সন্দীপনী আমার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান। সন্ধ্যায় আমি ও শিবপ্রিয়া নাটমন্দিরে বসে পর দিনে পূজাদির কথা আলোচনা করছিলাম। এমন সময় একটী জটাধারী দিব্যদেহী আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন ও আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম করতে আমার মাথায় হাত দিয়ে তিনি আশীর্বাদ করলেন। আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? মহাগৌরী ভৈরবানন্দকে বললেন ও ভৈরবানন্দ তাঁকে দেখে বললেন, ইনি কৃষ্ণভক্ত সন্দীপনী মুনি। আমার শরীর অসুস্থ ছিল। তাই সুচিকিৎসক সন্দীপনী আমাকে বল দিলেন ও কিঞ্চিৎ সুস্থ করলেন মাথায় হাত দিয়ে। তাঁর পূত স্পর্শে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হলো। সান্ধ্য আরতির পূর্বে ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে বসে উদ্ধব ও অক্রূরকে আহ্বান করলেন। পূর্ব রবিবার ২৭শে আগষ্ট মহাগৌরী বালি বাসায় উদ্ধবকে ও অক্রূরকে গেরুয়াধারী ব্রহ্মচারী বেশে দেখে ছিলেন। সান্ধ্য আরতির সময় মন্দিরে গোপালের কাছে গর্গ মুনি, সন্দীপনী, সুবল, উদ্ধব ও অক্রূর ও যশোদা প্রভৃতিকে দেখা গেল। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে স্বীয় শয্যায় শুয়ে আমি দেখলাম এবং মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় থেকে প্রজ্ঞানেত্রে দেখলেন, মা যশোদা মন্দির মধ্যে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে তাঁর আগমন জানালেন—যশোদা দেবী স্থূলকায়, গৌরবর্ণ, লালপেড়ে সাদা শাড়ী পরা, মাথায় কাপড়, নাকে

নং, স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি। রাত্রি তিনটায় আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে দেখলাম, একটী দেবতা আমার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান ও তাঁর পশ্চাতে আগুন জ্বলছে। তখন মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া নীচে যাচ্ছিলেন। আমার আহ্বানে মহাগৌরী তাঁকে দেখলেন; কিন্তু তিনি কে আমি বুঝতে না পারায় চিন্তিত রইলাম। তখন ইনি আমাকে স্পষ্ট ভাবে বললেন, আমি অগ্নি। মানুষের কণ্ঠস্বরবৎ তাঁর শব্দ স্পষ্টভাবে আমি শুনলাম। পরদিন ভৈরবানন্দকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ইনি সত্যই অগ্নিদেব ও মন্দিরে বিদ্যমান। পরদিন শুক্রবার পূজাকালে অগ্নিপূজা এই ধ্যানে করা হল।

পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ।
মেষস্থ সাক্ষসূত্রাগ্নিঃ সপ্তার্চি শক্তিধারকঃ।

অগ্নিস্থান মণিপুর ও অগ্নিবীজ রং ও অগ্নিদেব মেষবাহনও সপ্তশিখা। মহাগৌরী পূজাকালে দেখলেন, অগ্নির সাত শিখা জ্বলছে ও তৎসঙ্গে অগ্নিপত্নী স্বাহা। দেখা গেল, নিবেদিত নৈবেদ্য অগ্নিও স্বাহা উভয়ে নিলেন, কোন দেবতাকে দিলেন না। ইহার অর্থ, অগ্নিমুখে সমস্ত দেবতা গ্রহণ করেন। মূলাধারে অবস্থিত বৈশ্বানর অগ্নিই নানা অগ্নিমূর্তি ধারণ করেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ও শিব সংহিতায় বৈশ্বানর অগ্নি উল্লিখিত। মূলাধার থেকে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, চিত্রিণী, বজ্রিণী ও ব্রহ্ম নাড়ী ও শংখিনী এই সপ্ত নাড়ীই অগ্নির সপ্তশিখা সর্বভূক অগ্নির নিম্নোক্ত প্রণাম প্রচলিত।

নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে মহেশ্বরানাং মুখতামুপেয়ুঃ।
চরাচরানাং জঠরেষু সংস্থিতে ত্রিধা বিভক্তায় নমোঽস্তু বহ্নয়ে॥

অগ্নিদেব সত্ত্ব, রজঃ ও তমো তিন রূপে বিভক্ত। অগ্নির সত্ত্বাংশে (মন্ত্রপূত) দেবভোগ্য, রজোঅংশ অসুরভোগ্য, তমো অংশ জীবভোগ্য। শুক্রবার ৮॥টা থেকে ১॥ পর্য্যন্ত পাঁচ ঘণ্টায় আমরা পূজা-হোম ও অন্নভোগ শেষ করলাম। শিব, গোপাল; রামকৃষ্ণ, কল্কি, কালী, 'কৌমারীও

অগ্নি এই ছয় দেবতাকে পৃথক নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করা হল। পূজাকালে আমি বসুদেবকেও দেবকীকে পূর্ণ স্পষ্ট মূর্তিতে দেখলাম। গর্গমুনি, সন্দীপনী, নন্দ ঘোষ, যশোদা, সুবল, অক্রুর, উদ্ধবাদি অনেকে এলেন। দেবকী হেমবর্ণা অলংকৃতা ও গোলোকবাসিনী। হোমাগ্নিতে পূর্বোক্ত দেবতাগণ ও ঋষিবৃন্দ আবির্ভূত হলেন এবং অন্নভোগ নিবেদিত হলে সকলে গ্রহণ করলেন। সান্ধ্য আরতির সময় অনেক দেবতা ও ঋষিকে বাতি দেওয়া হলো। তখন জ্ঞানী উদ্ধবও অনেক দিব্যবাতি জ্বেলে সাজালেন। রাত্রি ৮টায় যখন আমরা মন্দিরে গোপালকে লুচি-মিষ্টি নিবেদন করলাম, তখন কোন সূক্ষ্মদেহী গোপালভক্ত দিব্যদ্রব্য নিবেদন করলেন। অনন্তর নাটমন্দিরে চেয়ারে শিবপ্রিয়ার গোপাল মূর্তি সজ্জিত ও রক্ষিত হলো। বেলুড় কীর্ত্তন সমিতির সভ্যবৃন্দ দুই ঘণ্টা গোষ্ঠলীলা সংকীর্ত্তন করলেন এবং প্রায় তিন শত শ্রোতা এই কীর্ত্তন সানন্দে শুনলেন। কীর্ত্তনান্তে আমি স্পষ্টভাবে দেখলাম, যশোদার কোলে শিশুকৃষ্ণ, মা যশোদা আমার দিকে স্নেহভরে তাকালেন। মধ্যাহ্নে প্রায় হাজার বালককে ও ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হলো। পূজাকালে আমার মন্দিরবাসী তপোমগ্ন পিতৃদেবের নামে সংকল্প করা হলো। তিনি পূজাস্থানে এক পাশে চুপ করে বসে ইষ্টপূজা দেখলেন। হোমান্তে মেদিনীপুরের অন্যতম উপমন্ত্রীর পুনর্দীক্ষা বা মন্ত্রচৈতন্য করা হলো। তখন তাঁর পূর্বজন্মের গুরুদেব সূক্ষ্মদেহে এসে তৎপশ্চাতে দাঁড়ালেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বললেন, ঐ সূক্ষ্মদেহী মুর্শিদাবাদের প্রহ্লাদ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি স্থূলদেহে গৃহস্থ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন ও এখন বিদেহ মুক্তির সাধন করছেন। প্রহ্লাদের মাথায় লম্বা চুল গোল করে জড়ান। পূজাকালে আমার প্রপিতামহী হেমাঙ্গিনী দেবীলোক থেকে এসেছিলেন। মা কালী শুদ্ধ সত্ত্বমূর্তিতে প্রসাদ বিতরণ করলেন। পরদিন শনিবার সকালে নামকীর্ত্তনকালে মন্দিরে দেবকীর কোলে সদ্যোজাত দেবশিশুকে দেখা গেল। পূর্বদিনবৎ

আজও জননী দেবকীকে পূর্ণ স্পষ্ট মূর্তিতে দেখিলাম। ইহার অর্থ, দেবকীর গর্ভ থেকে কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হতেই নন্দালয়ে প্রেরিত হলেন। পরদিন প্রাতঃকালে জননী দেবকী অন্ধকার কারাগারে বসে দুঃখ করছিলেন, "বাবা, তোমাকে গর্ভে ধারণ ও প্রসব করলাম। আজ আমার কোল শূন্য, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।" তখন তিনি দেখলেন, তাঁর কোলে গোপাল শুয়ে হাত পা নাড়ছেন। আমরা এই দৃশ্যই মন্দিরে দেখলাম। শুক্রবার রাত্রি ১১টার সময় আহারান্তে আমিও মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া তিনজন আমার খাটে বসে উৎসবের সাফল্য আলোচনা করছিলাম। তখন কালযবন এসে আমার শয্যাস্থ তাকিয়ার উপরে দেওয়াল ঠেস দিয়ে বসে আমাদের কথায় সম্মতি জানাইতেছিলেন। আমরা তাঁকে দেখে চিনে ফেলতে তিনি হাসতে লাগলেন এবং একটু পরে চলে গেলেন। শনিবার সকালে এগারটায় মহাগৌরী একতলায় বাথরুমে স্নান করছিলেন। তখন কয়েকটী সূক্ষ্মদেহী গোপিকা (গায়ে মুখে কাপড়ে হলুদ ও কাদা মাখা অবস্থায়) হাতে দধি-কাদার ভাণ্ড নিয়ে বাথরুমের সম্মুখে এলেন। ইহার কারণ, আজ নন্দোৎসব ও মহাগৌরী গোপালের মা হয়েছেন। সেইজন্য তাঁর অঙ্গে হলুদ ও দধি কাদা দিতে তাঁরা এসেছিলেন। তাঁদের আকৃতি উচ্চ প্রায় সাত হাত, ও পৌনে দুই হাত মোটা বলে মহাগৌরী প্রথমে ভয় পেয়েছিলেন। গোপিকারা গোপালের মার গায় হলুদ ও দধি-কাদা ছিটিয়ে চলে গেলেন। আজ মন্দিরে আমি ও মহাগৌরী ভক্তিভরে ঠাকুরপূজা করলাম ও অন্নভোগ দিলাম। পূজাকালে হেমবর্ণ বসুদেব এবং হেমবর্ণা দেবকী ও যশোদা প্রভৃতি ছিলেন। মন্দিরে আমার সূক্ষ্মদেহী গর্ভধারিণী অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বৈকুণ্ঠাগত কৃষ্ণভক্তবৃন্দ গোপালের জন্য বিবিধ আহার্য্য এনেছিলেন ও মন্দিরস্থ দেবগণকে দিলেন। আহারান্তে আমিও মহাগৌরী স্বীয় শয্যায় বসে বিশ্রাম করছিলাম। তখন দুইজন বৈকুণ্ঠবাসিনী গোপালভক্ত বড় বড়

থালায় বিবিধ মিষ্টান্ন মাথায় নিয়ে মন্দিরে প্রবেশার্থ আমার অনুমতি চাইলেন। আমি সপ্রণাম অনুমতি দিতেই তাঁরা মন্দিরে গেলেন। অনন্তর আর একটী বৈকুণ্ঠাগত গোপালভক্ত হাতে জরীর মালা এনে মন্দিরে যাবার জন্য আমার অনুমতি চাইলেন। তাঁর হাতে সেই দিব্য মালা চাঁদের মত ঝকঝক করছিল। বৈকাল পাঁচটায় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় দক্ষিণ কোণে ইজি চেয়ারে বসেছিলাম। তখন বৈকুণ্ঠাগত নরনারীগণ মন্দির থেকে নন্দোৎসব সমাপনান্তে যাবার সময় আমাকে জানিয়ে গেলেন। সান্ধ্য ভ্রমণান্তে আমি একা নাটমন্দিরে বসে আছি এবং ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী একতলার ঘরে ছিলেন। তখন আমি একটী দিব্যদেহী ঋষিমূর্তি দেখলাম—দীর্ঘ প্রায় সাত হাত, মাথায় জটা, গলায় তুলসী মালাও দোদুল্যমান পদ্মবীজমালা ও হলুদে বসন পরিহিত। আমি তাঁকে প্রণামান্তে মহাগৌরী ও ভৈরবানন্দকে তাঁর কথা বললাম। ভৈরবানন্দ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন, আমি ঋষি বিশ্ববান্। আজ নন্দোৎসব ও আমার ইষ্টদেব এখানে লীলা করছেন। তোমরা আমার ইষ্টদেবকে পূজা করেছ। তাঁর মনোহর লীলামূর্তি দেখতে এসেছি। অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞবরিষ্ঠ বিশ্ববান্ মন্দিরে ইষ্ট দর্শনে গেলেন।

১৩৬৭ সালে ভাদ্রী জন্মাষ্টমী থেকে ১৩৬৮ সালের ভাদ্রী জন্মাষ্টমী পর্য্যন্ত পুরা এক বর্ষ ব্যাপী গোপাললীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই অধ্যায়ে দেওয়া হলো। বিস্তৃত বিবরণ লিখিলে একটী বৃহৎগ্রন্থ রচিত হইবে। জয় ভগবান গোপালজী।

নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্॥

—৩৩র—

ভৈরবানন্দের যোগশক্তি

১৩৬৭ সালের বৈশাখ মাসে স্বামী ভৈরবানন্দ পরমাত্মমার্গে পরমশিবের ধ্যানকালে সমাধিযোগে হরগৌরীর যুগল মূর্তি দেখলেন ও বললেন, "মাগো, তুই রোজ বহু বার আমার হৃদয়ে আসছিস। তোর শাস্ত্রোক্ত বাসস্থান দেখাবি না?" তাঁরা সিদ্ধভক্তের মাথায় গায় হাত বুলিয়ে ও দাড়ি ধরে আদর করে বললেন, "তুইত ত ঘরের ছেলে। তোর অনুমতির কি দরকার? তুই যখন ইচ্ছা যাবি।" ভৈরবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, মা শিবলোকে যাব, না গৌরী লোকে যাব? তখন শিব ও গৌরী উভয়ে বললেন, শিবলোক ও গৌরীলোক পৃথক্। শিবলোকে মূর্তি নাই। সেখানে শিবশক্তির দিব্যজ্যোতিঃ দেখা যায়। গৌরীলোকেও কোন মূর্তি নাই, শুধু শক্তির জ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়। তুই কৈলাসে যাবি। সেখানে আমাদের মূর্তি দেখা যায়, আমাদের সঙ্গে কথা বলা যায়।" পরদিন সকালে ভৈরবানন্দ কারণ দেহে কৈলাসে গেলেন সমাধিযোগে, ইষ্টদেবী কালীর সঙ্গে কৈলাসযাত্রা করলেন। কৈলাস পুরীতে তিনি যথাসময়ে পদার্পণ করলেন। হরগৌরীর বিলাস কুঞ্জে যেতে হলে অষ্ট মহল পার হতে হয়। অষ্ট ভৈরব অষ্ট মহলের দ্বার রক্ষক। যখন ভৈরবানন্দ বিলাস কুঞ্জের দরজায় গেলেন, তখন বীরভদ্র ও কালভৈরব তাঁকে বাধা দিলেন। ভৈরবানন্দ জোর করায় তাঁরা রুদ্রমূর্তি ধরলেন। তখন ভৈরবানন্দ ইষ্টশক্তিতে বলীয়ান হয়ে তাঁদের ঠেলে ফেলে দিয়ে অষ্ট মহল পার হয়ে হরগৌরীর বিলাসকুঞ্জে গেলেন। উক্ত কুঞ্জের মণিময় শোভাও জ্যোতিঃ ও কারুকার্যের বর্ণনা করতে অষ্টসিদ্ধিযুক্ত মহাযোগীও পারেন না। ভৈরবানন্দ হরগৌরীকে ভক্তিভরে

নমস্কার করলেন। বাবা শিবকে প্রণাম করতেই তিনি দ্বাদশ শ্বেত রুদ্রাক্ষের মালা নিজ গলা থেকে খুলে নিয়ে ভৈরবানন্দের গলায় পরিয়ে দিলেন। মাতা গৌরীকে প্রণাম করতেই তিনি সিদ্ধ পুত্রকে স্বীয় কোলে বসিয়ে আদর করে একটী গেলাসে অমৃত পানীয় খাইয়ে দিলেন। সেই অমৃতের আস্বাদ কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। আসার সময় সিদ্ধযোগী হরগৌরীকে পুনরায় ভক্তিভরে নমস্কার করে কৈলাসপুরীর বাইরে মা-বাবার সঙ্গে এলেন। তখন কাল ভৈরব ভৈরবানন্দকে নমস্কার করে বললেন, আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্যে থাকবো ও আপনার নিকটতম সুহৃদ্গণকে রক্ষা করবো। ভৈরবানন্দ বললেন "আমি অঙ্গহীন বলে তোমাদের সেবাশুশ্রূষা করতে পারবো না। যদি স্বেচ্ছায় আমার সেবা কর ত চলো, নচেৎ নয়।" তখন কালভৈরব প্রীতিভরে বললেন, আমি স্বেচ্ছায় গিয়ে ভৃত্যবৎ আপনার সঙ্গে থাকবো। স্বামী ভৈরবানন্দ তাঁকে বললেন, আমি কখনও ভৃত্যনিয়োগ করিনি। আমি ও তুমি স্বরূপতঃ এক হয়ে থাকব। তখন হরগৌরী মৃদুহাস্যে বললেন, পৃথিবীর মানুষরা খুব চালাক। তারা স্বরূপতঃ কালভৈরব হয়ে পূজা করতে চায়। অনন্তর ভৈরবানন্দ কৈলাস থেকে মর্তে স্বগৃহে ফিরিলেন। তিনি মন্তব্য করেন, "মন্ত্রযোগীরা এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টার বেশী সমাধিতে থাকতে পারে না। কিন্তু পঞ্চতত্ত্বসিদ্ধ সাধক পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই ক্রিয়াযোগ সমাধিতে আরূঢ় থাকতে পারে। কৈলাসে যেতে, থাকতে ও আসতে মোট আড়াই ঘণ্টা লেগেছিল। উক্ত ঘটনার পরে ভৈরবানন্দ তিন মাসের অধিক কাল প্রাত্যহিক সান্ধ্য সমাধি কৈলাসে গিয়ে অভ্যাস করতেন। ইহাতে প্রত্যহ চারি ঘণ্টা লাগিত ও ততক্ষণ তিনি কুম্ভকযোগে সমাধিস্থ থাকিতেন।

৮জুন, ১৯৬১ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধর্মধক্রে আমি কুয়াতলায় বাথ টবে বসে হিপবাথ লইতেছি। তখন মহাগৌরী দোতলায় মন্দিরের বারন্দায়

ছিলেন। এমন সময় ভৈরবানন্দ পরমহংস সূক্ষ্মদেহে মাকড়দহ থেকে আসিলেন ও আমাকে নমস্কার করে দোতলায় মন্দিরে গেলেন এবং মন্দিরে ঠাকুর, মা কালী প্রভৃতিকে প্রণাম করে পশ্চিম বারান্দায় আমার জলচৌকিতে বসলেন। একটু পরে মন্দিরের চারি দিক দেখে তিনি চলে গেলেন। পরদিন শুক্রবার সকালে আমরা যখন নামকীর্তনান্তে গঙ্গাধ্যানাদি করছিলাম, তখন ভৈরবানন্দ পূর্বদিনবৎ সূক্ষ্মদেহে মন্দিরে এলেন ও আমাকে নমস্কার করে সিংহাসনের সামনে বসলেন। আমি তাঁকে সাক্ষাৎ ভৈরবজ্ঞানে আন্তরিক শ্রদ্ধাপ্রীতি জানাতে তিনি স্থূল মানুষের মত আমাকে প্রণাম করলেন। এত স্পষ্টভাবে সূক্ষ্মদেহে আমি তাঁকে কখনও দেখি নাই। তিনি যখনই আসেন, তাঁর ইষ্টদেবী মা কালীকে তৎসঙ্গে আনেন। মা কালীকে তদপেক্ষা স্পষ্টতর ভাবে দেখে আমি বুঝি, ভৈরবানন্দ সূক্ষ্মদেহে এলেন। গত এক বৎসর যাবৎ তিনি প্রায় রোজ ধর্মচক্রে সূক্ষ্মদেহে আসেন মাকড়দহ থেকে। সূক্ষ্মদেহে আকাশ মার্গে বিচরণক্ষম সিদ্ধযোগী অধুনা দেখা যায় না। সারা ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করিয়া আমি তাঁর মত একটীও সিদ্ধযোগী তত্ত্বজ্ঞানী দেখি নাই।

১২জুন সোমবার সন্ধ্যায় ধর্মচক্রের নাটমন্দিরে কলিকাতাস্থ ইউনাইটেড স্টেট্স ইনফরমেশন সার্ভিস কর্তৃক দেড় ঘণ্টা কাল সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত সিনেমা প্রদর্শিত হয়। আমরা ভৈরবানন্দ স্বামীকে অনুরোধ করেছিলাম, ঐসময় এখানে উপস্থিত থাকতে; কিন্তু তিনি স্থূলদেহে আসতে পারেন নাই। তথাপি মহাগৌরী দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন, যোগীরাজ সূক্ষ্মদেহে এসে মন্দিরের চাতালে দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলেন ও নৈসর্গিক দুর্যোগ বন্ধ করলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টি হইল না, নির্বিঘ্নে সিনেমা দেখান হইল এবং পাঁচ ছয় শত নরনারী মহানন্দে পাঁচটী বাংলা ও একটী ইংরাজী ফিল্ম দেখিলেন। তখন মহাগৌরী মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়াইলেন।

সন ১৩৬৩ সালে ফাল্গুণ মাসে শিবরাত্রিতে ভৈরবানন্দ বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহার ঠিক দুই বর্ষ পরে ১৩৬৫ সালের শিবরাত্রিতে মা কালীর নির্দেশে তিনি গেরুয়া ত্যাগ করেন। তখন দৈববাণী হইল, তুই পারমহংস্য সাধন কর। উক্ত শিবরাত্রি থেকে ছয় মাসের মধ্যে পরমহংস সাধনে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। পরমহংস অবস্থা প্রাপ্ত হবার পর ইষ্টদেবী তাঁকে নির্দেশ দেন, তুই তত্ত্বজ্ঞান সাধন কর। ছয় মাসের মধ্যেই ইষ্টকৃপায় তাঁর তত্ত্বজ্ঞান সাধন সমাপ্ত হয়। তুরীয় অবস্থা লাভের পর ভৈরবানন্দ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। তাঁর মতে তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা ও নির্বিকল্প সমাধি মহাসিদ্ধির দুই ভিন্ন স্তর। তুরীয় অবস্থায় আধ্যাত্মিক বাক্‌লয় হলেও নির্বিকল্প হয় না। নির্বিকল্প অবস্থা ও মৃত্যু বাহ্যদৃষ্টিতে অভিন্ন; কারণ নির্বিকল্পে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ, শরীর শক্ত, ও চৈতন্য বিলোপ ঘটে। যাঁর যেমন বায়ুসাধন, নির্বিকল্পে তাঁর তেমনি স্থিতি হয়। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু নির্বিকল্প অবস্থায় সহস্রারে উঠে। কুলকুণ্ডলিনীকে সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকাতে তুলে পরমাত্মার ধ্যান পারমহংস্যের প্রধান সাধন। আর তত্ত্বজ্ঞান সাধনে নির্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় ও ব্রহ্মচৈতন্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে মহাশূন্যের ধ্যান করতে হয়। তত্ত্বজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করলে সূক্ষ্মজগতের উপর কর্তৃত্ব জন্মে—কালিকাদি দশ মহাবিদ্যা, ব্রহ্মাদি দেবতা, যে কোন সূক্ষ্মদেহী বা প্রেত, যক্ষ রাক্ষস, গন্ধর্ব, সর্ব উর্দ্ধ ও নিম্ন লোকের অধিবাসী, এমন কি স্থূলদেহী মানুষের লিঙ্গদেহকে তত্ত্বজ্ঞানবলে টেনে আনতে পারেন। তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দের এই যোগসিদ্ধি আমরা শতবার স্বচক্ষে দেখিয়াছি। স্বামী ভৈরবানন্দ যে কোন ভক্ত বা সাধককে তাঁর ইষ্টমন্ত্র ও ইষ্টদেব নির্বাচন করে দিতে পারেন। যে কোন দেবতার বীজমন্ত্র তিনি ধ্যানযোগে অবগত হন ও যে কোন দীক্ষিতের মন্ত্রচৈতন্য করে দিতে পারেন। মন্ত্রচৈতন্য হলে সুষুম্না দ্বার বা যোগদ্বার খুলে যায়, জাপকের ইষ্টদর্শন হয়। পরমহংস ভৈরবানন্দ বাচনিক মন্ত্রদীক্ষাদানে

অসমর্থ। মন্ত্রচৈতন্য হলে জাপকের চক্ষে জল পড়ে, শরীর কাঁপে, কখনও হাঁপায়, কেউ বা মূর্চ্ছিত হয়। মোক্ষ শাস্ত্রে আছে, পরমহংস দীক্ষা দেন না বা কোন শিষ্য করেন না।

স্বকীয় সাধন কুটীর ও সপ্তজন্মরহস্য সম্বন্ধে স্বামী ভৈরবানন্দ স্বয়ং ১৩৬৭ সালে ২৮শে ফাল্গুন মাসে নিম্নোক্ত লিখিত বর্ণনা দিয়াছেন, "আজ তিন চার দিন ধরে আমার চতুর্থ ভাইপো অলোক প্রকাশ বলছে, "দেখ কাকা, এখানটায় পুরাকালে বোধ হয়, কোন ঋষির আশ্রম ছিল। আমি বলিলাম, কেন বল দেখি? সে বলিল, এই যে কটা ছেলে আমার সঙ্গে এখানে আসে, তারা ভাল নয়, কিন্তু তারা বলিতেছে, তোদের এই জায়গাটা বেশ, এখানে এলেই মনটা শান্ত হয়ে যায়। এরা অলোকের সহপাঠী, অলোক এবার আই এসসি পরীক্ষা দিয়াছে। আমি বলিলাম, প্রায় পাঁচ বৎসর এখানে সাধন করিলাম, তাই বোধ হয়, তোমাদের এই স্থান ভাল লাগে। অলোক বলিল, "আমি ক্লাস ফাইভ থেকে এখানে পড়িতে আসি। পাঠ্য বই খুলে মিনিট পাঁচেক পড়িতে আরম্ভ করিলেই চার পাঁচ ঘণ্টা কি ভাবে কেটে যায়, বলতে পারি না। তুমি মাত্র পাঁচ বৎসর বসিতেছ।" আমার মনে খট্‌কা লাগিল, তাইত। আমার বাবা (গুরুদেব) ও বলেছিলেন, তোমার জায়গাটা বেশ। তাঁর সঙ্গে কলিকাতা থেকে দুই চার জন ভক্ত এসেছিলেন। তাঁরাও বলেন, আপনার সাধন কুটীরে গেলেই মনটা শান্ত হয়ে যায়। এখানকার দুই চার জন লোক আমার কাছে মাঝে মাঝে আসে। তারাও বলে, তোমার এখানে এলে মনের অবস্থা অন্য রকম হয়ে যায়। আজ দিন পাঁচেক মহাশূন্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে দেখছি। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানটা অর্থাৎ আমার সাধন কুটীর ও তার আশপাশে কোন ঋষির

আশ্রম ছিল কি ? সৃষ্টিকর্তা বলিলেন, হাঁ। এই কথা শুনে আমি অবাক্ হলাম ও জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ ঋষির ? ব্রহ্মা বলিলেন, ত্রেতাযুগের দ্বিতীয়ার্ধে এখানে ঋচিক মুনির আশ্রম ছিল। আবার আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি জ্ঞান লাভ করেছিলেন ? ব্রহ্মা বলিলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, তিনি এখন কোথায় ? ব্রহ্মা বলিলেন, তাকে ডাক, দেখা পাবে। তাঁকে আমি ডাকিলাম ও ঋচিক মুনি এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর চেহারা দোহারা, মধ্যম গঠন, লম্বা প্রায় সাত আট হাত, মাথার জটা মাটিতে লুটিতেছে, গাত্র শ্যাম বর্ণ, কাঁচা পাকা দাড়ি, পরণে বল্কল, হস্তে কাঠের কমণ্ডলু, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, দুই হাতের উপরে ও নীচে রুদ্রাক্ষ বাঁধা, সৌম্যমূর্তি। আমি তাঁকে সভক্তি নমস্কার করিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু পায় হাত দিতে দিলেন না, কোলাকুলি করিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি জ্ঞানী, পায় হাত দিও না। আমি বলিলাম, আপনিও ত জ্ঞানী। তিনি বলিলেন, বয়সে ছোট ও সম্মানে ছোট হলেও জ্ঞানীকে কারো পায় হাত দিতে নাই, পুত্র হলেও নয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নাম কি ? তিনি বলিলেন, "আমার নাম ঋচিক মুনি, আমার পিতার নাম বৈশায়ন মুনি। ত্রেতাযুগের তৃতীয় পাদে এই খানে আমার আশ্রম ছিল। তোমার সাধন কুটীর যেখানে, আমার সাধন কুটীরও সেইখানেই ছিল। তুমি যেখানে বস, আমি সেখানে বসিতাম। আমার সম্মুখে হোমকুণ্ড থাকিত। আমার ইষ্ট কালী। তুমি যেখানে সিদ্ধিলাভ করেছ, ঐখানে আমার পঞ্চমুণ্ডী আসন ছিল বিল্ববৃক্ষতলে। তুমি ছিলে আমার পুত্র, নাম বিশ্বরূপ মুনি। আমরা ভরদ্বাজ গোত্রীয় ছিলাম। এটা নিয়ে তোমার সাত জন্ম হলো।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি এখানে দেহত্যাগ করেছিলেন ? তিনি বলিলেন, "হাঁ। তুমি দেহত্যাগ করিলে যেখানে শবদাহ করিতে

বলিয়াছ, তুমিই আমাকে সেইখানে দাহ করেছিলে, তোমার মাকেও। তোমার মায়ের নাম ছিল ভগবতী দেবী।" এই সব শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম। জন্মান্তরের কি অদ্ভুত আকর্ষণ! ঐ জায়গা আমার সাধন কুটীরের পূর্ব দক্ষিণ কোণে, বাগানের শেষ সীমায় গঙ্গার ধারে। ঋচিক মুনি আরও বলিলেন, "তোমার সাধন কুটীর যেথা, সেথা একটী পাকা ঘর করে রেখে যেও। এখানে তোমার বংশের চারজন ও বাহিরের অনেক লোক সাধন করিতে আসিবে।" আমি বলিলাম, মাও (ইষ্টদেবী) এই কথা বলেছেন। আমার সাধন কুটীর আমি করি নাই। সন ১৩৬২ সালে শ্রাবণ মাসে যখন ডান পা ভেঙ্গে আমি শয্যাশায়ী, তখন আমার মেজো ভাইপো তীর্থঙ্কর লোক দিয়ে এইখানে ঘরটীকে তৈরী করে পড়াশোনা করার জন্য; কিন্তু ঘরটী তৈয়ারী হবার পর সাত দিনও সে ওখানে বসে পড়িতে পারে নাই। এখনও ছেলেরা ঐ কুটীরে বসে পড়িতে পারে না ও বলে, ভাল লাগে না, কিন্তু ঐ কুটীরের বাহিরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে। আমি পূর্বোক্ত পাঁচ বছরের আগেও ওদিকে সাধন করিতে যাই নাই। যা সাধন করেছি, সব আমার গোয়াল ঘরে। গোয়ালের এক দিকে বহু গরু থাকিত ও অন্য দিকে আমি সাধন করিতাম। মাঝে ছিল চেঁচার বেড়া, তথায় চৌদ্দ বৎসর ছিলাম। আর আমার সাধন কুটীরের পশ্চিমে যে পুকুর আছে, তাহার দক্ষিণ দিকে সাধন করিতাম। আশ্চর্য্য এই যে, যখন সময় হলো, মা ঠিক উপরোক্ত কুটীরে নিয়ে গিয়ে পুরান পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসাল। ইহাই আজিকার দিনের আগে এই স্থানের পুরাবৃত্ত। আমি কিছুই জানিতাম না। আমাদের হিন্দুধর্মে মুমুক্ষু সাধকের ইষ্ট এই ভাবে স্বীয় ঘরেই সব প্রস্তুত রাখে। আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। হায় মা! কি তোমার লীলা! সন্তানের জন্য সব যোগাড় করে রেখেছ! আমি ঋচিক মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পিতঃ যদি আমি মুনিবংশে প্রথম জন্ম নিলাম, তবে আমার জ্ঞান লাভ করিতে সাত জন্ম লাগিল কেন? ঋচিক উত্তর দিলেন

"ত্রেতায় তোমার প্রথম মনুষ্য জন্মে দ্বাদশ বৎসর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সেই সময় তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে গরুবিক্রয় ও দুগ্ধবিক্রয় করেছিলে, সেজন্য তোমার গোজন্ম লইতে হয়েছিল। কারণ, মনুষ্য জন্ম থেকে একবার পশুজন্ম হলে পূর্ব্বজন্মের সাধন নষ্ট হয়। তাই তোমার সাত জন্ম লাগিল। গোজন্মের পর আবার নূতন করে সাধন করিতে হইল। গোজন্মের পর কাটোয়ায় রামকান্ত শর্মা, তৎপরে তারকেশ্বরে রত্নাকর ঘোসাল, তৎপর জন্মে চাপাডাঙ্গায় কৃষক কালী সর্দার, তৎপর জন্মে কামারপুকুরে পোদো (প্রতাপ হাজরা) ও বর্ত্তমান জন্মে তুমি জয়গোপাল শ্রীমানী ওরফে স্বামী ভৈরবানন্দ। এক জন্মে দৈবদুর্বিপাকে পড়ে ব্রাহ্মণ হয়ে গাভী ও দুগ্ধ বিক্রয়ের ফলে ছয় জন্ম লাগিল মোক্ষলাভ করিতে! হায় মা! তোমার কি খেলা!! আবার সেই প্রথম মনুষ্যজন্মস্থানে নিয়ে এসে মুক্তি দিলি। এই বাগান আমাদের বংশে তিন শত বৎসরের উপরও ভোগদখল করিতেছে। মানুষী দৃষ্টিতে এখনও দেখা যায়, ইহার পশ্চিমে একটী বৃহৎ খাল ছিল গঙ্গার সহিত সংযুক্ত। এখনও উহার কিয়দংশ বর্তমান আছে ভাণ্ডারদহ খাল নামে। পূর্বাদকে মিনিট ছয়েক রাস্তার দূরে সরস্বতী নদী প্রবাহিত ছিল। ১১১২ সাল পর্যন্ত মাকড়চণ্ডী দেবীর ইতিহাস পাওয়া যায়। ঋচিক মুনি আমাকে আশীর্বাদ করিলেন, তোমার পরমায়ু সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত হবে ও বাকী জীবন তুমি বিপুল লোককল্যাণ করিবে।

১৩৬৭ সালে ২৯ ফাল্গুন ভৈরবানন্দ পরমহংস নিম্নোক্ত লিখিত বিবৃতি আমাকে দিয়াছেন, "আজ ভগবান বিষ্ণু আমাকে বলিলেন, উপনিষদের যুগ দ্বাপরের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ। উহাতে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ সাধকের সাধন পরীক্ষা বিবৃত। এই সময় উক্ত বিষয় লইয়া সমাজে ভীষণ অনাচার প্রবেশ করেছিল। সেই হেতু বাকী দ্বাপর ও কলিযুগের জন্য গীতা প্রকাশ করিলাম।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তন্ত্রযুগ কখন আরম্ভ হলো? ভগবান্ বলিলেন, বৈবস্বত

মম্বন্তর হইতে আজ পর্য্যন্ত তন্ত্রে ভেল ঢোকেনি। কারণ, তান্ত্রিক সাধনে দুরূহ যোগের ভেতর দিয়ে যাইতে হয়। আর মহামায়াকে সকলে ভয় করে।" আমি বলিলাম, অদ্বৈতবাদে এত ভেল ঢুকিল কেন? ভগবান বলিলেন, কলিযুগে আসল অদ্বৈতবাদের শাস্ত্র ছেড়ে দিয়ে উপনিষদকে অদ্বৈতবাদের শাস্ত্র ও সাধন পুস্তকরূপে নেওয়াতে এই অবস্থা হয়েছে। আমি বলিলাম, অদ্বৈতবাদের মূল সাধনশাস্ত্র কি? ভগবান বলিলেন, "বেদের আরণ্যক খণ্ডও পরমহংস খণ্ড। তিনি আরও বলিলেন, বেদ পথে বেদান্ত পথে, উপনিষৎ পথে, তন্ত্র পথে, বৈষ্ণব পথে, শৈব পথে, গাণপত্য পথে, সাংখ্য পথে ও যোগ পথে—এই পথগুলির মধ্যে যে কোন একটী পথে প্রথমে সাধন আরম্ভ করিলে উপরোক্ত সমস্ত পথের সাধন সকলকেই করিতে হইবে। তাহলে বেদান্ত বা বেদসিদ্ধান্তের জ্ঞানলাভ হবে, নচেৎ নয়।"

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২১-২২ সেপ্টেম্বর রবিবার ও সোমবার বৈকালে ধর্মচক্রের নীচতলায় বসে ভৈরবানন্দ মৎপ্রণীত 'সাধিকামালা' পড়িলেন। প্রথমে তিনি অঘোরমণি দেবীর জীবনী পড়লেন। তখন তিনি দেখলেন, অঘোরমণিও তাঁর সঙ্গে বাল গোপাল এসে বসলেন। যতক্ষণ উক্ত অধ্যায় পড়া চলিল, তাঁরা উভয়ে ততক্ষণ বসেছিলেন। অধ্যায় পাঠশেষে নমস্কার করতেই তাঁরা চলে গেলেন। 'সারদামণি' শীর্ষক অধ্যায় পাঠকালেও শ্রীমা সারদা এলেন। ২৪সেপ্টেম্বর বুধবার স্বামী ভৈরবানন্দ মৎপ্রণীত 'নবযুগের মহাপুরুষ' ১ম ভাগ পড়তে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থোক্ত প্রত্যেক জীবনীর প্রথমেই সংস্কৃত প্রণাম মন্ত্র প্রদত্ত। ইহার প্রারম্ভে 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ স্বামী অদ্বৈতানন্দের প্রণাম মন্ত্র পাঠ ও প্রণাম করতেই ভৈরবানন্দজী দিব্যচক্ষুতে দেখলেন, তাঁর সম্মুখে বাম দিকে কালবর্ণ জ্যোতির্ময় দীর্ঘশ্মশ্রু স্থূলকায় অদ্বৈতানন্দ আবির্ভূত হলেন এবং তার বামে মা কালী দণ্ডায়মান। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, মা কালী তাঁর ইষ্টদেবী ছিলেন। অদ্বৈতানন্দজীর

ছবি দেখে ভৈরবানন্দ পরে বললেন, এই মূর্তিই দেখেছি। উক্ত গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যবৃন্দের জীবনী প্রদত্ত। স্বামীজীর শিষ্য স্বরূপানন্দজীর জীবনী পাঠকালে পাঠক উক্ত সাধুকে নমস্কারান্তে দেখলেন, তিনি আবির্ভূত হলেন ও তার বাম পাশে শংখ-চক্রাদিধারী নারায়ণ। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, সম্ভবতঃ নারায়ণ স্বরূপানন্দজীর ইষ্টদেব ছিলেন। তৃতীয় জীবনী স্বামী নিরঞ্জনানন্দের। ভৈরবানন্দ তাঁকে নমস্কার করে ডাকতেই নিরঞ্জনানন্দ স্বামী এলেন—তাঁর মাথায় পাগড়ী, গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় ও তাঁর পাশে দিব্যজ্যোতিঃ, কোন সাকার দেবতা নাই। ইহাতে উপলব্ধ হয়, স্বামী নিরঞ্জানন্দের ইষ্টদেব নিরাকার নিরঞ্জন ছিলেন। পাঠশেষে নমস্কার করতেই সেই মহাপুরুষ চলে গেলেন। চতুর্থ জীবনী স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্য প্রকাশানন্দজীর। ইহার প্রণাম মন্ত্র বইতে না থাকায় ব্রহ্মমন্ত্রে নমস্কার করতেই তিনি এসে দাঁড়ালেন। তিনি চকিতে এসেই দ্রুত বেগে সরে গেলেন এবং তাঁর কোন ইষ্ট দেখা গেল না। কারণ তাঁর ইষ্টসিদ্ধি হয় নি। ইষ্টসিদ্ধি না হলে সাধকের সঙ্গে ইষ্ট থাকেন না। পঞ্চম জীবনী স্বামী বিজ্ঞানানন্দের। ইনি ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য ও বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। মৎকর্তৃক লিখিত ইহার বিস্তৃত বাংলা জীবনী এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত। তাঁর প্রণাম-মন্ত্র পড়তেই তিনি এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ইষ্টদেবী করালবদনা মহাকালী তাঁর বাম দিকে বিরাজমানা। ষষ্ঠ জীবনী ঠাকুরের গৃহী শিষ্য সুরেশ দত্তের। তাঁর প্রণাম মন্ত্র বইতে নাই, তাঁকে শুধু প্রণাম করতেই তিনি এলেন। তাঁর বাম পাশে আমাদের ঠাকুর ছিলেন। মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর ইষ্টদেব ছিলেন। ঠাকুর স্থূলদেহ রক্ষার পরে গঙ্গাগর্ভ থেকে উঠে এসে ভক্তবর সুরেশ দত্তকে দীক্ষা দেন। সুরেশচন্দ্র ঠাকুরের এক সহস্র উপদেশ সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন। সপ্তম জীবনী স্বামী প্রেমানন্দজীর। প্রণাম মন্ত্র পাঠান্তে নমস্কার করতেই প্রেমিক প্রবর প্রেমানন্দ এলেন। তাঁর বামে

শ্রীরাধা ছিলেন। সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ বলেন, প্রেমানন্দজীর রূপ-মাধুর্য্য বাক্যে বা লেখনীতে প্রকাশ করা যায় না। দুধে মিশ্রিত আলতা অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিকতর তিনি সুন্দর ও স্নিগ্ধবর্ণ। শ্রীরাধার অঙ্গকান্তিও অত্যদ্ভুত অপরূপ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ। অষ্টম জীবনী স্বামী অখণ্ডানন্দের। ইনিও ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য ও বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। তাঁর প্রণামমন্ত্র পাঠান্তে নমস্কার করতেই তিনি এলেন। তাঁর বাম পাশে ইষ্ট শিব ছিলেন—জ্যোতির্ময় দ্বিভুজ বিগ্রহ, বাম হাতে শূল, ডান হাত খালি ও অখণ্ডানন্দজীর মাথার উপরে। নবম জীবনী মাতৃভক্ত যোগানন্দজীর। তাঁর প্রণাম-মন্ত্র পড়ে নমস্কার করতেই তিনি আবির্ভূত হলেন। তাঁর ডান দিকে পরমা সুন্দরী মানবী। সম্ভবতঃ ইনি যোগানন্দজীর বিবাহিত পত্নী, তাঁর মাথায় বিয়ের স্বর্ণ মুকুট ও গায় অলংকার। তাঁকে বৃদ্ধাবস্থায় বেলুড়মঠে আমি দর্শন করেছি। যোগানন্দ দর্শনে ভৈরবানন্দের এই অদ্ভুত অনুভূতি হলো—যোগানন্দজীর দিব্য দেহ থেকে এক সূক্ষ্ম বিদ্যুৎকণা এসে ভৈরবানন্দের হৃদয়ে আঘাত করল। তখন তাঁর সুষুম্নার মার্গ উন্মুক্ত ও উদ্দীপ্ত হয়ে মন উর্দ্ধে উঠে গেল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হল এবং নিশ্বাস বন্ধ অবস্থায় তিনি বই খুলে ধ্যানস্থ রইলেন এবং দশ বার মিনিট পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার উক্ত বই পড়তে লাগলেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দজী উক্ত গ্রন্থ নিয়ে মাকড়দহে চলে গেলেন ও তথায় অবশিষ্ট জীবনীগুলি পড়ে তাঁর দর্শনাবলীর কথা আমাকে পত্রে নিম্নোক্ত প্রকারে লিখলেন।—

"৮ই অক্টোবর, ১৯৫৮ স্বামী বোধানন্দজীর জীবনী পড়লাম। পড়ার আগে ব্রহ্মমন্ত্রে নমস্কার করতে বইতে যেরূপ ছবি আছে, সেরূপ মূর্তিতে (রঙ ফর্সা) তিনি আমার সম্মুখে বাম পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বামে জ্যোতির্ময়ী কালীমূর্তি ছিল। জীবনী পাঠান্তে নমস্কার করতে তিনি অন্তর্হিত হলেন। (ইনি স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন ও নিউইয়র্কে থাকতেন।

আমি বেলুড় মঠে তাঁকে দেখেছি ও তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সচিত্র জীবনী 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশ করেছি।) শ্রীরমণ মহর্ষির জীবনী পড়লাম। পড়ার আগে ব্রহ্মমন্ত্রে নমস্কার করতেই আমার সম্মুখে বাম পাশে বইতে যেরূপ ছবি আছে, সেরূপ মূর্তিতে এসে তিনি বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জ্যোতির্ময় দিব্য মূর্তি ধরলেন। তাঁর বামে ইষ্ট শিব। এঁর জীবনী পড়ে দেখলাম, ইনি সিদ্ধশৈব ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। ৯ই অক্টোবর স্বামীজির শিষ্য শুভানন্দজীর জীবনী পড়লাম। পড়ার আগে ব্রহ্মমন্ত্রে নমস্কার করতে তাঁকে (শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা, চেহারার চেয়ে মাথাটী ঈষৎ বড়, ভাবালু চক্ষু, মানানসই চুল, মাঝারি দাড়ি, খোলা গা, গলায় একখানা চাদর ঝুলছে দেখলাম। আমার সম্মুখে বাম পাশে এসে তিনি বসলেন ও তাঁর। বামে মা জগদ্ধাত্রী ছিলেন। (ইনি কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন।) এঁর জীবনী পড়ে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে কি ভাবে পরিচালনা করতে হয় সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুভূতি হলো। পাঠান্তে নমস্কার করতেই তিনি অন্তর্হিত হলেন। কেশবচন্দ্র সেনের জীবনী পড়লাম। পড়ার আগে ব্রহ্মমন্ত্রে নমস্কার করতে আমার সম্মুখে বাম দিকে তিনি (তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ, বিশাল নয়ন, উন্নত নাসা, প্রশস্ত বপুঃ, মাথায় অল্প কেশ, গায় সাদা গলাবন্ধ কোট ও তাতে সরু কাল ডোরা দাগ) এসে বসলেন। তাঁর বামে শিব ঠাকুর। তাঁর জীবনী পড়ার শেষে নমস্কার করতে তিনি চলে গেলেন। ইহাতে বোঝা যায়, কেশব সেন ইষ্টসিদ্ধ শৈব ভক্ত ছিলেন। পাঞ্জাবের স্বামী রামতীর্থের জীবনী পড়লাম। পড়ার আগে ব্রহ্মমন্ত্রে নমস্কার করতে আমার সম্মুখে বাম পাশে তিনি (দীর্ঘ মধ্যম চেহারা, শ্যামবর্ণ, মাথায় পাগড়ী, গায় আচকান) এলেন। তাঁর বামে রাজবেশে ভগবান্ রামচন্দ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবনীর প্রথমাংশ পড়ে দেখলাম, ইনি যৌবনে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ করে পাগল। তখন আমার ইষ্টদেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, মা তুই কি ভুল দেখালি? তখন তিনি বললেন, পড়ে যাও। তারপর

পড়তে পড়তে দেখলাম, রামতীর্থে ইষ্টদেব রামচন্দ্র। ইনি শেষে ওঁকার সাধনা করিতেন, আমার সঙ্গে মেলে। পড়িতে পড়িতে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসে ওঁকার ধ্বনি শুনলাম। পাঠান্তে নমস্কার করতে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

সন্ন্যাসিনী মহাগৌরীর ২৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ১৯ শে নভেম্বর ১৯৬১ শনিবার সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে বৈষ্ণব কথক মীরাবাঈ সম্বন্ধে কথকতা করলেন। তৎপূর্বে মহাগৌরী ভজন গাইলেন ও আমি মীরাবাঈ সম্বন্ধে আধ ঘণ্টা বললাম। তখন মীরাবাঈ ও রাধাকৃষ্ণ সভাস্থলে এলেন। আমার ভাষণ শেষ হতেই মীরাবাঈ ভৈরবানন্দকে নমস্কার করলেন। সেই সময় ভৈরবানন্দজী তাঁকে বললেন, আমাকে নমস্কার করলেন কেন? মীরা বললেন, আমি গোলোকে থাকি, আর আপনি ত সব লোকের উর্দ্ধে উঠেছেন। রাত্রে মন্দিরে ঠাকুরকে যখন লুচি হালুয়া নিবেদন করা হল, তখন মহাগৌরা মীরাবাঈকে ডাকলেন। মীরা এসে বিশেষভাবে ঠাকুরকে প্রণামান্তে কল্কি ও কালী প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম করলেন। তারপর ঠাকুর তাঁকে প্রসাদ দিলেন। পরদিন রবিবার পূজাকালে মীরা মন্দিরে এলেন ও আমাকে হাত জোড় করে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে গেলেন। গতকাল এটা করেননি বলে আজ মীরা ক্ষণকালের জন্য এলেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের শেষার্ধে মীরা স্বয়ং আমাকে জানালেন, "ষোড়শ শতকে আপনি আমাদের পিতৃবংশীয় কুলগুরু গদাধর পণ্ডিত ছিলেন।"

স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "ধর্ম ও যম অভিন্ন, যেমন জনক এক দিকে রাজা ও অন্য দিকে জ্ঞানী। যখন তিনি জীবের পাপপুণ্যের ফলদান করেন, তখন তিনি যম। আর তিনি যখন সাধককে ধর্মপথে চালনা করেন, তখন তিনি ধর্মরাজ। যমের সাত পত্নী সপ্ত দক্ষকন্যা ও ধর্মের দুই পত্নী শ্রদ্ধা ও সাধনা।" "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রমণি স্বর্গলোকের সত্ত্বস্তরে ছিলেন ও পিতা ক্ষুদিরাম সপ্তর্ষি মণ্ডলে রজোস্তরে আছেন।"

১৩৬৭ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে (১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসের মধ্যভাগে) হারান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মাকড়দহে কোন ভক্তগৃহে দেহরক্ষা করেন। তিনি শ্রীমা সারদার মন্ত্রশিষ্য ও গৃহীভক্ত ছিলেন। যে রাত্রে তিনি দেহত্যাগ করেন, তার পরদিন সকাল ৭৷৷০ টায় ভৈরবানন্দ তাঁর কক্ষে গিয়ে দেখেন, মাতৃভক্ত হারানচন্দ্র সূক্ষ্ম শরীরে সাধক মূর্তিতে শব দেহের শিয়রে দণ্ডায়মান এবং ভক্তবৃন্দ নামকীর্তন করিতেছেন। অনন্তর তাঁর মৃতদেহ লইয়া নগর প্রদক্ষিণান্তে ভৈরবানন্দজীর বাড়ীর সামনে একটি বাগানে দাহ করিলেন। শবদাহান্তে দেখা গেল, তিনি পিতৃলোকের সত্বস্তরে গেলেন। মা সারদা তাঁর সিদ্ধা গুরু বলে দীক্ষিত সাধককে সঙ্গে নিয়ে কর্মার্জিত পিতৃলোকে পৌছিয়ে দিলেন ও ধর্মরাজকে বলিলেন, "যতদিন ও কর্মফলে এখানে স্থিতি লাভ করবে, আপনি এর প্রতি সদয় থাকবেন।" কারণ দীক্ষিত মানুষ যদি দীক্ষামন্ত্র যথাসাধ্য সাধন করে, তাহলে সিদ্ধগুরু বা ইষ্টদেবতা আশ্রিত ভক্তকে সেই লোকে নিয়ে যায়।

৮ই জুলাই শুক্রবার ১৯৬০ গুরু পূর্ণিমা দিবসে সকাল সাতটায় স্বামী ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে ধর্মচক্রে এলেন চারটা আনারস ঠাকুরদের জন্য হাতে নিয়ে। তিনি বললেন, "সেদিন গ্রামের কৃষকরা কাতর ভাবে জানাল, "গত চার বৎসর ধান হয়নি। এ বৎসর ধার করে বীজধান কিনেও বুনতে পারবো না, যদি এরূপ নিয়ত জল হয়। কারণ এক সপ্তাহ ধরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। যদি তিন চার দিন বৃষ্টি বন্ধ থাকে, আমরা ধান বুনতে পারি। আর আমরা জমিও প্রস্তুত করেছি। নচেৎ আমরা মরে যাবো, যদি এ বৎসর ধান না হয়।" আমি তাদিগকে বললাম, যদি চার দিন বৃষ্টি না হয়, তোমাদের ধান বোনা কি হয়ে যাবে? তারা বললে, হাঁ। আমি বললাম, ভগবানের কাজ ভগবান করবেন। তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও। ২৬ জুন রবিবার বৈকালে তিনটা, সাড়ে তিনটায় কৃষকদের সঙ্গে আমার এই কথা হয়েছিল। সেদিনই পরলোকগত হারান মুখুজ্জের

শ্রাদ্ধাদি ও বড় ভাণ্ডারা হচ্ছিল। আমি অম্বুপতি বরুণদেবকে স্মরণ করতেই দেখলাম, বরুণদেবের পদতলে হারানচন্দ্র বসে আছেন বরুণলোকে। সকাল থেকে ঐ দিন তিন পশলা বৃষ্টি হয়েছে, আকাশও পরিষ্কার, রৌদ্র উঠেছে। পিতৃলোকের সত্ত্বংশে হারাণ বাবু থাকায় স্বর্গলোকের নিম্নে যে সকল দেবতার কর্মক্ষেত্র বা আবাসভূমি, সেখানে তিনি স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন এবং দেবতাদের অনুরোধ করে স্বকীয় বা ভক্তদের কামনা পূরণ করতে পারেন, যতদিন তার ঐ পুণ্যফল থাকবে; স্বীয় শক্তি দ্বারা নয়, দেবগণের নিকট অনুরোধে কার্য্যসিদ্ধি করতে পারেন। পুণ্যক্ষয় হলেই আবার তাহাদিগকে মর্ত্যে এসে জন্মাতে হবে। সাধারণতঃ এঁদের উচ্চবংশে ও সাধনভজনের অনুকুল স্থানে জন্ম হবে। হারাণ বাবুর ভাণ্ডারার বিঘ্ন যাতে না হয় বৃষ্টি দ্বারা, সেজন্য তিনি বরুণদেবকে অনুরোধ জানাচ্ছেন। আমি সূক্ষ্মদেহে বরুণলোকে বরুণদেবের কাছে গেলাম। হারান বাবু আমাকে দেখে চম্‌কে উঠে নমস্কার করলেন। আমি বরুণদেবকে বললাম, হে দেব, সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মাকড়দহে বৃষ্টিপাত বন্ধ রাখুন। বরুণদেব বললেন, মঙ্গল ও বুধও গুরুবার তিন দিন বারি বর্ষণ বন্ধ রাখতে পারবো না, এমন কি, সোমবারও না। বিধাতার নির্দেশে সোমবার সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে দুই পশলা বৃষ্টি বর্ষণ করতে হবে। আমি বললাম, ঠাকুর, আমার অনুরোধ, আপনি যে কোন প্রকারে এটা বন্ধ রাখুন। বরুণদেব বললেন, আমরা বিধাতার অধীন। আমি স্বেচ্ছায় কি করতে পারি! আমি জানালাম, আপনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে বর্ষণ না করে আমার শরীরস্থা পৃথিবীতে বর্ষণ করুন। বরুণ বললেন, আচ্ছা, তাতে যদি সম্মত হন, আমি পৃথিবীতে বৃষ্টি বন্ধ রাখতে পারবো। পরদিন সোমবার প্রাতে পুনঃ সূক্ষ্মদেহে আমি বরুণালয়ে গেলাম ও বরুণকে বললাম, ঠাকুর আপনি কখন দুই পশলা বর্ষণ করবেন? বরুণ বললেন, সকালেও বেলা বারটায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে কি আমায় দুইবার

আসতে হবে? এই বলে আমি ভৈরবস্বরূপে রুদ্রমূর্তি ধরলাম। বরুণদেব আমাকে নমস্কার করে বললেন, আপনাকে দুইবার আসতে হবে না। এক বারেই আমি দুই পশলা বৃষ্টি বর্ষণ করে দিব। তখন আমি ভৈরব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বললাম, তবে তাই করুন। বরুণ বললেন, "আপনি ত পরমাত্মলোকে চলে গেলেন। আমাদের এত শক্তি নাই যে, অত উঁচুতে উঠে বর্ষণ করতে পারি। আমাদের বর্ষণ-শক্তি আছে, স্বর্গের নীচে থেকে বর্ষণ করতে পারি।" তখন আমি বায়ুতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বললাম, আপনি এখন বর্ষণ করুন। বরুণ আমার পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে বারিবর্ষণ করলেন। সেই বৃষ্টি-জল বায়ুতত্ত্বপ্রভাবে আমার সমস্ত শরীরে চারিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা ব্যাধি এসে আমাকে আক্রমণ করল ও প্রায় দশ দিন ভোগাল। মকড়দহে অবশ্য স্থূল বৃষ্টি চার দিন বন্ধ রইল। অসুখ ভোগের সময় মা কালী ও ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার এরূপ দুর্ভোগ হলো কেন? তাঁরা বললেন, "তুইত ভুল করেছিস্। যে তত্ত্বের ফল নিতে হয়, হয় সেই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, না হয় ঐ তত্ত্বের বিপরীত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উহা নিতে হয়। যদি জলতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তুমি এই বর্ষণ নিতে, তাহলে ঐ জল প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয়ে যেত।" এই তত্ত্ব ত্রৈলঙ্গ স্বামী জানতেন। শুধু তাই নয়, তিনি দুইতত্ত্বজয়ী ছিলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী দিব্যদেহে আমার কাছে মাস দুই ছিলেন ও আমাকে দুইতত্ত্ব সাধন শিক্ষা দিতে সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু ইষ্টদেবীর অনিচ্ছায় তাঁর নিকট উক্ত তত্ত্ব শিক্ষা করি নাই। গত চারি শত বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতে ত্রৈলঙ্গ স্বামীও বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথ ব্যতীত তত্ত্বজয়ী হঠযোগী হয় নি। ইষ্টদেবী বলেন, আর অগ্নিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উল্লিখিত বারিবর্ষণ নিলে অগ্নিদেব সেই জল শুষে নিতেন। তুই বায়ুতত্ত্বে আরূঢ় হয়ে নিয়েছিস বলে ভুগতে হলো। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে ঐ বৃষ্টিপাত স্বীয় দেহে নিতে বারণ করেছিলেন। আমি ওসব করিনি। সাধন শেষ হলে বেড়াল ছানার ভাবে থাকতে হয়।"

২১শে জুলাই বুধবার ১৯৬০ দুপুরে স্বামী ভৈরবানন্দ দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ থেকে এখানে এলেন। আজ সকালে তিনি ঐ আদ্যাপীঠে গিয়েছিলেন। আজ দুপুরে তাঁর লেখা পোষ্টকার্ড পেলাম। তাতে তিনি লিখছেন, "মা আদ্যাকালী ডাকছেন দক্ষিণেশ্বর থেকে। ওখানে যাবো, যেদিন মা নিয়ে যাবেন।" আজ তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ কথা-প্রসঙ্গে বললেন, "যমলোকের রাজসভা শত যোজন ব্যাপী ও যমলোক তিন ভাগে সহস্র যোজন বিস্তৃত। ইন্দ্রদেবের রাজসভা দশ সহস্র কোটী যোজন ও স্বর্গলোক সহস্র কোটী যোজন পরিমিত। ব্রহ্মার লোক কত যোজন, তাহা ইয়ত্তা করা যায় না। সেই লোকের ভিত্তি নাই, থাম নাই, উহা শূন্যে অবস্থিত। মহাভারতে নারদ বলছেন, এক-মাত্র মহাস্তম্ভের উপর ব্রহ্মলোক অবস্থিত, কিন্তু আমি ব্রহ্মলোকে কোন স্তম্ভ দেখিনি। সেখানে যেতে আমার সূক্ষ্মদেহকে কিছু দেখতে দিল না, পরমাত্মলোকে তুলে দিল। কেবল চোখে পড়ল, এক শত বা দেড় শত মুনিঋষি ব্রহ্মার সিংহাসনের দুই দিকে বসে আছেন। তাঁদের চেহারা শত মধ্যাহ্ন সূর্য্যের জ্যোতিঃ অপেক্ষাও জ্যোতির্ময়। তাঁদের দাড়ি ও মাথার চুল সাদা বরফের মত, দাড়ি নাভি পর্য্যন্ত ঝুলছে। যমলোকের পরে বহু ক্ষুদ্র লোক আছে—চন্দ্রলোক, ধ্রুবলোক, সূর্য্যলোক ইত্যাদি। সপ্তর্ষিমণ্ডলে আমার যাবার ইচ্ছা আছে। সেখান থেকে অমর স্বামীজী এসেছিলেন। পারিত, এই অমাবস্যাতেই যাবো। আপনার মঙ্গলগ্রহ মেষ থেকে বৃষে যাবে এই শনিবার। যদি বৃহস্পতির দৃষ্টি মঙ্গলের দিকে থাকে, মঙ্গল অনিষ্ট করতে পারে না।" স্বামী ভৈরবানন্দ আরও বললেন, "অন্নদা ঠাকুর আমার কাছে গত ছয় দিন ধরে রোজ এসেছিলেন। তিনি ইষ্টসিদ্ধ স্বর্গবাসী ও মোক্ষপ্রার্থী। আজই হয়ত তিনি এই মন্দিরে আসবেন। আদ্যাপীঠের মন্দিরে প্রতিমা দর্শন করতে গিয়ে দেখি, অন্নদা ঠাকুর সূক্ষ্মদেহে ঘাড়

নীচু করে নমস্কার করলেন। আমার বাড়ীতে তিনি কয়দিন গিয়েছিলেন ও আমার পায়ের ধুলো নিয়েছিলেন। যেখানে আভাপীঠের বিশাল মর্মর মন্দির নির্মাণ হচ্ছে, সেখানে ছিল সাবর্ণ চৌধুরীদের ঠাকুরবাড়ী। সাবর্ণ চৌধুরীদের ইষ্টদেবী আভাকালী। শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী, অন্নদা ঠাকুর যে বেলতলায় বসতেন বা সাধন করতেন, তথায় থাকতেন, বৃষ্টি হলে ঠাকুর বাড়ীতে আশ্রয় নিতেন—যেমন তোতাপুরী পঞ্চবটীতলায় থাকতেন ও বৃষ্টি হলে বাবুদের কুঠীতে বা সাধন কুটীরে ঢুকতেন। তখন ঐ বেলগাছে একটী ব্রহ্মদৈত্য থাকতেন। তথায় তিনি অন্নদা ঠাকুরের আমলেও ছিলেন। অন্নদা ঠাকুরের শেষ জীবনে তিনি সরে গেছেন। অন্নদা ঠাকুর যখন হরিদ্বারের অদূরে লছমন ঝোলায় ছিলেন, তখন আভা মা স্বপ্নে তাঁকে বলেন, ওখানে আমার জন্য শ্বেতপাথরের মন্দির নির্মাণ কর। সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ী থেকে গয়না পরে ভৈরবী ব্রাহ্মণী যশোদাভাবে ও অন্যভাবে ঠাকুরের কাছে রাসমণির কালীবাড়ীতে আসতেন এবং ঐ চৌধুরীদের কোন আত্মীয়ের বাড়ী থেকে একটী মেয়ে এনে ঠাকুরের কোলে বসিয়েছিলেন। একে তন্ত্রে বীরসাধন বলে—সাধনকালে নারী ও পুরুষ উভয় উলঙ্গ। আভা মা গত রবিবার থেকে প্রসাদের থালা হাতে করে আমাকে ডাকছেন—আলু ভাজা, কুমড়া ভাজা, ডাল, পুঁইশাক চচ্চড়ি, শাক ও ভাত। মা যা যা দেখিয়েছিলেন, সেই সব ওরা আভাপীঠে আমাকে খেতে দিল। সাবর্ণ চৌধুরীদের শিবমন্দির আভাপীঠে অক্ষত ভাবে বিদ্যমান। সব সাধনার শেষে শিব সাধন করতে হয়। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ১৪ অধ্যায় থেকে ১৮ পর্য্যন্ত পঞ্চাধ্যায়ে আছে, সকল সাধককে সর্বশেষে শিবত্বের সাধনা করতে হয়। ওখানেই শিবের সহস্র নাম আছে। আজকাল আধ ঘণ্টা অন্তর ফুস করে আমার নিঃশ্বাস পড়ে নাক থেকে তিন চার আঙ্গুল দূর পর্য্যন্ত। এখন সর্বদা আমার কুম্ভক হয়। কোন শাস্ত্র চেঁচিয়ে পড়তে পারি না।

আগে মনে মনে পড়লেও কুম্ভক হতো। সাধক বা সাধিকার মধ্যে শিব-শক্তির আবির্ভাব হলে ত্রিভুবন প্রকম্পিত হয়। বিষ্ণুশক্তির আবির্ভাবে তাহা হয় না। বিষ্ণুশক্তির ক্রিয়া অনাহত থেকে বিশুদ্ধ পর্য্যন্ত চলে। আর শিব-শক্তির খেলা আজ্ঞাচক্র থেকে মহাকুণ্ডলিনী পর্য্যন্ত। তারপর নকুলেশ্বর বিরাজিত। সম্প্রতি নিখিল ভারত ডাক ধর্মঘটকালে বেলুড়ে দাঙ্গাহাঙ্গামার সম্ভাবনা ঘটেছিল। আমাদের মন্দির থেকে কালভৈরব বেরিয়ে দুই মেন গেটের উপর শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার সারা দিনরাত অনুচরবৃন্দ সহ দাঁড়িয়েছিলেন এবং রবিবার সকালে মন্দিরে ফিরেছেন।"

"মহাগৌরীর সঙ্গে দুই তিন দিন থেকে একটী বয়োবৃদ্ধা গৌরবর্ণা সাধিকা (স্বর্গপ্রাপ্তা) ঘুরছেন। তিনি মহাগৌরীর পূর্বজন্মের গুরুমাতা ও হরিহরানন্দ ব্রহ্মচারীর ধর্মপত্নী।" ব্রহ্মার দশ মানস পুত্র—সনৎ, সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, নারদ, অগস্ত্য, অঙ্গিরা, ঋচী, ভৃগু ও ভরদ্বাজ ঋষি। এঁরা সকলে সত্যযুগের ঋষি। গুরুপূর্ণিমায় দেবতারা বৃহস্পতিকে সত্যযুগে গুরুপদে বরণ করেন। ত্রেতায় গুরুপূর্ণিমায় শিব তন্ত্রপ্রকাশ করেন ও দেবগণের মধ্যে গণেশকে দীক্ষা দেন, আর বলির ছেলে বানকে দীক্ষা দেন। তাই থেকে বাণলিঙ্গের উৎপত্তি। তন্ত্র ইষ্টকে গুরুপদে বরণ করল। দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সন্দীপনী মুনির পাঠশালায় দীক্ষা নেন। শুক্রাচার্য্যকে গুরুপদে বরণ করার পর দৈত্যরা গুরুশক্তিবলে বলীয়ান হয়ে দেবতাদের হারিয়ে দেন। গুরুশক্তি পেতে অদিতির গর্ভে বিষ্ণু বামন হয়ে জন্মালেন বলিকে হারাবার জন্য। শুক্রাচার্য্য থাকতে যুদ্ধে বলিকে হারান যাবে না, তাই দান দ্বারা জয় করলেন। এইজন্য সর্বধর্ম সম্প্রদায় গুরুপূর্ণিমাকে মানে।" ২০ জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় আমাদের মাটমন্দিরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কলিকাতা বিভাগ কর্তৃক বিচিত্র সিনেমা প্রদর্শিত হয়। ঐ দিন বৈকালে হঠাৎ ভীষণ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ সিনেমা চলিতেছিল, ততক্ষণই

অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হলো। বহু পূর্ব থেকেই ভৈরবানন্দ পরমহংস বরুণ ও ইন্দ্রকে ঐ দিন বেলুড়ে বৃষ্টি না করার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তাহা সত্ত্বেও বৃষ্টি হওয়ায় এবং তজ্জন্য সিনেমায় লোক কম আসায় ভৈরবানন্দ বিরক্ত হয়ে ইন্দ্রকে ও বরুণকে মাকড়দহে স্বীয় কক্ষে আবদ্ধ করে রাখেন এবং প্রার্থনা সত্ত্বেও বারিবর্ষণ করায় তিনি ভৈরবস্বরূপে সমারূঢ় হয়ে এই দেবতাদ্বয়ের প্রতি ত্রিশূল নিক্ষেপ করেন। ইহাতে ব্রহ্মা এসে ইন্দ্রকে ও বরুণকে সেই শূলাঘাত থেকে রক্ষা করেন। তখন মূলশক্তি মহামায়া ঝড়বৃষ্টি করান। ভৈরবানন্দ দেবতাদের উপর ক্ষাত্র কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। আজ উহা ব্যর্থ হতে দেখে তিনি ঐ সিদ্ধাই ইষ্টদেবী কালীর হাতে ফেরৎ দেন। ইহার পর দেবতার উপর তাঁর ক্ষাত্র কর্তৃত্ব চলে গেল, শুধু ভক্তের দাবী রহিল। ১৪ই আগষ্ট, ১৯৬০ রবিবার দুপুরে কোন ভক্তের দীক্ষাকালে স্থূলদেহে নীচে থেকেও সূক্ষ্মদেহে ভৈরবানন্দ মন্দিরে ছিলেন এবং সান্ধ্য সভায় স্থূলদেহে বাহিরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজিতে ছিলেন, অথচ সূক্ষ্মদেহে নাটমন্দিরে সভাস্থলে বসেছিলেন। আবার যখন মন্দিরে অন্নভোগ নিবেদিত হল, তিনি স্থূলদেহে নীচে থেকে সূক্ষ্মদেহে মন্দিরে বিরাজ করলেন। মহাগৌরীকে রক্ষা করার জন্য তাঁর সঙ্গে তিনি সূক্ষ্মদেহে বাসেও যাতায়াত করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভৈরবানন্দকে বলেছেন, "মথুরানাথ বিশ্বাস (রাসমণির জামাই) ও তৎপত্নী জগদম্বা আমার সর্বপ্রথম দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য-শিষ্যা এবং রাণী রাসমণির গুরুদেব রামভক্ত বাউল সাধক।" স্বামী ভৈরবানন্দ যোগদৃষ্টিতে জেনে মন্তব্য করেন, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ ভগবানের খণ্ডশক্তি, পূর্ণশক্তি নন;. কারণ তাঁদের স্ব স্ব ইষ্টমন্ত্র ক্লীং ও হ্রীং বীজে যথাক্রমে তাঁদের পূজাদি হয়। যাঁরা ভগবানের পূর্ণ শক্তি অবতার, তাঁদের নিজস্ব স্বতন্ত্র বীজমন্ত্র আছে, যেমন রাম, কৃষ্ণ ও কল্কি প্রভৃতি।"

৮ই জুলাই শুক্রবার ১৯৬০ তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ তাত্ত্বিক প্রসঙ্গে বলেন,

"দেবতাদের বীজমন্ত্র শিব-রচিত তন্ত্রসমূহে পাওয়া যায়। ত্রেতাযুগে তন্ত্র-শাস্ত্র সৃষ্টি হয়। তখনকার যুগে যজ্ঞস্থলে যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্বরা দেবতাদের বেশ ধরে এসে যজ্ঞভাগ নিয়ে গেছে এবং অত্যাচারও করেছে। আমাদের মুনিঋষিরা এত তত্ত্বদর্শী ছিলেন যে, প্রকৃত দেবতারা যজ্ঞস্থলে যজ্ঞভাগ নিতে এলেন কিনা, তাহা জানার উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। যে দেবমূর্তি যজ্ঞস্থলে এসে আবির্ভূত হলেন, সেই দেবমূর্তি বা মানব মূর্তির হৃদয়ে ব্রহ্মজ্যোতিঃশিখা জ্বলিত। তাহলে প্রত্যেক দেবতার হৃদয়ে নিজস্ব বীজমন্ত্র প্রণব সহ লেখা থাকে। আমাদের মুনিঋষিরা এত সূক্ষ্ম যোগদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন।"

১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৬১ পূর্বাহ্নে বর্তমান অধ্যায়ের এই অংশ লিখিত হইল মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায়—আমি লিখিতেছি ও মহাগৌরী আমার পুরাতন নোটবুক পড়িতেছেন। তখন দেখা গেল, দক্ষিণাকাশে শূন্যে একটী ঋষি দাঁড়িয়ে শুনছিলেন—তাঁর গাত্রবর্ণ সাদা বরফের মত, লম্বা দাড়ি এবং গোঁফ ও মাথায় দীর্ঘকেশ, সবই শ্বেতবর্ণ। আমরা তাঁকে দেখে সভক্তি প্রণাম করতে তিনি চলে গেলেন। আধুনিক তত্ত্বদর্শীর জীবন-কথা শোনার জন্য একটী প্রাচীন ব্রহ্মর্ষি এসেছিলেন। এই ঘটনার পূর্বে মহাগৌরী ভৈরবানন্দের সদ্যপ্রাপ্ত চিঠি পড়ছিলেন ও আমি তাঁকে একটী চিঠি লিখছিলাম 'কল্কি-গীতা' পাঠাবার সঙ্গে। তখন আমরা উভয়ে দেখলাম, ভৈরবানন্দের সূক্ষ্মদেহ বিরাট মূর্তিতে এসে আমার বিছানায় বসলেন—শুভ্রবর্ণ, স্থূল শরীর সদৃশ, অথচ বৃহদাকার। এই সূক্ষ্মদেহ ইষ্টপদে সমর্পিত ও সর্বত্র ভ্রমণরত। আমি সশ্রদ্ধ বন্দনা ও অর্চনা করতেই তিনি হাত যোড় করে মাথা নীচু করলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে চলে গেলেন। এই দেহই পাপ-পুণ্য ভোগ করে বলে তিনি উহা ইষ্টহস্তে তুলে দিয়েছেন।

পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে তত্ত্বদর্শী ভৈরবানন্দ বলেছিলেন, "মহাগৌরী সেদিন

যে প্রজাপতিময় দিব্যবৃক্ষ দেখেছিল, তাহা স্বর্গের নন্দনকাননে বিদ্যমান। মন্ত্রলয়ের অর্থ, সাধনার শেষে সেই মন্ত্র সাধকের আপাদমস্তকে সর্ব অস্থিতে লেখা হয়ে যায়। সেই মন্ত্রের বাচনিক উচ্চারণ সাধক আর করতে পারে না। তাই বৈষ্ণবরা শবদেহ দাহ করে না, ঘাঁটিতে পুতে রাখে বা সমাধি দেয়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বৃন্দাবনে একটী হাড় পেয়েছিলেন। তাতে যার হাড় তার ইষ্টদেবের বীজমন্ত্র লেখা ছিল। সিদ্ধাবস্থায় সর্বাঙ্গে ইষ্টমন্ত্র লেখা হয়ে যায়। তারই স্থূল বাহ্য প্রয়োগ নামাবলী।" "গতকাল মহাগৌরী যে পূর্ণচন্দ্র বা পূর্ণসূর্য্য বা জ্যোতির্মণ্ডল সমাধিতে দেখেছিল, সেটী পরমাত্মার পূর্ণজ্যোতিঃ। বৈষ্ণব মতে ঐখানেই জ্ঞানলাভ হয়। তদূর্দ্ধে একটী জ্যোতির্ময় ত্রিকোণমণ্ডল আছে। ওটী সাংখ্যমতে প্রকৃতি বা চতুর্বিংশতি তত্ত্বলোক। সাংখ্য সাধন এইখানে শেষ হয়। তারপর পরম শিব। তাঁর মাথায় অর্ধচন্দ্রাকারে কুণ্ডলিনী আছেন। ইনিই মহাকুণ্ডলিনী। তারপরে নকুলেশ্বর। শিব এইখানে তান্ত্রিক সাধন শেষ হয়। তৎপরে জ্যোতিঃসম্পন্ন ত্রিকোণমণ্ডল। একে নির্বাণকলা বলে। এইখানে বৌদ্ধ সাধক সাধন শেষ করে। তাঁর উপরে কোটীগুণে অধিকতর জ্যোতিঃসম্পন্ন এক বিন্দু বিদ্যমান। সেই বিন্দুর পরেই নির্বিকল্প সমাধি ভূমি। তৎপরে বিন্দুময় পরমাত্মা। ওখানে গেলে পরমহংসপদ। "এটী বেদান্ত সিদ্ধান্ত।" বরুণের বর্ণ জলতত্ত্ববৎ শ্বেতবর্ণ ও জ্যোতির্ময়, চারি হাত—ডান দুই হাতে ধনু ও তীর এবং দুই বাম হাতে পাশ ও বজ্র, মাথায় মুকুট, চার হাতে ও গলায় অলংকার। জ্ঞানমার্গী সাধক বা সিদ্ধ জ্ঞানী গেলে তিনি সংকুচিত হন। প্রত্যেক দেবতার অবস্থাও তাই। অগস্ত্য বা ভৃগু স্থূল বা সূক্ষ্মদেহে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় গেলে তিনি উঠে পাদবন্দনা করতেন।" ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে আছে, জ্ঞানীকে পাপস্পর্শ করে না। ১৩৬৭ সালে কার্তিক মাসে ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবত কি আপনার রচনা? বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাধকের উপকরণও

ভাবধারা আলাদা হতে পারে ; কিন্তু সাধন-ক্রম এক হবে। তবে উভয় গ্রন্থে এত তফাৎ কেন? ব্যাসদেব উত্তর দিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরে ভাগবত ধর্মই সমাজে প্রবল হয়েছিল। ভাগবত ধর্মের মধ্যে যেটুকু মূর্তিমার্গের স্তর (বিশুদ্ধ পদ্মের তলা পর্য্যন্ত সাধন) আছে, তাহা ভারতের অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত। তাই সুবিধাবাদীরা আমার লিখিত মূল ভাগবতের কতকাংশ বাদ দিয়ে তাদের সুবিধা মাফিক করে নিয়ে বর্তমান ভাগবত চালাচ্ছে, কিন্তু দেবীভাগবতের প্রভাব ত্রেতায় ও দ্বাপরে খুব ছিল। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পরে দেবী ভাগবত অপ্রচলিত হয়ও তান্ত্রিক সাধন মুষ্টিমেয় খাঁটি লোকের হাতে থাকে। তাই উহাতে ভেজাল বা ভেল হয়নি। শ্রীকৃষ্ণের পরে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব পর্য্যন্ত ভাগবত ধর্ম পূর্ণরূপে চলেছে। রামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হতে ভৈরবী ব্রাহ্মণী (বর্তমানে মহাগৌরী) চৌষট্টি খানি তন্ত্রসাধন করিয়ে উহার বিশুদ্ধ ফল মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত দেখিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণই তখন থেকে তান্ত্রিক সাধন পুনঃপ্রচার করলেন। অবশিষ্ট কলিযুগে তন্ত্রশাস্ত্র প্রবল হবে এবং কল্কিদেবও তান্ত্রিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবেন। এখন থেকে তন্ত্রই প্রধান হবে। কল্কির সময় ও পরে ত্রিশ হাজার বৎসর কল্কির ভাবধারা নিয়ে ভারত সারা বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তার করবে ধর্ম, শিল্প, দর্শনাদি সর্ব বিষয়ে।"

"গীতাখানি তিনবার পড়ার পর গীতোক্ত সাধনতত্ত্ব লেখার সংক্ষেপে সংকল্প করি। তখন পাঠকালে কোন কোন শ্লোকের শেষে নোট লিখতে ইচ্ছা করলাম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে ভগবানের ঐশ্বর্য্য বর্ণিত আছে, সেখানে নোট লেখার পরেই শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাস উভয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, গীতায় কোন নোট লিখো না, দাগ কেটো না বা আঁচড় দিও না। কারণ, গীতা কলিযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। যদি কেউ এই গীতা পূজা ও পাঠ করে, সেটা অশুদ্ধ হবে, পাঠের অসুবিধা হবে।"

অন্য সময় মন্ত্রতত্ত্ববিশারদ ভৈরবানন্দ বলেন, "যে দেবতার মন্ত্রে গুরু দীক্ষা দেবেন, সেই দেবতার স্বরূপে গুরু প্রতিষ্ঠিত হয়ে শিষ্যকর্ণে মন্ত্র দিলে সেই মন্ত্রচৈতন্য বা মন্ত্রসিদ্ধি সুনিশ্চিত ; নচেৎ মন্ত্রদান সফল হয় না। জ্ঞানচক্ষু না খুললে দীক্ষাদান অনুচিত, কারণ জ্ঞানচক্ষু না থাকলে ইষ্টদেব নির্বাচন বা ইষ্টমন্ত্র নির্ধারণ অসম্ভব।

প্রায় চোদ্দ মাস অনুপস্থিতির পর সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ তেসরা এপ্রিল, ১৯৬০ বাসন্তী সপ্তমীর প্রাতঃকালে মাকড়দহ থেকে ধর্মচক্রে আসেন এবং দুর্গোৎসবের চারদিন এখানে থেকে বৃহস্পতিবার সকালে স্বস্থানে ফিরে যান। এই চারদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেছিলেন, "বাবা, এবার আপনি দুর্গাপূজায় ব্রতী ও মহাগৌরী আপনার সহকারিণী হওয়ায় ৺মায়ের অপূর্ব সাত্ত্বিক প্রকাশ হয়েছে। এরূপ সাত্ত্বিক প্রকাশ অন্যত্র দুর্লভ। গত চার বর্ষ অন্য পূজকের পূজায় ৺মায়ের রাজসিক প্রকাশ দেখেছি। আপনার সূক্ষ্মদেহী মাতাপিতা দুর্গাপূজাকালে প্রত্যহ আপনার দুই দিকে বসেছিলেন। বোধ হয়, আপনার জননী দুর্গাপূজার সংকল্প অপূর্ণ ছিল। আপনার পিতা কৃষ্ণভক্ত হলেও আপনার মাতা কালীভক্ত। তাই আপনার মা এই মন্দিরে আসার দিনই মা কালীও তাঁর সঙ্গে এসেছেন। এবার এখানে বাঘাযতীন পল্লীর ননীমা আসার পর ননীমা আমার ও মহাগৌরীর দর্শনাদিকে অসত্য ও কল্পিত বলে উড়িয়ে দেওয়ায় আপনি মর্মাহত হয়েছিলেন। এই কথা আপনার চিঠিতে পড়ে আমি ব্যথিত হয়ে ধর্মরাজকে বলেছিলাম, এর প্রতিকার করুন। অবিলম্বে ধর্মরাজের ইংগিতে তিনটি যমদূত ননীমার ঠাকুরঘরে গিয়ে হাজির হয়েছেন। তন্মধ্যে একটির গলায় গোমুণ্ডমালা, অন্যের গলায় মহিষমুণ্ড-মালা ও আর এক জনের হাতে নরকংকাল দণ্ড। এই যমদূতত্রয়কে দেখে ননীমার গোপাল ভয়ে আমার কাছে চলে এসেছে ও আছে ও আমাকে বলছে, ননীমা তোমার কাছে আসবে। আপনার সম্পর্কে ঠাকুর আমাকে

বলেছেন, "ওর জীবন ঝড়ের জীবন, ও সারা জীবন খুব দুঃখ পেয়েছে। তাই ওর কর্মক্ষয় হয়েছে, এইটী ওর শেষ জন্ম। তাকে এখন আজ্ঞাচক্রে সাধন করতে বল। তার পরে সহস্রার সাধনে তার তিন বৎসর লাগবে। তোর বাবার পূর্ণ সিদ্ধি এজন্মে হয়ত হবে না।" আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমি যেখানে যাবো, বাবাকেও সেখানে নিয়ে যাবো, নচেৎ আমি যাবো না। মহাগৌরীও ঠাকুরকে তাই বলেছে। আমাদের উভয়ের অনুরোধে ঠাকুর বলেছেন, দেখছি যাতে এই জন্মেই ওর সাধন শেষ হয়। এখন বই লেখা, বক্তৃতা দেওয়া প্রভৃতি ছেড়ে তাকে তপস্যায় ডুবতে বল। বাবা, আপনি সাধনের যে অপূর্ব সুযোগ পেয়েছেন, শেষ জন্মে এমনটি কেউ পায় নি। আমি ও মহাগৌরী আপনার দুই পাশে আছি। আপনার চিন্তা কি? আপনি সব ছেড়ে সাধনে ডুবে যান। ধর্মচক্রের জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আপনার অবর্তমানেও ধর্মচক্র ভালভাবেই চলবে এবং মহাগৌরী এর সুনাম বৃদ্ধি করবে। সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে মহাগৌরী আপনার পায় মাথা রেখে কাঁদে কেন জানেন? আপনার প্রতি পূর্বজন্ম থেকেই তার গভীর প্রীতি আছে। গত জন্মে ঠাকুরের অবতারত্ব প্রতিপাদনার্থ ভৈরবী ব্রাহ্মণীরূপে মহাগৌরী দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীর নাটমন্দিরে পণ্ডিতদের সভা আহ্বান করেছিলেন। দুই শতাধিক পণ্ডিত ঐ সভায় এসেছিলেন ও ঠাকুরকে দেখে সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিলেন। তখন আপনি সুপণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিরূপে বলেছিলেন, "অবতারের সব লক্ষণ এঁর মধ্যে দেখছি। এঁর অবতারত্ব অস্বীকার করা যায় না।" ভৈরবী ব্রাহ্মণীও ঠাকুরকে অবতার বলে ভেবেছিলেন। আর আপনি তাকে সমর্থন করে ঠাকুরকে অবতার বলে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করায় আপনার প্রতি মহাগৌরীর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি হয়েছিল। তাই এই জন্মে সেই প্রীতির প্রকাশ হচ্ছে। স্থূলদেহে পূর্ণজ্ঞান না হলে কেহই কোন স্থূলদেহী বা সূক্ষ্মদেহী সাধককে পূর্ণজ্ঞান দিতে পারে না।

বিবেকানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, নাগ মহাশয় ও অঘোরমণি দেবী (গোপালের মা)—এই চারজন ব্যতীত ঠাকুরের কোন শিষ্য স্থূলদেহে জ্ঞান লাভ করেন নি, দেহান্তে অন্যান্য সকলে বিদেহমুক্তি লাভ করেছেন। আপনি যখন বাসন্তী নবমী দিবসে দুর্গাহোমে ঠাকুরের দুই গুরু তোতাপুরী ও ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নামে আহুতি দিলেন, তখন ঠাকুর আমাকে বললেন, "ত্যাখ ভৈরব, তোমার বাবা ভৈরবী ব্রাহ্মণী জন্মেছে জেনেও তার নামে আহুতি দিচ্ছে। এত বড় পণ্ডিত হয়েও এই ভূল করছে। আমার নামে নানা স্থানে যত হোম হচ্ছে, সেই সব হোমে ভৈরবীর নামে আহুতি দেওয়া হয় বলেই মহাগৌরীর শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে ও আয়ূ কমছে।" বাবা, আপনি আর কোন হোমে ভৈরবীর নামে আহুতি দিবেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এগার জন পার্ষদকে গেরুয়া দিয়েছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাস দেন নি। এর কারণ কি জানেন? সন্ন্যাস দিলে যদি কোন সন্ন্যাসীর পতন হয়, তাহলে সেই পাপে গুরুর অধোগতি হবে। তাই ঠাকুর সন্ন্যাস দিলেন না, গেরুয়া দিলেন। নিবেদিতা জন্মেছেন ও কলিকাতায় আছেন ও বেদান্তে এম. এ. পাশ করেছেন। তিনি সূক্ষ্মদেহে আমার কাছে একদিন গিয়েছিলেন। সে বাসন্তী নবমীর দিন এখানে এসেছিল ও হোমে আহুতি দিয়ে প্রসাদ পেয়ে গেছে। সেও আমাকে দেখেছে এবং আমিও তাঁকে দেখে চিনেছি। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, হ্যাঁ। এই সেই মেয়ে, শীঘ্রই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। মহাপুরুষজীর স্ত্রীও জন্মেছেন। তার বিয়ে হয়েছে ও বর্ত্তমান বয়স ২৯ বৎসর। সেও শীঘ্র আপনার কাছে আসবে ও আমার কাছে যাবে। ধর্মচক্রই আমার হেড কোয়াটার্স। যারা আমার কাছে যাবে, তারা আগে এখানে আসবে। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীমণি জন্মেছে ও কলিকাতায় থাকে। সে এখানে এসেছে বহুবার। ঠাকুর বলেছেন, এই মেয়ে পূর্বজন্মে আমার ভাই-ঝি লক্ষ্মী ছিল। 'কথামৃতে,' শ্রীম অনেক কথা মনগড়া লিখেছেন—

এই কথা ঠাকুর আমাকে বলেছেন। গৌরীপুরীর ছবি পূর্বে দেখিনি। সম্প্রতি আমাদের নাটমন্দিরে তাঁর ছবি দেখে তাঁর আজ্ঞাচক্রে ধ্যান করলাম। তখন দেখলাম, তাঁর আজ্ঞাচক্র থেকে দেহের নিম্নাংশ জ্যোতির্ময় ও উর্ধাংশ রক্তমাংসময়। তখন বুঝলাম, গৌরীপুরী স্থূলদেহে সাধন করে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত উঠেছিলেন। তাই তিনি সূক্ষ্মদেহে তৎ প্রতিষ্ঠিত সারদেশ্বরী আশ্রমে থেকে বাকী সাধন করছেন। মহাগৌরী ও সেদিন ঐ আশ্রমে গিয়ে ঠাকুরঘরে সূক্ষ্মদেহী গৌরীপুরীকে দেখে এসেছে। ঠাকুর আমাকে বলেছেন, বার বছর বেলুড় মঠে না খেয়ে ছিলাম। তোর বাবা যখন এই মঠ প্রতিষ্ঠা করল, তখন থেকে এখানে এসে আছি ও বাতাসা খাচ্ছি। ও আমাকে খুব ভালবাসে ও প্রাণভরে ডাকে। তাই ওকে ফেলে যেতে পাচ্ছি না। আর মহাগৌরী এখন এখানে থাকে। তাই এখন এখানেই থাকবো। বিজয়া দশমীতে বিসর্জনের সময় প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে মা দুর্গাকে বলেছি, মা আমাদের ছেড়ে যেও না। বাবার শরীর যতদিন থাকবে, ততদিন তুমি এই মন্দিরে বিরাজ কর। মা দুর্গা আমার কাতর প্রার্থনায় সম্মতি জানিয়েছেন। ঠাকুর আমাকে আরও বলেছেন, "মহাগৌরীকে দিয়ে অনেক মহৎ কাজ হবে। তুই ওর পেছনে থাক এবং ওকে সর্বদা রক্ষা কর। আমি ওর হাত ধরে আছি। তোর বাবাও প্রাণপণে মহাগৌরীর সেবা করছে। তাই আমি ওর প্রতি খুব প্রসন্ন হয়েছি।" বাসন্তী বিজয়া দিবসে কলা বৌ কাঁধে করে আপনি যখন গঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন মহাগৌরীও আপনার সঙ্গে যাচ্ছিল। আমি আপনাদের সঙ্গে সূক্ষ্মদেহে যাবার মনস্থ করেছিলাম। তখন ঠাকুর মন্দির থেকে নেমে এসে আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে বললেন, "শালা, এখানেও সূক্ষ্মদেহে খেলা করছ? বুড়ো অন্ধ সাধুর সঙ্গে বাচ্চা গৌরী যাচ্ছে; আর তুই এখানে বসে আছিস্! যা; এক্ষুনি ওদের সঙ্গে যা।" আপনারা খানিকটা এগিয়ে পড়েছিলেন। আমি ছুটে গিয়ে আপনাদিগকে ধরলাম।

যখন ঠাকুর আমাকে ধাক্কা মারলেন, তখন আমি বিড়ি খাওয়ায় মশগুল ছিলাম। ঠাকুরের ধাক্কায় বিড়ির আগুন পড়ে আমার কাপড় পুড়েছে ও গায়ে ফোস্কা হয়েছে। মহাগৌরীও সেই ফোস্কা দেখেছে।”

১৭ই জুন শুক্রবার বৈকালে ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে ধর্মচক্রে এলেন ও কথাপ্রসঙ্গে বললেন, “স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক ও পিতৃলোকে তিন তিন স্তর—সত্ত্ব, রজঃ ও তমো। প্রেতলোকের তমোস্তরে নরক আছে ও যমশাসন চলে। মধ্যস্তরে বা রজোস্তরে পাপ-পুণ্য সমান যাদের, তারা বাস করে। ওদের মৃত্যুর পর যমরাজ জিজ্ঞাসা করেন, পাপভোগ বা পুণ্যভোগ—কোন্‌টী আগে করবে? এইটুকু স্বাধীনতা প্রেতগণকে দেওয়া হয়। সত্ত্বস্তরই পিতৃলোক বা যমলোকের সত্ত্বলোক। দান-পূজাদি পুণ্যকর্ম করে যারা পিতৃযান মার্গে গেছে, তারা তথায় যান ও পুণ্যক্ষয় হলে আবার জন্ম নেন। যমরাজের সভাগৃহে ১০১ স্তম্ভের উপর ছাদ। দ্বাদশ পূর্ণচন্দ্র একত্রিত হলে যেরূপ জ্যোতির্ময় হয়, যমরাজের সভাগৃহ সেইরূপ জ্যোতির্ময়। আমি ইন্দ্রসভা, যমসভা ও সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সভা—এই তিন সভা দেখেছি। মহাভারতে আছে, নারদকে হাজার বৎসর তপস্যা করতে হয়েছিল, ব্রহ্মসভা দর্শনের জন্য। আমিও সূক্ষ্মদেহে সেখানে গেছি। সূক্ষ্মদেহে সেখানে গেলেও লয়াবস্থা আসে। উক্ত দিব্য স্থানের ঝলক স্থূলদেহে আঘাত করে ও লয়াবস্থা আসে। দেহ পঞ্চবিধ—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ ও অণু। স্থূলদেহ গেলে বাকী চার সূক্ষ্মদেহ থাকে। শক্তিমান্ সিদ্ধ সাধক সূক্ষ্মদেহ ছাড়লে শক্তি ভাগ করে দেয়—কিছু স্থূলেও কিছু সূক্ষ্মে। যদি চার সূক্ষ্মদেহে পূর্ণ শক্তি যায়, তাহলে স্থূল দেহ থাকতে পারে না। পাপ অধিক হলে এই চারি দেহ মৃত্যুর পরে যমলোকে পাপভোগ করে। এই সূক্ষ্মদেহ কারণ, মহাকারণ ও অণু দেহ সহ তখন ধর্মরাজের অধীন হয়। সূক্ষ্মদেহই যমলোকে পাপ ভোগ বা স্বর্গে পুণ্য ভোগ করে। যমলোকে পিতৃমার্গী পুণ্যাত্মা সাধকের দৈহিক

ঔজ্জ্বল্য পার্থিব মানুষবৎ থাকে, ঈষৎ উজ্জ্বলতা বাড়ে। যোগসিদ্ধ শরীরের লাবণ্য ওখানে হয় না। ওখানে সাধনও বেশী হয় না। সাধনবলে প্রেতদেহ প্রথমে অগ্নিমূর্তি ও পরে জ্যোতিঃমূর্ত্তি ধরে। যমলোকে বা পিতৃলোকে তাহা হয় না। অগ্নিময় জ্যোতির্ময় কারণ শরীর স্বর্গ ভোগ করে। সাধনবৈগুণ্যে বা বৈচিত্র্যে স্বর্গের তিন স্তরে গতি হয়। মহাকারণ শরীর ব্রহ্মলোক ভোগ করে, আর অণুদেহ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের অতীত এবং বেদান্তের মূলসাধন এই দেহে হয়। অণুদেহে নিরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম ধ্যেয়। অণুদেহ লয় হলে নির্বিকল্প সমাধি হয়। অণুদেহই ভিন্ন ভিন্ন দেহধারণ করে। কর্মক্ষয়ে অণুদেহ খাদ্যের সঙ্গে মিশে কারণ, মহাকারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ ধারণ করে। অণুই ফুলের সঙ্গে বা জলের মধ্যে মেশে। ইন্দ্রসভায় তিনস্তর বিদ্যমান—সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণভেদে। স্তবাদি পাঠ দ্বারা সাযুজ্যলাভ প্রভৃতি এই তিন গুণের মধ্যে। ত্রিগুণের পারে গেলে পরমাত্মার সাধনা আরম্ভ হয়। ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষকে যোগ-যাগ ও অভিচার দ্বারা দেবতা বা মনুষ্য কেহই পীড়িত করতে পারে না। কেবল পূর্বজন্মকৃত প্রারব্ধই তাঁকে পীড়িত করে। ইন্দ্রসভা ১০০১ স্তম্ভের উপর অবস্থিত। উহা দ্বাদশ ভাস্করজ্যোতিঃসম্পন্ন। ইন্দ্রসভা পঞ্চাশ যোজন বিস্তৃত। ইহার মধ্যস্থলে ইন্দ্রদেবের সিংহাসন অবস্থিত। ইন্দ্রের সভা ও সিংহাসন এত মণিমাণিক্য খচিত, এত পুষ্পমাল্য শোভিত ও এত জ্যোতিঃসম্পন্ন যে, তাহার বর্ণনা দেওয়া যায় না। অগস্ত্য, ভরদ্বাজ, অঙ্গিরা, পৌলস্ত্য ও বশিষ্ঠ সশরীরে স্বর্গ-মর্ত্যে যাতায়াত করেন। এই কথা ঋগ্বেদে আছে। পঞ্চতত্ত্বের সম্রাট না হলে এই শক্তি লাভ হয় না। এঁরাই উক্ত তিন সভার বর্ণনা পুংখানুপুংখরূপে দিতে পারেন। মহাভারতে ও রামায়ণে এই সভাত্রয়ের বর্ণনা আছে। ব্রহ্মসভার কোন স্তম্ভ বা ভিত নাই। ইহার ছাদ শূন্যে ঝুলছে। ইহা সহস্র যোজন বিস্তৃত। আমি সেখানে সূক্ষ্মদেহে গেছি। কোটী সূর্য্যের জ্যোতিঃ সেই সভাগৃহে

বিদ্যমান। ব্রহ্মার ডান ও বাম দিকে অসংখ্য মুমুক্ষু সন্ন্যাসী বিরাজমান। তাঁদের শরীর জ্যোতির্ময়। ব্রহ্মাজী আমাকে কোলে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কি চাস্? আমি বললাম, "ঠাকুর, তুমি জগৎ সৃষ্টি করেছ। আমাকে পরমাত্মলোকে পৌছে দাও। তখন তিনি আমাকে পরমাত্ম-লোকে পৌছে দিলেন ও আমার নির্বিকল্প সমাধি হলো। কোন শাস্ত্রেই সাধনরহস্য লিখিত নাই, শুধু সাধনের ইঙ্গিত মাত্র আছে। উক্ত তিন সভার তিন স্তর আমাদের শরীর-ব্রহ্মাণ্ডে আছে। মন্ত্রযোগ সাধন করলে তাহা অনুভব করা যায়।" "পিতৃলোকের মন্ত্র স্বধা ও স্বর্গলোকের মন্ত্র স্বাহা। পিতৃলোকের সত্ত্ব ও রজোস্তরের অধিবাসীরা স্বধামন্ত্রের অধিকারী ও স্বর্গলোকের তিনস্তরবাসীরাই স্বাহামন্ত্রের অধিকারী। আমাদের একমাস পিতৃলোকের একদিন, আর আমাদের এক বৎসর স্বর্গলোকের একদিন।"

২রা মার্চ ১৯৬১ বৃহস্পতিবার ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে আমাদের নাটমন্দিরে প্রতিমায় ব্রহ্মাপূজা ও শ্রীচৈতন্য জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন শুক্রবার সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রণীত 'গীতা ধ্যান' নামক পুস্তক পড়ছিলেন। পরদিন ডাক্তার মহানামব্রত আমাদের নাটমন্দিরে সান্ধ্য সভায় ভাষণ দিলেন। আমি শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বামী ভৈরবানন্দকে বললাম, ব্রহ্মচারী মহানামব্রত ফরিদপুরের প্রভু জগদ্বন্ধুর শিষ্য। এই কথা বলে আমি ও মহাগৌরী রাজেন শেঠ লেনে বেড়াতে গেলাম। আমি মহাগৌরীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রভু জগদ্বন্ধুর কথাই ভাবছিলাম। কারণ, আমিম তিচ্ছন্ন মহেন্দ্র কৃত 'প্রভু জগদ্বন্ধু'র জীবনী পড়েছিলাম ও তৎশিষ্য রমেশ চক্রবর্তীকে জানতাম। রমেশ চক্রবর্তী কৃত 'ব্রহ্মচর্য্য' বইখানি আমি ছাত্রজীবনে বহুবার পড়েছি। বেড়াতে বেড়াতে মহাগৌরীকে প্রভু জগদ্বন্ধুর কথা বলছি। এমন সময় প্রভু জগদ্বন্ধু সূক্ষ্মদেহে এসে আমাদের সম্মুখে শূন্যে বিরাজ করলেন। তাঁকে নিয়ে আমরা সত্বর ধর্মচক্রে ফিরলাম

ও নীচে পশ্চিম বারান্দায় উপবিষ্ট ভৈরবানন্দকে বললাম। প্রভু জগদ্বন্ধু ভৈরবানন্দের পায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন ও পার্শ্বস্থা মহাগৌরীকে যুক্ত করে শ্রদ্ধা জানিয়ে মেজেতে বসলেন। ভৈরবানন্দ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে জগদ্বন্ধু বললেন, "আমার নাম মৌনী জগদ্বন্ধু, ভক্তরা প্রভু জগদ্বন্ধু নাম রেখেছে। আপনি মৎশিষ্য মহানামব্রতের বই পড়ছেন।" প্রভু জগদ্বন্ধু বিষ্ণুভক্ত ও চরম ইষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্ত ও উর্দ্ধগতিপ্রার্থী। এই মন্দিরে সম্প্রতি বিষ্ণু প্রমুখ অনেক দেবতা বিরাজ করায় তিনি এখানে থাকতে চাইলেন। ভৈরবানন্দ জগদ্বন্ধুর গুরুদেবকে ডাকলেন। আহূত গুরুজী অবিলম্বে এসে বললেন, আমার নাম নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী। নিত্যানন্দ গেরুয়া-পরা ও বিদেহ মুক্তির সাধক। নিত্যানন্দ আসতেই জগদ্বন্ধু তাঁকে সাষ্টাঙ্গ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন। তখন গুরু শিষ্যের দিকে ফিরেও চাইলেন না, মহাগৌরীর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ভৈরবানন্দ তিনবার তিরস্কার করায় নিত্যানন্দ জগদ্বন্ধুকে তুললেন। ভৈরবানন্দ নিত্যানন্দকে বললেন, আপনি আপনার শিষ্যের সাধন শেষ করে দিন ও সঙ্গে রাখুন। উক্ত প্রস্তাবে নিত্যানন্দ আদৌ রাজি হলেন না; বললেন, আপনিই এর সাধন শেস করে দিন। ভৈরবানন্দ অসম্মত হওয়ায় উভয়ে বিবেকানন্দ নাটমন্দিরে ব্রহ্মা প্রতিমার সামনে বসে জপ করে চলে গেলেন। নিত্যানন্দের মধ্যম চেহারা, মাথায় টিকি, গলায় তুলসীমালা ও উপর হাতে চন্দনমালা বাঁধা, গায় গেরুয়া চাদর। জগদ্বন্ধু প্রভুর গলায় পৈতে, খর্বাকৃতি, সাদা বস্ত্রপরা, মধ্যম চেহারা, মাথায় টিকি। গুরু-শিষ্য উভয়েই গৌরবর্ণ।" ৪ঠা মার্চ শনিবার সকাল নয়টায় প্রভু জগদ্বন্ধু একতলার বারান্দায় এলেন ও ভৈরবানন্দকে নমস্কার করে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন ও উর্দ্ধগতির আকাংক্ষা জানালেন। এখন প্রভু জগদ্বন্ধু স্বর্গলোকের সপ্তস্তরে বাস করেন। ভৈরবানন্দ তাঁকে প্রীতিভরে বললেন, "বাবা, তোমার উর্দ্ধগতি হবে না, পুনর্জন্ম

হবে।" জগদ্বন্ধু তা শুনে দুঃখিত ও ব্যথিত হয়ে বললেন, আবার আমাকে দেহধারণ করতে হবে? ভৈরবানন্দ বললেন, "সেটা তোমার পক্ষে সুখকর ও শ্রেয়স্কর হবে। তোমার ইষ্ট বিষ্ণু কল্কিমূর্তিতে মথুরায় ১৯৮৫ খ্রীঃ বা ১৩৯২ বঙ্গাব্দে অবতীর্ণ হবেন। আজ থেকে চব্বিশ বৎসর পরে ভগবান্ কল্কিদেব আসবেন। কল্কি-জন্মের বিশ বৎসর পরে তুমি জন্মাবে। তোমার ইষ্টকে স্থূল মূর্তিতে দেখবে। এর চেয়ে সাধকের পক্ষে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে?" তখন জগদ্বন্ধু জোড় হাত করে আহ্লাদিত হয়ে বললেন, তাহলে উত্তম। এই কথোপকথনের সময় তাঁর গুরু নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী উপস্থিত হলেন। তখন গুরুভক্ত জগদ্বন্ধু তাঁকে সাষ্টাঙ্গ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন। অবিলম্বে নিত্যানন্দ তাঁকে ধরে তুলে আলিঙ্গন করলেন ও ভৈরবানন্দকে বললেন, "আমার গতি কি হবে? আমি বিদেহ মুক্তিমার্গে এতকাল সাধন করেও সিদ্ধি পাচ্ছি না কেন?" ভৈরবানন্দ বললেন, "তোমার বৈষ্ণবী গোঁড়ামি প্রধান অন্তরায় হয়েছে। তুমি এখন যে স্তরে আছ, তদূর্দ্ধ স্তরের কর্ত্রী মহামায়া, যিনি তোমার ইষ্ট বিষ্ণুর ইষ্টদেবী ও গুরুদেবী। মহামায়া বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মাকে স্বয়ং দীক্ষা দেন। তিনি একাধারে এই তিন দেবতার ইষ্ট ও গুরু। তুমি মহামায়াকে ইষ্টজ্ঞানে আশ্রয় কর।" নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী সুবিস্মিত হয়ে বললেন, আমি জানতাম না যে, আমার ইষ্ট কৃষ্ণের গুরু মহামায়া। ভৈরবানন্দ বললেন, মহামায়াও সর্বশক্তিময়ী নন। তিনিও নিরাকার পরমাত্মার অধীনা। তোমার ইষ্ট বিষ্ণু তোমাকে মহামায়ার হাতে তুলে দেবেন এবং মহামায়ার সাধন শেষ হলে মহামায়া তাঁর ইষ্ট ও স্বামী ও গুরু শিবের হাতে তোমাকে তুলে দিবেন এবং পরম শিব সাধককে মাথায় নিয়ে নিরাকার পরমাত্মায় লয় করবেন।" প্রভু জগদ্বন্ধু স্থূল দেহে যেমন খুঁড়িয়ে চলতেন, সূক্ষ্ম দেহেও তেমনি চলেন। স্থূল দেহে তাঁর এক পা অসাড় অচল হয়েছিল একাসনে আসনসিদ্ধির দুরাগ্রহে। অনন্তর

নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী মহামায়াকে দর্শন করতে চাইলেন। তাঁর প্রার্থনায় সিদ্ধশক্ত ভৈরবানন্দ মহামায়াকে আহ্বান করলেন। অবিলম্বে মহামায়া এসে নিত্যানন্দের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। তখন নিত্যানন্দ মহামায়া দর্শনে অবাক্ বিস্ময়ে বিগলিত অশ্রুধারে মহামায়ার পদতলে লুটিয়ে পড়ে প্রেমাশ্রুতে মহামায়ার পদধৌত করলেন ও বললেন, এরূপ সৌন্দর্য্য কখনও দেখিনি। একি সুন্দর জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি! এই কথা বলে তিনি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। অনন্তর নিত্যানন্দ মহামায়াকে পূজা করলেন, পূজান্তে মহামায়া অন্তর্হিত হলেন। নিত্যানন্দ জগদ্বন্ধু উভয়ে তৎপরে দ্বিতলস্থ মন্দিরের বারান্দায় এসে মন্দিরস্থ দেবগণকে প্রণাম করে চলে গেলেন। দুপুরে মন্দিরে পূজাকালে আমরা নিত্যানন্দ ও জগদ্বন্ধুকে গন্ধপুষ্প দিলাম ও প্রসাদ নিতে বললাম। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিত্যানন্দকে প্রসাদ দিলেন ও নিত্যানন্দ জগদ্বন্ধুকে প্রসাদ দিলেন। নিত্যানন্দ খেজুর, মিষ্টি ও লাল পদ্ম কয়েকটী এনেছিলেন। তিনি পদ্মগুলি ঠাকুরের হাতে দিয়ে মা কালীকে নিবেদন করতে বললেন। তাঁর অনুরোধে ঠাকুর সেই পদ্মগুলি মা কালীর পায় দিলেন। তারপরও প্রভু জগদ্বন্ধু একাধিক বার এখানে এসেছিলেন। পরদিন জগদ্বন্ধুর শিষ্য ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী আমাদের নাটমন্দিরে ধর্মসভায় সুদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। তখন জগদ্বন্ধু বা নিত্যানন্দ কেহই আসেন নি। অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রভু জগদ্বন্ধুর গুরুদেব নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর নাম পর্য্যন্ত ডক্টর মহানামব্রত শোনেন নি! কলিযুগের ধর্মসমাজে কি ভ্রান্তি ও ভণ্ডামি চলছে!!

১৩৬৬ সালের মাঘ মাসে রাত্রি ৮।৮।০টার সময় ভৈরবানন্দ তাঁর সাধন কুটীরের সম্মুখে খোলা জায়গায় বসে সাধনরত ছিলেন। তখন তিনি দেখলেন, একটা হাওয়া দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে হু হু শব্দ করে আসছে, কিন্তু কোন গাছপালা নড়ছে না। ১৩৩৫ সাল থেকে প্রায় ত্রিশ বর্ষ যাবৎ

তিনি দেখেছেন, ঐ হাওয়া একই সময়ে বহে যায় উত্তর-পশ্চিম কোণে। ঐ হাওয়া সাগর থেকে হিমালয়ের দিকে বহে যায়। তিনি তাঁর বাপ-ঠাকুরদার মুখেও শুনেছেন, তাঁরাও ঐ দিব্য হাওয়ার প্রবাহ অনুভব তখন করেছেন। উক্ত দিন তাঁর কৌতূহল হওয়ায় তিনি যোগবলে সেই বায়ুস্রোতকে রোধ করেন। সেই বায়ুমধ্য হতে একটী ঋষি (দশ বার হাত লম্বা, তাম্রবর্ণ-জটাজাল পৃষ্ঠ দেশে পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত, কপালে ভস্ম ও সিঁদুরের ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় রুদ্রাক্ষ বাঁধা) শূন্য হতে নেমে ভৈরবানন্দের সম্মুখে রুদ্রমূর্তিতে দাঁড়ালেন ও গম্ভীর নিনাদে বলিলেন,"তুমি আমার পথরোধ করলে কেন? "আজ হতে প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব পর্যন্ত হিমালয় হতে সাগরদ্বীপে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে আসি এবং উক্ত সময়ে আমি রোজই ফিরি এবং তোমাকে সাধনরত দেখতে পাই। আজ আমার পথরোধ করিলে কেন?" ভৈরবানন্দ অনুনয় সহকারে তাঁহাকে জানাইলেন, "আমার মাথার উপর দিয়ে কে রোজ যান, তাহা দেখিবার জন্যই আজ আপনার পথরোধ করিলাম। যদি অপরাধ হয়ে থাকে, ক্ষমা করিবেন।" ইহা বলিয়া সিদ্ধযোগী আবির্ভূত সিদ্ধঋষির পায় মাথা রাখিয়া প্রণামপূর্বক বিবিধ মানস উপচারে পূজা করিলেন। পূজান্তে তাঁকে পুনরায় নমস্কার করিবার পর তিনি ভৈরবানন্দজীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন ও জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, আমার নাম জমদগ্নি। অনন্তর তিনি অন্তর্হিত হইলেন। দ্বিতীয় দিবস উক্ত সময়ে আবার সিদ্ধঋষি জমদগ্নি স্থূলদেহ ধারণপূর্বক আসিলেন এবং সঙ্গে একটী সুন্দর গাভী বৎস সহ আনিলেন। গাভীটী এত সুন্দর যে, তাহাকে দেখিলে স্বতঃই মস্তক নত হয়। ভৈরবানন্দজী জমদগ্নি ও তাঁর গাভীকে ভক্তিভরে নমস্কার করিলেন। তখন জমদগ্নি বলিলেন, "আমার সবলা নাম্নী কামধেনু তুমি নাও। এই কামধেনু রাখার অধিকার এখন তোমার জন্মেছে : পূর্ণজ্ঞানী ব্যতীত কেহ এই কামধেনু রাখার অধিকারী নহে, তার কাছে কামধেনু আসেও না।" তখন ভৈরবানন্দ নম্রভাবে

নিবেদন করিলেন, "প্রভো, আমি এই স্থূলদেহী কামধেনু রাখবো না।" তখন জমদগ্নি বলিলেন, "এই কামধেনু তুমি রাখ। ইহা তোমার কর্ম-জীবনে ও ধর্মজীবনে সর্বদিক দিয়া অপূর্ব্ব সহায়তা করিবে।" ভৈরবানন্দ পরমহংস বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী। এই স্থূলদেহী কামধেনু লইলে ত্রিসন্ধ্যা ইহার পূজারতি, খাদ্য, পরিচর্যা ও শুশ্রূষা কে করিবে? আমি অঙ্গহীন বলে আমার পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। আপনি উহা ফিরিয়ে নিয়ে যান।" তখন সেই কামধেনু সুন্দরী দেবীমূর্ত্তি ধারণ করে বললেন, "বাবা, তুমি সত্যিই সন্ন্যাসী। আমি তোমার কন্যা। তোমার কন্যার এই কামনা তুমি পূর্ণ কর—যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন আমি তোমার কাছে সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করবো এবং সূক্ষ্মভাবে তোমার ধর্মপথে সহায়তা করবো।" তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ বলিলেন, মাগো, তুমি থাকলে যদি আমার ঝন্‌ঝাট কিছু না হয়, তাহলে তুমি থাকতে পার।" সেই সময় হতে কামধেনু সূক্ষ্মদেহে ভৈরবানন্দজীর কাছে বিরাজমান। প্রবাদ আছে, জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম মাকড়দহে পূর্ববাহিনী সরস্বতীতীরে ঘুগিপোতা শিবস্থানে তপস্যা করে স্বহস্তে সংলগ্ন কুঠার খুলেন। ইহার অদূরে ঋচিক মুনির আশ্রম ছিল। সুতরাং এই প্রবাদ সত্যই মনে হয়। উক্ত ঘটনার পর ঐ হাওয়া আর বহিত না। বিবেকান্ধ গ্রামবাসীরাও ঐ দিব্য হাওয়া বইতে দেখেছে ও বলছে, বিশ হাত চওড়া এই হাওয়া বইত ও উহা ভূতের হাওয়া। বস্তুতঃ উহা পরশুরামের পিতা জমদগ্নির গমনজনিত বায়ুস্রোত।

দীক্ষাগ্রহণান্তে ভৈরবানন্দ স্নানকালে পুকুরের জলে বসে (বুক পর্য্যন্ত ডুবিয়ে) যখন জপধ্যান করতেন, তখন গঙ্গা, গঙ্গা বলে ডাকলেই পুকুরের নিথর জলে ঢেউ উঠতো। আর যখন গভীর ধ্যানে ডুবে যেতেন, তখন একটী মাছ এসে জলে নিমজ্জিত শরীরাংশ কামড়াত। প্রথম ২।৪ দিন তিনি ইহাতে অস্বস্তি বোধ করতেন। পরে ঐ মৎস্যদংশন

অনুভব করিতেন না, দুই ঘণ্টা অনায়াসে জলমধ্যে গভীর ধ্যানে অতিবাহিত হইত।

স্বীয় সাধনকালের কথা ভৈরবানন্দ নিজ মুখে এইভাবে কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন, "যখন নির্বিকল্প সমাধির পূর্ণ সাধন করছি, তখন একদিন দেখলাম, আমার দুই পাশে দুটী লাউডগা সাপ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তখন আমি মা কালীকে বললাম, মা, আবার একি উপসর্গ আনলি? মা বললেন, শিবভাবে পূর্ণরূপে না সাজলে, পূর্ণভাবে শিবস্বরূপ প্রাপ্ত না হলে নির্বিকল্প সমাধি হবে না। আমি বললাম, মা এসব জ্যান্ত সাপ দেহে ধারণ করে সমাজে থাকতে পারবো না। যদি একান্তই নিতে হয়, আমাকে সূক্ষ্ম সাপ দে। তাই মা আমাকে সূক্ষ্ম সাপ দিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে আমার গলদেশে সর্পচিহ্ন ফুটে উঠল, এই চিহ্নে হাত দিলে মালুম হতো। সেই দুটী সাপ ও দশ বার হাত লম্বা একটী ঢ্যামনা সাপ প্রায় ছয় সাত মাস আমার কাছে আসতো। ছোট সাপ দুটো দিনের বেলায় দেখা যেত, আর ঢ্যামনা সাপ রাত্রে কুঁড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে থাকতো। সিদ্ধাবস্থায় বহু সূক্ষ্মদেহী নানা লোক থেকে এসে আমার কুঁড়ে ঘরের চার দিকে থাকত এবং এখনও থাকে। যখন আমি সিদ্ধির শেষ স্তরে উঠেছি, তখন দিনকতক এমন আরম্ভ হলো দলে দলে শত শত কাঠ পিঁপড়ে এসে আমাকে দংশন ও আমার গাত্রে বিচরণ করতে লাগল। অথচ অন্য সময় আমার সাধন কুটীরে পাঁচ সাত ঘণ্টা বসে থাকলেও একটী কাঠ পিঁপড়া দেখা যেত না। যখন আমি পরমহংস সাধন করিতেছি ও সিদ্ধি আমার করায়ত্ত হয়ে এসেছে, তখন কোথা থেকে বহু ছোট ছোট পোকা এসে চক্ষুর পাতায় বা কোণে কামড়াত। কখনও বা তারা নাকে ঢুকে যেত। এই সব বিঘ্ন মুমুক্ষু সাধককে বিপর্যস্ত করে। তখন আমার ইষ্টদেবীকে এই সকল উপদ্রব অপসারণার্থ প্রার্থনা করায় তিনি আমাকে একটী প্রক্রিয়া দেখিয়ে

দিলেন। সেই প্রক্রিয়া অভ্যাস করতে সর্ববিঘ্ন অপসারিত হলো। পরমহংস সাধন ও সিদ্ধিলাভান্তে এমন অবস্থা হল যে, কুণ্ডলিনী আর পরমহংস মার্গ থেকে নামতে চায় না। যদিও অল্প ক্ষণের জন্য নামে, আবার উঠে যায়। তখন নির্বিকল্প সমাধিহেতু চৈতন্য বিলোপ ঘটে। তখন ইষ্টদেবীকে কাতর প্রার্থনা করলাম, মা, আমাকে পাগল করিস্‌নি। মা তখন হেসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়ে বললেন, ওকে জিজ্ঞাসা কর, ও তোকে বলে দেবে। তখন আমি ঠাকুরকে বললাম, বলুন, অনায়াসে আমি কি করে মন নাবিয়ে রাখতে পারি। তখন ঠাকুর দেখালেন, তিনি হুঁকো কল্‌কেতে তামাক খাচ্ছেন। তিনি বললেন, যখন আমার এইরূপ অবস্থা হতো, আমি তামাক খেয়ে মন নামাতুম। তোর ডান হাত নেই, তুই ত তামাক সাজতে পারবি না। তুই বিড়ি খা। ঐ অবস্থার পূর্বে প্রতিদিন পঁচিশটা বিড়ি খেতাম। উক্ত সমাহিত অবস্থা লাভের পরে রোজ একশত বিড়িও খেতে হয়েছে। তার ফলে শরীর খুব গরম হয়ে যেত। তখন মাকে বললাম, ঠাকুর যা বলেছিলেন তা করে আমার রোগ হবার উপক্রম হয়েছে। মা বললেন, তুই অত বিড়ি খাস্‌নি। আমি বললাম, আমি এত বিড়ি না খেলে মন নামে না। তখন মা হেসে বললেন, আচ্ছা। এই বলে তিনি চলে গেলেন। ইহার পনের মিনিট পরে দেখলাম, আমার পর্ণকুটীরের চার পাশে ১৫।১৬টী পান পায়রা এসে বসল। তারা এসে কুটীরের চার দিকে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও মধুর সুস্বর ঝংকার করছে। এখনও মাঝে মাঝে ৫।৭টা পায়রা আসে। যখন মন নামাতে খুব কষ্ট হতো, তখনই তারা আসতো। তাদের নৃত্য দেখে ও মধুর গুঞ্জন শুনে আমার মন নেমে আসতো। তখন থেকে আমার বিড়ি খাওয়া কমে গেল। ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা নেবার পূর্বে আমি স্বকক্ষে সকালে ও সন্ধ্যায় সাধনে বসতাম, তখন বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গোলমাল করতো,

তাতে আমার সাধনের ব্যাঘাত হতো। তখন মাকে বললাম, মা, এমন একটী উপায় বলে দে, যাতে আমার পেছনে শত ঢাক বাজিলেও আমার যেন হুঁস না থাকে। তখন মা দুই কর্ণের কাছে পূষা ও যশস্বিনী নাড়ী দুটী দেখিয়ে তার সাধন-কৌশল বলে দিলেন। সেই সাধন করার ফলে দেখলাম, যেন আমার কাণে ছিপি দেওয়া হয়েছে। আমি প্রত্যহ আসনে বসে ঐ প্রক্রিয়া করলে কাণে কোন বাহ্য শব্দ যেত না, যেন কর্ণদ্বার রুদ্ধ হইত, আবার সেই প্রক্রিয়ায় খুলে দিলে কানে পূর্ববৎ সব শব্দ শুনতে পেতাম।"

মহানির্বাণ তন্ত্রোক্ত মানসপূজা অনুসারে যে কোন দেবপূজায় সহস্রারাচ্যুত মহামৃত দেবতাদিগকে পাদ্য, পানীয় ও স্নানীয় দিতে হয়। ঐ অমৃত কি তাহা আধুনিক ধর্মগুরুগণ বা সাধক-সাধিকারা জানেন না। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "ইহা মহামৃত। পর্বতপ্রমাণ স্থূল খাদ্যে যে ফল হয়, এক ফোঁটা অমৃতে তদপেক্ষা বহু গুণে অধিক ফল হয়। সহস্রার থেকে অমৃত নামিয়ে দেবপূজায় দেবার অর্থ, এক বা একাধিক দেবতার আহ্বান করে নৈবেদ্যাদি দেওয়া হয়। আর সহস্রারাচ্যুত মহামৃত দেবদেবীরা লোলুপ নয়নে পান করতে ইচ্ছা করেন। মানব শরীরে সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকাতে বিন্দুরূপ যে পরমাত্মা আছেন, তাহার ঊর্দ্ধে অমৃতভাণ্ড বিদ্যমান। সাধক এই স্থানে জীবাত্মারূপী কুলকুণ্ডলিনীকে তুলে অগ্রে জীবাত্মাকে পরিতোষ সহকারে অমৃত পান করান। তৎপরে শরীররূপ ব্রহ্মাণ্ডে যত দেবদেবী অবস্থিত, তাঁহাদিগকে ঐ অমৃত পান করান। ইহা দ্বারা স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের দেবদেবীগণকেও অমৃত পান করান হয়। ইহার কারণ, স্থূল ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, শরীররূপ ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাই আছে। সর্বশেষে সাধক বা সাধিকা স্বয়ং ঐ অমৃত পান করেন। শক্তিশালী সিদ্ধসিদ্ধাগণ পাঁচ ফোঁটা পর্য্যন্ত ঐ অমৃত পানে সমর্থ। তদধিক পরিমাণে অমৃত পান করলে শরীর ত্যাগ হয়। সহস্রার থেকে ধ্যানযোগে

স্রোতাকারে অমৃতস্রোত পদনখ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। এই অমৃত পানে স্বাস্থ্য সুদৃঢ় হয়, স্থূলাহার কমে যায় এবং এমন নেশা হয় যে, দুই এক শত বোতল মদ্যপানেও সেই নেশা হয় না। তখন সাধক বা সাধিকা মহানন্দে উন্মত্তপ্রায় হন, কেহ বা বুঁদ হয়ে বসে থাকেন। ইহার নাম ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ। ইষ্টকৃপায় সিদ্ধাবস্থায় আমি উহা পান ও উক্ত অবস্থা সম্ভোগ করেছি। শক্তিপীঠের উপরে যে চন্দ্রমণ্ডল আছে, তাহা থেকে সুধা নামিয়ে সাধকরা পান করেন। তাহাতে সাধকের সর্বরোগ নাশ হয় এবং গোলাপী নেশা হয়। ইহা চন্দ্রসুধা বা চন্দ্রামৃত নামে অভিহিত। স্থূল ব্রহ্মাণ্ডে যে চন্দ্রসুধা দ্বারা গাছপালা, ফলফুল বৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়, শরীর ব্রহ্মাণ্ডেও তদ্রূপ ঘটে। যাঁরা সত্ত্বভূমিতে উঠে সাধন সমাপ্ত করেন, তাঁরাই এই সুধা নামিয়ে পান করতে পারেন। শরীরস্থ দেবদেবীগণ এই চন্দ্রসুধা পান করেন না, কারণ উহা পৃথিবীর জন্য, দেবদেবীদের জন্য নয়। কোন কোন সম্প্রদায়ের সাধকগণ এই চন্দ্রামৃত পানে মনে করেন, তাঁরা সহস্রারামৃত পান করেছেন। ইহা সত্য নহে।”

যখন স্বামী ভৈরবানন্দ নির্বিকল্প সমাধি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর পরমহংস পদ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর পূর্বজন্মের জ্ঞানীগুরু পরমানন্দগিরি পরমহংস তাঁকে পরমাত্মানন্দ পরমহংস নাম দেন। ইহা আমি জানিতাম না। তাঁর অলৌকিক পারমহংস্য অবস্থা দর্শনে আমি তাঁকে একদিন আমাদের মন্দিরের বারান্দায় বসে বললাম, আপনি এখন পরমহংস হয়েছেন। তখন তিনি পূর্বোক্ত ঘটনা আমার নিকট প্রকাশ করেন। ইহার পর তিনি ভৈরবানন্দ পরমহংস নামে অভিহিত হন। সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী সরস্বতীও মন্তব্য করেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পর আর কেহ নির্বিকল্প সমাধি লাভান্তে তত্ত্বজ্ঞান ও পরমহংস সাধন করেছেন বলে মনে হয় না। ঠাকুরের পর এরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ও পরমহংস আর হয়নি।”

ভৈরবানন্দজী যে কক্ষে শয়ন ও সাধন করেন, তথায় অনেক দেবতা থাকেন। তিনি তাঁহাদের বাহ্যপূজা করেন না বা তাঁহাদিগকে স্থূল নৈবেদ্য দেন না, ত্রিসন্ধ্যা শুধু স্থূল ধূপ দেন। তিনি সূক্ষ্মপূজা করেন ও সূক্ষ্ম নৈবেদ্য দেন। তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুলে যাঁরা দেহত্যাগ করেছেন, তাঁহাদিগকে তিনি যোগবলে স্বর্গে তুলে দিয়েছেন। যে কোন ঊর্দ্ধ লোকের সিদ্ধ ঋষি, মুনি, দেবতা, অপদেবতা, ব্রহ্মদৈত্য, যোগী, জ্ঞানী প্রভৃতিকে ভৈরবানন্দ যোগবলে ক্ষণকাল মধ্যে ডেকে আন্‌তে পারেন। ইহা আমরা বহুবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। এইরূপ যোগশক্তি প্রদর্শন করিতে বর্তমান কালে কাহাকেও দেখি নাই বা শুনি নাই। কোন তাত্ত্বিকজিজ্ঞাসা করিলেই পরমযোগী পরমহংস সমাধি-ভূমিতে উঠিয়া উহার যথার্থ জবাব বলিয়া দেন। তখন তিনি এমন তত্ত্ব কথা বলেন, যাহা কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি অবিরাম অনর্গল তত্ত্বকথা বলিয়া যান। দিবারাত্রিতে তিনি বহুবার সমাধিমগ্ন হন। তাঁর জ্ঞান-চক্ষু মর্ত্ত্যলোক হইতে সর্বলোক ভেদ করিতে পারে। এমন লোকজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ, মন্ত্রজ্ঞ, কালজ্ঞ, তন্ত্রজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, বেদজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, যোগজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ অধুনা সমগ্র ভারতে আর আছেন বলে মনে হয় না।

ধর্মচক্রে বৈদিক সন্ন্যাস ও প্রেষমন্ত্র গ্রহণান্তে ভৈরবানন্দ মাত্র দশ দিন প্রেষমন্ত্র উচ্চারণে সমর্থ ছিলেন। অনন্তর তিনি আর উক্ত মন্ত্র জপ করতে পারতেন না, মানস জপ করলেও সমাধিস্থ হতেন। নির্বিকল্প সমাধিলাভের পরে তিনি কোন বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন না।

প্রণব বা ব্রহ্মবীজ উচ্চারণেও এই তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংস অসমর্থ। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি যে কোন দেবীর বা দেবতার বীজমন্ত্র আবিষ্কার অনায়াসে করতে পারেন। অনাবিষ্কৃত অপ্রকাশিত অধুনালুপ্ত সর্ববিধ বীজমন্ত্র ও সাধনরহস্য তিনি সমাধিবলে উদ্‌ঘাটন করিতে

পারেন। এমন মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ আর সমগ্র ভারতে নাই। আবার তিনি কাহাকেও বাচনিক মন্ত্রদীক্ষা দেন নাই। যে কোন দীক্ষার্থীর ইষ্টমন্ত্র ও ইষ্টদেব নির্বাচন তিনি মুহূর্তমধ্যে করিতে পারেন। যে কোন গ্রহগ্রস্ত বা প্রেতগ্রস্ত মানুষকে দেখেই তিনি বলে দিতে পারেন, কোন প্রেত বা গ্রহ উহাকে আক্রমণ করেছে। স্থূল জগৎ অপেক্ষা সূক্ষ্ম জগতেই তিনি অধিক দিব্যকর্ম করে থাকেন। তাই তাঁর বাহ্য জীবনযাত্রা দেখে তাঁকে বোঝা যায় না। তিনি গুপ্তভাবেই থাকেন ও গুপ্তভাবেই দিব্য কর্ম করেন।

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা মার্চ রবিবার শিবরাত্রি পড়েছিল। ঐ দিন বৈকালে বেহালা থেকে একটি বৃদ্ধভক্ত স্বামী ভৈরবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া কুমারী কন্যা মিনতি গত দশ বর্ষ যাবৎ উন্মাদপ্রায় হয়েছে। বালিগঞ্জ মেণ্টাল হসপিটালে ও দমদম উন্মাদ আশ্রমে ঐ পাগলী বালিকাকে চিকিৎসার জন্য রাখা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ইহা ছাড়া বিবিধ চিকিৎসা ও অনেক মাদুলী ব্যবহার করেও ঐ বালিকা সুস্থ হয় নাই। উক্ত ভক্ত আমার সহিত পরিচিত থাকায় ভৈরবানন্দের নিকট এসে তাঁর কন্যার আরোগ্য সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য ঐ ভক্তকে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম। পিতার নিকট পুত্রীর অসুখের কথা শুনে ভৈরবানন্দ ঐ অসুস্থা বালিকাকে স্থূল চক্ষে দেখতে চাইলেন। দুই দিন পরে বুধবার সকালে ওখানে যাবার দিন স্থির হল। রবিবার মধ্যরাত্রে ভৈরবানন্দ ধর্মচক্র থেকে সূক্ষ্মদেহে বেহালায় উক্ত ভক্তগৃহে গিয়ে অসুস্থা বালিকাকে দেখলেন ও বুঝলেন, বালিকা প্রেতগ্রস্ত, রোগাক্রান্ত নহে। তখনই তিনি ঐ প্রেতকে যোগবলে টেনে এনে ধর্মচক্রের উত্তর দিকস্থ সুতাকলের উচ্চ প্রাচীরে বেঁধে রাখলেন। বুধবার সকালে ঐ ভক্ত এসে স্বামী ভৈরবানন্দকে বললেন, গত দুই দিন আমার মেয়ে শান্ত আছে ও পূর্ববৎ উপদ্রব করছে না। ইহার কারণ আমরা বুঝিলাম। ঐ বদ্ধ প্রেতকে জিজ্ঞাসা করে

জানা গেল, সে বেলুড়ের বিবাহিতা কমলা সরকার ছিল। তাঁর স্বামী কোন কারণে তাঁর গলা টিপে তাঁকে মেরে ফেলেছিল। তাই সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছে। যখন উক্ত ভক্ত তাঁর কন্যাদি সহ লিলুয়া কলোনীতে বাস করতেন, তখনই তাঁর কন্যা ঐ নারী প্রেত কর্তৃক আক্রান্ত হয়। কমলার প্রেতাত্মা ভৈরবানন্দের কাছে ঊর্ধ্বগতির প্রার্থনা জানাল। বুধবার প্রাতে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী বেহালায় উক্ত ভক্তের গৃহে গেলাম এবং প্রেতগ্রস্তা মিনতিকে আমাদের কাছে ডেকে বসালাম। স্বামী ভৈরবানন্দ মিনতির উপর মন্ত্রপূত গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন ও তাঁকে স্পর্শ করে দেখলেন, সত্যই কমলা তাকে ছেড়ে গেছে। মিনতির ইষ্ট কালী। তাই ভৈরবানন্দ যোগবলে মিনতির হৃদয়ে কালীমূর্তি ফুটিয়ে তুললেন। ইহাতে বুঝা গেল, মিনতি প্রেতাত্মার কবল থেকে মুক্তি লাভ করেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই মিনতি কিঞ্চিৎ সুস্থ হল এবং আমাদের হাত থেকে চা, বিস্কুট, ফল, মিষ্টি, লুচি, তরকারী প্রভৃতি নিয়ে খেল। ভৈরবানন্দ মিনতির পিতাকে বললেন, "আপনি শীঘ্র গয়ায় গিয়ে প্রেতশিলায় ও গদাধরের পাদপদ্মে কমলার নামে পিণ্ডাদি দিন। তাহলে ঐ প্রেত ঊর্ধ্বগামী হবে এবং মিনতিকে আর স্পর্শ করবে না। যতদিন আপনি গয়ায় পিণ্ডাদি না দিবেন ততদিন আমি ঐ প্রেতকে পূর্বস্থানে বেঁধে রাখব। মিনতির শরীর সুস্থ রাখার জন্য পুষ্টিকর আহারাদির ব্যবস্থা করলেই সে ক্রমশঃ সুস্থ হবে।" অপমৃত্যুকালে কমলার ঘাড় বেঁকে গিয়েছিল ও দমবন্ধ হয়ে গলা ফুলে উঠেছিল। দীর্ঘ দশ বৎসর ঐ প্রেতের কবলে পড়ায় মিনতিরও ঘাড় বেঁকে গেছে ও গলা ফুলেছে। অলৌকিক যোগশক্তি না থাকলে কেহই এরূপ প্রেতগ্রাস থেকে কাহাকেও মুক্ত করতে পারে না। বলা বাহুল্য, কমলার প্রেতমূর্তি আমিও দেখেছি—মাথায় কাপড়, লালপেড়ে সাদা শাড়ী পরা, সুন্দর চেহারা, বয়স ত্রিশ বৎসরের মধ্যে। এই ঘটনা লিখে রেখেছি জেনে

পরবর্তী রাত্রিকালে কমলা আমাকে বলল, "আপনি আমার নাম কমলা সরকার লিখলেন কেন? আমি ত কমলা সেন।" ইহাতে বোঝা যায়, কমলার পিতৃকুলের পদবী সেন ও পতিকুলের পদবী সরকার। শ্বশুরালয়ে নির্য্যাতিত হওয়ায় সে পৈতৃক পদবী ও পরিচয় দিতে চায়। কমলা বন্ধন মুক্তির জন্য বার বার ভৈরবানন্দকে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছে। মিনতিকে তার প্রপিতার প্রেতাত্মাও প্রভাবিত করেছিল। তাই ভৈরবানন্দ তাকেও তার গৃহের অদূরে বেঁধে রেখেছিলেন। উক্ত দুই প্রেতের সঙ্গে আরও দুই প্রেত মিলিত হয়েছিল। তারাও উর্ধগতির কামনায় মিনতিকে পরে, আক্রমণ করিল। ১৬ই মার্চ শুক্রবার আমরা রামনগর থেকে ফিরে মিনতির পিতার কাছ থেকে উক্ত মর্মে একখানি পোষ্টকার্ড পেলাম। বৈকালে মিনতির পিতা স্বয়ং এসে বললেন, মিনতির অবস্থা আবার খারাপ হয়েছে ও তার উপদ্রব বেড়েছে। তখন ভৈরবানন্দ সূক্ষ্মদেহে গিয়ে শেষ দুই প্রেতকে সরিয়ে প্রপিতার প্রেতাত্মার সঙ্গে বেঁধে রাখলেন এবং মিনতির সর্বাঙ্গে কালীমন্ত্র লিখে দিলেন। ইহার ফলে সন্ধ্যাকালে পিতা বাড়ী ফিরে দেখলেন, প্রেতগ্রস্তা কন্যারত্ন অনেকটা সুস্থ হয়েছে। গয়াধামে প্রেতশিলায় শ্রাদ্ধ করার পরে ঐ চারি প্রেত উর্ধগামী হলো এবং মিনতির দশবর্ষব্যাপী মানস বিকার ধীরে ধীরে সেরে গেল।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কার্তিক সংক্রান্তিতে আমাদের নাটমন্দিরে মৃন্ময়ী প্রতিমায় কার্তিক-কৌমারী পূজা হয়। রবিবার সন্ধ্যায় আমরা কার্তিক প্রতিমা গঙ্গাগর্ভে বিসর্জনান্তে নাটমন্দিরে বসে শান্তিজল লইলাম। ঠেলা বাহক ও ঢাকী সহ কয়েকজন লোক অগ্রে ধর্মচক্রে আসিল ও আমরা তাদের পেছনে আসিলাম। আমরা এসে দেখলাম, যে কাঠের চৌকিতে প্রতিমা স্থাপিত হয়েছিল, তদুপরি একখানি ভেজা কাপড় রহিয়াছে। যখন আমরা শান্তিজল লইতেছি, সেই সময় শ্রীরাম-পুরবাসী কোন ভক্তের জামার বুক পকেট থেকে অনবধানতাহেতু আনা

দশেক পয়সা নাটমন্দিরে পড়িয়া যায়। সমবেত সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছে—এই পয়সাগুলি কাহার? যখন সকলকে বুঁদিয়া প্রসাদ দেওয়া হইতেছে, তখন একটী অচেনা লোক নিঃসংকোচে সকলের সমক্ষে পয়সাগুলি কুড়িয়ে নেয়, কিন্তু কেহই তাকে নিষেধ করিল না। তাহাকেও বুঁদে প্রসাদ দেওয়া হলো। সে বুঁদিয়া নিয়ে উক্ত চৌকিস্থ ভিজা কাপড় নিয়ে নিজের মাথায় বেঁধে চলে যায়। যখন সে ঐ চৌকি থেকে ভিজা কাপড় তুলে নেয়, তখন ভিজা কাপড় থেকে গাঁদা ফুলের মালাটী পড়িল ও ঠক করে একটি আওয়াজ হলো। সমবেত ২৫।৩০ জন লোক বসে দেখিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল না, ঐ কাপড় থেকে ফুলের মালা পড়িল কেন? উক্ত লোক চলে যাবার পর সকলের হুঁস হলো, কাপড়টী ত নিয়ে গেল কিন্তু ও মালা ফেলে গেল কেন? যার পকেট থেকে পয়সা পড়ে গেছিল, তিনি তখন বলিলেন, "আমার পকেট থেকেই পয়সা পড়ে গেছে, আমি শান্তিজল নিতেছিলাম বলে তখন বলিনি। আমার পয়সাগুলি কে নিয়ে গেল?" সকলে ভেবেছিলেন, ঠেলাওয়ালা ভেজা কাপড় ও প্রাপ্য ভাড়া নিয়ে গেছে। তাই কেউ কিছু বলেনি। ঠেলাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আমি পয়সা নিইনি। আমরা এখনও আছি, যাইনি। ও আমাদের লোক নয়।" তখন ফুলের মালা তুলে দেখা গেল, এক খণ্ড আধ পোড়া মানুষের হাড় বাহির হইল। পরে আরও দেখা গেল, ঐ লোক মন্দিরে উঠিবার সিঁড়িতে সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়েছে। আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম এই ভেবে যে, এত লোকের চোখে ধূলো দিয়ে সে পয়সা চুরি করে চলে গেল! তখন আমি সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দকে বলিলাম, 'বাবা, এই চোরকে যোগবলে শীঘ্র ফিরিয়ে আনতে হবে ও সে হাড় ফেলে গেল কেন তাহাও জানতে হবে।' তখন ভৈরবানন্দ জগন্মাতাকে কাতর প্রার্থনা করায় আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখা গেল, সেই চোর ফিরে এসে ঘাড় নীচু করে দাঁড়াল। তখনও তার

মাথায় ঐ কাপড় বাঁধা ছিল। অনুসন্ধানে জানা গেল, সে দাগী চোর ও তিন চার বার জেল খেটেছে। আমরা তাকে পুলিসে দিলাম। ঐ মালা ও হাড় ও সিঁদুর ছড়ান দ্বারা এতগুলি লোককে সে কিছুক্ষণ সম্মোহন করেছিল। বলা বাহুল্য, এই চোর স্বেচ্ছায় ফিরে নাই, ভৈরবানন্দের যোগবলে আনীত। স্বামী ভৈরবানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী মৎপ্রণীত 'কল্কিগীতা'য় প্রদত্ত।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি [৩]

আগষ্ট, ১৯৬১

গত কাল থেকে আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় আজ সকালে সাড়ে নয়টার সময় আমি দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়েছিলাম চাদর মুড়ি দিয়ে। এমন সময় দেখলাম, আমার বিছানায় দেওয়াল ঠেস দিয়ে একটি দিব্যদেহী বৈষ্ণব সাধক বসে আছেন। তাঁর মাথায় শিখা, কপালে তিলক, সাদা কাপড় পরা, ঐ পরা কাপড়ের খুঁটটি গায় দেওয়া ও খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। একটু পরে মহাগৌরী উপরে এলেন ও আমার শয্যায় বসা সূক্ষ্মদেহীকে দেখলেন। মহাগৌরীকে দেখে তিনি মৃদু হাস্য করে মাথা নীচু করলেন। অনন্তর তিনি অন্তর্হিত হলেন। মনে হল, ইনি বৈকুণ্ঠবাসী চিকিৎসক বৃন্দাবন ধর এবং আমার চিকিৎসার্থে এসেছিলেন; কারণ তিনি আসার পর আমি একটু সুস্থবোধ করলাম। স্বামী ভৈরবানন্দও যোগবলে জেনে বললেন, ইনি বৃন্দাবন ধরও পূর্বে এখানে বহুবার এসেছেন।

দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে নিত্যপূজা করলাম। তখন মহাগৌরী ব্যাসদেবকে দেখলেন—তাঁর কপালে তিলক, তিলকমধ্যস্থ

তৃতীয় নয়ন থেকে দিব্যজ্যোতিঃ বাহির হচ্ছে, দুই ভ্রূ মোটা, খুব বড় চোখ দুটী, বড় মাথা, মাথায় সাদা চুল, বিরাট শরীর। তিনি মহাগৌরীর দিকে স্নেহভরে চাইছিলেন। বৈকাল তিনটার পর আমি সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়েছিলাম ও মহাগৌরী মন্দির খুলে ধূপ জ্বালিতেছিলেন। আমি চাতালে দাঁড়িয়ে দেখলাম, মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় সুভদ্রার কোলে গোপালজী বসে রয়েছেন। গোপালের বয়স আড়াই তিন বৎসর মাত্র, গাত্রবর্ণ সোণালী, বড় বড় চোখ। গোপালজী আমাদের দিকে চাইছিলেন, এবং সুভদ্রা আমাকে ইংগিতে বললেন, স্নেহের গোপাল গত রাত্রে আপনার শয্যায় ডিগবাজী খাচ্ছিলেন।

বৈকাল পাঁচটায় আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে স্বীয় শয্যায় শুয়েছিলাম এবং মহাগৌরী আমার কোমরে কবিরাজী তৈল মালিশ করিতেছিলেন। তখন আমি দেখিলাম, একটী দিব্যদেহী সিদ্ধ ঋষি এসে আমার শয্যায় দেওয়াল ঠেস দিয়ে বসলেন। তাঁর চেহারা—বেঁটে, মোটা, চোখ ছোট ও গোল, মাথা বড় ও ছোট চুল। তিনি তৃতীয় নয়ন দিয়ে দিব্যালোক বাহির করে আমার দিকে সর্বক্ষণ চেয়েছিলেন। ইহার ফলে আমি একটু সুস্থবোধ করলাম। আমরা তাঁকে প্রণাম করতেই কিছুক্ষণ পরে তিনি চলে গেলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে লিখেছেন, ইনি বিভাণ্ডক মুনি এবং ইতোপূর্বে এখানে দুইবার এসেছেন ও আমার প্রতি স্নেহসম্পন্ন। দেবী ভাগবতে বিভাণ্ডকের নাম উল্লিখিত।

দোসরা বুধবার সকালে সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী ও রাষ্ট্রমন্ত্রী চারুচন্দ্র মহান্তি সহ আমি মোটর গাড়ীতে মাকড়দহে গিয়াছিলাম। মাকড়চণ্ডী মন্দির সমীপে ভৈরবানন্দজী এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। আমরা সকলে চণ্ডী মন্দির ও শিবমন্দির দর্শন ও প্রণাম করলাম। মহাগৌরী চণ্ডী মন্দিরে চণ্ডিকাকে দর্শন ও প্রণাম করে সমাধিস্থ হলেন। অনন্তর আমরা ভৈরবানন্দজীর সিদ্ধপীঠে গেলাম। ঐ নারিকেল গাছের তলায়

আমরা প্রণাম করলাম। মহাগৌরী দেখলেন, তথায় মা কালী দিব্য মূর্তিতে বিরাজিতা। আমরা যখন ভৈরবানন্দজীর মুখে তাঁর পূর্ব সাত জন্মের কথা শুনছিলাম, তখন তাঁর আদিপুরুষ ও প্রথম পিতা ঋচিক মুনি এবং আরও ৫০।৬০ জন সূক্ষ্মদেহী এসে ভিড় করে দাঁড়ালেন। তন্মধ্যে একটী সিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক প্রায় আমার গা ঘেঁসে দাঁড়ালেন। আমার আদি কুলগুরু বিপ্রদাস শর্মাকেও ভৈরবানন্দজী ডাকলেন। গত ২৪শে জুলাই সোমবার সন্ধ্যায় তিনি ধর্মচক্রের মন্দিরে এসেছিলেন ও আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, স্থুল দেহে সাধন শেষ ও জ্ঞান লাভ কর। কারণ, বিদেহ মুক্তি সাধন কষ্টকর ও দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। তিনি প্রায় তিন শত বর্ষ পূর্বে স্থূলদেহ ত্যাগ করে বিদেহ মুক্তির সাধনা করছেন। তিনি চরম ইষ্ট সিদ্ধি লাভ করে কোন পূর্ব জন্মে আমাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। আমরা সকাল সাতটায় গিয়ে ১২॥০ টায় ফিরলাম। ফেরার সময় মোটর কারে অপরাজিতা দেবী দেখা দিলেন। স্নেহের কৌমারী ও গোপাল আমাদের সঙ্গে আমার দুই কাঁধে চড়ে গিয়েছিলেন।

বৈকাল ৪॥০ টায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে 'দিব্যদৃষ্টি' গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলাম। তখন একটী সিদ্ধ শৈব দিব্য দেহে আমাদের সম্মুখে বারান্দায় এলেন। তাঁর মাথায় লম্বা জটা ও হাতে ত্রিশূল ও ত্রিশূলে ডম্বরু বাঁধা। আমরা তাঁকে প্রণাম করে মন্দিরে যেতে বললাম, কিন্তু তিনি মন্দিরে না গিয়ে ত্রিশূল তুলে আমাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

৬ই রবিবার দুপুরে আমি ও মহাগৌরী নীচ তলার বারান্দায় খেতে বসেছি এবং কোন সাধু দোতলায় মন্দিরে পূজা করছেন। এমন সময় আমি দেখলাম, সম্মুখে একটী সূক্ষ্মদেহী সাধু—মাথায় লম্বা জটা, শ্যামবর্ণ, দীর্ঘকায়। তৎপার্শ্বে একটী সিদ্ধা সাধিকাকেও দেখা গেল—অতি সুন্দরী, মাথায় কাপড়, শুভ্রবর্ণা। উভয়ে আমাদের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করছেন

ও ইংগিতে বলছেন, উপরে মন্দিরে পূজা ভাল হচ্ছে না। তখন গোপালও কৌমারী আমাদের কাছে ছিলেন। আমরা সভক্তি প্রণাম করতেই তাঁরা অন্তর্হিত হলেন। তাঁরা আমাদের মন্দির থেকে নীচে গিয়েছিলেন।

সন্ধ্যায় মহাগৌরী স্বহস্তে নারিকেল কুরে ও গুড়ে পাক করে মন্দিরে বসে নাড়ু তৈরী করছিলেন। তখন স্নেহের গোপালজী নাড়ুর জন্য হাত পাতলেন। সব নাড়ু চাইছেন ভেবে মহাগৌরী গোপালকে একটীও নাড়ু দিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে দক্ষিণ বারান্দায় এসে মহাগৌরী আমাকে ঐ কথা বললেন। তখন সত্যনিষ্ঠ গোপালজী একটী আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, আমি একটী মাত্র নাড়ু চেয়েছিলাম, সব চাইনি। তখন স্নেহের গোপাল নগ্ন শিশু মূর্তিতে টেবিলের উপর দাঁড়িয়েছিলেন। ৭ই সোমবার সকালে কয়েক ঘণ্টা কাজ করার পর ক্লান্ত হয়ে আমি বেলা দশটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় মাদুরে শুয়ে বিশ্রাম করছি। তখন গোপালজী আমার মাদুরের উপরে গ্রাম্য শিশু-মূর্তিতে এসে দাঁড়ালেন—শ্যামবর্ণ, কোমরে ইজের পরা। আর স্নেহের কৌমারী আমার বাম পাশে শিশুমূর্তিতে এসে দাঁড়ালেন—ফ্রগ পরা, বব কাটা চুল মাথায়, উজ্জ্বল বর্ণ। দুই দেব-শিশুর পূতসঙ্গে আমার অকাল বার্ধক্য আনন্দেই কাটছে। ৭ই ও ৮ই সোমবার ও মঙ্গলবার দুই দিন দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপূজা করলাম এবং দেবগণকে আম, আপেল, নাসপাতি, কলা, নাড়ু ও সন্দেশের নৈবেদ্য দিলাম। আমাদের মন্দিরে অধুনা অনেক দেবতা বিরাজ করেন, অথচ নৈবেদ্যের পরিমাণ তদনুযায়ী প্রচুর নহে। এই দুই দিন মহাগৌরী দিব্য চক্ষে দেখিলেন, পূর্বোক্ত নৈবেদ্য বহুগুণে অধিক হয়েছে এবং মন্দিরস্থ দেবগণ সকলে প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। এই যুগে এরূপ অদ্ভুত ঘটনা আর কোন মন্দিরে ঘটে কি?

৯ই বুধবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায়

স্বীয় শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছি এবং মহাগৌরী আমার পাশে বসে আছেন। এমন সময় আমি দেখলাম, আমার মন্দিরবাসিনী গর্ভধারিণী সীতাদেবী আমার বাম দিকে তাকিয়ার উপরে দেওয়াল ঠেস দিয়ে বসে আছেন। তিনি এলে আমি বিরক্ত হই বলে দীর্ঘকাল মা জননী আমার কাছে আসেন নি। তাই আজ তাঁকে বিষণ্ণ দেখলাম। কিছুক্ষণ তিনি আমার পাশে বসে মন্দিরে চলে গেলেন। বিশ্রামান্তে আমি উঠে দেখলাম, কাল যবন ও অন্য একটি সিদ্ধবৈষ্ণব সাধক আমার খাটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঐ সিদ্ধ সাধকের চোখ দুটি টর্চ লাইটের মত উজ্জ্বল, বেশ বড় বড় এবং আকর্ণ বিস্তৃত। তিনি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মন্দিরস্থ দেবগণকে দর্শন করছিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে আমিও মহাগৌরী পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ কোণে বসে 'কল্কিগীতা'র প্রুফ দেখছিলাম। তখন আমার সম্মুখে দক্ষিণ আকাশে ওঁকার দেবতাকে দেখলাম—সম্মুখে শুভ্রবর্ণ প্রণব ও পশ্চাতে পুরুষ দেবতা। বলা বাহুল্য, ওঁকার দেবতার দুই রূপই জীবন্ত। তখন তাঁর পার্শ্বে ত্রিনয়না একটি দেবীমূর্তি দেখা গেল। তাঁর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থ তৃতীয় নয়ন থেকে দিব্য জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছিল। তিনি শাড়ী পরা মাতৃমূর্তি ও মন্দিরে প্রবেশ করলেন না। সন্ধ্যা সাতটায় আমি কুয়াতলায় বাথটবে বসে হিপবাথ্ নিতেছিলাম এবং সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় আমি দেখলাম, একটি জটাধারী ঋষিমূর্তি আমার সম্মুখে এলেন। তাঁর আগমন বার্তা মহাগৌরীকে জানিয়ে আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম করলাম। মহাগৌরী তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, তিনি নাটমন্দিরে অবস্থিত একটি হাতির উপর উঠলেন। ঐ হাতি মন্দিরের দিকে পিছন ফিরে পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা ভাবলাম, ঐ হাতি চড়া ঋষিমূর্তি কে? তখন মহাগৌরী দেখলেন, ঐ ঋষি হাসতে হাসতে হাতি চড়ে স্বর্গে চলে যাচ্ছেন। ইহাতে আমরা বুঝলাম,

ইনি ইন্দ্রদেব ব্যতীত অন্য কেহ নহেন এবং দেবহস্তী ঐরাবতে চড়ে কল্কিদর্শনার্থ ছদ্মবেশে আমাদের মন্দিরে এসেছিলেন। মহাগৌরী তাঁকে চিনে ফেলায় তিনি আর আত্মগোপন করতে না পেরে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। দেবরাজ দয়া করে মাঝে মাঝে এই পার্থিব মন্দিরে পদার্পণ করেন।

১০ই বৃহস্পতিবার বৈকালে মোনবেড় গ্রামের মোহন ঘোষ এলেন এবং পশ্চিম বারন্দার দক্ষিণ কোণে বসে আমার হাতের ও পায়ের নখগুলি কেটে দিলেন। তখন গোপাল ও কৌমারী শিশু মূর্তিতে আমার সম্মুখে এসে খেলা করছিলেন। নখ কাটা শেষ হবার পর আমি উক্ত দীক্ষিত কুমার ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দেখুন ত আমার সম্মুখে কোন দেবশিশু খেলা করছেন কি না?" তিনি অদূরে দাঁড়িয়ে ইষ্টধ্যান করে দেখলেন স্নেহের শ্যামল গোপালকে। গোপালজী দেড় বছরের শিশুমূর্তি, বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও হামাগুড়ি দিচ্ছেন। তিন সপ্তাহ পরে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী হবে। তাই গোপালজী এই বিষ্ণু-ভক্তকে কৃপা করে দর্শন দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি কৌমারীকে দেখতে পেলেন না। সন্ধ্যায় মন্দিরে আমরা আরতি ও নামকীর্তন করে কৃষ্ণ সঙ্গীত গাইলাম। সন্ধ্যার পর মহাগৌরী আসতে উক্ত ভক্ত তাঁর গোপাল দর্শনের বর্ণনা তাঁকে দিলেন। নৈশ ভোজনান্তে আমি নাটমন্দিরে ইজি চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছি এবং মহাগৌরী দোতালায় মন্দিরের উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে আছেন। এমন সময় আমি দেখলাম, স্নেহের কৌমারী পনের বৎসরের বালিকা মূর্তি ধরে আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন—শুভ্রবর্ণ ও শুভ্রশাড়ী পরা ও মাথায় চুল ভাল করে আঁচড়ানো। আজ অমানিশি বলে স্নেহের কৌমারী তাঁর শুভ্রমূর্তি সারারাত্রি আমাকে দেখালেন এবং আমিও কৌমারী-চিন্তায় মগ্ন রইলাম। পরদিন শুক্রবার সকালে আমি যখন স্বীয় শয্যায় শুয়ে

দুই একটি যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাস করছিলাম, তখন কৌমারী ও গোপাল শিশুমূর্তি ধরে অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাইতেছিলেন। এই বৃদ্ধ বয়সে দুঃখকষ্টের মধ্যেও কৌমারীলীলা ও গোপাললীলা আমার সন্তপ্ত জীবনকে শান্তিময় করে তুলেছে।

১১ই শুক্রবার সকালে আমি মন্দিরের পশ্চিম বারন্দায় বসে মুড়ি খাইতেছিলাম। তখন স্নেহের সুকন্যা সুভদ্রা এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন এবং দন্তহীন বুড়ো বাপের মুড়ি খাওয়া দেখতে লাগলেন। দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপূজা করলাম। পূজার্থ মন্দিরে ঢুকেই আমি দেখলাম, মা কালী পূর্ণ মূর্তিতে পূজাস্থলে দণ্ডায়মান। তিনি এখন স্নেহময়ী জননীবৎ সর্বদা আমার সঙ্গে থাকেন। বৈকালে চারটায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ কোণে বসে চিঠি লিখছিলাম। তখন পূর্বোক্ত বৈকুণ্ঠবাসী বৈষ্ণব সাধক এলেন—তাঁর মাথায় শিখা, কপালে তিলক ও টানা চোখ। তিনি মাঝে মাঝে এখানে কল্কিদর্শনে আসেন।

১২ই শনিবার দুপুরে আমি ও মহাগৌরী একতলার পশ্চিম বারান্দায় মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছি। তখন স্নেহের সুপর্ণা রাণীর বেশে এসে আমাদের সামনে বসলেন—সোনালী রঙের শাড়ী পরা ও সর্বালংকারে সুশোভিতা, গায়ের রঙ শাড়ীর রঙের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় ও মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্ব স্ব শর্য্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছি। এমন সময় আমি দেখলাম, আমার বাম দিকে বিছানার উপরে একটি সূক্ষ্মদেহী সিদ্ধঋষি বসে আমাকে কিছু লিখে জানাচ্ছেন—মাথায় জটা, মধ্যম চেহারা ও গৌর বর্ণ। সেই সময় স্নেহের কৌমারী ও গোপাল আমার তাকিয়ার উপর বসে খেলা করছিলেন। উক্ত ঋষি ঐ দুই দেবশিশুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। বৈকাল পাঁচটায় আমি দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে

বিবেকানন্দ নাটমন্দিরে গেলাম ও দেখলাম, একটি স্বর্গবাসী রাজা মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ পরে নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে আছেন ও মন্দিরের দিকে তাকাচ্ছেন। মহাগৌরীও দোতলা থেকে তাঁকে দেখলেন। আমার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি মন্দিরে না এসে চলে গেলেন। সান্ধ্য আরতির সময় মহাগৌরী কালী, কল্কি, কৌমারী, গোপাল ও লোমশ মুনির উদ্দেশ্যে ছয়টি মোমবাতি জ্বালিলেন। স্নেহের সুভদ্রাও শনির সন্ধ্যায় দশ মহাবিদ্যার উদ্দেশ্যে দশটি দিব্যবাতি জ্বালিলেন। ছয় স্থূল বাতির সঙ্গে দশ সূক্ষ্ম বর্তি মন্দিরে অপূর্ব শোভা বিস্তার করিল। যখন আমরা শংখ, কাঁসর ও ঘণ্টাদি বাজাইয়া দীপারতি করিলাম, তখন সুভদ্রাও দিব্য শংখ বাজাইলেন। রাত্রে মহাগৌরী মা কালীকে সুজির পায়স নিবেদন করিলেন। মা কালী ইহা গ্রহণ করিয়া অন্যান্য মহাবিদ্যা, কল্কি ও ঠাকুর প্রভৃতিকে দিলেন।

সন্ন্যাসিনী শিবপ্রিয়া কয়েক বৎসর যাবৎ নানা রোগে ভুগিতেছিলেন। দেড় বর্ষ পূর্বে চণ্ডীদেবী তাঁকে স্বপ্নে বলেছিলেন, "একটি সাধু তোকে দিব্য ঔষধ দিবেন এবং তাতেই তোর অসুখ সেরে যাবে, ঐহিক ঔষধে তোর রোগ সারবে না।" তেসরা বৃহস্পতিবার রাত্রি দেড় দুইটার সময় শিবপ্রিয়া স্বপ্নে দেখছেন, একটি সাধু তাঁকে বললেন—এখনই একটি সাধু এসে তোকে ঔষধ দিবেন। একটু পরেই সেই সাধু এসে ঔষধ দিলেন। সেই সাধু শিবপ্রিয়ার সর্বাঙ্গে ধ্যানপূত দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর দৃষ্টি শিবপ্রিয়ার যে অঙ্গে পড়ল, সেই অঙ্গ যেন জ্বলে গেল। একটু পরেই তিনি অন্তর্হিত হলেন এবং পূর্বে যে সাধু এসেছিলেন, তিনি আবার এসে বললেন, এখনই ঐ সাধু যে ঔষধ দিয়ে গেলেন, এতেই তোর রোগ সারবে। একটু পরেই শিবপ্রিয়া পায়খানার বেগ অনুভব করলেন এবং পায়খানায় গেলেন। প্রধানতঃ তিনি কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভুগিতে ছিলেন। আজ তাঁর বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হল এবং তিনি বেশ সুস্থ বোধ

করলেন। এই সম্বন্ধে স্বামী ভৈরবানন্দকে আমি পত্রে লিখেছিলাম; তিনি ১১ তারিখে ইহার উত্তরে লিখলেন, "শিবপ্রিয়াকে যে সাধু ঔষধ দিয়েছিলেন, তিনি ঢাকার লোক, তান্ত্রিক সাধক, তাঁর নাম প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি মা কালীর আদেশে শিবপ্রিয়ার আরোগ্যার্থ ধ্যানযোগ ও দিব্য ঔষধ প্রয়োগ করেছিলেন। ইহার কারণ, সাধন কালে বায়ুর ক্রিয়া আরম্ভ হওয়ায় শিবপ্রিয়ার কোষ্ঠকাঠিন্য হয়েছিল। এবং সে ফোড়া ও জ্বরাদি রোগে ভুগেছিল। আর যে সাধু তাঁকে বলেছিল, তোমার রোগ ভাল হবে, তিনিও ঐ সাধুই ছদ্মবেশে।"

১৪ই সোমবার মধ্যাহ্ন আহারান্তে আমি নাটমন্দিরে ইজি চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছিলাম। কিঞ্চিৎ তন্দ্রাবিষ্ট হয়ে চোখ বুজে দেখছি, একটী সূক্ষ্মদেহী সিদ্ধ সাধু আমার কাছে বসে স্নেহভরে আমাকে কিছু বললেন; কিন্তু আমি তাহা বুঝিতে পারলাম না। আমি তাঁকে বললাম, "মহাগৌরী বাড়ী গেছেন, আপনি তাঁকে বলুন। দুই তিন মিনিট থেকে তিনি চলে গেলেন এবং বালি বাসায় মহাগৌরীকে দুই তিন বার দেখা দিলেন। সন্ধ্যার পরে মহাগৌরী ধর্মচক্রে ফিরলেন। রাত্রি নয়টায় আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় বসে মুড়ি খেতে খেতে উক্ত সাধুর কথা তাঁকে বলছিলাম এবং তিনি ঐ সাধুর কথা ভাবছিলেন। এমন সময় ঐ সাধু এলেন—মুখে লম্বা দাড়ি-গোঁফ, মাথায় লম্বা চুল জটা পাকান, চোখ বড় বড়, শরীরের তুলনায় মুখখানা বড়, গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। আমরা উভয়ে দুপুরে তাঁর এই মূর্তি দেখেছিলাম। রাত্রে আমি তাঁকে দেখে মহাগৌরীকে বললাম। ক্ষণকাল পরে তিনি তাঁর আসল আকৃতি দেখালেন—অতিশয় শুভ্রবর্ণ, মন্দিরের ছাদে মাথা ঠেকেছে, প্রায় সাত হাত দীর্ঘ, মাথায় জটাজাল পাগড়ীর মত করে জড়ান, তাঁর ডান বুক থেকে বিদ্যুৎবৎ তীব্র আলো নিঃসৃত হয়ে আমার বাম বুকে পড়িল। তখনই তিনি আমার দুই বদ্ধ বাহুর মধ্যে একগুচ্ছ (নারিকেল গাছের মেথিবৎ) সাদা দ্রব্য দিলেন।

আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আজ দুপুরে আমাদের উভয়ের কাছে এসেছিলেন? ইহার উত্তরে তিনি মৃদু হাস্য করে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আমরা তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করতে তিনি তাঁর নাম লিখে দিলেন। আমরা শুধু ঐ নামের প্রথম বর্ণ 'ক' পড়লাম। অনন্তর তিনি ডান হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। সম্ভবতঃ ইনি ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার প্রথমে এসেছিলেন। ১৯শে আগস্ট শনিবার ভৈরবানন্দ পরমহংস উক্ত সিদ্ধ ঋষিকে আহ্বান করে জানলেন, ইনি ঋষি কাত্যায়ন, যাঁর আশ্রমে মহামায়া কাত্যায়নীরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে ও দেবী-ভাগবতে কাত্যায়নীর কথা আছে। বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়নী এবং গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার জন্য কাত্যায়নীব্রত করতেন। শ্রীকৃষ্ণও কাত্যায়নী পূজা করেছিলেন। শ্রীরাধার বিরহ সময়ে কাত্যায়নী তাঁকে স্পর্শ করে বর দেন, তুমি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে কাছে দেখতে পাবে। নাগোজী ভট্ট-রচিত কাত্যায়নীতন্ত্র প্রসিদ্ধ পুস্তক। মহর্ষি কাত্যায়ন যে দুই পুষ্পগুচ্ছ আমাকে প্রীতিউপহার দিয়েছিলেন, তাহার নাম সহস্রশীর্ষ বা সহস্রশিষযুক্ত ফুল, সে ফুল মর্ত্যে পাওয়া যায় না। একমাত্র স্বর্গোদ্যান নন্দনকাননে উহা বিদ্যমান। উহা কচি নারিকেল শিষযুক্ত ফুলের মত। তিনি স্বীয় বক্ষনিঃসৃত জ্যোতিঃস্রোত দ্বারা আমার শরীরে দৈবশক্তি সঞ্চার করেছিলেন। আমি প্রকৃত ঋষিশাস্ত্র রচনা ও কল্কিলীলা প্রচার করছি বলে তিনি আমাকে উপহার দিলেন ও শক্তিসঞ্চার করলেন।"

১৫ই মঙ্গলবার প্রাতর্ভ্রমণান্তে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে নানা কথা বলছিলাম। তখন আমি দেখলাম, একটী দেবীমূর্তি ও তাঁর মাথার চারি দিকে দেদীপ্যমান জ্যোতির্মণ্ডল। আমি মহাগৌরীকে বললাম, ইনি কি আমার মেয়েদের মধ্যে কেউ, না মা

কালী। মহাগৌরী তাঁকে দেখে বললেন, দাদু, ইনি আপনার ইষ্টদেবী। জ্যোতির্মণ্ডলসংযুক্ত ইষ্টমূর্তি আজ প্রথম দেখে আমি ধন্য হলাম। বেড়াতে যাবার পূর্বে আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় জলচৌকিতে বসে চা খাইতেছিলাম ও মহাগৌরী অদূরে চেয়ারে বসেছিলেন। এমন সময় মহাগৌরী দেখলেন, আমার সম্মুখে অতি নিকটে খড়মদ্বয়ের উপরে সদ্য-স্নাতা সিদ্ধেশ্বরী আমার চা পান দেখছেন ও হাসছেন। তাঁর মাথায় কাপড় নাই ও দীর্ঘকেশ, বাম কাঁধ দিয়ে এক গোছা ভেজা চুল বুকের উপরে ঝুলছে। আমরা তাঁকে চেনার আগেই তিনি অদৃশ্য হলেন। পূর্বরাত্রে আহারান্তে আমি নাটমন্দিরে পায়চারি করিতেছিলাম ও মহাগৌরী মন্দিরের উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়েছেন। আমি দেখলাম, একটী দীর্ঘকায় সূক্ষ্মদেহী আমার সঙ্গে বেড়াচ্ছেন—সাদা কাপড় পরা ও কাঁধে সাদা উত্তরীয়। আমি দোতলায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় আসতে তিনিও আমার সঙ্গে এলেন। আমি তাঁর কথা মহাগৌরীকে বলতে তিনিও তাঁকে দেখলেন ও বললেন, উনি আমাকে স্বকীয় নানা মূর্তি দেখাচ্ছেন এবং কাল ভৈরব আসতেই তিনি পালিয়ে গেলেন। সম্ভবতঃ ইনি হালিসহরের পোড়ো শিবমন্দিরবাসী সিদ্ধশৈব নন্দিত্বপ্রাপ্ত প্রাণনাথ মিত্র।

১৫ই মঙ্গলবার দুপুরে আমি, মহাগৌরী ও বিশ্বরূপানন্দ প্রভৃতি একতলায় পশ্চিম বারান্দায় খেতে গিয়েছি। আমি কাঠের পিঁড়িতে বসেই দেখলাম, একটী বয়োবৃদ্ধা সূক্ষ্মদেহী সম্মুখে এসে বসলেন। তখন মহাগৌরী পাতিলেবু কাটছিলেন। আমি তাঁকে সমাগত সূক্ষ্মদেহীর কথা বলায় তিনি তাঁকে দেখে বললেন, "ইনি আমার পূর্বজন্মের গুরুমাতা, হরিহরানন্দজীর ধর্মপত্নী। স্নেহবশে তিনি আমাকে প্রায়ই দেখতে আসেন।" সান্ধ্য আরতির পর আমরা নামকীর্তন করলাম এবং মহাগৌরী বালি বাসা থেকে ফিরে এসে মন্দিরে বগলা, মাতঙ্গী, গোপাল ও

মঙ্গলগ্রহ এই চারি দেবতার উদ্দেশ্যে চারটী মোমবাতি জ্বালিলেন। তখন আমরা উভয়ে দেখলাম, বিষ্ণুপ্রিয়া ও সুভদ্রা পনেরটী দিব্য বাতি জ্বালিলেন। ঐ দিব্য দীপশিখাগুলি হাওয়ায় নড়ছে না, সোজাভাবে জ্বলছে, স্থূল দীপশিখা অপেক্ষা দীর্ঘতর। রাত্রি নয়টায় মহাগৌরী মন্দিরে বগলামুখী মহাবিদ্যাকে উষ্ণ দুগ্ধ নিবেদন করলেন। মন্দিরে অনেক দেবতা উপস্থিত থাকায় তিনি গোপালকে বললেন, বাবা, মা বগলাকে পূজা কর ও ভাল নৈবেদ্য দাও। তখন গোপালজী বড় বড় লাল ফুল দেবী বগলার পায় দিয়ে ধূপারতি করলেন এবং বিবিধ মিষ্টান্ন ভোগ দিলেন। বগলা দেবী সেই দিব্য মিষ্টান্ন স্বয়ং নিলেন ও মন্দিরস্থ দেবগণকে দিলেন। যখন গোপালজী বগলার আরতি করছিলেন, তখন বগলাভক্ত মঙ্গলগ্রহ বগলার মাথায় সোণার ছাতা ধরে দাঁড়ালেন। ঐ ছাতায় সোণার উপর নীল ও লাল মিনে করা ছিল।

১৬ই বুধবার ভোরে (মঙ্গলবারের শেষ রাত্রে) আমি স্বীয় শয্যায় আমার ইষ্টদেবীর সত্ত্বমূর্তি দেখলাম। অনন্তর স্নেহের কৌমারী ঈষৎ ভিন্নমূর্তিতে সলজ্জ বদনে আমার বিছানায় শিয়রে এসে বসলেন এবং প্রায় এক ঘণ্টা রইলেন এবং ততক্ষণ আমি কৌমারীধ্যানে সমাহিত ছিলাম। আমি মহাগৌরীকে বলায় তিনি কৌমারীকে ডাকলেন। তখন কুমার ও কৌমারী উভয়ে তাঁকে দেখা দিলেন। কুমার ঠাকুরের কোমরে হলদে কাপড় ও মাথায় হলদে পাগড়ি। কার্তিক সঙ্গে থাকায় কন্যা কৌমারী সলজ্জ বদনে বুড়ো বাপের কাছে বসেছিলেন।

১৫ই মঙ্গলবার শেষরাত্রে তিনটা থেকে চারটার মধ্যে আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে হঠাৎ দেখলাম, পূর্বাকাশে একটী ক্ষুদ্র ফলবৃক্ষ—দেড় হাত উচ্চ, কোন পাতা বা ফুল নাই, গোড়া থেকে ১০।১২ টা ডাল উপরে উঠছে, প্রত্যেক ডাল বহু ফলে সমাবৃত এবং ফলগুলি আমড়ার মত ছোট ও সবুজ। ঐ ফলবৃক্ষের আড়ালে ইষ্টদেবী প্রচ্ছন্ন ছিলেন—তাঁর মাথায়

মুকুট ও গলায় সাদা ফুলের মালা ও গাত্রবর্ণ ঘনশ্যাম। মহাগৌরীকে ঐ দিব্য বৃক্ষের কথা বলায় তিনিও স্বীয় শয্যা থেকে জ্ঞানচক্ষুতে উহা দেখলেন। দুই তিন মিনিট দৃশ্য থেকে ঐ ফলবৃক্ষ অন্তর্হিত হলো। ঘণ্টাখানিক পরে বুধবার ভোরে একটী এলোকেশী গৌরবর্ণা সূক্ষ্মদেহী আমার খাটের কাছে এসে বুকের উপর প্রিয়জনবৎ ঝুঁকে পড়ে আমাকে কিছু বললেন। তিনি শ্বেতবস্ত্র পরিহিত, মাথায় ঘোম্‌টা ও বিপুল সুদীর্ঘ কেশদাম। স্বামী ভৈরবানন্দ ১৯।৮।৬১ শনিবার সমাধিযোগে জেনে বললেন, "উহা দেবীলোকের কল্পবৃক্ষ ও উহার ডালে শত শত কল্পফল। স্বর্গলোকে, বিষ্ণুলোকে, শিবলোকাদি উর্দ্ধলোকেও কল্পবৃক্ষ আছে। ব্রহ্মার লোকে কল্পবৃক্ষ নাই। ঐ লোকের অধিবাসীরা বিদেহ মুক্তি সাধন করেন বৈরাগ্য অবলম্বনে। যাহারা তাহা না করেন, তারা সৃষ্টিকর্তার দাস হয়ে থেকে পুণ্যক্ষয়ান্তে মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করেণ। কল্পবৃক্ষ কামনা বৃক্ষ, ভোগবৃক্ষ বা কল্পতরু। ব্রহ্মা ইষ্টবোধে উপাসিত হন না বলে তাঁর লোকে কল্পবৃক্ষ নাই। যেমন সম্মানিত অতিথি এলে খাওয়া পরা দিতে হয়, তেমনি ইষ্টসাধনে সিদ্ধ হয়ে ইষ্টলোকে গেলে ইষ্টদেবতা কল্পবৃক্ষ দ্বারা সিদ্ধ ভক্তের পালনাদি করেন। দেবী ভাগবতে আছে, দেবীলোকে কল্পবৃক্ষের কাছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর গিয়ে বসেছিলেন। আপনার ইষ্টদেবীই আপনাকে দেবীলোকের কল্পবৃক্ষ দেখালেন।"

"যে সূক্ষ্মদেহী সিদ্ধা সাধিকা কল্পবৃক্ষ দর্শনের একটু পরে আপনাকে কিছু বললেন, তিনি আপনার প্রপিতামহী দেবীলোকবাসিনী ও আপনার আদি কুলগুরু বিপ্রদাস শর্মার শিষ্যা। ইনি প্রায় তিন শত বর্ষ পূর্বে দেহ রক্ষা করেছেন এবং তাঁর নাম হেমাঙ্গিনী দেবী। তিনি গৌরবর্ণা, অতি সুন্দরী ও স্নেহশীলা।" হেমাঙ্গিনী দেবী তৎপরে দুই তিন বার আমার কাছে এসেছেন।

১৭ই বৃহস্পতিবার দুপুরে আমরা একতলার বারান্দায় খেতে বসেছি।

তখন আমাদের সম্মুখে জানালার কাছে আমার দেবীলোকবাসিনী প্রপিতামহী হেমাঙ্গিনী এসে দাঁড়ালেন। একটু পরে আমি ও মহাগৌরী দেখলাম, আমাদের সম্মুখে জরৎকারু মুনি ও তৎপত্নী মনসাদেবী আবির্ভূত হলেন—উভয়েই শুভ্রবর্ণ। এখানে আসার পূর্বে মনসা দেবী কালিঘাটে সন্ন্যাসিনী শিবপ্রিয়ার কাছে বালিকামূর্তিতে গিয়ে দুধ-কলা খেতে চেয়েছিলেন। পরে জানা গেল, ঐদিন নাগপঞ্চমী ও মনসাপূজা দিবস। মহাগৌরী গত সাত আট বর্ষ নাগপঞ্চমীতে উপবাস করে মনসাপূজা করেছেন; কিন্তু এই বৎসর করা হয় নাই বলে মনসা দেবী দেখা দিলেন।

১৮ই শুক্রবার বৈকাল চারটায় আমি মন্দিরের বারান্দায় জলচৌকিতে বসে চা খাবার কথা ভাবছিলাম ও মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় অবস্থিত। তখন আমি দেখলাম, আমার সম্মুখে পূর্ণমূর্তিতে রাজবেশে কল্কিদেব আবির্ভূত, তাঁর পেছনে অনন্তনাগ তাঁর মাথায় ছত্রবৎ ফণা বিস্তার করেছেন। আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? মহাগৌরী তাঁকে দেখে চিনলেন এবং তাঁকে চেনামাত্রই তিনি মন্দিরে ঢুকে গেলেন ও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি মারতে লাগলেন। সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে আমেরিকান সিনেমা প্রদর্শিত হলো ও ছয় সাত শত নরনারী সিনেমা দেখতে সমবেত হলেন। সিনেমা আরম্ভ হবার পরই স্বামী ভৈরবানন্দ পরমহংস মাকড়দহ থেকে এলেন। সিনেমা হবার পরে রাত্রি সাড়ে আটটায় ভৈরবানন্দ নীচে বসে কোন ডাক্তারের সঙ্গে গঙ্গাদেবীর কথা বলছিলেন। তখন মহাগৌরী রান্নাঘরে ও আমি উপরে পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ কোণে ছিলাম। এমন সময় আমি দেখলাম মকরবাহনা স্বর্ণবর্ণা গঙ্গাদেবীকে। মহাগৌরীকে ডাক দিয়ে তাঁর কথা বলতেই তিনিও দেখলেন, ইনি স্বয়ং গঙ্গাদেবী। তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংস যে দেবতা বা ব্রহ্মজ্ঞের প্রসঙ্গ করবেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত

হবেন। রাত্রে মহাগৌরী দেখলেন, আমার প্রথম প্রপিতা লোমশ মুনি এসে আমার পূর্ব দশ জন্মের অবস্থা দেখালেন। অব্যবহিত পূর্বজন্মে আমি ছিলাম পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক এবং তৎপূর্ব জন্মদ্বয়ের এক জন্মে রাজা এবং অন্য জন্মে প্রসিদ্ধ নর্তক ও গায়ক ছিলাম। শেষ রাত্রে মহাগৌরী দেখলেন, গোপাল ও কল্কি শিশু মূর্তিতে একটা ভাঙ্গা বাসে চড়ে খেলা করছে এবং সেই বাসে আমি ও ভৈরবানন্দ বিদ্যমান।

১৯শে শনিবার প্রাতে একটী মোটর গাড়ীতে আমি, ভৈরবানন্দ, মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া প্রভৃতি মাহেশে জগন্নাথ দর্শনে গেলাম। যাত্রার পুর্বে আমরা নাটমন্দিরে বসে শ্রীমা সারদার কথা বলছিলাম। তখন শ্রীমা এসে আমাদের সম্মুখে সহাস্য বদনে দাঁড়ালেন। গোপালজী আমার কাঁধে চড়ে বেড়াতে চললেন। বালি কল্যাণেশ্বর শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে যখন আমাদের গাড়ী গেল, তখন ঐ মন্দিরের পেছনে চাতালে কল্যাণেশ্বর মহাদেব এসে দাঁড়ালেন। অনন্তর বালিবাজার কালীতলায় আমাদের গাড়ী যেতেই মা কালী উক্ত মন্দিরের বাহিরে এসে দাঁড়ালেন। উত্তরপাড়া পার হয়েই ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী দেখলেন, মাহেশ মন্দিরের বাহির ফটকে শংখ-চক্র গদা-পদ্ম-ধারী নারায়ণ তাঁহাদিগকে সপ্রেম আহ্বান করছেন। আমরা মন্দিরের বহিঃদ্বারে গিয়ে ভগবান নারায়ণকে দেখলাম। যখন আমরা মন্দিরের দরজায় গিয়ে প্রণাম করলাম, তখন আমি তাঁকে স্পষ্টভাবে আমার সম্মুখে দেখলাম। নারায়ণ মহাগৌরীর দুই কাঁধে হাত রেখে সম্মুখে দাঁড়ালেন ও মহাগৌরী তাঁকে প্রণাম করার সময় ভূমিষ্ঠ অবস্থায় সমাধিস্থ হলেন। নারায়ণ মহাজ্ঞানী ভৈরবানন্দকে প্রণাম করতে ও চরণামৃত খেতে নিষেধ করলেন। মন্দির প্রদক্ষিণকালেও নারায়ণ আমাদের সম্মুখে চললেন ও প্রত্যাগমনকালে বহির্দ্বার পর্যান্ত আমাদের সঙ্গে এলেন। অনন্তর আমরা মাহেশ রামকৃষ্ণ

আশ্রমে গেলাম। উহার প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত প্রেমঘনানন্দ আমার গুরুভ্রাতা ছিলেন। তিনি যে ঘরে দেহরক্ষা করেন, সেই ঘরে আমরা বসলাম ও চা খেলাম। আমাদের আহ্বানে পিতৃলোকবাসী প্রেমঘনানন্দ এলেন। একটু পরে আমার ইহজন্মের গুরুদেব মহাপুরুষজী এলেন। আমি তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করলাম। তৎপরে আমরা রিষড়ায় গঙ্গাতীরে এলাম। তখন গঙ্গাবক্ষে গঙ্গাদেবী ও তৎসম্মুখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করলাম। গঙ্গাধার দিয়ে যাবার সময় আমরা মা গঙ্গা, মা গঙ্গা বলতেই গঙ্গাবক্ষে গঙ্গাদেবী দেখা দিলেন। প্রায় সাড়ে এগারটায় আমরা ধর্মচক্রে ফিরলাম।

প্রায় বারটায় আমরা সকলে একতলার বারান্দায় খেতে বসেছি। তখন আমার প্রপিতামহী হেমাঙ্গিনী দেবীলোক থেকে এসে স্নেহভরে আমাদের খাওয়া দেখতে লাগলেন। সম্ভবতঃ তিনি আমার আদিকুলগুরু বিপ্রদাস শর্মার শিষ্যা ও দুই শতাধিক বর্ষ পূর্বে দেহরক্ষা করেছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে স্বীয় শয্যায় বিশ্রামকালে আমি দেখলাম, আমার ইষ্টদেবী শিয়রে দাঁড়িয়ে স্বহস্তস্থিত শক্তিবলে আমার ত্রিনয়ন সূক্ষ্মদেহকে স্থূলদেহ থেকে বাহির করে আমার পাশে শয্যায় শায়িত করলেন ও নিম্নমুখী সহস্রদল পদ্ম দুই তিন বার দেখাইয়া তাহার কর্ণিকাতে, কেন্দ্রস্থলে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী সূর্য্যজ্যোতিঃসম্পন্ন মহাজ্যোতিঃ দেখাইয়া ইংগিত করিলেন, এখন থেকে পরমাত্মায় জীবাত্মার লয় সাধন কর। তখন কৌমারী প্রমুখ দেবতা তাঁর পাশে ছিলেন। স্থূলদেহের পাশে সূক্ষ্মদেহকে দেখে আমার মৃত্যুভয় চিরতরে চলে গেল। আমার সূক্ষ্মদেহ সমুজ্জ্বল ও অবিকল স্থূলদেহবৎ। প্রায় এক মাস পূর্বে নাটমন্দিরে বসে দ্বিদল আজ্ঞাচক্র দর্শন করেছিলাম। আজ্ঞাচক্রের উপরে মন উঠলে সাধনার অন্তঃস্রোত ফল্গুনদীবৎ প্রবাহিত হয় এবং ইষ্টদেবতা স্বয়ং গুরুরূপে সাধকের হাত ধরে থাকেন।

২০শে রবিবার একতলার বারান্দায় বসে মধ্যাহ্ন ভোজন কালে আমি দেখলাম, পূর্বোক্ত পিতৃলোকবাসী গুরুভ্রাতা প্রেমঘনানন্দ সূক্ষ্মদেহে এসে প্রথমে উত্তর রাস্তায় ও পরে দক্ষিণস্থ গুদাম ঘরের টিন চালায় দাঁড়ালেন। তখন মহাগৌরী দোতলায় ছিলেন। আমি তাঁকে এই কথা বলায় তিনিও তাঁকে দেখলেন ও এখন চলে যেতে বললেন। সন্ধ্যা পাঁচটায় আমি ও মহাগৌরী প্রভৃতি কয়েকজন মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ কোণে মাদুরে বসে চা খাচ্ছিলাম। তখন স্নেহের সুপর্ণা এসে আমাদের সম্মুখে কন্যারূপে বসলেন ও আমাদের চা খাওয়া দেখলেন। সান্ধ্য ভ্রমণের পর আমি ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে বসে কোন শিল্পী ভক্তের সঙ্গে প্রকাশমান 'দিব্যদৃষ্টি' নামক গ্রন্থের প্রচ্ছদপট সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। তখন আমি দেখলাম, কে একজন আমাকে দেখালেন, প্রচ্ছদপটের ডিজাইন কিরূপ হওয়া উচিত—উপরে ও নীচে যথাক্রমে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম লাল কালিতে এবং মধ্যবর্ত্তী ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরীর আলেখ্যাভাস নীল কালিতে হলে বই ভাল দেখাবে। এই কথা মহাগৌরীকে বলায় তিনিও তাঁকে দেখে বললেন, ইনি ছদ্মবেশী ব্যাসদেব, হাতে কাগজ ও কলম নিয়ে প্রচ্ছদ পট এঁকে দেখালেন ও পূর্ণ পুস্তকের আকৃতিও সম্মুখে ধরলেন। ইহাতে স্পষ্টভাবে বোঝা গেল, 'কল্কি গীতা' ও 'দিব্যদৃষ্টি' গ্রন্থদ্বয় দৈব প্রেরণায় রচিত ও মুদ্রিত হচ্ছে। আমি ব্যাসদেবকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতেই তিনি আমাদের মন্দিরে চলে গেলেন—

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারত তৈলপূর্ণ
প্রজ্বালিত জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥

২০শে রবিবার রাত্রি দুইটায় আমি ও মহাগৌরী দক্ষিণ ও উত্তর

বারান্দায় স্ব স্ব শয্যা হতে উঠে জল খেলাম। তখন আমরা উভয়ে দেখলাম, দক্ষিণ বারান্দায় মন্দিরের জানালার কাছে একটী সূক্ষ্মদেহী বৈষ্ণব সাধক দাঁড়িয়ে মন্দিরস্থ গোপাল, কল্কি প্রমুখ দেবতা দর্শন করছেন। তাঁর মাথায় লম্বা চুল ঘাড় পর্য্যন্ত ঝুলছে ও সাদা কাপড় পরা ও মধ্যম বয়স ও স্বর্গবাসী। ২৩শে বুধবার সকালে এগারটায় ৩।৪ ঘণ্টা লেখা পড়ার পর আমি দক্ষিণ বারান্দায় টেবিলের পার্শ্বস্থ কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে গ্লাসে খাচ্ছি ও মহাগৌরী অদূরে উপবিষ্ট। এমন সময় আমি দেখলাম, টেবিলের নীচে একটী স্বর্গবাসিনী সাধিকা জানালা দিয়ে মন্দিরস্থ দেবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন ও জপধ্যানে মগ্ন আছেন। বারান্দার অন্য স্থানে আমরা যাতায়াত করি বলে, তিনি এই একান্ত জায়গা মনোনীত করে বসেছেন। দিবারাত্রি বহু সূক্ষ্মদেহী নরনারীর আগমন আমাদের মন্দিরের তিন বারান্দায় রোজই হয়ে থাকে। দুপুরে আমি ও মহাগৌরী আহারান্তে দক্ষিণ বারান্দায় আমার খাটে বসে নানা কথা আলোচনা করছি। এমন সময় মহাগৌরীর গুরুমাতা (হরিহরানন্দজীর ধর্মপত্নী) এলেন ও স্নেহভরে কন্যাতুল্যা মহাগৌরীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ২৫ আগষ্ট শুক্রবার ঝুলন পূর্ণিমা দিবসে আমি ও মহাগৌরী ঠাকুরকে খিচুড়ি ভোগ দিলাম, অন্য এক ভক্ত পূজা করলেন। গরম খিচুড়ির হাঁড়ি থেকে ধোঁয়া উঠছিল। তখন গোপাল কৌমারীর হাত ধরে গরম খিচুড়ির হাঁড়ির মধ্যে ঐ হাতটী ঢুকিয়ে রেখে আমার দিকে বড় বড় চোখে চাইছিলেন। আমি গোপালকে বারণ করতে তিনি কৌমারীর হাত ছেড়ে দিয়ে খিচুড়ি খেতে লাগলেন। আমাদের অভক্ত পাচিকা খিচুড়ি রান্না করায় মহাগৌরীর অনুরোধে ঠাকুর নিবেদিত খিচুড়ি ও ব্যঞ্জনাদির উপর ব্রহ্মবারি ছিটিয়ে দিলেন। আজ থেকে এক সপ্তাহ পরে এখানে জন্মাষ্টমী মহোৎসব হবে।

২১শে সোমবার দুপুরে স্নানাহারের পূর্বে এগারটার সময় নাটমন্দিরে

ক্যানভাস ইজি চেয়ারে শুয়ে আমি বিশ্রাম করছিলাম। এমন সময় একটু তন্দ্রাভিভূত হয়ে আমি দেখলাম, আমার বাম দিকে একটী সূক্ষ্মদেহী সিদ্ধঋষি এসে বসলেন ও আমাকে কিছু বললেন। তাঁর দোহারা চেহারা শ্যামবর্ণ, গোঁফ ও দাড়ি ও মাথার চুল ছোট করে কাটা ও মধ্যম বয়স। তিনি আমাকে দুই তিন বার নিম্নমুখী সহস্রদল পদ্ম ও তৎপরে একটি বড় শিব লিঙ্গ দেখালেন। ঐ শিবলিঙ্গ কাল পাথরের তৈরী ও এক ফুট উচ্চ ও কাল পাথরের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ শিবলিঙ্গ ও সিদ্ধঋষি অন্তর্হিত হলেন। স্বামী ভৈরবানন্দকে এই দর্শনের কথা বলায় তিনি যোগবলে জেনে বলেন, "সোমবার দুপুরে নাটমন্দিরে যে সিদ্ধ ঋষি আপনি দেখেছিলেন, তিনি লোমশ মুনির তৃতীয় পুত্র আরুণি। ইনিই আপনার আদি পিতা ও জ্ঞানী ঋষি ছিলেন। সহস্রদলের তলায় তিনি যে শিবলিঙ্গ দেখিয়েছিলেন, উহা সহস্রারে অবস্থিত পরম শিবলিঙ্গ। উক্ত লিঙ্গ সহস্র কোটী সূর্য্য জ্যোতিঃসম্পন্ন, সহস্রদল পদ্মও তদ্রূপ জ্যোতির্ময়। সেইজন্য তিনি কাল বর্ণ শিবলিঙ্গ দেখিয়ে ছিলেন। তিনি আপনাকে উক্ত লিঙ্গে সাধন করিতে বলিতেছেন।" মহর্ষি আরুণি ইতঃপূর্বেও দুই তিন বার এসেছিলেন। তৎকৃত 'আরুণিক উপনিষৎ' অদ্যাপি প্রচলিত। তিনি ত্রেতাযুগের রামভক্ত ছিলেন।

২২শে মঙ্গলবার রাত্রি নয়টায় নৈশ ভোজনান্তে আমি নাটমন্দিরে ইজি চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছি এবং মহাগৌরী দোতলায় স্বীয় শয্যায় শায়িতা। এমন সময় আমি তন্দ্রিত স্তিমিত নয়নে দেখলাম, একটী দেবী আমার পশ্চিমে দণ্ডায়মান—পাকা সোণালী রঙের শাড়ীপরা, এলোকেশী, গাত্রে অল্প অলংকার, বর্ণ পাকা সোণার মত, বড় বড় চোখ। আমি তাঁর কথা মহাগৌরীকে বলার জন্য উপরে এলাম। তিনিও আমার সঙ্গে উপরে এলেন ও মহাগৌরী তাঁকে দেখলেন। একটু পরে তিনি চলে গেলেন। পরদিন বুধবার বৈকাল পাঁচটায় তিনি আবার

এসে আমাকে ও মহাগৌরীকে দেখা দিলেন ও কিছু লিখে দেখালেন; সন্ধ্যায় মহাগৌরী অন্যান্য দেবতার সঙ্গে ঐ দেবীর উদ্দেশ্যেও মন্দিরে মোমবাতি জ্বালিলেন। তখনও তিনি এলেন। অনন্তর শিবপ্রিয়া-প্রেরিত তাল বড়া ও কলা বড়া ঠাকুরকে নিবেদন করা হল। গোপালজী দুই হাতে দুই মুঠো বড়া নিয়ে সকল দেবতাকে ঠেলে ফেলে দিলেন এবং নিজ বুকে হাত দিয়ে মহাগৌরীর দিকে তাকিয়ে ও শিবপ্রিয়ার গৃহাভিমুখে অঙ্গুলি নির্দেশে স্নেহভরে বললেন, "আমার মাসী বড়া পাঠিয়েছে, কাউকে দেবো না।" তারপর আমি আদর করে ডাকতে গোপাল আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। নবাগতা দেবী গোপালকে কোলে নিতে চাইলেন; কিন্তু গোপাল ছটফট্ করলেন ও আমার কোলে ছুটে এলেন। ঐ দেবী গোপালকে না নিতে পেরে ফিরে গিয়ে ঠাকুরের হাত থেকে প্রসাদ নিলেন। ঐ দেবীর কথা ভৈরবানন্দকে জানাতে তিনি পত্রে লিখলেন, "আপনি মঙ্গলবার রাত্রে যে দেবীকে দেখেছেন, ইনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়নী। চণ্ডী আদি গ্রন্থমতে কাত্যায়নী নবদুর্গার অন্যতমা। কাত্যায়নীপূজা দুর্গাপূজার অঙ্গীভূতা। ইনিও আপনাকে পরম শিবের সাধন করতে বলেছেন।" উক্ত চিঠি ২৬শে শনিবার দুপুরে এল ও আমরা আহারান্তে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় বসে উহা পড়লাম। যখন ঐ চিঠি পড়া হল, তখন কাত্যায়নী দেবী পূর্ণমূর্তিতে এসে মহাগৌরীর কাছে দাঁড়ালেন এবং আমি তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতে তিনি আমাকে বৃন্দাবন তীর্থে যাবার জন্য অঙ্গুলি নির্দেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে অন্তর্হিত হলেন।

২৪ শে বৃহস্পতিবার সকালে মন্দিরে নামকীর্তনান্তে আমরা গোপাল সঙ্গীত গাইলাম। তখন গোপাল এসে সামনে দাঁড়ালেন ও তৎপশ্চাতে ব্যাসদেব পূর্ণমূর্তিতে বিরাজ করলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে মদীয় 'কল্কি-গীতা'র তীব্রতম

সমালোচনা কোন বয়স্ক বান্ধবের পত্রে পড়িতেছিলাম। তখন স্নেহের সুভদ্রা এসে আন্তরিক সমবেদনায় সম্মুখে দাঁড়ালেন। পূর্বদিন বৈকাল পাঁচটায় আমি যখন 'কল্কি-গীতা'র প্রুফ দেখিতেছিলাম, তখনও কন্যা সুভদ্রা এসে সম্মুখে প্রীতিভরে দাঁড়ালেন।

২৬শে শনিবার পূর্বাহ্নে আমিও মহাগৌরী মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় 'দিব্যদৃষ্টি' রচনায় অত্যন্ত ব্যাপৃত ছিলাম। রচনান্তে আমরা দেখলাম, মিত্রবর কালযবন আমার শয্যায় তাকিয়ার উপরে দেওয়াল ঠেস দিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম করতে তিনি চলে গেলেন। আমরা উভয়ে স্নানান্তে দুপুরে মন্দিরে ঠাকুর-পূজা করলাম। পূজায় বসার পূর্বে প্রণামকালে দেখা গেল, সিদ্ধেশ্বরী পূর্ণ স্পষ্ট ভাবে পূজাস্থলে পদ্মা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সুভদ্রা, সুপর্ণা প্রভৃতির পাশে বসে আছেন। শিব, কল্কি, ঠাকুর ও গোপালকে স্নান করাবার সময় মা কালীও স্নান করতে চাইলেন। মা কালীকে অর্ঘ্যদানান্তে আমি দেখলাম, তিনি সোণার শাড়ী পরে স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিতে বসে আছেন। তাঁকেই নৈবেদ্য দেওয়া হলো ও তিনি উক্ত নৈবেদ্য গ্রহণপূর্বক সকল দেবতাকে প্রসাদ দিলেন।

২৪ বৃহস্পতিবার বৈকাল চারটায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসেছিলাম। এমন সময় আমার সম্মুখে বারান্দায় এক সিদ্ধ ঋষি এলেন—শুভ্রবর্ণ, মুখ ও চোখ গোলাকার, সাদা কাপড় পরা, দীর্ঘকায় ও জটাধারী। আমি তাঁকে দেখে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে মহাগৌরীকে তাঁর কথা বললাম। মহাগৌরী তাঁকে দেখে প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে ও কেন এসেছেন? তিনি লিখে জানালেন, কল্কি দর্শনে এসেছি। তিনি স্বীয় নাম লিখেও দেখালেন, কিন্তু আমরা তাঁর পুরা নাম পড়তে পারলাম না। তিনি ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দেশে বললেন, আমি ঊর্দ্ধলোক থেকে এসেছি। আমি প্রণাম করতেই তিনি হাত তুলে আনাকে আশীর্বাদ করলেন। তিনি আসতেই শ্রীরামকৃষ্ণ, কল্কিদেব, শ্রীমা সারদা ও গোপালজী মন্দিরের

বাহিরে এসে দাঁড়ালেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বললেন, ইনি তোতাপুরী পরমহংস। পূজ্যপাদ তোতাপুরী কিয়ৎক্ষণ পরেই অন্তর্হিত হলেন। ২৫শে শুক্রবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়েছি ও মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বশয্যায় শায়িত। এমন সময় একটী দিব্যদেহী সিদ্ধঋষি এসে আমার মাথার কাছে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আমার প্রসারিত ডান হাত স্পর্শ করলেন। তাঁর পূত স্পর্শে আমি চমকে উঠলাম, যেমন বৈদ্যুতিক তাঁর ছুঁলে লোকে চমকে উঠে! তাঁর চোখ দুটী গোল ও ছোট। মাথায় সাদা পাকা খাড়া চুল। গায়ের রং ফর্সা ও গোলাপী, সাদা কাপড় পরা, খালি গা। মহাগৌরী আমার আহ্বানে এসে দেখলেন, ঐ ঋষি আমার দিকে চেয়ে আছেন এবং মহাগৌরী আসতেই তিনি অদৃশ্য হলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ পরমহংস যোগবলে জেনে বললেন, ইনি কাত্যায়ন ঋষি ও ছদ্মবেশে এসেছিলেন। ইনি আমার দেহস্থ সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীদ্বার বা যোগদ্বার খোলার জন্য আমাকে স্পর্শ করলেন। যখন সাধক সত্ত্বমার্গে সাধন করে, তখন দিব্যদেহী সিদ্ধ যোগীরা এসে সাধকের যোগদ্বার খুলে দেন বা প্রেরণা দিয়ে যান। তাঁরা সর্বদা সাধক-সাধিকার ইষ্টনির্দেশে আসেন না, স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে আসেন। হয়ত, পূর্ব পূর্ব জন্মের কোন সম্পর্ক তাঁদের সঙ্গে ছিল।

২৫শে শুক্রবার ঝুলন পূর্ণিমা সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতি ও মোমবাতি জ্বালা ও নামকীর্তন ও গোপাল সঙ্গীত হলো। তখন এক সিদ্ধ সাধু দিব্যদেহে এসে একটী লাঠিবৎ লম্বা দণ্ডে ১৫।১৬টী বাতি জ্বেলে দেবতাদের সামনে ধরলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বললেন, ইনি ব্রহ্মজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ উদ্ধব এবং তাঁর ইষ্ট কৃষ্ণ। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে ঝুলনোৎসব প্রচলিত এবং ঐ দিন সন্ধ্যায় বাতি জ্বালা হয়। ২৬শে শনিবার প্রাতর্ভ্রমণ কালে আমিও মহাগৌরী রাজেন শেঠ লেনে দেখলাম, দিব্যদেহী দেবীমূর্তি একটী আমাদের সম্মুখে এলেন ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন।

তাঁর গায়ের রং সোণার মত, সোণালী শাড়ী পরা, মাথায় কাপড়। এমন সময় ঠাকুরকে তাঁর পাশে দেখা গেল। ইনি আমার ইষ্টদেবী ব্রহ্মময়ী জগদম্বা। সুপ্রসন্না স্নেহময়ী ইষ্টদেবী কৃপাপূর্বক মাঝে মাঝে অযাচিত দর্শনদানে আমাকে কৃতার্থ করেন। ২৭শে রবিবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে ১২॥০ থেকে ১টার মধ্যে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় আমি শুয়ে একটু তন্দ্রিত হয়ে দেখলাম, একটী হেমবর্ণা দিব্যদেহী নারীমূর্তি এসে আমার শয্যায় বসলেন ও স্নেহভরে আমার মুখের কাছে তাঁর মুখ এনে কিছু বললেন। তাঁর মুখ-চোখ অতি সুন্দর ও দেবীতুল্য, মাথায় কাপড় নাই, মধ্যম বয়স্কা। ইনি আমার প্রপিতামহী দেবীলোকবাসিনী হেমাঙ্গিনী। ইনি সংগোপনে বললেন, বাবা, কাজ কমাও ও সাধন শেষ কর। উক্ত তারিখে রাত্রি তিনটার পরে স্বীয় শয্যায় শুয়ে মুদ্রিত নয়নে আমি দেখলাম, কোন দেবী আমাকে একটী মস্ত বড় জবাফুল দেখালেন। ঐ জবাফুলের বর্ণ ঈষৎ লাল, গাঢ় লাল নহে ও উহার একাংশ নীলাভ। ঐ দিব্য পুষ্প একটী বড় থালার চেয়েও বড়। ধীরে ধীরে এই জবা অন্তর্হিত হলো। কাত্যায়নী দেবী ঐ বড় জবা ফুল আমাকে দেখালেন ও বললেন, "উহা মনোজবা। এই মনোজবা দিয়ে মানসপূজা কর ও বাহ্যপূজা ছাড়।" উহা নীলাভ, কারণ মানসপূজা হৃৎপদ্মে করতে হয়। অনাহত চক্র বায়ুতত্ত্বের স্থান ও বায়ুতত্ত্ব নীলবর্ণ বলে মনোজবা নীলাভ।

২৭শে রবিবার দুপুরে দেড়টায় মহাগৌরী বালি বাসায় দেখছেন, "দুটী ব্রহ্মচারী, নয় দশ বৎসর বয়স্ক, নেড়া মাথা, গৌরবর্ণ, গেরুয়া পরা, হাতে দণ্ড, গলায় পৈতে, খড়ম পায় ও ভিক্ষাঝুলি কাঁধে। দুইজন পরস্পর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন—একজন অন্যজন অপেক্ষা একটু বড়। মহাগৌরী প্রণাম করতেই তাঁরা চলে গেলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, ঐ দুই জন উদ্ধব ও অক্রুর। তাঁরা পরে জন্মাষ্টমী মহোৎসবে আমাদের মন্দিরে এসেছিলেন।

সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

২রা শনিবার জন্মাষ্টমীর পরদিন স্বামী ভৈরবানন্দ পরমহংস আমাকে ধর্মচক্রে বললেন, "বাবা, আপনার পূর্ব দশ জন্মের মধ্যে তিন জন্মের কথা যোগবলে জেনেছি। আপনার আদি পিতা লোমশ মুনির তৃতীয় পুত্র আরুণি। আপনি আদি জন্মে আরুণির পুত্র অধিরথ ছিলেন। অধিরথ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। আপনি চতুর্থ জন্মে রাজা পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জন্মেঞ্জয়ের পুত্র ভীম বা অজয়। জন্মেঞ্জয়ের তিন পুত্র ছিলেন জয়, বিজয় ও ভীম। ঐ জন্মে আপনার মাতা কাশীরাজকন্যা বপুষ্টমা।" মহাভারতের আস্তিক্য পর্বে অধিরথ ও বপুষ্টমা ও ভীমের কথা আছে। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু ও অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ। সুতরাং জনমেজয়ের পুত্র ভীম রাজা পরীক্ষিতের বংশধর।

২রা শনিবার নন্দোৎসব রাত্রিকালে আহারান্তে আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে আছি। এমন সময় আমি দেখলাম, আমার শয্যাপার্শ্বে একটী দেবী এসে দাঁড়ালেন—শ্বেতবর্ণা, ত্রিনয়না, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, চতুর্ভুজা, চার হাতের উপরে নীচে রুদ্রাক্ষ বাঁধা, উর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে শূল ও বিষাণ, গলায় রুদ্রাক্ষমালা ও অস্থিমালা ও সর্প জড়ান, মস্তকে অর্ধ চন্দ্র ও শিববৎ জটার ঝুঁটী বাঁধা ও তাতে সর্প জড়ান। তিনি এসে আমাকে স্পর্শ করতেই আমার সমুজ্জ্বল সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ থেকে পৃথক্ হয়ে গেল। তৎসঙ্গে আর একটী পুরুষ দেবতা ছিলেন—শুভ্রবর্ণ চতুর্ভুজ শিবাকৃতি। আমি মহাগৌরী ও ভৈরবানন্দকে ডেকে তাঁদের কথা বলায় তাঁরা বললেন, "মহেশ্বর ও মাহেশ্বরী উভয়ে এসেছেন। যখন সাধক পরম শিব মার্গে সাধন করেন, এই দুই দেবতার আশীর্বাদ প্রয়োজন হয়। আপনি উক্ত মার্গে সাধন করছেন বলে তাঁরা আপনাকে আশীর্বাদ করতে এসেছেন।" আমি নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করতেই তাঁরা কিছুক্ষণ পরে চলে গেলেন। মহাগৌরী দক্ষিণ বারান্দায় আসতেই মাহেশ্বরী

জ্যোতিঃরূপে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন ও আমি সেই তীব্র স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দেখে চমকে উঠলাম এই মন্ত্র শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে।—

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনী।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণী নমোহস্তু তে॥

২রা শনিবার বৈকাল পাঁচটায় আমি নাটমন্দিরে দাঁড়িয়ে তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দের সঙ্গে নানা কথা আলোচনা করছিলাম। তখন আমি দেখলাম, তাঁর পশ্চাতে একটী বিরাট মূর্তি—উহা ভৈরবানন্দ সদৃশ হইলেও আকারে বহুগুণে বৃহত্তর। আমি মহাগৌরীকে ডেকে উহা দেখালাম। ইহা ভৈরবানন্দের ভ্রাম্যমান ইষ্টাধীন সূক্ষ্মদেহ ও আসল ভৈরব স্বরূপ। ইহা ইষ্টনির্দেশে সপ্তস্বর্গে ঘুরে বেড়ায়। অনন্তর প্রসঙ্গান্তরে ভৈরবানন্দ পরমহংস রুদ্রমূর্তি ধরলেন। তখন মহাগৌরী দেখলেন, ভৈরবানন্দের পশ্চাতে তদাকৃতি অগ্নিবর্ণ রুদ্রমূর্তি। ইহা আকারে স্থূল দেহ সদৃশ ও রুদ্রতুল্য। কোন আধুনিক সিদ্ধযোগীর এরূপ বিভিন্ন মূর্তি আমরা দেখি নাই। নৈশ আহারান্তে আমি ও ভৈরবানন্দ পূর্বোক্ত নাটমন্দিরে বসে ষট্চক্রতত্ত্ব আলোচনা করিতেছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে 'ষট্চক্র-নিরূপণম্' নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংসের কথা উঠিল। স্বামী ভৈরবানন্দ বলিলেন, "আমি পূর্ণানন্দজীকে দেখেছি। তিনি সুপুরুষ সিদ্ধযোগী। মাকালী বলেন, তিনি দশ হাজার বৎসর পূর্বে বর্দ্ধমানে আবির্ভূত হয়েছিলেন ও সাধক কমলাকান্ত তাঁর বংশধর। তিনি আধুনিক সিদ্ধযোগী নহেন।"

৫ই মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরে মহাগৌরী দুই দিন পরে বালি বাসা থেকে ফিরলেন। নৈশ ভোজনান্তে আমরা উভয়ে আমার বিছানায় বসে আলোচনা করছি, "কবে তারকেশ্বরের অদূরে লোকনাথ শিবদর্শনে যাওয়া যায়; কারণ গত রবিবার তারকেশ্বর দর্শনান্তে আমরা লোকনাথ দর্শনে যেতে পারিনি।"

এমন সময় আমরা উভয়ে দেখলাম, মহাগৌরীর পাশে একটী ছদ্মবেশী দেবমূর্তি আবির্ভূত। মহাগৌরী দিব্যদৃষ্টিতে তাঁকে দেখে বললেন, ইনি নিশ্চয়ই স্বয়ং লোকনাথ। আমরা তাঁকে চিনতেই তিনি স্বরূপ প্রকট করলেন—সশক্তিক শুভ্রবর্ণ ত্রিনয়ন জটাধারী মহাদেব। আমরা তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ও মানস পূজা করে মন্দিরে যেতে প্রার্থনা জানালাম। তিনি মন্দিরে না ঢুকেই অন্তর্হিত হলেন। লোকনাথ মহাদেব স্বয়ং শিবসিদ্ধা মহাগৌরীকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন।

৪ঠা সোমবার সকালে আমি ও মহাগৌরী নিশ্চিন্দায় একটী বৃহৎ মৃৎশিল্পের কারখানায় আমাদের কালী প্রতিমা ও কার্তিক প্রতিমা অর্ডার দিতে গিয়েছিলাম। কৌমারী প্রতিমা সম্বন্ধে মৃৎশিল্পীর সহিত আলোচনাকালে কৌমারী দর্শন দিলেন। শোনা যায়, আসাম প্রদেশে গৌহাটী অঞ্চলে কৌমারী প্রতিমা পূজিত হয় এবং কামাখ্যা মন্দিরে কুমারীপূজা প্রচলিত। ঐ কারখানায় অনেক বিশ্বকর্মা প্রতিমা নির্মিত ছিল, কারণ বার দিন পরে নানা স্থানে বিশ্বকর্মাপূজা হবে। যখন আমরা হস্তীবাহন বিশ্বকর্মার কথা বলছিলাম, তখন বিশ্বকর্মা দেবতা আবির্ভূত হলেন—চতুর্ভুজ, মাথায় মুকুট, হাতীর উপরে সমাসীন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বিশ্বকর্মার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনন্তর কালী প্রতিমার কথা আলোচনাকালে শুভ্রবর্ণ কালীমূর্তি আমি স্পষ্টভাবে দেখলাম। ৫ই মঙ্গলবার রাত্রে একটার পর আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ বেদীযুক্ত বৃহৎ শিবলিঙ্গ দেখলাম। বলা বাহুল্য, মহাগৌরীও উহা দেখলেন ও বললেন, ইহা পরম শিবলিঙ্গ।

৩রা রবিবার প্রাতে মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া প্রভৃতি সহ আমি শিবতীর্থ তারকেশ্বর দর্শনে গেলাম। পূর্ব রাত্রে তারকেশ্বর মহাদেব নগ্ন মূর্তিতে এসে আমার বিছানায় বসেছিলেন। তারকেশ্বর শিবের ধন্বন্তরি ভৈরবমূর্তি। তাই রোগার্ত নরনারী তাঁর কাছে নানা রোগের

ঔষধাদি পায়। আমরা তারকেশ্বর স্টেশনে পৌছিবার অল্পকাল পূর্বে আবার ট্রেনে আমি তারকেশ্বর ভৈরবকে দেখলাম। গোপালজীও আমার পাশে বালমূর্তিতে ছিলেন। অর্ধপথে ট্রেনে একটী মাতৃমূর্তি দেবী এসে আমাকে বিদ্যুৎবৎ উজ্জ্বল প্রসাদ খাওয়ালেন। তাঁকে দেখে অন্য কামরায় উপবিষ্ট মহাগৌরীকে আমি অবিলম্বে ডেকে আনিলাম। তিনি তাঁকে দেখে বললেন, ইনি তারকেশ্বর শক্তি ও আপনাকে শিবলোকের মহাপ্রসাদ খাওয়ালেন। একটী শিবানুচরও ট্রেনে এসে আমাদিগকে আমন্ত্রণ জানালেন। আমরা ঐ শিবতীর্থে গিয়ে নাট-মন্দিরের এক পাশে বসেছিলাম। তখন তারকেশ্বর মহাদেব এসে মহাগৌরীকে ইসারায় জানালেন, "এখন যাত্রীর ভিড় নাই। সত্বর মন্দিরে গিয়ে দর্শনাদি কর। তদনুসারে প্রথমে মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া শিবলিঙ্গ দর্শন করলেন। পরে আমি গিয়ে দেখলাম, শিবলিঙ্গের পাশেই তারকেশ্বর পূর্বদৃষ্ট মূর্তিতে বিরাজমান। আমরা তিন জনেই শিবগঙ্গায় মহাস্নান করলাম। অসংখ্য সূক্ষ্মদেহী নরনারী এসে মহাগৌরীর সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়ালেন। অনন্তর আমরা কালীমন্দিরে গেলাম। তথায় আমি প্রণামান্তে দেখলাম, মন্দিরের মধ্যে ট্রেণে দৃষ্ট তারকেশ্বর ভৈরবী বিরাজিতা। আমি উক্ত মন্দিরের বারান্দায় বসে কিছুক্ষণ জপ করলাম। তখন আমার সম্মুখে একটী অবাঙ্গালী সূক্ষ্মদেহী সিদ্ধ সাধক এসে বসলেন এবং আমি যতক্ষণ জপ করলাম, ততক্ষণ তিনি আমার সম্মুখে শান্ত মূর্তিতে বসে রইলেন। ইনি প্রসাদ শর্মা ও ঋষিলোকবাসী। বার শত বর্ষ পূর্বে ইনিই স্থানীয় জঙ্গল মধ্যে তারকেশ্বর শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারান্তে তিনিই আবিষ্কৃত শিবলিঙ্গের নিত্যপূজা গোপনে করতেন। রাখাল বালকেরা তারকেশ্বর শিবলিঙ্গকে চুরি করে নিয়ে যায় ও স্বগৃহস্থ ঢেঁকিশালের গর্তমধ্যে পাথররূপে রেখে তদুপরি ধানভানা প্রভৃতি করে। তখন তারকেশ্বর স্থানীয় রাজা-রাণীকে স্বপ্নে বললেন, "আমার মাথায় এরা

ধান ভানছে ও ঢেঁকির আঘাতে আমার মাথায় গর্ত হয়ে গেছে। আমাকে সত্বর এখান থেকে নিয়ে গিয়ে নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা কর।" রাজা স্বপ্নদর্শনান্তে শিবলিঙ্গকে রাখালদের কবল থেকে উদ্ধারপূর্বক নব-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। তখন পূর্বোক্ত প্রসাদ শর্মা প্রথম পূজক নিযুক্ত হন। সেইজন্যই তারকেশ্বরের মাথায় এখনও গর্ত দেখা যায়। তথায় প্রসাদ দেহরক্ষা করেন ও ঋষিলোক প্রাপ্ত হন। ২১শে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দের আহ্বানে তিনি ধর্মচক্রে এসেছিলেন। কালীমন্দিরের উঠানে সূক্ষ্মদেহী রাজা ও রাণী এবং তাঁদের পশ্চাতে অনেক পুরুষ সূক্ষ্মদেহী এসে ভীড় করে দাঁড়ালেন। তাঁদের অনেকের স্থূল দেহ মন্দির প্রাঙ্গণে সমাহিত হয়েছে। অনন্তর আমরা পার্শ্ববর্তী ধর্মশালার বারান্দায় গিয়ে জলযোগ করলাম। তখন আমি আমাদের মন্দির-রক্ষক কাল ভৈরবকে দেখলাম। তৎপার্শ্বে তারকেশ্বর ভৈরব এসে দাঁড়ালেন এবং আমি উভয়কে সভক্তি প্রণাম করতে তারকেশ্বর মহাদেব তাঁর আসল স্বরূপ দেখালেন—শিবতুল্য শুভ্রমূর্তি জটাধারী মাথায় সাপ। তখন ঐ বারান্দায় সূক্ষ্মদেহী রাজা-রাণী এলেন। তারপর আমরা হাতিশালায় গিয়ে একটী বেশ বড় বুড়ো হাতি দেখলাম। ঐ হাতিতে চড়ে মোহন্ত মহারাজ উৎসব উপলক্ষে বিহার করেন। আমরা মোহন্তজীর বাসভবন দেখার সময় রাস্তায় একটী দীর্ঘকায় দিব্যদেহী দেখলাম—প্রায় বার হাত লম্বা, সাদা কাপড় পরা, মাথায় লম্বা জটা। আমাদের মন্দির-রক্ষক কাল ভৈরব উক্ত পূর্ণমূর্তি ধরে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন দুষ্ট প্রেতাদি থেকে আমাদিগকে রক্ষা করবার। তৎপরে মোহন্তজীর বাসভবনের বারান্দায় আমরা বিশ্রাম করলাম। তখন তারকেশ্বর মহাদেব এসে মহাগৌরীর কাছে বসলেন—মাথায় জ্যান্ত সাপ, বাঘছাল পরা, হাতে রূপার ত্রিশূল, ও জটাধারী। বহু সূক্ষ্মদেহী তাঁর চার দিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। আমরা তথায় যতক্ষণ বিশ্রাম করলাম, ততক্ষণ তারকেশ্বরও সূক্ষ্মদেহীবৃন্দ

আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমরা সাড়ে তিনটার ট্রেণে চড়ে যথাসময়ে ধর্মচক্রে ফিরলাম।

৬ই বুধবার বৈকাল ছয়টায় আমি একা নাটমন্দিরে ইজি চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছিলাম। দুই তিন দিন জ্বরে ভুগে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। তখন মহাগৌরী দোতলায় ছিলেন। এমন সময় আমি তন্দ্রিত নয়নে দেখলাম, আমার দেবীলোকবাসিনী প্রপিতামহী হেমাঙ্গিনী এসে আমাকে সস্নেহে স্পর্শ করলেন। ইহার ফলে আমি একটু সুস্থবোধ করলাম। তিনি চলে যাবার পর এলেন স্নেহের সুকন্যা সুপর্ণা রাণীর বেশে। তিনি কিছুক্ষণ আমার কাছে বসলেন। বলা বাহুল্য, মহাগৌরী দোতলা থেকে হেমাঙ্গিনী ও সুপর্ণা উভয়কে দেখলেন দিব্যদৃষ্টিতে।

৭ই বৃহস্পতিবার রাত্রি দুইটায় আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে ধ্যানকালে স্পষ্ট ভাবে দেখলাম;-দেবসেনাপতি কার্তিক সামরিক বেশে বালমূর্তিতে আমার শয্যায় দণ্ডায়মান—গাঢ় নীলবর্ণের পোষাক পরা, পীঠে তূণ বাঁধা ও মাথায় মুকুট। আমি মহাগৌরীকে ডেকে বলায় তিনিও তাঁকে দেখলেন। আমি কার্তিক ঠাকুরকে প্রণামান্তে কার্তিকমন্ত্র—ওঁ কং দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ায় নমঃ—১০৮ বার জপ করতেই তিনি অন্তর্হিত হলেন এবং সেই ক্ষণেই কৌমারী এসে তাকিয়ায় বসলেন শুভ্রজ্যোতিঃতে আমার মশারি ও বারান্দা আলোকিত করে। তাঁকেও পূর্বোক্ত প্রকারে প্রণাম ও অর্চনা করতে তিনি চলে গেলেন। যখন কার্তিক দেখা দিলেন, তখন কৌমারী অদূরে আড়ালে ছিলেন।

৮ই শুক্রবার প্রাতে আমি দক্ষিণ বারান্দায় পূর্ব জানালার কাছে দাঁড়িয়ে 'দিব্যদৃষ্টি' গ্রন্থের প্রুফ দেখছিলাম। তখন কুমারিল ভট্ট এসে প্রথমে আমার পশ্চাতে দাঁড়ালেন ও পরে মদীয় শয্যায় তাকিয়ায় বসলেন। বহু দিন পরে তাঁকে দেখা গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সিদ্ধেশ্বরী

ভৈরবী এসে আমার শয্যায় পূর্ণমূর্তিতে দাঁড়ালেন। তাঁর সুন্দর সুশুভ্র বদন পূর্ণচন্দ্রবৎ জ্যোতির্ময় দেখা গেল। অনন্তর যখন আমি চেয়ারে বসে মুড়ি খাচ্ছিলাম, তখন ওঙ্কার দেবতা ও গোপালজী ও মহাগৌরীর গুরুমাতা—তিন জনকে আমার টেবিলের উপর দেখা গেল। মহাগৌরীর গুরুমাতা প্রায়ই আমাদের মন্দিরে আসেন।

৮ই শুক্রবার বৈকাল পাঁচটায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে চিঠি লিখিতেছিলাম। এমন সময় দক্ষিণ বারান্দায় মা কালীকে পূর্ণমূর্তিতে দেখলাম—স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি ও তাঁর পশ্চাতে পূর্ণচন্দ্রবৎ স্নিগ্ধতম ব্রহ্মজ্যোতিঃ। আমি তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম ও অর্চনা করতে তিনি পুত্রপ্রাণা জননীবৎ এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ও স্নেহাদর করলেন। তিনি যেন এই অধম সন্তানকে কোলে নিতে চেয়েছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সানন্দে মন্দিরে চলে গেলেন। জগদম্বার এরূপ পুত্র-পাগল স্নেহোন্মাদ মাতৃমূর্তি কখনো দেখি নাই। আমি কয়েকদিন ধরে ভাবছিলাম, ইষ্টদেবীরূপে মা কালী কি মোক্ষ দানে সমর্থা? তাই তিনি দেখালেন, তিনি মোক্ষদাত্রী জ্ঞানদাত্রী ব্রহ্মময়ী ইষ্টদেবী। সন্ধ্যায় কুয়াতলায় যখন আমি বাথ টবে বসে হিপ বাথ নিতেছিলাম, তখন শিবলোকের একটী সিদ্ধা সাধিকা কমণ্ডলু হাতে এসে নাটমন্দিরে মহাগৌরীর সামনে দাঁড়ালেন ও মন্দিরে যাবার জন্য অনুমতি চাইলেন। আমরা মন্দিরে যেতে বলায় তিনি মন্দিরে গেলেন। আজ অঘোর চতুর্দশী বলে নানা উর্দ্ধলোক থেকে অনেক শিবভক্ত নরনারী মন্দিরে শিবদর্শনে এসেছিলেন। রাত্রে আমরা ভক্তিভরে দুগ্ধ ও গঙ্গাজলে শিবস্নান করিয়ে পঞ্চোপচারে অঘোর শিবপূজা করলাম। তখন মহাগৌরী দেখলেন, অঘোর শিব এসে পূজাদি নিলেন। অঘোর শিব রুদ্রমূর্তি।

৯ই শনিবার প্রাতে নামকীর্তনকালে আমি স্নেহের সুপর্ণাকে স্পষ্টভাবে

দেখলাম—স্বর্ণবর্ণা রাণীমূর্তি, রঙ্গীন সিল্কের জামা-শাড়ী পরা। দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুরপূজা করলাম। পূজাকালে কালী, তারা, মাতঙ্গী ও বগলা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যা এলেন ও পূজাদি নিলেন। তারা দেবীর মাথায় মুকুট নাই, সোণার সিঁথি আছে, মনোহর মাতৃমূর্তি, নানা অলংকারে ভূষিতা। কালী ও মাতঙ্গী ও বগলার মাথায় মুকুট ছিল। কথা হয়েছিল, মহাগৌরী স্বহস্তে যে সাগুর খিচুড়ি আমার জন্য রান্না করবেন, তাহাই মা কালীকে নিবেদন করা হবে। আমি আপত্তি করলাম, রোগীর পথ্য দেবীভোগ্য হবে কি? তাই সাগুর খিচুড়ি নিবেদিত হল না। আমি একতলায় আহারকালে উহা স্নেহের কন্যা কৌমারীকে নিবেদন করলাম। নিবেদনান্তে কাঠের পিঁড়িতে চোখ বুজে বসে দেখছি, শুভ্রবর্ণা মহামায়া আবির্ভূত হয়ে নিবেদিত সাগুর খিচুড়ী খাচ্ছেন—শত শত শুভ্র জ্যোতিঃরশ্মি মহামায়া থেকে বিনিঃসৃত হয়ে খিচুড়িতে পড়ছে। ইষ্টদেবীর এইরূপ সুস্পষ্ট শুভ্র বর্ণ সত্ত্বমূর্তি আমি পূর্বে দেখি নাই। খিচুড়ি গ্রহণান্তে তিনি অন্তর্হিত হলেন। যখন সত্ত্বমার্গে সাধক সাধন করেন, তখন তিনি ইষ্টাধীন হন, স্বাধীন থাকেন না। পুরীর সমুদ্রে স্নানার্থী অন্তঃস্রোতে বা আণ্ডার কারেণ্টে পড়লে আর তীরে ফিরতে পারে না। ইষ্টাধীন সাধক মাতৃক্রোড়ে শিশুবৎ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হন। ১১ই সোমবার আহারান্তে বেলা একটায় আমি ও মহাগৌরী দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় বসে সদ্যপ্রাপ্ত চিঠিগুলি পড়িতেছিলাম। তখন আমি শুভ্রবর্ণা কালীমূর্তি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখলাম—তুষারধবল জ্যোতির্ময়ী ভক্তবৎসলা মাতৃমূর্তি। মহাগৌরীও তাঁকে দেখলেন ও আমাকে বললেন, "মা কালী সর্বদা আপনার সঙ্গে থাকেন ও মাঝে মাঝে তাঁর অস্তিত্ব আপনাকে জানিয়ে দেন। ইষ্টসিদ্ধিলাভের পর ইষ্টদেবতা সর্বদা ভক্তসঙ্গে থাকেন।" আজ আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর-পূজা করলাম। পরম শিব বা পূর্ণ শিব পূজান্তে শিবকে নৈবেদ্য দিতে

তিনি জ্যোতির্ময় দিব্য মূর্তিতে এলেন—জ্যোতিঃতে তাঁর রূপ বিগলিত, শুধু মস্তকের উর্দ্ধাংশ একটু দেখা যাচ্ছে। তাই দেবী গৌরীই প্রসাদ বিতরণ করলেন। পূজান্তে মন্দিরদ্বার বন্ধ করার সময় মহাগৌরী দেখলেন, শিব ঠাকুর শুভ্র মূর্তি ধরে বসে আছেন। দেবপূজাকালে ভূতশুদ্ধি দ্বারা জীব শিবকে সহস্রারস্থ পরমশিবে লীন করিতে হয়।

১৫ই শুক্রবার আহারান্তে বেলা সাড়ে বারটার সময় আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে মহাগৌরীর সঙ্গে কথা বলছি। তখন আমি দেখলাম, আমার শিয়রে একটী হেমবর্ণা দেবীমূর্তি আবির্ভূতা, স্নেহময়ী জননীবৎ উপবিষ্টা। তিনি এলোকেশী ও ত্রিনয়না—তৃতীয় নয়ন উর্দ্ধমুখী ও তা থেকে রক্তাভ জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বয়স্কা আকৃতি হলেও স্নেহোজ্জ্বল মুখমণ্ডল ১৫।১৬ বর্ষের বালিকাবৎ সুকোমল। মহাগৌরী তাঁকে দেখে বললেন, ইনি আপনার ইষ্টদেবী। তাঁর অল্প দূরে সুভদ্রা বসেছিলেন। একটু পরে উভয়ে অন্তর্হিত হলেন। এই ঘটনার অল্প কাল পূর্বে আমার খাটের পাশে দুই সূক্ষ্মদেহী তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকা এসে দাঁড়ালেন—উভয়ের হাতে লাঠি, গেরুয়া পরা, পরিব্রাজক। আমরা শ্রদ্ধা জানাতেই তাঁরা হাত জোড় করে অন্তর্হিত হলেন। ১৩ই বুধবার মধ্যরাত্রে আমি শয্যায় শুয়ে বিজ্ঞানানন্দ স্বামীকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি একটী আমলকী গাছতলা দিয়ে যাচ্ছিলেন ও ২।৪টী পাকা আমলকী কুড়িয়ে নিলেন। ঐ আমলকী গাছের তলায় অনেক আমলকী পড়েছিল। আমিও কয়েকটী আমলকী সানন্দে কুড়িয়ে পকেটে রাখলাম। আমি তাঁকে সভক্তি প্রণামান্তে বিদায় গ্রহণ সময়ে কাঁদছি ও বলছি, আবার কবে দেখা হবে? তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, তুমি জ্ঞানী হয়ে কাঁদছ কেন? আমি এত আবেগভরে কাঁদছি যে, ঘুম ভেঙ্গে গেল ও উঠে দেখলাম, আমার দুই চোখ দিয়ে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে গাল বেয়ে পড়ছে! স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও

বেলুড় মঠের অন্যতম প্রেসিডেন্ট। আমি তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতাম ও তাঁর বিস্তৃত বাংলা জীবনী লিখেছি। ঐ জীবনী এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত।

১৬ই শনিবার সকালে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে মুড়ি খাবার সময় আমি পদ্মাদেবীকে অনেক দিন পরে আমার সামনে দেখলাম, তিনি কন্যাতুল্য সশ্রদ্ধ আননে অদূরে দণ্ডায়মান। মহাগৌরীও তাঁকে দেখে বললেন, দাদু, ইনি আপনার কন্যা পদ্মা দেবী।

সন্ধ্যা আটটার পরে মহাগৌরী বাড়ী থেকে ফিরলেন। কোন্নগরের কোন রাহুগ্রস্ত ভদ্রলোকের গৃহে হোম করার কথা উঠিল। আমি অসম্মতি জানিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছি। এমন সময় আমি দেখলাম, নাটমন্দিরে আমার ইষ্টদেবী স্নেহময়ী জননীবৎ পূর্ণমূর্তিতে আবির্ভূতা—স্বর্ণবর্ণ গায়ের রঙ ও শাড়ীর রঙ, এলোকেশী, আঁচল হাওয়ায় উড়ছে। আমার অভিপ্রায় সমর্থনান্তে তিনি অন্তর্হিত হলেন। ভোর চারটায় বা পরদিন রবিবার সকালে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের বারান্দায় আলোচনা করছিলাম, শ্রীশ্রীচণ্ডীতে কথিত জ্ঞানদাত্রী মহাসরস্বতী মহামায়া কি না? তখন দেখা গেল, পূর্বদৃষ্ট ইষ্টদেবীই মহামায়ারূপে আবির্ভূত হলেন। সকালে রাধাগোবিন্দনগরে কোন ভক্তের বাড়ীতে যাবার পূর্বে আমরা দেখলাম, আমার টেবিলের উপরে কাল যবন পূর্ণ মূর্তিতে উপবিষ্ট। আমরা পূর্বরাত্রে যে কাজের ভার তাঁকে দিয়েছিলাম, তা সম্পন্ন করে তিনি জানাতে এসেছিলেন। লিলুয়া কলোনি দিয়ে যাবার পথে আমরা ইষ্টদেবীকে আবার দর্শন করলাম। ট্রেনে বিশ্বকর্মা দেবতাকে দেখা গেল। আজ রবিবার অসংখ্য কারখানায় মৃণ্ময়ী প্রতিমায় বিশ্বকর্মা পূজা হচ্ছিল। আমি তাঁকে প্রণাম ও অর্চনা করতে তিনি চলে গেলেন! আমাদের সঙ্গে শিব ও কলী গেলেন, রাধাগোবিন্দনগরে ভক্তগৃহে আমরা, দুপুরে নামকীর্তনান্তে অন্নভোগ দিলাম।

তখন স্বামী ভৈরবানন্দ সূক্ষ্মদেহে মাকড়দহ থেকে এসে ঠাকুরঘরে বিরাজ করলেন। নামকীর্তনকালে মহাগৌরী সমাধিস্থ হলেন। অন্নভোগের সময় ধর্মচক্রের মন্দিরস্থ দেবগণ আমাদের সপ্রেম আহ্বানে এলেন ও নিবেদিত পায়স ও অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করলেন। আহারান্তে বিশ্রাম-কালে উক্ত ভক্তের স্বর্গবাসী মাতামহ প্রভৃতি সূক্ষ্মদেহে এসে আমাদিগকে সম্বর্ধনা করে গেলেন। ফেরার পথে আমরা বেলুড়ে তিনখানি সুসজ্জিত সুনির্মিত বিশ্বকর্মা প্রতিমা দেখলাম। দুঃখের বিষয়, কোথাও দেবতার আবির্ভাব পরিলক্ষিত হলো না। রাত্রি দশটায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে আমি দেখলাম, একটী দিব্যদেহী বিরাটমূর্তি এসে আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন—তাঁর চোখ দুটী ডাবের মত বড় ও মাথা মন্দিরের ছাদে ঠেকে, শুভ্রবর্ণ। ক্ষণকাল পরে তিনি চলে গেলেন। রাত্রি তিনটায় আমি ও মহাগৌরী স্ব স্ব শয্যায় শুয়ে দেখলাম, কৌমারী দেবীকে—৪।৫ বৎসরের শিশুকন্যা মূর্তি, মাথায় বব কাটা চুল, ছোট জাঙ্গিয়া পরা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মা কৌমারী কন্যামূর্তিতে বসেছিলেন।

১৮ই সোমবার সকাল সাড়ে নয়টায় আমি নাটমন্দিরের পূর্বদক্ষিণ কোণে ড্রেণের ধারে বসে হাতমুখ ধুতেছিলাম। তখন আমি দেখলাম, একটী বিধবা বুড়ী পিতৃলোকবাসিনী সূক্ষ্মদেহী ড্রেণের ওপারে গাণের উপরে দাঁড়িয়ে আছে—তার মাথার সামনে চুল নাই, সাদা থান পরা। বেলা চারটায় আমি ও মহাগৌরী পশ্চিম বারান্দায় বসে এই অধ্যায় লিখছি। আমার শরীর অসুস্থ থাকায় মর্মাহত হয়ে আমি ভাবছি, কি করে এই দেহে সাধন শেষ করবো? তখন আমার সামনে একটী দেবীমূর্তি এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, মা, আপনি কি আমার মেয়ে সুভদ্রা? তখন তিনি তাঁর শুভ্র বাম পদ বাড়িয়ে দিলেন। পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তবে কি আপনি আমার ইষ্টদেবী? তখন তিনি সহাস্য বদনে আমার বুকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে সঙ্কেত

জানালেন, তিনি আমার ইষ্টদেবী। ইষ্টদেবীর পূর্ণমূর্তি আপাদমস্তক দর্শনে আমার সংশয়াকুল চিত্তে আশার আলোক দেখা গেল। অধুনা প্রায় প্রত্যহ ইষ্টদর্শনলাভে আমি ধন্য হইতেছি।

২০ শে বুধবার বৈকাল চারটায় আমি ও ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসেছিলাম এবং বিশ্বরূপানন্দ স্বামী ভৈরবানন্দ কর্তৃক রচিত ও স্বহস্তে লিখিত 'মন্ত্রযোগ' শীর্ষক নিবন্ধ পড়িতেছিল। মহাগৌরী আমার চেয়ারেই বসেছিলেন। তখন ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি ভাগুরি, যাঁর কাছে মার্কণ্ডেয় মহামুনি প্রথমে শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্য প্রকাশ করেন, এসে মহাগৌরীর কাছে দাঁড়ালেন। তখন মহাগৌরী চেয়ার থেকে উঠে গেলেন ও ভাগুরি ঐ চেয়ারে বসলেন। তখন 'মন্ত্রযোগ' থেকে পাঠ হচ্ছিল, "বৈবস্বত মন্বন্তরে শিব তন্ত্র ও চণ্ডী প্রভৃতি প্রকাশ করলেন। তখন ভাগুরি হাত নেড়ে উহা সমর্থন করলেন ও বললেন ইহা সত্য। আবার যখন পাঠ হলো, 'ত্রেতাযুগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের মধ্যে যে বৈষ্ণব, শৈব ও গাণপত্য সাধন ও শাস্ত্র রাজা ঋষভ, কুবের ও শুক্রাচার্য্য প্রকাশ করেছিলেন, তখনও তিনি হাত নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এই ভাবে আমাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্র সূক্ষ্মদেহী মুনিঋষি ও দেবদেবীদের কাছে প্রাপ্ত ও লিখিত। পাঠান্তে আমরা তাঁকে সভক্তি প্রণাম করতে তিনি মন্দিরে গিয়ে আমার আসনে বসলেন। মহাগৌরী সন্ধ্যায় তাঁর নামে মন্দিরে বাতি জ্বালিলেন এবং ঠাকুরকে রাত্রে পায়স নিবেদন করে ভাগুরিকে আহ্বান করলেন। তখন ভাগুরি এসে পায়স গ্রহণ করলেন। রাত্রি পৌনে এগারটায় আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়েছি। এমন সময় তন্দ্রাবিষ্ট হয়ে দেখলাম, পূর্বোক্ত ভাগুরি আমার শয্যায় এসে বসলেন ও বললেন, "তুমি সাধনে বসে যাও। তোমাকে সর্বদিকে আমি রক্ষা করবো, যাতে মঙ্গল গ্রহাদি তোমার সাধনে বাধা দিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করবো।" যখন সাধক চরম ইষ্টসিদ্ধি লাভ করে, তখন

ইষ্টদেবতা স্বয়ং বা সিদ্ধ মুনিঋষিগণ এসে তাঁহাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন। ভাণ্ডরির চেহারা—দুধে আলতা মিশান রঙ, প্রায় নয় দশ হাত লম্বা, বিশাল বপুঃ, মাথায় তাম্রবর্ণ জটা, রক্তবস্ত্র পরিহিত, গলায় হাতে রুদ্রাক্ষ, হাতে প্রবালের জপমালা। মঙ্গল গ্রহরোষে আমি এখন পড়েছি বলে তিনি প্রবালের জপমালা হাতে নিয়ে আমাকে জানালেন, আমি প্রবাল ধারণ বা প্রবালের মালায় জপ করলে গ্রহশান্তি হবে। ভাণ্ডরি মার্কণ্ডেয় মুনির শিষ্য ও মুনিবংশসম্ভূত। দেবী ভাগবতে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভাণ্ডরির কাহিনী উল্লিখিত। ২১ শে বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে আমি ও মহাগৌরী আমার শয্যায় বসে সদ্যপ্রাপ্ত চিঠিগুলি পড়ছিলাম। তখন কোন কারণে আমি ক্রোধান্বিত হয়েছিলাম। এমন সময় ভাণ্ডরি এসে আমার খাটের পাশে ছদ্মবেশে দাঁড়ালেন ও তাঁর সান্নিধ্যে আমার ক্রোধ সত্বর কমে গেল।

১৭ই রবিবার রাত্রি দশটায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে খাটের পাশে আমি একটী দীর্ঘকায় দিব্যদেহীকে দেখলাম। ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, "ইনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য। ইনি সর্বপ্রথম গাণপত্য সাধন প্রচার করেন। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন। কুবের প্রথমে শিবসাধনে সিদ্ধিলাভ করেন। তাই তিনি শিবের ভাণ্ডারী। ইনি রাবণের ভ্রাতা ও বিশ্বশ্রবার পুত্র। কুবেরের কাছেই পুষ্পক রথ ছিল। শিবভক্ত বলে তাঁর অহংকার হওয়ায় শিবই রাবণকে দিয়ে তার দর্পচূর্ণ করে পুষ্পক রথ কেড়ে নিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মাত্র দুটী পুষ্পক বিমান আছে—একটী কুবেরের ও অন্যটী ইন্দ্রের। সম্প্রতি আমি গণপতির আরাধনা আরম্ভ করেছি বলে শুক্রাচার্য্য আমাকে প্রেরণা দিতে এসেছিলেন। গণপতি সাধনে অষ্টাদশ স্তর আছে এবং শুক্রাচার্য্য ভৈরবানন্দকে এই অষ্টাদশাক্ষর গণেশমন্ত্র দিয়েছেন—ওঁ গং সর্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ নমঃ। গণেশ দেবতার প্রণাম মন্ত্র একটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

যতো বুদ্ধিরজ্ঞাননাশো মুমুক্ষোর্যতঃ সম্পদো ভক্তসন্তোষিকা স্যুঃ।
যতো বিঘ্ননাশো যতঃ কার্য্যসিদ্ধিঃ সদা তং গণেশং নমামঃ ভজামোঃ॥

৬ঠা সোমবার দুপুরে আহারান্তে বেলা একটায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিত নয়নে আমি দেখলাম, পদ্মমধ্যে বিন্দুগর্ভ ষট্‌কোণ। ইহা সমুজ্জ্বল ও কেন্দ্রস্থলে বিন্দুটী বিদ্যুৎবৎ জ্যোতির্ময়। যোগীবর ভৈরবানন্দ বলেন, এটী অনাহত মহাপদ্ম। তন্মধ্যে জ্যোতির্ময় বিন্দু শিবলিঙ্গ। একমাত্র হৃৎপদ্মে ষট্‌কোণ অবস্থিত। এটী আমার ইষ্টদেবী আমাকে দেখালেন। পূর্বে প্রদর্শিত সহস্রারে কৃষ্ণবর্ণ পরম শিবলিঙ্গ উক্তরূপ জ্যোতির্লিঙ্গরূপে ধ্যেয়। চিত্তশুদ্ধি বা ইষ্টসিদ্ধি লাভ হলে মনই গুরু হয় এবং ইষ্টই উক্ত প্রকারে সাধকের গুরুরূপে সাধন করান এবং ক্রমিক সাধনের ইঙ্গিত দেন।"

৮ই শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় আমি কাপড় কেচে ক্লান্ত হয়ে নাটমন্দিরে বেঞ্চিতে শুয়ে বিশ্রাম করছি। তখন আমি দেখলাম, একটী দেবী অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তৎসঙ্গে একটী পুরুষ দেবতাও ছিলেন। মহাগৌরীও রান্নাঘর থেকে এসে দেখলেন ঐ দুই দেবতাকে। আমি সভক্তি প্রণাম করতেই ঐ দেবী আমার কোলের কাছে এগিয়ে এলেন। আমাদের অনুরোধে তাঁরা মন্দিরের বারান্দায় গেলেন, কিন্তু মন্দিরে ঢুকলেন না। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "ইনি শত্রুঘ্ন চৌধুরী ও তৎপত্নী রমাদেবী, যাঁরা চব্বিশপরগণায় যথাক্রমে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর অংশে ভগবান কল্কিদেবের সহচররূপে জন্মাবেন। তাঁরা তাঁদের সুদর্শন দেবমূর্তি বা আসল স্বরূপ দেখালেন।" পূর্বে তাঁরা এই মূর্তি আমাকে দেখাননি। এঁরা স্বর্গবাসী। ইন্দ্র ও শচী উভয়ই জ্ঞানী এবং মন্দিরে ঢুকতে পারেন, কিন্তু তাঁদের অংশে যাঁরা জন্মাবেন, তাঁরা মন্দিরের বারান্দা পর্য্যন্ত আসতে পারেন। এঁদের কথা মৎপ্রণীত 'কল্কি গীতা'য় উল্লিখিত।

৯ই শনিবার সকালে পৌনে এগারটার সময় আমি নাটমন্দিরে ইজি চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছি ও মহাগৌরী রান্নাঘরে আছেন। তখন

নাটমন্দিরে একটী বিরাট পুরুষ দিব্যদেহে এসে বসলেন—বড় হাণ্ডার মত তাঁর বড় মাথা, চোখ দুটী বড় বড় ডাবের মত, গাত্রবর্ণ অতি শুভ্র, হলদে কাপড় পরা, মাথায় লম্বা জটা, উপবিষ্ট অবস্থায় প্রায় ছয় হাত উচ্চ। আমি মহাগৌরীকে ডেকে বলায় তিনি মহাগৌরীর দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করতে তিনি মাথা নীচু করে গ্রহণ করলেন এবং মন্দিরে আসতে বলায় চলে গেলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ ২০শে বুধবার পূর্বাহ্নে ধর্মচক্রে তাঁকে আহ্বান করায় তিনি এলেন ও বললেন, আমি চ্যবন ঋষির পিতা। ইনি পূর্ণজ্ঞানী ও সত্যযুগের মানুষ। ভৈরবানন্দ তাঁকে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি নাম বললেন না, চলে গেলেন। ইনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মর্ষি ও মহাভারতে এঁর নামোল্লেখ আছে।

১২ই মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে আমি নাটমন্দিরে ইজি চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছি। একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দেখলাম, একটী শ্যামবর্ণা সূক্ষ্মদেহী প্রৌঢ়া নারী আমার কাছে এসে সংগোপনে কিছু বললেন। তাঁর হাতে গায় নানা অলংকার ও মাথায় কাপড়। তার পরই দেখলাম, একটী শুভ্রবর্ণ সহস্রদল মহাপদ্ম বিদ্যুৎবৎ শুভ্রজ্যোতির্মণ্ডিত। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "ইহা সম্পূর্ণ সহস্রার এবং ঐ প্রৌঢ়া নারী আমার ছদ্মবেশী ইষ্টদেবী। উক্ত পদ্মে সাধন করার জন্যই ইষ্টদেবী আমাকে ঐ মহাপদ্ম দেখালেন। ঐ দিন রাত্রি দশটায় একটী ঋষি এসে দক্ষিণ বারান্দায় আমার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে একটী শ্বেতপদ্ম দিলেন—আধফোটা পদ্মফুল। তার ভেতর থেকে সাদা জ্যোতিঃ নির্গত হচ্ছে, পদ্মের চার দিকে সবুজ পাতা। আমি তাঁর শুভ্র হস্ত স্পষ্টভাবে দেখলাম স্বশয্যায় শায়িত অবস্থায়। মহাগৌরী তাঁকে দেখার পর তিনি চলে গেলেন। তারপর এলেন একটী শুভ্রবর্ণা দেবীমূর্তি—বয়স্কা দোহারা চেহারা, সাদা শাড়ী পরা। তিনি এসে আমার শয্যায় বসলেন একটী প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম হাতে নিয়ে। তিনি মাতৃবৎ সস্নেহে ঐ পদ্ম আমাকে দিয়েই চলে

গেলেন। ঐদিন রাত্রি তিনটায় স্বপ্নে আমি দেখলাম, আমি কোন তীর্থস্থানে গেছি। ওখানে আমাকে এক সাধু বলছেন, পীণনাথ দর্শনে যাও। ইহার কিছুক্ষণ পরে এক ঋষি এসে আমার শয্যায় বসলেন ও আমাকে কিছু বললেন। আমি বুঝতে পারলাম, ইনি আমার আদি পিতা আরুণি মহর্ষি। ঐ রাত্রে মৎকর্তৃক পূর্বোক্ত দেবী দর্শনান্তে মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় শুয়ে দেখলেন, এক সিদ্ধ ঋষি এসে মেজেতে বীরাসনে বসে খাটে পা ঝুলিয়ে উপবিষ্ট মহাগৌরী দুই কাঁধ ধরে বলছেন, "আমিও তোমার দাদু হই। তোমাকে অখণ্ড চণ্ডীপাঠ করতে হবে।" মহাগৌরী সবিনয়ে বললেন, আমি চণ্ডী পড়তে ভাল পারি না। তিনি দাদুর মত স্নেহভরে আদর করে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই পারবে। ঐ সিদ্ধর্ষি দীর্ঘকায় ও জটাধারী এবং মেজেতে বসেই এত উঁচু হয়েছিলেন যে, খাটে বসা মহাগৌরীর কাঁধে সমান্তরাল ভাবে হাত রেখেছিলেন। তিনি অনেক ক্ষণ থেকে মহাগৌরীর সঙ্গে নানা কথা বলে চলে গেলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, ইনি ভৃগু ও এঁরই বংশে মহাগৌরী প্রথম মানব জন্ম লাভ করেন। যে ঋষি আমাকে শ্বেতপদ্ম দিলেন, তিনি আমার পূর্বজন্মের গুরু পরমানন্দ গিরি পরমহংসও সম্প্রতি এই মন্দিরে বিরাজ করছেন এবং যে দেবীমূর্তি এসে আমার শয্যায় বসে আমাকে শ্বেতপদ্ম দিলেন, তিনি আমার ইষ্টদেবী। পরমানন্দজী ও ইষ্টদেবী আমাকে সহস্রারের দ্বাদশ দলপদ্ম দেখালেন। যিনি আমাকে 'পীননাথ' যেতে বললেন, তিনি কোন সিদ্ধ শৈব ও আমাকে নেপালে পশুপতিনাথ শিবদর্শনে যেতে বললেন। পশুপতিনাথ বা পীননাথ লিঙ্গবৎ শ্বেতবর্ণ শিবলিঙ্গ। সম্প্রতি আমি পরমশিবের সাধনা করছি বলে তিনি আমাকে পশুপতিনাথ দর্শনে যেতে বললেন মহাগৌরীর সঙ্গে।

যে ঋষি এসে আমাকে উক্ত তীর্থে যেতে নিষেধ করলেন, তিনি আমার আদি পিতা মহর্ষি আরুণি। পূর্বদিন 'কল্কিগীতা' বেরিয়েছে।

তাই অদ্য রাত্রে মহাগৌরী দেখলেন, নানা ঊর্দ্ধ লোক থেকে সিদ্ধ ঋষিবৃন্দ ও সিদ্ধা সাধিকারা হাতে কিছু উপহার নিয়ে আমাকে অভিনন্দিত করতে এসেছেন। তাঁরা আকাশ থেকে ভিড় করে মন্দিরের বারান্দায় নামছেন। আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এঁরা কে ও কেন এসেছেন? মহাগৌরী তাঁদের কথা শুনে ও কাজ দেখে বললেন, এঁরা সব 'কল্কিগীতা' প্রকাশের জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে এসেছেন! প্রায় দুই তিন ঘণ্টা মহাগৌরী সিদ্ধ ঋষি ও ঋষিকাদের আগমন ও অভিনন্দন দেখলেন। 'কল্কিগীতা' প্রকাশের জন্য সপ্তস্বর্গে সাড়া পড়েছে; কিন্তু হায়! মর্ত্যলোকে এখনও সাড়া পড়েনি!

২১শে বৃহস্পতিবার বৈকালে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে হালিসহরের সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদের কথা আলোচনা করছিলাম। তখন কালীভক্ত রামপ্রসাদ এলেন। ভৈরবানন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি স্থূলদেহে সাধন শেষ করেননি কেন? রামপ্রসাদ ঊর্দ্ধে হাত তুলে ইসারায় উত্তর দিলেন, দেহান্তে উপরে গিয়ে সাধন শেষ করেছি। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, রামপ্রসাদ বিদেহ মুক্তি লাভ করে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছেন এবং তাঁর গুরু কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্বর্গলোকের সত্ত্বস্তরে বাস করেন। ২২শে শুক্রবার সকালে আমরা মন্দিরে নামকীর্ত্তনান্তে সমবেত চণ্ডীপাঠের আয়োজন করছি। এমন সময়ে চণ্ডিকাদেবী সত্ত্বমূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। আমি তাঁকে দেখে বারান্দাস্থ মহাগৌরীকে ডেকে বললাম এবং মহাগৌরী একতলায় ভৈরবানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন বাবা, মন্দিরে ইনি কোন্ দেবী এসেছেন? ভৈরবানন্দজীও বললেন, উনি সত্ত্বমূর্তি চণ্ডীদেবী। মহাগৌরী শ্রীশ্রীচণ্ডীর তৃতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঠ করলেন। তাঁর সুষুম্না নাড়ীতে এই চণ্ডীপাঠ ঝংকৃত হয়ে চণ্ডিকাকে প্রসন্না করল। অনন্তর আমরা একটি মাতৃসংগীত প্রাণ ঢেলে গাইলাম—দেহি দেবি দরশন। ভক্তের কাতর আহ্বানে এলেন

শেষবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা—শুভ্রবর্ণা নিরাভরণা, শুভ্রবস্ত্রা মাতৃমূর্তি। এমন স্নেহময়ী শুভ্রবর্ণ মাতৃমূর্তি চর্মচক্ষে কখনো দেখিনি। তিনি এসে আমাকে কাণে কাণে বললেন, "বাবা, প্রেষমন্ত্র মূলধারে থেকে ষট্চক্রে ধ্বনিত করে সহস্রারে লয় কর। মূলাধার থেকে মণিপুরে, মণিপুর থেকে হৃৎপদ্মে ও হৃৎপদ্ম থেকে আজ্ঞাচক্রে যথাক্রমে ভূঃ, ভুবঃ ও স্ব তত্ত্বত্রয় লয় করে নিরাকার জ্যোতির্ময় ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হও। তাহলে মোক্ষ পাবে।" আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম ও মানসপূজাদি করার পর আমার প্রার্থনায় গোপালজী ব্রহ্মবিদ্যাকে সূক্ষ্ম পূজাদি করে দিব্য মিষ্টি খাওয়ালেন। তখন ব্রহ্মবিদ্যা আমাকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হলেন। ব্রহ্মবিদ্যার আশীর্বাদ ব্যতীত মোক্ষলাভ অসম্ভব।

২২শে শুক্রবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বেলা প্রায় একটায় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে পায়খানায় গেলাম। তখন স্নেহের কন্যা কৌমারী আমার বাম কাঁধে চড়ে পায়খানা পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন ও আমাকে দেখা দিয়ে ফিরে এলেন। মহাগৌরীও মন্দিরের বারান্দায় বসে তাঁকে দেখেছিলেন। সকাল থেকে আমি কর্মব্যস্ত থাকায় কৌমারী আমার কাঁধে চড়ার সুযোগ পান নি। তাই তিনি এই সামান্য সুযোগে আমার কাঁধে চড়ে একটু বেড়িয়ে এলেন। নরশিশুবৎ দেবশিশুও ক্রীড়াপ্রিয়। ২৩শে শনিবার কুয়াতলায় স্নানকালে শুভ্রবর্ণা সত্ত্বমূর্তি ইষ্টদেবীকে আমি দেখলাম। স্নানান্তে পূজাকালে মন্দিরে মস্তকে জ্যোতিমণ্ডিত ইষ্টদেবী ও সারদা দেবী প্রভৃতিকে আমি দেখলাম। সন্ধ্যা পাঁচটায় রাজেন শেঠ লেনে আমি ও মহাগৌরী বেড়াবার সময় দেখলাম, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পূর্ণমূর্তিতে আমাদের সঙ্গে চলছেন। ২৫শে সোমবার শেষ রাত্রে মহাগৌরী ধর্মচক্রে স্বীয় শয্যায় শুয়ে দেখছেন, নবদ্বীপে একটা বড় খোলা মাঠে কল্কিযুদ্ধের প্রস্তুতি হচ্ছে ও স্বাস্থ্যবান বাঙ্গালী যুবকরা কৃত্রিম যুদ্ধশিক্ষা করেছেন ও ব্রাহ্মণ কুমারী বিষ্ণুপ্রিয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীবৎ আহত সৈন্যদের পরিদর্শন করছেন। একটা মুসলমান গুপ্তচরকে ধরে

আছাড় মারা হল ও তার মৃতদেহকে একটী মেয়ে ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে ফেলে দিল। সকাল পাঁচটায় আমরা দক্ষিণ বারান্দায় খাটে বসে এই সব কথা বলছিলাম। তখন কল্কিপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন ও উক্ত দর্শন সত্য হবে বলে জানালেন। মনে হয়, কল্কিযুদ্ধের পূর্বাভাস এইরূপে মহাগৌরী স্বচক্ষে দেখবেন।

২৬শে মঙ্গলবারে ভোরে চা খাবার পূর্বে আমি স্বীয় শয্যায় বসে বগলা দেবীর ধ্যানান্তে মাতঙ্গী মন্ত্রজপ করছিলাম। তখন মাতঙ্গী দেবী আমার ডান দিকে জ্যোতিঃঘন বিদ্যুৎবর্ণ শিবলিঙ্গ দেখিয়ে জ্যোতির্ময় পরম শিবধ্যানে মগ্ন হতে বললেন। তন্মুহূর্তে আমি দেখলাম, আমার ব্রহ্মতালুতে বিদ্যুৎবৎ জ্যোতির্ময় সহস্রারে জ্যোতির্ময় পরমশিব বিরাজিত। এই দিব্যদর্শন বহু ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল। সকাল ৮॥০ টায় আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী তিনজন মন্দিরের বারান্দায় বসে মহালয়া মহোৎসবের দ্রব্য-তালিকা করছিলাম। তখন ব্রহ্মর্ষি ভাগুরি এসে টেবিলের উপর বসলেন ও আমাকে বললেন, মহালয়া দিবসে চণ্ডীপূজাকালে ৺মাকে বিশেষার্ঘ্য দিও। আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম করতে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। বলা বাহুল্য, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী সুপুরুষ ভাগুরিকে দেখলেন। আহারান্তে আমি ও মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় খাটে বসে নানা কথা আলোচনা করছিলাম। তখন ইষ্টদেবী জ্যোতির্মণ্ডিত মস্তকে এসে জানালেন, এই মূর্তিতে প্রায়ই তিনি আমাকে দর্শন দেন। অনন্তর সিদ্ধিদাতা গণেশ ঠাকুর এসে মা কালীর পাছে দাঁড়ালেন।

২৭শে বুধবার প্রাতে ভৈরবানন্দ, মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া প্রভৃতির সঙ্গে আমি শ্রীরামপুর যাত্রা করলাম। লিলুয়া স্টেশনে ইলেকট্রিক ট্রেণের অপেক্ষায় বসে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছিলাম। তখন নিত্যানন্দ প্রভু সস্ত্রীক এসে আমাদের সামনে শূন্যে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের

সঙ্গে শ্রীরামপুরে রাধাবল্লভ মন্দির দর্শনে চললেন। আমরা শ্রীরামপুরে পৌঁছে রাধাবল্লভ মন্দিরে গেলাম। যখন আমরা মন্দিরের ফটক পার হচ্ছি, তখন রাধাকৃষ্ণ আংশিক সত্ত্বায় মন্দিরের প্রধান দরজায় আমাদিগকে অভ্যর্থনা করার জন্য বাহিরে এলেন। আমরা মন্দিরে দেবতা দর্শনে গেলাম। মহাগৌরী প্রধান দরজার সামনে যেতেই রাধাকৃষ্ণ উভয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করতে তিনি দাঁড়িয়েই বাহ্যজ্ঞানশূন্য হলেন। ভৈরবানন্দজী রাধাকৃষ্ণের সত্ত্বাকে আহ্বান করলেন। রাধাকৃষ্ণ উভয়ে পূর্ণ সত্ত্বায় আবির্ভূত হবার পর আমরা স্তবস্তুতি করলাম। তাঁরা উভয়ে পূর্ণজ্ঞানী ভৈরবানন্দকে প্রণাম করতে ও পাদপদ্মের তুলসীচন্দন খেতে নিষেধ করলেন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে মানুষ পরম দেবতা হন, নর নারায়ণো ভবেৎ। কারণ, বর্তমানে ওখানে পূজাদি ঠিক ভাবে হয় না। তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংসকে দেবতারাও সম্মান করেন। মন্দির প্রদক্ষিণান্তে আমি কিছুক্ষণ জপধ্যান করিলাম। একটু পরে মহাগৌরী এসে আমার পাশে বসলেন। তখন রাধাকৃষ্ণ উভয়ে আমার মাথায় স্বীয় মুকুট খুলে পরিয়ে দিলেন। এই দিব্য মুকুট শুভ্রজ্যোতিঃ নির্গত হচ্ছিল। এই মুকুট স্বমস্তকে অনুভব করে আমি ভাবাবিষ্ট হলাম। অনন্তর আমরা বাহিরে এসে দেখলাম, মন্দির গাত্রস্থ ফলকে লিখিত আছে, ১৪৩০ শকাব্দে এই মন্দির রুদ্ররাম ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ভক্তবর রুদ্ররাম ১৪৫১ শকাব্দে বৃন্দাবনে যান ও বিশ বর্ষ বৃন্দাবন বাসান্তে ২৩ শে ফাল্গুন শুক্লা দ্বাদশীতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন ১৪৭১ শকাব্দে। ইতিমধ্যে ঋষিলোকবাসী রুদ্ররাম মন্দিরে এসেছিলেন। যখন আমরা মন্দির প্রতিষ্ঠার সন-তারিখ পড়ে লিখছি, তখন তিনি সম্মুখে এলেন ও জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, আমি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রুদ্ররাম। ব্রহ্মচারী রুদ্ররাম ভৈরবানন্দের পায় মাথা রেখে প্রণাম করলেন ও মহাগৌরীর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। অনন্তর আমরা গঙ্গাদর্শনে গেলাম।

যখন আমরা ষষ্ঠীতলায় রামকৃষ্ণ আশ্রমে যাইতেছি, সেই সময় অদূরে গঙ্গাতীরে সাত আটটী বহু পুরাতন শিবমন্দিরের চূড়া দেখলাম এবং তদুপরি শুনে প্রতাপ হাজরার সূক্ষ্ম মূর্তি। আমরা স্থানীয় লোকজনকে এই শিবমন্দিরের ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করায় কেহ কিছু বলিতে পারিল না। আমরা পুরাতন শিবমন্দিরগুলির পাশে গিয়ে দেখি, বারটী শিব মন্দিরের মধ্যে আটটী দাঁড়িয়ে আছে ও চারটী ভেঙ্গে গেছে ও কোন মন্দিরে শিবলিঙ্গ নাই। অবশিষ্ট আট মন্দিরে উদ্বাস্তুগণ বাস করছে। দ্বাদশ মন্দিরের সম্মুখে একটী পুরাতন গঙ্গাঘাট আছে। ভৈরবানন্দ দেখলেন, ঐ ঘাটের কাছে প্রতাপ হাজরা ও ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সূক্ষ্ম দেহ ও যোগদৃষ্টিতে জানলেন, চতুর্থ মন্দিরের সম্মুখে বিল্ববৃক্ষমূলে পঞ্চমুণ্ডীর আসন বিদ্যমান এবং পূর্বজন্মে উভয়ে তথায় তান্ত্রিক সাধন করেছেন। ভৈরবানন্দ মহাগৌরীকে সঙ্গে নিয়ে বেলতলায় গিয়ে দেখলেন, ভূগর্ভে সাত হাত নীচে পঞ্চমুণ্ডীর আসন অবস্থিত—নরমুণ্ড, চণ্ডালমুণ্ড, শৃগাল মুণ্ড ও বানর মুণ্ড চার কোণে ও মধ্যে কেউটে সাপের মুণ্ড, সাপটী ফণা তুলছে ও চণ্ডালের মুণ্ড নড়ছে। ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বললেন, "আজ থেকে আড়াই শত বর্ষ পূর্বে উক্ত দ্বাদশ মন্দিরের শেষ পুরোহিত বামন শর্মা বা বামন ঋষি এই পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রতিষ্ঠা ও উহাতে সাধনপূর্বক সিদ্ধিলাভ করে ব্রহ্মজ্ঞ হন। এই সিদ্ধাসনের রক্ষাকর্তা ডাকিনী, যোগিনী, তাল, বেতাল রয়েছেন। আশা করা যায়, আর এক জন সাধক অদূর ভবিষ্যতে উক্ত আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করবেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে তথায় গিয়ে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সাধন করে পিশাচসিদ্ধ হন। তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে নৌকা করে ওখানে গিয়েছিলেন এবং ঘটস্থাপনপূর্বক সাধন করেন। জাতিস্মর মহাগৌরী কিরূপে নৌকায় এসেছিলেন ও ঘটস্থাপনপূর্বক ইষ্টপূজা করছিলেন, তাহা দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন'। ভূগর্ভে সাত হাত নিম্নে অবস্থিত আসন দর্শনকে যোগশাস্ত্রে

পাতালসিদ্ধি বলে। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসার পূর্বে সুযোগ্য সাধক প্রতিষ্ঠাতাকে আহ্বানপূর্বক তাঁর অনুমতি নিয়ে প্রথমে তাঁকে ও পরে তাঁর ইষ্টকে পূজা করেন। অনন্তর তাল বেতাল, দশদিকপাল, ডাকিনী-যোগিনী, অষ্ট ভৈরব-ভৈরবী অষ্ট নায়িকা, চামুণ্ডা, রুদ্রচামুণ্ডা প্রভৃতির পূজা করে আসনে বসতে হয়। নিজে আসন প্রতিষ্ঠা করলে শুধু ইষ্টপূজা করতে হয়। শিবমন্দিরাদি দর্শনান্তে কোন ভক্তগৃহে আহার কালে আমরা দেখলাম, ইষ্টদেবী পরিচারিকা সহ আবির্ভূত হলেন। সন্ধ্যায় আমরা শ্রীরামপুর থেকে ফিরে লিলুয়া স্টেশনে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তখন দেখা গেল, তথায় একটী ভিখারী অন্ধ বুড়ীর হাত ধরে করুণ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম গেয়ে ভিক্ষা করছে। ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বললেন, এই দুই ভিক্ষুক পূর্বজন্মে সঙ্গতিপন্ন ধনশালী গৃহস্থ ছিলেন, কিন্তু এই মাতা-পুত্র গত জন্মে অনেক অশাস্ত্রীয় অনাচার করেছেন ও বহু অন্ন নষ্ট করেছেন, কিন্তু মানুষকে অন্ন দেন নাই। তাই এই জন্মে অন্ধ মায়ের হাত ধরে মানুষের কাছে হাত পেতে অন্নভিক্ষা করতে হচ্ছে। গত জন্মে তারা ভগবান্‌কে আদৌ ডাকেনি বলে এই জন্মে অন্নের জন্য অবিরাম ঈশ্বরকে ডাকতে হচ্ছে। পর জন্মে ইহারা আবার উচ্চবংশে জন্মাবে। এইরূপে ভগবান দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে মানুষকে উর্দ্ধ পথে পরিচালন করেন। কর্মবাদের কি ভয়াবহ পরিণাম! ধর্মচক্রে ফেরার পর আমিও মহাগৌরী মন্দিরের বারান্দায় বসে বিশ্রামকালে দেখলাম, আমার ইষ্টদেবী সহাস্য বদনে আবির্ভূতা ও তাঁর পশ্চাতে ব্রহ্মজ্যোতিমণ্ডল দেদীপ্যমান।

২৩শে শনিবার পূর্বাহ্নে দশটার পরে আমি ক্লান্ত হয়ে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দার উত্তর দিকে মাদুর পেতে শুয়েছিলাম; অদূরে মহাগৌরী স্বীয় খাটে বসেছিলেন। একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দেখলাম, একটী শ্যামবর্ণ দেবীমূর্তি এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। তাঁর বয়স সতের আঠার বৎসর,

কাল শাড়ী পরা, দুই হাতে সাদা ধবধবে এক এক গাছি শাঁখা। তিনি আমাকে প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত দেখালেন এবং হাত নেড়ে কিছু বললেন। তাঁর দুই হাতে দুটি শাঁখা চাঁদের মত ঝকঝক করছিল। মহাগৌরীও তাঁকে দেখলেন। তিনি প্রায় পাঁচ মিনিট থেকে চলে গেলেন। এই দেবী শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শাঁখা কড়া ইত্যাদি অলংকার মহালয়া দিবসে চণ্ডীপূজাকালে দিতে বললেন। বৈকাল তিনটায় আমি স্বীয় শয্যায় দক্ষিণ বারান্দায় শুয়ে আছি ও আমার শরীর অসুস্থ হয়েছে। তখন আমি দেখলাম, একটী শ্যামবর্ণা শীর্ণদেহা দেবীমূর্তি এসে আমার খাটের পাশে শূন্যে বীরাসনে বসলেন ও তাঁর বাম হাত দেখালেন। ঐ হাতে চাঁদের মত সাদা এক গাছা শাঁখা ছিল। তিনি সাদা শাড়ী পরা ও তাঁর মাথায় কাপড়। তিনি আমার হাতে একটী কাল কুচকুচে (কয়লার মত) একটী ঔষধ বড়ি দিয়ে চলে গেলেন। ঐ কাল বড়ি আমার হাতের চেটোতে অনেকক্ষণ ছিল। মহাগৌরীও ঐ দেবীকে ও তৎপ্রদত্ত কাল বড়ি দেখেছেন। আমার ইষ্টদেবী শংকরী মূর্তিতে যে কালবড়ি দিলেন, তাহা আমার জ্বরাদি রোগনাশ, শরীর সুস্থ ও সাধনোপযোগী রাখার জন্য পরমৌষধ এবং সর্বৌষধি ও মহৌষধি থেকে প্রস্তুত। অনন্তর রাজবেশে একটী পুরুষ দেবতা এলেন ও আমার খাটের পাশে দাঁড়ালেন—বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ও রাজার মত পোষাকপরা, পায়ে নাগরা জুতা। তিনি আমার ডান হাত ধরে কিছু বললেন এবং প্রায় ৪।৫ মিনিট থেকে চলে গেলেন। ইনি শিবের শ্বশুর হিমালয়, শংকরীর পিতা ও আমাকে আশীর্বাদ করলেন। রাজা হিমালয় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ও দেবীলোকবাসী। হিমালয়ের পুত্র মৈনাক পর্বত। ইন্দ্র মৈনাকের এক পক্ষ ছেদন করায় মৈনাক সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হন। বৈকাল ৪॥ টায় আমি দোতালা থেকে নীচে হাতমুখ ধুতে গিয়েছিলাম। তখন কোন দেবী আমার হাতে শুভ্র জ্যোতিঃ খণ্ড (এক টুকরা চকখড়ির

মত) আমার ডান হাতের চেটোতে দিয়ে চলে গেলেন। আমি সেটী হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসার সময় মহাগৌরী সেই শ্বেত বড়ি দেখতে পেলেন। এই শ্বেত বড়ি ও পূর্বে প্রাপ্ত কাল বড়ি আমার হাতে কয়েক ঘণ্টা দেখা গেল। শ্বেত বড়ি একটী দৈব ঔষধ—হীরকচূর্ণ পূর্বোক্তা শংকরী দিলেন। ইহা বহুমূত্ররোগের মহৌষধ। রাত্রি সাড়ে নয়টায় আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে জাগ্রত অবস্থায় দেখলাম, একটী গৌরবর্ণ বিরাট পুরুষ এসে আমার খাটের পাশে দাঁড়ালেন ও ডান হাতে আমার দাড়ি ধরে আদর করে কিছু বললেন। আমি তাঁর কথা বুঝতে না পারায় তিনি সেই কথা আড়াই লাইনে লিখে দেখালেন। আমি সভক্তি প্রণাম করতে কয়েক মিনিট পরে তিনি চলে গেলেন। মহাগৌরীও স্বীয় শয্যায় উত্তর বারান্দায় শুয়ে তাঁকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন। তিনি যাহা আমাকে বললেন ও লিখে দেখালেন, তন্মধ্যে 'রাজা জনমেজয়…' অংশ আমি বুঝতে পারলাম। ইনি দ্বাপর যুগে আমার কোন পূর্বজন্মের পিতা গোলোকবাসী রাজা জনমেজয়। তিনি বললেন, বাবা, তুমি শাস্ত্রচর্চা ও গ্রন্থরচনা ফেলে তুমি সাধন শেষ ও মোক্ষলাভ কর। ২৪শে রবিবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে আমি ১২॥ টার সময় মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দেখলাম, একটী দিব্যদেহী সিদ্ধঋষি এসে দাঁড়ালেন ও আমাকে কিছু বললেন। তাঁর কাল গোঁফ ও দাড়ি ও মাথায় লম্বা কাল চুল, তরুণ বয়স, মুখমণ্ডল সূর্য্যবৎ ভাস্বর। ইনি ব্যাসপুত্র শুকদেব। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি শাস্ত্র ছাড়বে কেন? কদাচ শাস্ত্র ছেড়ো না। শাস্ত্র ছাড়লে কি নিয়ে থাকবে? শাস্ত্র চর্চার সঙ্গে মোক্ষ সাধন কর। কলিযুগে শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী দুর্লভ।" শুকদেব অযোনিসম্ভূত। ব্যাসদেব সৎপুত্র ব্যতীত ঊর্দ্ধগতি অসম্ভব বলে চিন্তিত হয়েছিলেন ও ভাবছিলেন, দার পরিগ্রহ করবেন কিনা? সেই সময় তিনি স্বীয় কুটীরের সম্মুখে কাঠ কাটছিলেন। তখন তিনি দেখলেন, গাছের

উপর ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চী সঙ্গমাসক্ত হয়ে রতিক্রিয়া করছে। তা দেখে ব্যাসদেবের শুক্রক্ষরণ হলো কাঠের উপর। তিনি সেই শুক্র কাষ্ঠে ঘর্ষণ করায় শুকদেবের উদ্ভব হয়। শুকদেব জ্ঞানলাভান্তে যোগবলে মহাশূন্যে উঠে দেহরক্ষা করেন। এই কথা মহাভারতে ও দেবীভাগবতে আছে। মহাভারতে আছে, শুকদেব যখন রাজা পরিক্ষিৎকে মৃত্যুশয্যায় জ্ঞানশিক্ষা দিতে আসছিলেন, তাঁর কৃষ্ণসদৃশ অঙ্গকান্তি দেখে সমাগত ঋষিবৃন্দ তাঁকে চিনলেন। ২৬শে মঙ্গলবার পূর্বাহ্নে মন্দিরের বারান্দায় বসে যোগিবর ভৈরবানন্দ শুকদেবকে আহ্বান করেন। শুকদেব মন্দিরের বারান্দায় আবির্ভূত হলেন ও আমরা তাঁকে সভক্তি প্রণাম করতে চলে গেলেন। ২৪শে রবিবার রাত্রি ৯॥টায় নৈশ আহারান্তে স্বীয় শয্যায় শুয়ে একটু তন্দ্রাবিষ্ট হয়ে আমি দেখলাম, একটী শ্যামবর্ণ শীর্ণকায় শ্বেতবস্ত্রা দেবীমূর্তি এসে আমার খাটের কাছে দাঁড়ালেন ও কোন বই খুলে দেখালেন। তাঁর দুই হাতে দুই গাছা সোণার বালা ছিল। মহাগৌরীও উত্তর বারান্দা থেকে তাঁকে দেখেছেন। ইনি আমার ইষ্টদেবী ও যোগশাস্ত্র খুলে দেখালেন, আজ্ঞাচক্রের উপর পরম শিব পর্য্যন্ত পড়ে দেখ ও ধ্যান কর। ২৫শে সোমবার সকাল ৮॥ টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় মাদুরে বসে স্নানের পূর্বে গায় তেল মাখছিলাম। তখন একটী ক্ষুদ্রকায় স্বর্গবাসী ফকির এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন। তিনি দেড় হাতের বেশী দীর্ঘ নন, শুভ্রবর্ণ, চোখ দুটী ছোট, মাথায় কাল টুপি, হাত দুটী সরু, ভ্রূদ্বয় ঝুলে পড়েছে। তিনি ডান হাত নেড়ে আমাকে কিছু বললেন ও আমি তাঁর কথা বুঝতে না পারায় বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। ২৬শে মঙ্গলবার পূর্বাহ্নে ভৈরবানন্দের আহ্বানে তিনি মন্দিরের বারান্দায় এলেন ও উর্দ্ধগতির প্রার্থনা করলেন। ২৫শে সোমবার পূর্বাহ্নে কলিকাতা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আমি ও মহাগৌরী নাটমন্দিরে বসে কোন ভক্তের মোটর গাড়ীর অপেক্ষা করছি। এমন সময় তন্দ্রিত নয়নে আমি দেখলাম,

মহাদেব ক্ষুদ্রমূর্তিতে এসে আমার বাম দিকে দাঁড়িয়ে আমাকে জ্যোতির্ময় বৃহদাকার পাদদ্বয় দেখালেন। আমার সম্মুখে ইষ্টদেবী দাঁড়িয়েছিলেন। এই পাদপদ্ম আমার মানসপটে অংকিত হয়ে অনেকক্ষণ রইল। এটী সহস্রারের দ্বাদশদলস্থ গুরুপাদপদ্ম বা ইষ্টপাদদ্বয়। ইহার উপরে যে শূন্য স্থান আছে, তথায় অবস্থিত জ্যোতির্মণ্ডল ধ্যান করে যাত্রা করলে কার্য-সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। আধ ঘণ্টা পরে জটাধারী শুভ্রবর্ণ সিদ্ধ ঋষি আবির্ভূত হলেন—তাঁর মাথা নাটমন্দিরের ছাদে ঠেকেছে। আমি তাঁকে প্রণাম ও প্রার্থনা করতেই তিনি আমার মাথায় ডান পা রেখে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর পাদস্পর্শে আমার শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় পুলকিত হলো। একটু পরে তিনি চলে গেলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, ইনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য ও গণেশপূজার প্রবর্তক। মধ্যরাত্রে সত্ত্বগুণী ভৈরব এসে আমার শয্যায় বসলেন—তাঁর মাথায় রুক্ষ দীর্ঘ শুভ্রজটা, লম্বা শীর্ণ তেজস্বী চেহারা। আমি তাঁকে প্রণামান্তে মহাগৌরীকে ডেকে বললাম। মহাগৌরীও তাঁকে ডাকলেন। তিনি আমার কাছে কিছুক্ষণ বসে মহাগৌরীকে দেখা দিয়ে চলে গেলেন। ভোর চারটায় আমি ও মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় খাটে বসে তাঁর কথা আলোচনা করছিলাম। তখন আবার তিনি এলেন ও আমি তাঁর পায় মাথা রেখে প্রণামান্তে প্রার্থনা করলাম, হে দেবতা, এই দেহে আমার সাধন শেষ ও সিদ্ধি লাভ হউক। তিনি স্নেহ ভরে আমার কাছে এসে আমার মাথা ধরে আদর ও আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। ইনি সত্ত্বগুণী ভৈরব, আমাকে আশীর্বাদ করতে ও বলতে এসেছিলেন, এখন থেকে অবিরাম আমার মত শিবভাবে ভাবিত হয়ে সাধন কর। ইনি মুমুক্ষু সাধকগণকে সর্বত্র প্রেরণা দিয়ে বেড়ান। কয়েক দিন যাবৎ দেখছি, আমার ইষ্টদেবী আমার কাছে প্রায় আসেন। তাঁর মাথার পেছনে লালবর্ণ জ্যোতির্মণ্ডল দেখা যায়। তিনি শুভ্রবর্ণ ও তৎপশ্চাতে ব্রহ্মজ্যোতির মহামণ্ডল। প্রায়ই

দেখি, আমার ইষ্টদেবী স্বর্ণবর্ণ মাতৃমূর্তিতে এসে আমার শয্যায় বসেন ও তাঁর দুই হাতে দুই গাছি সোণার কঙ্কণ দেখা যায়।

২৮ শে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজেন শেঠ লেনে ভ্রমণকালে আমি ও মহাগৌরী সন্ন্যাসিনী শিবপ্রিয়ার কথা বলিতেছিলাম। আমি তাকে দুই গাছি সোণার বালা গড়িয়ে হাতে পরতে বলেছি। তখন শ্রীমা সারদা আমাদের সম্মুখে পূর্ণমূর্তিতে আকাশে আবির্ভূত হয়ে আমার প্রস্তাব সমর্থন করলেন। শিবপ্রিয়া পূর্বজন্মে গোলাপসুন্দরীরূপে শ্রীমার সেবিকা ও সঙ্গিনী ছিলেন বলে শ্রীমা তাকে স্নেহ করেন।

৩০ শে শনিবার সকালে মন্দিরে নামকীর্তনান্তে আমি ইষ্টধ্যানে মগ্ন ছিলাম। তখন আমি দেখলাম, মন্দির মধ্যে সৌম্যমূর্তি সুশান্তবদন কমলনয়ন ভাণ্ডরী—যাঁকে মহামুনি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বলেছিলেন—আমার সম্মুখে এসে বসে আমাকে প্রেরণা দিতেছিলেন। ইনি আমাকে সম্প্রতি অভয় দিয়েছেন, তিনি আমার মোক্ষসাধনে সহায়ক হবেন। তাই তিনি আমার সাধন সময়ে আসেন ও আমাকে আকস্মিক উপদ্রব থেকে রক্ষা করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে, অবধূতের চব্বিশ গুরু ছিলেন। এতদিন ইহার যথার্থ গ্রহণে অসমর্থ মর্ম ছিলাম। এখন নিজ জীবনে দেখিতেছি, ভাণ্ডরি, দধীচি, তোতাপুরী, আরুণি, মার্কণ্ডেয়, লোমশ, চ্যবন, বিভাণ্ডক, কাত্যায়ন, অষ্টাবক্র, শুকদেব, মেধাতিথি, অগ্নিবাহু, ব্যাসদেব, পরমানন্দ গিরি পরমহংস, পরীক্ষিৎপুত্র রাজর্ষি জনমেজয়, হিমালয়, বিশ্ববসু, পাণিনি কর্দম, চ্যবনপিতা ভৃগুমুনি, পুত্র, জহ্নু, অরিষ্টনেমি, মহাপুরুষজী শিবানন্দ, মাতঙ্গ ও তত্ত্বদর্শী—এই ছাব্বিশজন সিদ্ধ ঋষি আমাকে গুরুরূপে অসীম অভয় ও আশীর্বাদ দিয়াছেন। সকাল দশটায় যখন মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় বসে মিছরির পানা খাচ্ছিলেন, তখন সিদ্ধেশ্বরী ভৈরবী সূক্ষ্মদেহে এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন। বেলা এগারটায় আমি নীচে আমাদের পাচিকার সঙ্গে গ্রাম্য কথা

বলছিলাম, তখন দীপ্তিমতী ইষ্টদেবী পূর্ণমূর্তিতে আবির্ভূত হলেন ও আমার মনকে উর্দ্ধমুখী করে দিলেন। আজ আরও দুইবার তিনি আমাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করেছেন ও জানাচ্ছেন, তিনি সর্বদা আমার হাত ধরে আছেন ও জননীবৎ সঙ্গে থাকেন ও আমাকে মোক্ষধামে নিয়ে চলেছেন।

২৬ শে মঙ্গলবার ভৈরবানন্দ ও শিবপ্রিয়া ধর্মচক্রে এলেন। কথা প্রসঙ্গে শিবপ্রিয়া বললেন—আমি ধ্যানে বসলে একটী উজ্জ্বলবর্ণ সাধুমূর্তি কয়েক দিন যাবৎ দেখছি। আমি অনুভব করি, তিনি আমাকে আকর্ষণ করছেন। ঐ সাধুকে কালীঘাট শ্মশানে দেখেছি এবং ডায়মণ্ড হারবারের পরে কাকদ্বীপের কাছে তাঁর বৃহৎ আশ্রম আছে। তিনি পাঞ্জাবী উদাসী বয়স্ক বৈষ্ণব সাধু এবং স্নেহভরে তাঁর আশ্রমে যেতে আমাকে সাদর আহ্বান করেছিলেন। এই কথা ভৈরবানন্দকে বলায় তিনি যোগবলে জেনে বললেন, ঐ সাধু শিবপ্রিয়ার প্রতি সম্মোহন শক্তি প্রয়োগ করে টানছেন। ঐ সাধুর মন সপ্তম ভূমিতে উঠেছে ও তিনি বিদেহ মুক্তিমার্গের সাধক। ভৈরবানন্দ রাত্রি দশটায় ঐ সাধুর সূক্ষ্মদেহকে টেনে আনলেন ও তাঁকে তিরস্কার করলেন, এই সন্ন্যাসিনীকে টানছ কেন? তিনি ভৈরবানন্দের পায় মাথা দিয়ে প্রণামপূর্বক ক্ষমা ভিক্ষা করতে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। মধ্যরাত্রে ঐ সাধু ক্রুদ্ধ হয়ে শূল ছেড়েছিলেন আমাদিগকে আঘাত করার জন্য। তখন ভৈরবানন্দ ভৈরবস্বরূপে সূক্ষ্মদেহে তাঁর কাছে গিয়ে স্বীয় শূলে তাঁকে আঘাত করতে উদ্যত হলেন। তখন উদাসী সাধক ক্ষমা চেয়ে বললেন, 'বাবা, কোসুর হো গয়া। মাফ কিজীয়ে।' তখন ভৈরবানন্দ তাঁকে ক্ষমা করে ফিরে এলেন। তৎপরে শিবপ্রিয়া ধ্যানে বা স্বপ্নে ঐ সাধুকে আর দেখেন না বা তাঁর আকর্ষণ অনুভব করেন না।

৩০ শে শনিবার বৈকাল চারটায় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে আহত অন্তরে ভাবছি, সদ্যপ্রকাশিত 'কল্কিগীতা'র প্রতিকূ

সমালোচনা কেন হচ্ছে? তখন একটি স্বর্গবাসী পণ্ডিত সস্ত্রীক আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। ঐ স্বর্গবাসীর মাথায়, দাড়িতে ও গোঁফে কাল চুল, সাদা কাপড় পরা ও গায়ে সাদা উত্তরীয় তৎসহ নারী ও সাদা সাড়ী পরা। তিনি শূন্যে দাঁড়িয়ে প্রথমে লিখলেন—৺৶০ আনা। আমি তাঁকে দেখে শ্রদ্ধা জানিয়ে মহাগৌরীকে বললাম। তখন তিনি কিছু লিখে দেখালেন। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, ঐ স্বর্গবাসী পণ্ডিতের নাম রামলাল বাগচি। তিনি আমাকে বললেন, "আপনি শাস্ত্র লেখা ছাড়বেন না। আপনার দ্বারা যে দিব্য কর্মের শুভ সূচনা হবে, তার চৌদ্দ আনা বাকী, মাত্র দুই আনা হয়েছে।"

৩০ শে শনিবার সন্ধ্যায় মন্দিরে আমি জপধ্যানকালে দেখলাম, ব্রহ্মর্ষি ভাণ্ডুকি আমার সম্মুখে এসে বসলেন এবং আমি যতক্ষণ জপধ্যান করলাম, ততক্ষণ রইলেন। পূর্বদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি প্রত্যহ আমার মোক্ষসাধনে প্রেরণা দিতে আসেন।

—পনের—

বিবিধ প্রসঙ্গ

তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ তাত্ত্বিক প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞগণ কোন লোকে বাস করেন না, তাঁরা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে থাকেন ও ভক্তের আহ্বানে যে কোন মূর্তিতে বা অবস্থায় দেখা দিতে পারেন। বিদেহমুক্তগণ ব্রহ্মজ্যোতিঃলোকে বাস করেন ও ভক্তের আহ্বানে পূর্বমূর্তিতে দেখা দেন, এবং স্থূলদেহে যে সাধনে সিদ্ধ হয়েছেন, সেইটুকু সম্বন্ধে সাধককে সাহায্য করিতে পারেন, তদধিক সাহায্য প্রদানে অক্ষম। আর 'পরমহংস' জীবন্মুক্তগণ সর্বাধিক শক্তি প্রয়োগ বা সাহায্য প্রদানে সমর্থ।"

দশাবতার প্রসঙ্গে স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "হংসাবতার আদি অবতার। এই কথা মহাভারতে ও বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত। এই হংসডিম্ব থেকে বিশ্বের উৎপত্তি বলে বিশ্বের নাম ব্রহ্মাণ্ড। প্রলয়ান্তে যখন পৃথিবী কারণ সলিলে নিমজ্জিত, পরমাত্মা হংসমূর্তিতে সেই সলিলে এসে সেই সলিল ও সলিলে নিমজ্জিত মেদিনী জীবের জীবনধারণোপযোগী হয়েছে কিনা জানার জন্য স্বয়ং পরমাত্মা হংসমূর্তি ধরে এই কারণ-সমুদ্রে বিচরণ করেন। এইজন্য হংসই প্রথমাবতার। অণ্ড থেকেই জীব ও বিশ্বের জন্ম। এই কারণ সলিলে হংস অণ্ড প্রসব করেন। তৎপরে মৎস্য ও তৎপরে কূর্ম অবতার হন। ইহার নিম্নোক্ত বিকৃত ব্যাখ্যা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে, শ্রীরাধা হাজার বছর গর্ভধারণান্তে অসময়ে এক অণ্ড কারণ সলিলে নিক্ষেপ করেন। তাহা থেকে বিশ্বের উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধযুগে হংসের পরিবর্তে বুদ্ধ অবতাররূপে পরিগণিত হন। বস্তুতঃ হংসই পরমাত্মার প্রথম প্রাণীমূর্তি।" স্বামী ভৈরবানন্দ যোগদৃষ্টিতে জেনে বলেন, "রাম ঠাকুর, জিতেন ঠাকুর, অন্নদা ঠাকুর ও প্রভু জগবন্ধু স্বর্গবাসী। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ঋষিলোকবাসী। সন্তদাস বাবাজী বিদেহমুক্ত। হাওড়ার বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় পিতৃলোকবাসী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণের মধ্যে বিবেকানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, অঘোরমণি দেবী ও দুর্গাচরণ নাগ স্থূলদেহে জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছেন এবং অন্যান্য সকলে বিদেহমুক্ত হয়েছেন।"

৭ই ও ৮ই জানুয়ারী ১৯৬১ শনিবার ও রবিবার ধর্মচক্রে যুগাচার্য্য বিবেকানন্দের ৯৯ তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হলো। পরদিন সোমবার স্বামিজীর শুভজন্মতিথি পড়েছিল, কিন্তু সেদিন বেলুড় মঠে উৎসব হবে বলে আমরা পূর্ব দুই দিন উৎসব করলাম। আট দশ দিন পূর্ব থেকে প্রাতে মন্দিরে বিবেকানন্দ পঞ্চক ও বিবেকানন্দ সঙ্গীতাদি দ্বারা আমরা গভীর ভাবে স্বামিজীর চিন্তা করেছি। শনিবার দুপুরে মন্দিরে নিত্য

ঠাকুরপূজার সময় স্বামিজীর পৃথক পূজা ও নৈবেদ্য দেওয়া হলো। স্বামিজীকে নৈবেদ্য নিবেদিত হলে তিনি এসে আমাদের পূজাদি নিলেন এবং নৈবেদ্য নিয়ে আগে ঠাকুর, শ্রীমা ও গোপালজীকে দিয়ে পরে নিজে খেলেন ও গুরুভাইদের দিলেন। তিনি স্বয়ং প্রধান এগারজন গুরুভ্রাতাকে আলিঙ্গন করলেন। তখন গুরুভাইরা ফুলের মালা ও চন্দন দিয়ে তাঁকে সাজালেন এবং বিবিধ দিব্য ফল ও মিষ্টি এনে তাঁকে খেতে দিলেন। অন্নভোগের সঙ্গে আমরা অল্প দধি দিয়েছিলাম। সেটী গোপালজী একাই নিলেন। তাহা দেখে ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দ এক হাঁড়ি দিব্য দধি এনে ঠাকুরপ্রমুখ দেবগণকে দিলেন ও নিজেরা নিলেন। স্বামিজী গুরুভ্রাতৃবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হয়ে মন্দির আলো করে বসেছিলেন এবং গোপালজী স্বামিজীর কাঁধে প্রায় দুই ঘণ্টা বসেছিলেন, যতক্ষণ পূজা ও ভোগাদি হলো। নৈবেদ্য গ্রহণ সমাপ্ত হলে আমি স্বামিজীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলাম। তখন তিনি আমার মাথার উপর ডান পদ রেখে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। পূজার প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি আমার সামনে বসেছিলেন। তাঁর পাদ পদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে গেলে তিনি পুষ্পাঞ্জলি স্বহস্তে নিলেন। সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ নাটমন্দিরে বিবেকানন্দ স্মৃতিসভা হলো—বক্তৃতা, সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রভৃতি তিন ঘণ্টা চলিল। তখন স্বামিজী দিব্যদেহে সভামণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর দুই দিকে ঠাকুর, শ্রীমা ও মহাপুরুষজী প্রভৃতি গুরুভাইরা ছিলেন এবং গোপালজী সভার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন স্বামিজীর ইংরাজ শিষ্য মিষ্টার সেভিয়ার হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে স্বামিজীর সম্মুখে অল্প দূরে বসেছিলেন। সভাপতির বক্তৃতাকালে তাঁর ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রী তাঁর সামনে ছিলেন। রাত্রিকালে মিসেস সেভিয়ার মহাগৌরীকে দেখতে এসেছিলেন।

পরদিন রবিবার সকালে নামকীর্তনান্তে বিবেকানন্দ পঞ্চক ও বিবেকানন্দ সঙ্গীত আমরা মন্দিরে গাইলাম। দুপুরে আমি ও মহাগৌরী

মন্দিরে পূজায় বসলাম। শিবস্নানান্তে যখন মহাগৌরী শিবের আরতি করলেন ও আমি হাততালি দিয়ে শিবনাম গাইলাম, তখন শিবগৌরীকে ঘিরে নারদাদি ঋষিগণ ও দেবগণ নাচছিলেন। ঠাকুরকে গন্ধপুষ্প দেবার পর যখন মহাগৌরী দীপারতি করলেন ও আমি হাততালি দিয়ে তন্ময় হয়ে রামনাম করছিলাম, তখন রামভক্ত মহাবীর শূন্যমার্গে ক্ষিপ্রবেগে মন্দিরে এলেন ও হাততালি দিয়ে নাচতে লাগলেন। তখন তাঁর দুই চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু পড়ছিল। অনন্তর ভগবান্ কল্কিদেব প্রথমে মন্ত্রগুরু মহাগৌরীকে ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে যুক্ত করে নতশিরে আমাকে শ্রদ্ধা জানালেন। তখন স্বামিজী প্রমুখ ঠাকুরের পার্ষদগণ প্রথমে কল্কিগুরু মহাগৌরীকে ও পরে আমাকে দিব্য শ্বেত পুষ্পমাল্য গলায় পরিয়ে দিলেন। মহাগৌরীকে একটী মালা স্বামিজী পরিয়ে দিতেই মহাগৌরী সতর্ক হলেন ও আর মাল্যোপহার নিলেন না। তখন এগারজন পার্ষদ আমার গলায় এগারটী দিব্য মাল্য দিলেন। প্রথমে মালা দিলেন প্রেমানন্দ স্বামী ও তৎপরে গুরুদেব মহাপুরুষজী একটী লাল গোলাপ আমার হাতে দিলেন। তখন আমার গলায় এত পুষ্পমাল্য হলো যে, আমার মুখ-চোখ ঢেকে গেল। শুধু মহাগৌরী নয়, আমি নিজেও তাহা দেখতে পেলাম। আজও স্বামিজীকে দিব্যমাল্যে দিতে সুশোভিত দেখা গেল। ঠাকুরকে অর্ঘ্য দেবার পর স্বামিজীকে অর্ঘ্য দিতেই তিনি অর্ঘ্য মাথায় নিলেন না, হাতে নিলেন। অর্ঘ্য গ্রহণে দেবতাই অধিকারী, ব্রহ্মর্ষিও নহে। গত কালের ন্যায় আজও স্বামিজী দিব্যজ্যোতিঃ বিমণ্ডিত ছিলেন অন্যান্য গুরুভ্রাতা অপেক্ষা এবং তাঁর দিব্যজ্যোতিঃতে মন্দির আলোকিত হয়েছিল। অন্নভোগ নিবেদিত হলে শ্রীমা সারদা স্বহস্তে ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দকে মাতৃস্নেহে খাওয়ালেন। অন্নভোগের পূর্বে দুইজন দীক্ষা নিলেন। দীক্ষাকালে উভয়ের পূর্বজন্মের গুরু সূক্ষ্মদেহে এসে স্ব স্ব শিষ্যের পাশে দাঁড়ালেন। তন্মধ্যে একজনের গুরু হিন্দুস্থানী



স্বামী ভৈরবানন্দ পরমহংস

ছিলেন। অন্যের গুরু একজন সিদ্ধা সাধিকা ছিলেন। একই ইষ্টমন্ত্র উভয়কে দেওয়া হলো। তখন মহাগৌরীর মনে সন্দেহ জাগল, ইহা কি সিদ্ধমন্ত্র? তখনই জ্যোতির্ময় অক্ষরে লেখা দেখা গেল, এটা সিদ্ধমন্ত্র। বিশ্বসারতন্ত্রে ৪৯ প্রকার মন্ত্রদোষ লিখিত আছে। তন্ত্রসার ও প্রাণ-তোষণী তন্ত্রে এই সকল মন্ত্রদোষ ব্যাখ্যাত। সাধন বলে মন্ত্রদোষ নাশ করলে মন্ত্রচৈতন্য হয়। দেবতার হৃদয় থেকে সিদ্ধ গুরু যে শুদ্ধ সিদ্ধ মন্ত্র প্রাপ্ত হন, তাতে মন্ত্রদোষ স্পর্শ করে না। ভৈরবানন্দ স্থূলদেহ নীচে থেকেও সূক্ষ্মদেহে দীক্ষাকালে মন্দিরে ছিলেন। সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে হাওড়া অভয় সঙ্গীত পরিষদ বিবেকানন্দ গীতিনাট্য পরিবেশন করলেন। তখন ঐ গীতিনাট্যের রচয়িতা স্বর্গবাসী ভক্ত-কবি অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায় সূক্ষ্মদেহে গায়ক-গায়িকাদের মধ্যস্থলে দাঁড়ালেন। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি এমনভাব দেখালেন যে, তিনিই এই গীতিনাট্যের পরিচালক। সন্ধ্যার পরে মন্দিরে ঠাকুরকে লুচি হালুয়া তরকারী ঘুগ্‌নি ও মিষ্টি নিবেদন করা হলো। তখন মহাগৌরী অভয়পদকে ডাকলেন মন্দিরে এসে প্রসাদ নিতে, কিন্তু তিনি আসতে পারলেন না। দেবতাদের হাত থেকে প্রসাদ নেবার অধিকার তাঁর নাই। মন্দিরস্থ ঠাকুর, শ্রীমা ও পার্ষদবৃন্দ, গোপালজী ও বহু সূক্ষ্মদেহী বিবেকানন্দ-ভক্ত নাটমন্দিরে ছিলেন প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত। স্বামিজীই নাটমন্দিরে প্রধান ভাবে বিরাজ করলেন। গীতিনাট্যে স্বামিজীর মহিমা শুনে যখন আমি কাঁদছিলাম, তখন স্বামিজী মৎসমীপে এসে দাঁড়িয়ে আমার মাথায় দুই হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তখন আমি এই ভেবে কাঁদছিলাম— স্বামিজী, তুমি যে মিশন স্থাপন করেছিলে, তাতে আমি প্রায় পঁচিশ বৎসর প্রাণপাত করার পর ভাগ্যদোষে সংঘচ্যুত হয়েছি। আজ তুমি এখানে এসে এত কাণ্ড করছ কেন? আমার মর্মব্যথা অনুভব করে স্বামিজীর চোখে জল এল ও তিনি ছুটে এসে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে

জানালেন, এই আশ্রম ওআমারি এবং আমি এখানেও আছি। তখন স্বামিজীর চোখেও জল পড়ছিল। সভায় প্রায় তিন শত নরনারী আবিষ্ট হয়ে স্বামিজীর মর্তালীলা শুনছিলেন। আজ অন্ন ভোগের সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ এসে ব্যাসদেবকে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। নানা প্রকার রথে চড়ে দেবতারা এলেন নিবেদিত অন্নভোগ গ্রহণ করতে। দীক্ষিতদ্বয়ের ইষ্টদেবী ছিলেন মহাকালী বা মহামায়া। তিনি দশভুজা, দশপদা, ত্রিনয়না, ভয়ংকরা, কোটি সূর্য্যবৎ জ্যোতির্ময়ী, দশ হস্তে দশায়ুধ, লোলজিহ্বানন। শিবঠাকুর দ্বিভুজা মহামায়াকে কাঁধে করে এনে মন্দিরে নামিয়ে দিলেন। অনন্তর দ্বিভুজা মহামায়া দশভুজা মহাকালী মূর্তি ধারণ করলেন। তখন মন্দিরস্থ দেবগণ তাঁকে প্রণাম করলেন। দীক্ষান্তে অন্নভোগ নিবেদিত হলে মহাকালী অন্নভোগ গ্রহণ করলেন। ৯ই জানুয়ারী সোমবার স্বামিজীর ৯৯তম শুভ জন্মতিথি দিবসে সকালে আমরা মন্দিরে নামকীর্তনান্তে বিবেকানন্দ পঞ্চক ও বিবেকানন্দ সঙ্গীত গাইলাম। অনন্তর যখন আমি স্বামিজীর নামজপ করছিলাম, তখন মহাগৌরী দেখলেন, আমার হৃদয়ে স্বর্ণময় মঙ্গলঘট অবস্থিত এবং ঘটোপরি আম্রপল্লব শোভিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় মস্তক থেকে ঈষৎ গোলাপী আভাযুক্ত একটী শ্বেতপদ্ম নিয়ে ঐ স্বর্ণঘটের উপর রাখলেন। আমি ভাবে বিভোর হয়ে জলে ডুবে গেলাম। দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর পূজায় বসলাম এবং আজও স্বামিজীকে পৃথক্ নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করলাম। আজও দেখা গেল, গত পরশুবৎ গুরুভাইরা স্বামিজীকে ফুল ও মালাদি দিয়ে সাজিয়েছেন। প্রথমেই স্বামিজীকে নৈবেদ্য দেওয়া হল। তখন গুরুভাইরা সকলে এসে প্রসাদ নিলেন স্বামিজীর হাত থেকে। তখন দেখা গেল, স্বামিজীর চোখ দিয়ে জল পড়েছে! ইহার কারণ, বেলুড় মঠের মন্দিরে আজ নানা দ্রব্য নিবেদিত হওয়া সত্বেও প্রেতদৃষ্টি পড়ায় তিনি ঐ সব দ্রব্য নেননি!' স্বামি-

প্রমুখ গুরুভাইরা হাত জোড় করে ব্যাসদেবকে প্রথমেই প্রসাদ নিতে বললেন, কিন্তু ব্যাসদেব প্রথমে নিলেন না, পরেই নিলেন। অন্নভোগের সময় ঠাকুর, শ্রীমা ও পদ্মা তিনজনে অন্নব্যঞ্জনাদি বিতরণ করলেন। গোপালজী ঠাকুরের কোলে গিয়ে বসলেন ও একাই দইটুকু খেলেন। নাগমহাশয়, রাম বাবু ও বুড়ো গোপাল তিনজনেই এসেছিলেন। আজ দেবপ্রিয় মহীপাল মুচুকুন্দ এসে অন্নভোগ নিলেন। কয়েক দিন ধরে তাঁকে মন্দিরে দেখা যাচ্ছে। মুচুকুন্দ দ্বাপর যুগে কৃষ্ণদ্বেষী কালযবনকে ক্রোধানলে ভস্মীভূত করেছিলেন। তিনি কলিকাতায় নরদেহে আবির্ভূত হবেন এবং কল্কিদেবের জামাতারূপে কল্কিলীলার সহযোগী হবেন। মৎপ্রণীত 'কল্কিগীতা'য় তাঁর বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত।

•

অক্টোবর ১৯৬১

পয়লা রবিবার ভোরে আমি শয্যায় থাকাকালে দেখলাম, কৌমারী ও ইষ্টদেবী উভয়ে শয্যায় এসে বসেছেন—কৌমারীর কিশোরী মূর্তি, গোলাপী শাড়ী পরা, মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রবৎ দীপ্তিশালী এবং ইষ্টদেবীর পশ্চাতে ব্রহ্মজ্যোতির্মণ্ডল। প্রাতঃকালে মন্দিরে জপধ্যানকালে ব্রহ্মর্ষি ভাগুরি পূর্ণমূর্তিতে এসে সম্মুখে বসলেন এবং আমি যতক্ষণ জপধ্যান করলাম, ততক্ষণ রইলেন। ইহার পর এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি আরও দুই বার এলেন, যখন আমি ও মহাগৌরী শ্রীশ্রীচণ্ডীর একটী বৃহত্তর সংস্করণের কথা বলছিলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, গোপাল চক্রবর্তী কৃত চণ্ডীটীকা ও অনুবাদ সহ একটী বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশ করবো কি? তিনি সহাস্য সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আমি দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করলাম এবং তিন বারই তিনি পূর্বোক্ত প্রকারে উত্তর দিলেন। ব্রহ্মর্ষি ভাগুরি পঞ্চতত্ত্বসিদ্ধ পূর্ণজ্ঞানী ও অমৃতভোজী। সকাল ৯টায় মহাগৌরী ভৈরবানন্দকে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিতেছিলেন, মন্দিরের

পশ্চিম বারান্দায় বসে। আমি পাশে বসে তাঁকে বলিতেছিলাম, কি কি বিষয় লিখতে হবে। পত্রারম্ভে মা কালীকে দেখা গেল। পত্রশেষে লিখতে বললাম, "মা কালীকে জানাবেন, যেন আমার 'কল্কিগীতা' সারা বাংলায় প্রচারিত হয়। তখন আমরা উভয়ে দেখিলাম, মা কালী স্বর্ণবর্ণ পূর্ণমূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে আমার প্রার্থনা শুনলেন ও ডান হাত তুলে অভয় দিলেন। দুপুরে স্নানান্তে মন্দিরের বারান্দায় এসে দেখলাম, ইষ্টদেবী জ্যোৎস্নাময়ী শুভ্রমূর্তিতে সহাস্য বদনে আমাকে ইংগিত করলেন, পূজাকালে মন্দিরে ধ্যানে বসতে। পূর্বদিন দুপুরে ও তিনি আমাকে ইসারায় জানিয়েছিলেন, আজ থেকে ত্রিসন্ধ্যা ধ্যানে বসবে। বৈকালে শ্রীরামপুর থেকে তিনটি ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক এলেন এবং মন্দিরের বারান্দায় বসলেন। আমি ও মহাগৌরী তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেখলাম, তন্মধ্যে একজনের স্বর্গবাসিনী পিতামহী ও তাঁর পূর্ব জন্মের গুরুদেব সূক্ষ্মদেহে এসে পিছনে দাঁড়ালেন এবং তাঁর মৃত পিতা সূক্ষ্ম দেহে মন্দিরের বাহিরে শূন্যে থেকে আমাদিগকে দেখলেন। সমাগত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম ও সান্ধ্য ধ্যানার্থ মন্দিরে বসতে অনিচ্ছা হয়েছিল। তখন ইষ্টদেবী এসে পুনরায় দেখা দিয়ে প্রেরণা দিলেন ও আমি মন্দিরে গিয়ে ধ্যানে বসলাম। সারারাত্রি ইষ্টদেবী ও ব্রহ্মর্ষি ভাগুরি আমার শয্যায় ছিলেন, তাই নিদ্রাকালেও সুপ্তমনে ইষ্টচিন্তার ফল্গুস্রোত চলছিল। ২রা সোমবার প্রাতে আমার শরীর অসুস্থ থাকায় মন্দিরে গিয়ে ধ্যানে বসতে অনিচ্ছা হয়েছিল। তাই ভাগুরি ঠাকুর নীচ থেকে উপরে আমার সঙ্গে এলেন এবং আমি মন্দিরে গিয়ে ধ্যানে বসলাম। যতক্ষণ আমি ধ্যান করলাম, ততক্ষণ ভাগুরি আমার সামনে বসে আমার মনকে উর্দ্ধমুখী করে রাখলেন। আমি শিবভাবে সমাহিত হয়ে দেখলাম, একটি দিব্য সাপ এসে প্রথমে আমার সামনে ফণা তুলে দাঁড়াল ও পরে আমার দক্ষিণ জানুতে উঠল

তৎসঙ্গে আমার কপালে অর্ধচন্দ্র, কোমরে বাঘছাল, মাথায় জটা ও রজতগিরিনিভ গাত্রবর্ণ অনুভব করলাম। আজ সকালে মহাগৌরী বালি বাসায় গেলেন। সকাল ৯টার পরে নাটমন্দিরে ইজিচেয়ারে বসে আমি বিশ্রাম করছি। তখন তন্দ্রিত নয়নে আমি দেখলাম, আমার স্থূলদেহের মধ্য থেকে সমুজ্জ্বল সূক্ষ্মদেহ বেরিয়ে পড়ল এবং ঐ সূক্ষ্মদেহের পদদ্বয় স্পষ্টভাবে দেখলাম এবং অনুভব করলাম, এই ভৌতিক দেহের মধ্যে সূক্ষ্মদেহ বাস করে এবং ঐ সূক্ষ্মদেহই ঊর্ধ্বলোকে যায়। ৩রা মঙ্গলবার পূর্বাহ্নে মন্দিরের বারান্দায় বসে আমি একজন দ্বারা পড়িয়ে শুনিতেছিলাম, বিশেষার্ঘ্যে কি কি দ্রব্য দিতে হয়। তখন ব্রহ্মর্ষি ভাণ্ডরি আবির্ভূত হয়ে জানালেন, ঐরূপ বিশেষার্ঘ্য মহালয়া দিবসে চণ্ডীপূজাকালে দিতে হবে। আজ সারাদিনে বহুবার ইষ্টদেবীর দর্শন লাভে ধন্য হয়েছি—কখনো নাটমন্দিরে, কখনও মন্দির মধ্যে, কখনও বা মন্দিরের বারান্দায়। এতবার ইষ্টদর্শন পূর্বে কোন দিন পাই নি।

২রা সোমবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিত নয়নে দেখলাম, একটী শীর্ণকায়া দীর্ঘাকৃতি হেমবর্ণা কৃষ্ণকেশী দেবীমূর্তি এসে আমার শয্যায় বসে আমাকে সংগোপনে কিছু বললেন। তিনি যে দিব্য শাড়ী পরেছিলেন, তাহাও হেমবর্ণা। মহাগৌরী সন্ধ্যায় বালি থেকে ফেরার পর রাত্রি ৮টায় আমি দক্ষিণ বারান্দায় তাঁকে ঐ দেবীর কথা বলছিলাম। তখন সেই দেবী আবার এসে আমার বিছানায় বসলেন ও আমার গলা জড়িয়ে ধরে হাতমুখ নেড়ে স্নেহভরে কিছু বললেন। অনন্তর তিনি আমাদের প্রার্থনায় মন্দিরে গেলেন। রাত্রি নয়টায় তাঁকে মন্দিরে দেখা গেল; কিন্তু তার পরে তাঁকে আর মন্দিরে দেখা গেল না। এই হেমবর্ণা দেবীমূর্তি শেষবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা বা পরা বিদ্যা। শেষবিদ্যার স্তরে যখন সাধক উঠেন, তখন প্রথমে শেষবিদ্যার ক্ষীণমূর্তি দেখা যায়। যত সাধক সাধনায় পুষ্ট ও উন্নত হবেন, উনিও তত পুষ্টিলাভ

করবেন। শেষ বিদ্যা আমার গলা জড়িয়ে ধরে সাধন শেষ করতে বললেন। কয়েক দিবস পূর্বে ইনি মন্দিরে এসে আমাকে প্রেষমন্ত্র জপ ও ধ্যান রহস্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। ৩রা মঙ্গলবার দুপুরে আহারান্তে দক্ষিণ বারান্দায় আমার খাটে বসে মহাগৌরী আমাকে শিয়াখোলার উত্তর বাহিনীর মাহাত্ম্য পড়ে শুনালেন। তখন উত্তরবাহিনী মহাদেবী আবির্ভূত হলেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে মহাগৌরী উত্তরবাহিনীর উদ্দেশে মোমবাতি জ্বালিলেন। তখনও উত্তর বাহিনী এলেন ও আরতির পর পর্য্যন্ত রহিলেন। আগামী পরশু রবিবার বৈকালে আমরা উত্তরবাহিনী দেবীদর্শনে যাবার সংকল্প করেছিলাম বলে উত্তরবাহিনী স্বয়ং আমাদিগকে আমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন। উত্তরবাহিনী শিবাক্ষেত্র ও শিবাক্ষেত্রের অপভ্রংস শিয়া খোলা। ৪ঠা বুধবার প্রাতেঃ মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে আমি ও মহাগৌরী চা-পান করিতেছিলাম। তখন আমার ইষ্টদেবী স্নেহভরে সামনে এসে দাঁড়ালেন। আজ আরও বহু বার তাঁর পুণ্য দর্শন লাভে আমি ধন্য হয়েছি। প্রাতঃকালে মন্দিরে নামকীর্তনান্তে আমরা চণ্ডীপাঠ, দুর্গাধ্যান ও দুর্গামন্ত্রজপাদি করিলাম। তখন দুর্গাদেবী শুভ্রবর্ণা গৌরীমূর্তি ধরে সামনে দাঁড়ালেন। এমন সুষমামণ্ডিত স্নেহোজ্জ্বল জ্যোৎস্নাময়ী সুদর্শন দুর্গামূর্তি পূর্বে আমি দেখি নাই।

৫ই বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্নে আমি ও বিশ্বরূপানন্দ 'কল্কিগীতার' বিজ্ঞাপনাদি লিখিতেছিলাম। তখন ব্যাসদেব আমাদের মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে টেবিলের উপরে বসলেন ও আমার কার্য্য সমর্থন করলেন। মহাগৌরী ও উত্তর বারান্দা থেকে দিব্যদৃষ্টিতে ব্যাসদেবকে দেখলেন। প্রথমে আমি তাঁকে ভাগুরি ভেবেছিলাম। পরে তাঁর কপালে বৈষ্ণব তিলক দেখে বুঝলাম, ইনি ব্যাসদেব। তখন আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম ও বন্দনা করলাম। আমাদের কাজ শেষ হতে তিনি মন্দিরে চলে গেলেন।

৯ই সোমবার ধর্মচক্রে সপ্তম বার্ষিক মহালয়া মহোৎসব অনুষ্ঠিত হলো।

"পূর্ব রাত্রে মহাগৌরী বললেন, দাদু, ঘটস্থাপন পূর্বক চণ্ডীপূজা ও চণ্ডীপাঠ করা উচিত। সোমবার সকালে ঘটসংগ্রহ সম্ভব হলো না। সকাল ৭॥০টায় দক্ষিণ বারান্দায় আমিও মহাগৌরী দেখলাম, পদ্মাদেবী স্বর্ণঘট পঞ্চপল্লব ও কলা সহ এনে আমাকে জানালেন। আমরা চণ্ডীপূজায় বসে দেখলাম, স্বর্ণঘট সম্মুখে সংস্থাপিত। অনন্তর মহাগৌরী প্রমুখ দশজন সাধু ও ভক্ত অখণ্ড চণ্ডীপাঠ করলেন। আড়াই ঘণ্টায় চণ্ডীপাঠ সমাপ্ত হলো। ব্রহ্মর্ষি ভাগুরি সম্মুখে বসেছিলেন চণ্ডীপাঠ, চণ্ডীপূজা ও চণ্ডীহোমের সময়। মহালয়া দিবসে মার্কণ্ডেয় মুনি ভাগুরিকে এবং মেধামুনি সুরথ ও সমাধিকে চণ্ডী বলেছিলেন। ভাগুরি মহালয়াতে তৎশিষ্যবৃন্দের নিকট চণ্ডী প্রচার করেন। দ্বিতীয় বা স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ-সমাধি সমীপে এই মহালয়াতে মেধামুনি চণ্ডীপাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর তাঁরা শারদীয়া দুর্গাপূজা করেন। দুর্গাপূজার প্রকৃত ও প্রথম প্রবর্তক মেধামুনি এবং সুরথ ও সমাধি, রামচন্দ্র নহে। দুর্গাপূজান্তে মহামায়া সুরথ ও সমাধিকে বর দেন, সমাধি জ্ঞান-বর পান ও সুরথ উক্ত জন্মে হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার ও দেহত্যাগান্তে অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্নি মনুরূপে জন্মগ্রহণপূর্বক জ্ঞান লাভ করেন। অষ্টম মন্বন্তরে মার্কণ্ডেয় মুনি মহালয়া দিবসে ভাগুরিকে চণ্ডী বলেছিলেন। তাই মহালয়ার এত মাহাত্ম্য। মহালয়া থেকেই দেবীপক্ষ আরম্ভ হয়। চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীপূজাকালে আমাদের সম্মুখে মা চণ্ডিকা পূর্ণ মূর্তিতে বিরাজমান ছিলেন এবং চণ্ডীহোমে চণ্ডীদেবী বহ্নিমূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। সকাল ৮॥০ থেকে বৈকাল দুইটা পর্য্যন্ত ৫॥০ ঘণ্টায় আমাদের পূজা, পাঠ ও হোমাদি সমাপ্ত হল। মহাগৌরী চণ্ডীহোমে অষ্টোত্তর শত সাজ্য বিল্বপত্র আহুতিও তদন্তে পূর্ণাহুতি দিলেন। অখণ্ড চণ্ডীপাঠান্তে তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। তিনি গৌরীস্বরূপে সমারূঢ় হয়ে চণ্ডীপাঠ করলেন ও চণ্ডীপাঠান্তে চণ্ডিকাস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বেদোক্ত অম্ভৃণ ঋষিকন্যবাকতুল্য অনুভব করলেন—সাহম। ইহার

অর্থ, আমি সেই চণ্ডিকা। অন্ন ভোগ নিবেদনকালে দেখা গেল, ব্রহ্মজ্ঞ ভাণ্ডরি বিবিধ দিব্য আহার্য্য তাঁর ইষ্টদেবী চণ্ডিকাকে নিবেদন করলেন। পূজাকালে ভাণ্ডরি চণ্ডিকার মাথায় ও কপালে সিঁদুরের টিপ দিলেন। আমরা চণ্ডিকাকে শাঁখা ও শাড়ী নিবেদন করতে মা দয়া করে পরলেন। কোন স্ত্রীভক্ত একজোড়া শাঁখা এনেছিলেন। সেই শাঁখা দেবীকে নিবেদন করতে তিনি বললেন, অন্যকে দাও।

কয়েক দিবস পূর্বে চণ্ডিকা আমাকে দর্শন দিয়ে পূজাকালে ভাল শাঁখা নিবেদন করতে বলেছিলেন। বিশেষার্ঘ্য নিবেদিত হলে দেখা গেল, চণ্ডিকা শংখোপরি পাদস্থাপন করলেন। ভাণ্ডরি কয়েক দিবস চণ্ডীপূজাকালে বিশেষার্ঘ্য দিতে বলেছিলেন। সান্ধ্য আরতির পর নাটমন্দিরে বসে আমি মাতৃ সঙ্গীত শুনছিলাম। তখন আমি দেখলাম, মা চণ্ডিকার দিব্যহস্ত আমার সম্মুখে প্রসারিত ও উহাতে জ্যোতির্ময় সাদা ফুল। এই ঘটনা আমি মহাগৌরীকে বললাম। ভৈরবানন্দ দিব্যদৃষ্টিতে দেখে বললেন, মা চণ্ডিকা দিব্য নির্মাল্য হাতে এনে আপনার মাথায় ও বুকে বুলিয়ে আশীর্বাদ করে স্বস্থানে গেলেন। সারাদিন মন্দিরে চণ্ডিকার পূর্ণপ্রকাশ পরিলক্ষিত হল। পূর্বরাত্রে মোনবেড় গ্রামের মোহন ঘোষ স্বপ্নে দেখেছিলেন পদ্মাসনা গায়ত্রী দেবীকে; কিন্তু তাঁকে রাজলক্ষ্মী বলে ভ্রম করেছিলেন। তখন একটী সূক্ষ্মদেহী এসে তাকে তিরস্কার করে বললেন, ইনি গায়ত্রী দেবী। এই কথা ভৈরবানন্দকে বলায় আজই সিদ্ধযোগী সূক্ষ্মদেহীকে আহ্বান করলেন। অবিলম্বে ঐ সূক্ষ্মদেহী ঋষিলোক থেকে এলেন ও প্রণামান্তে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন ও বললেন, "আমি মুর্শিদাবাদের গিরিশ ভারতী ও মোহন ঘোষের পূর্বজন্মের গুরু। অধুনা আমি ঋষিলোকবাসী।" বৈষ্ণব সাধক গিরিশ ভারতীর গলায় শ্বেত পদ্মফুলের মালা ছিল এবং মহাগৌরী ও তাঁকে দেখেছেন। সোমবার শেষরাত্রে বা মঙ্গলবার ভোরে ৪॥০ টার সময় আমি দেখলাম কার্তিক

ঠাকুরকে—সাদা ধুতি পরা বালকমূর্তি, আমার শয্যায় বসেছেন। অনন্তর শায়িত অবস্থায় আমি দেখলাম, আমার ইষ্টদেবী খাটের পাশে দাঁড়িয়ে কাল পাথর বাটিতে দিব্য প্রসাদ এনে আমাকে খাওয়ালেন। আমি উহা খেয়ে তৃপ্ত ও সুস্থ বোধ করলাম। সোমবার অতিরিক্ত পরিশ্রমহেতু আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়েছিল। তাই ইষ্টদেবী এসেছিলেন—স্বর্ণবর্ণা ও তাঁর মাথায় সোণার মুকুট, সোণালী শাড়ী পরা। আজকাল প্রতিদিন বহুবার ইষ্টদেবীর চকিত দর্শন লাভ করি। আজ সকালে যখন তিনি আমাকে প্রসাদ খাওয়ালেন, তখন মহাগৌরীও তাঁকে দেখেছেন। তিনি মহাগৌরীর কাছেও প্রসাদ নিয়ে গেলেন, কিন্তু মহাগৌরী ঐ প্রসাদ খেলেন না।

১০ই মঙ্গলবার সকাল সাতটায় আমি 'দিব্যদৃষ্টি' গ্রন্থের প্রচ্ছদপট (শম্ভুশীল কর্তৃক পেন্সিলে আঁকা) মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। উহাতে অংকিত স্বাভাবিক চক্ষুদ্বয় ঠিক হয় নাই। এমন সময় ব্যাসদেব আবির্ভূত হয়ে তাঁর তিন নয়ন দেখালেন ও জানালেন, প্রচ্ছদপটে তিনটী চক্ষু কী ভাবে আঁকতে হবে। ব্যাসদেবকে আমি এত স্পষ্টভাবে কখনও দেখি নাই। সুমনোহর বিশাল নয়ন ব্যাসমূর্তি ও তাঁর ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র দেখে আমি চমৎকৃত হলাম ও তাঁকে করজোড়ে সভক্তি প্রণাম জানালাম। সকালে ও দুপুরে আমি ধ্যানে বসতে না পারায় দুইবার মহর্ষি ভাগুরি এসে আমাকে দেখা দিলেন। স্নানের পূর্বে ভ্রমণান্তে আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছি। তখন আমি দেখলাম স্পষ্ট ভাবে, আমার পূর্বজন্মের প্রথমা পত্নী স্বর্গের সপ্তস্তর বাসিনী করুণাময়ী এসে আমার পায় মাথা রেখে প্রণাম করলেন ও বললেন, আপনি ত সাধন শেষ করবেন, আর আমি! গতকাল মহালয়ায় পিতৃপক্ষ শেষ হয়েছে বলে তিনি এসে দেখা দিলেন। প্রায় পাঁচ মাস পূর্বে পয়লা জ্যৈষ্ঠ সোমবার আমার জন্মদিন প্রাতে তিনি এসে আমাকে দেখা দিয়েছিলেন। আজ তিনি এসে মাথা নীচু করে রইলেন ও সজল নয়নে মনোব্যথা

জানালেন। আমার আহ্বানে মহাগৌরীও দক্ষিণ বারান্দা থেকে এসে তাঁকে দেখলেন। পরদিন বুধবার বৈকালে আমি একাকী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে একমনে লেখাপড়া করছিলাম ও মহাগৌরী বালিতে গিয়েছিলেন। তখন স্বর্গবাসিনী করুণাময়ী এসে পূর্বদিনবৎ একই কথা বলে কাঁদতে লাগলেন। তখন আমি সজল নয়নে বললাম, "আমার সাধন শেষ হবে কিনা তা ৺মা জানেন, আমি জানি না। আর তোমার কি হবে তাও তিনিই জানেন।" ১৩ই শুক্রবার সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে এলেন ও করুণাময়ীকে আহ্বান করলেন। আমার মুখে করুণাময়ীর আবেগময় আবেদন শুনে সিদ্ধযোগী তাকে অভয় দিয়ে বললেন, "মা, তুই এখন বাবাকে আঁকড়ে ধরিস্‌নি। তাঁর সাধন শেষ হলে যাবার সময় আমি তোকেও তাঁর সঙ্গেই শেষ স্তরে পাঠিয়ে দেবো।" তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংসের মুখে এই অভয়বাণী শুনে বিষণ্ণবদনা করুণাময়ীর মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠলো ও তিনি জননীবৎ স্নেহভরে ভৈরবানন্দকে পুত্রজ্ঞানে মাথায় হাত দিয়ে দাড়ি ধরে আদর করে অন্তর্হিত হলেন। স্নানের পূর্বে উত্তর বারান্দায় মহাগৌরীর খাটের কাছে মেজেতে বসে আমি তেল মাখছিলাম। এমন সময় একটি উর্দ্ধলোকবাসী সূক্ষ্মদেহী এসে আমার দিকে বড় বড় চোখ পাকিয়ে দাঁড়ালেন। মহাগৌরী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চাও? তিনি গাঢ়লালবর্ণ বড় বড় হরফে লিখে দিলেন—দীক্ষা। মহাগৌরী তাঁকে দীক্ষা দিতে অসম্মত হওয়ায় তিনি রক্তবর্ণ ক্রুদ্ধ চক্ষু আমাকে দেখালেন। বোঝা গেল, সূক্ষ্মদেহী ও স্থূলদেহীর নিকট দীক্ষা চান।

৮ই রবিবার দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে ঠাকুর পূজা করলাম। পুষ্পশুদ্ধিকালে আমরা উভয়ে দেখলাম, পুষ্পপাত্রস্থ পুষ্পরাশির উপর একটী ক্ষুদ্রকায় দেবতা বসে আছেন—গোলাপী গাত্রবর্ণ, লাল কাপড় পরা ও গায় জড়ান, মাথায় কাল চুল, ছোট চোখ। স্বামী ভৈরবানন্দ

বললেন, ইনি পুষ্পার্ঘ্য দেবতা ও মন্ত্রপূত গন্ধপুষ্প দেবতাদিগকে দেন। আমরা দেবতাকে স্থূল দ্রব্যাদি দিই, আর তিনি সূক্ষ্মদ্রব্যাদি দেন।" প্রায় পাঁচ মাস পূর্বে মহাগৌরী দেখেছিলেন, যখন আমি মন্দিরে পূজা করছিলাম, তখন ভূতশুদ্ধিকালে আমার কুণ্ডলিনী মূলাধারোত্থিত দিব্য অগ্নি শিখা সহ উঠে কৃষ্ণবর্ণ কজ্জলপ্রভ রক্তশ্মশ্রুবিলোচন পাপ পুরুষকে বিদগ্ধ করলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বদেহস্থ পাপপুরুষ দগ্ধীভূত হতে দেখেছিলেন।

৭ই শনিবার মহাগৌরী বললেন, "গত ছয় সাত দিন আমার ক্ষুধাবোধ ছিল না, খেতে ইচ্ছা হতো না। মনে হতো, সর্বদা পেট ভরা। ইহার কারণ, অনেক সূক্ষ্মদেহী নারী বড় বড় সাদা থালায় বিবিধ মিষ্টান্ন এনে আমাকে খাওয়ালেন। তাই সর্বদা পেটভরা মনে হয় ও স্থূল খাদ্যাদি খেতে ইচ্ছা হয় না।" শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ রঘুনাথ দাসের জীবনে দেখা যায়, একবার পুরীধামে ও আর একবার বৃন্দাবনে তিনি সূক্ষ্ম দিব্য প্রসাদ খেয়ে উদর পূর্তি অনুভব করেছিলেন, এমন কি, তাঁর পেটের অসুখ হয়েছিল।

১৪ই শনিবার ভোরে আমি, ভৈরবানন্দ, মহাগৌরী ও বিশ্বরূপানন্দ শিয়াখোলায় উত্তরবাহিনী দেবীদর্শনে যাত্রা করি। ট্রেনে কালীপুর থেকে শিয়াখোলা যাবার পথে আমাদের কামরায় একটী অন্ধ ভিখারী এই গান গেয়ে যাত্রীদের কাছে পয়সা ভিক্ষা করছিল—'নেচে নেচে আয় মা শ্যামা।' স্বামী ভৈরবানন্দ ও সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী অদূরে বসে দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন—ঐ অন্ধ পূর্বজন্মে গলা টিপে খুন করে ও চক্ষুদ্বয় অন্ধ করে দিয়ে লোকের সর্বস্ব হরণ করতো বলে এই জন্মে উক্ত অসৎ কর্মফলে অন্ধ হয়ে ভিক্ষা করছে! তবে এই জন্মে ৺মায়ের নাম করে ভিক্ষা করছে বলে পর জন্মে তাদের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থা হবে। প্রায় ৯৷৷০ টায় আমরা উত্তর বাহিনী মন্দিরে গিয়ে মূর্তি দর্শন ও প্রণাম করলাম। আমি মন্দিরের সম্মুখে প্রথমে দেখলাম ঋষি বিশ্বামিত্রকে মন্দির মধ্যে—তাঁর

চোখ দুটী উজ্জ্বল ও ক্ষুদ্র ও জ্যোতিঃসম্পন্ন, মাথায় জটা, কৌপিন পরা, হাতে কাঠের কমণ্ডলু। তৎপরে ঋষি বশিষ্ঠকে মন্দির মধ্যে দেখা গেল। তাঁর নয়নযুগল বিশাল, বৃহৎ বপুঃ, হাতে কমণ্ডলু, বল্কল পরিহিত মাথায় জটা। উত্তরবাহিনী মূলতঃ স্বর্গ লোকের কুলদেবী বিশালাক্ষী—তপ্তকাঞ্চবর্ণা, খড়্গা ও মুণ্ড ও খর্পর ও অভয়মুদ্রা ধারিণী চতুর্ভূজা, সর্বালংকারে ভূষিতা, রক্ত বস্ত্র পরিহিতা সংহারিণী মূর্তি। বর্তমান দেবীমূর্তি প্রস্তরময় এবং দুইদিকে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মূর্তিদ্বয় বিদ্যমান। দেবী মূর্তির পদতলে বিষ্ণু ও মহাকাল ও অসুরমুণ্ড। যখন দানবরা ও অসুররা স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন, তখন বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহাদিগকে দমন করতে অক্ষম হন। তৎকালে মহামায়া দেবগণকে দৈববাণী করে জানান, আমাকে এই মূর্তিতে পূজা করলে তোমরা যুদ্ধে জয়ী হবে। তদনুসারে দেবতারা এই চতুর্ভূজা বিশালাক্ষীমূর্তি স্বর্গে পূজা করেন। তখন দেবী পূর্ণমূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে দেবগণকে বর দেন ও দৈত্যগণকে সংহার করেন। সেই জন্য স্বর্গলোকের কুলদেবী বিশালাক্ষীর এক পদ বিষ্ণুমস্তকে, অন্যপদ মহাকাল বক্ষে ও পদতলে অসুরমুণ্ড। মর্ত্যলোকে এই দেবীমূর্তি সর্বপ্রথম বশিষ্ঠ পূজা করে কামধেনু ও সর্বসিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। তৎপরে বিশ্বামিত্র কামধেনু লাভার্থ বশিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিশালাক্ষীর আরাধনা করেন। তাই বিশালাক্ষীর পদতলে দুইপাশে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে দেখা যায়। প্রায় সাড়ে চার শত বর্ষ পূর্বে দেবী উত্তর-বহিনীর সম্মুখে কৌষিকী নদী প্রবাহিত। তাহার পশ্চিমতীরে একটী শ্মশান অবস্থিত ছিল। সেই শ্মশানে শান্তিলাল শর্মা নামে পিতৃমাতৃ-তাড়িত এক ব্রাহ্মণ সন্তান তপস্যা করতেন। তিনি পরে সন্ন্যাস নিয়ে প্রণবানন্দ গিরি নামে অভিহিত হন। তাঁহার সাধনকালে কৌশিকী নদীগর্ভ থেকে বিশালাক্ষী দেবী প্রত্যক্ষ হন এবং বলেন, "ঐ নদী গর্তে আমার শিলামূর্তি বিদ্যমান। এই শিলা তুলে নিয়ে তুই আমার পূজা-অর্চনা

কর।" তখন প্রণবানন্দ নির্দিষ্ট স্থানে সন্ধান করে শিলাপ্রাপ্ত হন। সেই শিলা ও পূর্ব দৃষ্ট দেবীমূর্তি অনুসারে মৃণ্ময়ী প্রতিমা গঠন পূর্বক পূজাদি ও সাধন করে তিনি বিদেহমুক্তি লাভ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় দেবী পশ্চিমমুখী ছিলেন। কৌষিকী নদীতে নৌকার মাঝিরা মধুর সঙ্গীত করতে করতে যাচ্ছিল। তারা সঙ্গীত বন্ধ করায় দেবী নারীমূর্তিতে গিয়ে তাঁদের বলেন, "তোমরা গান বন্ধ করলে কেন? তোমরা পূর্ববৎ গান গাও।" সেই সময় প্রণবানন্দ স্বামী মন্দিরে এসে দেখেন, পশ্চিমমুখী দেবীমূর্তি উত্তরমুখী হয়েছেন। তখন দেবী উক্ত সাধককে আদেশ দেন, "এতদিন সাধন করে তুই বিদেহ মুক্তি স্তরে উঠেছিস্। অদ্য হতে আমি উত্তরবাহিনী নামে খ্যাত হবো। তুই পূর্বে যে বীজমন্ত্র আমার কাছে পেয়েছিলি, তাহা তোর ইষ্টমন্ত্র। আজ হতে আমার এই একাদশাক্ষর সিদ্ধ মন্ত্রে—ওঁ শ্রীশ্রীউত্তরবাহিন্যৈ নমঃ—পূজা হবে। উক্ত মন্ত্র কোন তন্ত্রে নাই। পূর্বদিন শুক্রবার রাত্রি তিনটায় স্বামী প্রণবানন্দ ধর্মচক্রে দিব্যদেহে এসে আমাকে দর্শন ও ঐ মন্ত্র লিখে দেখান। আমি রাত্রি চারটায় উঠে ঐকথা ভৈরবানন্দকে বললাম। প্রণবানন্দ গিরি গত হবার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ ঐ মূর্তিতে পূজা করতেন। তাঁরা অনাচার করায় তাঁদের বংশনাশ হয়। তৎপরে সেই মৃণ্ময়ী প্রতিমা নদীগর্ভে বিসর্জন দেওয়া হয়। সর্বশেষে এই বর্তমান সৌম্যমূর্তি নির্মাণান্তে পূজা হয়। আধুনিক পুরোহিতগণ কর্তৃক পূর্ব মন্ত্র পূর্বমূর্তিসহ বর্জিত হয়েছে। এখন তন্ত্রোক্ত মতে পূজা হয়, কিন্তু কোন তন্ত্রে উত্তরবাহিনী উল্লিখিত নাই। জীবন্মুক্ত ভৈরবানন্দ পরমহংস যোগবলে প্রণবানন্দকে আহ্বানপূর্বক আনেন ও তাঁর মুখনিঃসৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। প্রণবানন্দ গত রাত্রে ধর্মচক্রে এসে যে মূর্তিতে আমাকে অধুনালুপ্ত উত্তরবাহিনী দেবীমন্ত্র ঘন কাল বড় বড় বাংলা হরপে লিখে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই মূর্তিতে আহুত হয়ে এসে ভৈরবানন্দকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ও মহাগৌরীকে যুক্ত করে নমস্কার করলেন। প্রণবানন্দ

কর্তৃক প্রাপ্ত শিলামূর্তি দিব্যদৃষ্টিতে সিদ্ধযোগী অন্যত্র দেখলেন ও উল্লিখিত বিশালাক্ষী মূর্তি রহস্য প্রতিপন্ন করিলেন। ঐ শিলামূর্তি এত কাল মন্দিরেই ছিল ও পূজিত হত। আমরা শুনিলাম, উহা তিন বর্ষ পূর্বে মন্দির থেকে অপহৃত হয়েছে। উক্ত শিলা উত্তরবাহিনী মন্দিরের চতুর্দিকে আধ ক্রোশের মধ্যে কোন গুপ্ত তান্ত্রিক সাধকের কাছে আছে। তিনি তাঁকে ভক্তিভরে পূজা ও সাধন করছেন। মন্দির দর্শনান্তে আমরা ইলাহিপুরে কোন ভক্ত গৃহে আহার ও বিশ্রাম করতে গেলাম। তথায় যাবার পথে অন্য একটি বিশালাক্ষী মন্দিরের পাশ দিয়ে গেলাম ; অথচ না জানায় এই মন্দির দর্শন করি নাই। তাই উক্ত ভক্ত গৃহে আমি বিশ্রামকালে দেখলাম, বিশালাক্ষী দেবী এসে নির্মাল্যের বিল্বপত্র ও জবাফুল এনে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। তাই আমরা ফেরার পথে এই মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করে এলাম। চণ্ডীতলা, শিয়াখোলা প্রভৃতি অঞ্চল নদীমাতৃক ও তন্ত্রপ্রধান ছিল। উক্ত ভক্তগৃহে দুপুরে আহারকালে মহাগৌরী অন্নব্যঞ্জনাদি শিবকে নিবেদন করলেন। তখন একজন শিবানুচর নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি ও ফলমিষ্টি প্রভৃতি সূক্ষ্মদ্রব্য আনলেন এবং শিব ঠাকুর সেই সব সূক্ষ্মদ্রব্য বিশলাক্ষীকে দিলেন। উক্ত ভক্ত ভবানীপুর নিবাসী জিতেন ঠাকুরের মন্ত্র শিষ্য। তখন স্বর্গবাসী জিতেন ঠাকুর এলেন ও অনেকক্ষণ রইলেন।

১১ ই বুধবার বৈকাল ছয়টায় শয্যায় শায়িত অবস্থায় ধর্মচক্রে আমি একটী শ্বেত অশ্বের মুখ দেখলাম অন্যান্য লোকের মধ্যে। এই সম্বন্ধে স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "অশ্বক্রান্তায় প্রচলিত তন্ত্রোক্ত সাত্বিক স্তরের সাধন কর—এই কথা আপনার ইষ্টদেবী মূর্তিযুক্ত দেবভাষায় আপনাকে বললেন। সত্বস্তরের সাধকবৃন্দ সহ শ্বেত অশ্বকেই আপনি দেখেছেন। তান্ত্রিক সাধকদের সূক্ষ্মদেহ এইরূপ হয়। মানব হৃদয়ে সূক্ষ্মদেহ বিরাজ করে। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন যোগীরা সাধকের হৃদয়স্থ লিঙ্গদেহ দেখে কোন্ স্তরে তিনি কি সাধন করছেন, তাহা অবগত হন।"

১২ই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর মহাগৌরী বালি থেকে এলেন। রাত্রি নয়টায় আমি নীচে হাতমুখ ধুতে গিয়ে দেখলাম একটী হেমবর্ণা নারীমূর্তি। অনন্তর দোতলায় শয্যায় আমি 'অষ্টাবক্র সংহিতা' শুনছিলাম ও বিশ্বরূপানন্দ পড়ছিলেন। তখন আমি দেখলাম, পূর্বদৃষ্ট নারীমূর্তি আমার শয্যাপার্শ্বে শূন্যে পূর্ণাকারে উপবিষ্টা। তিনি হেমবর্ণা, স্থূলকায়া ও শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা ও সমাহিতা। ১৩ই শুক্রবার সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে ধর্মচক্রে এলেন। আমি তাঁকে ঐ কথা বলায় তিনি মৎদৃষ্ট নারীমূর্তিকে আহ্বান করলেন ও ঐ নারী এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে প্রণামান্তে মন্দিরে যেতে বলায় তিনি মন্দিরে গেলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "ইনি দেবীলোকবাসিনী অষ্টাবক্রজননী। জ্ঞানী পুত্র সহ তিনি এই মন্দিরে উক্তদিন এসেছিলেন। অষ্টাবক্র মহামুনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। যখন তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তাঁর পিতা ঐ মাতার সঙ্গে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ করছিলেন। সেই প্রসঙ্গে কিছু ভ্রম থাকায় অষ্টাবক্র মাতৃগর্ভ থেকে ঐ ভ্রম নির্দেশ করেন। তাই তেজস্বী পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, "পুত্র হয়ে পিতার ভুল ধর" ? ও অভিশাপ দেন, "তুমি কুরূপ কুৎসিৎ হয়ে জন্মাবে।" তাই অষ্টাবক্র বক্রদেহে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন। আবার যখন তাঁর পিতা জনক রাজার সভায় রাজপুরোহিত সত্যকামের সহিত শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত হন, তখন সত্যকাম তাঁকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করেন। অনন্তর অষ্টাবক্র বাল্যকালেই সত্যকামকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করে স্বীয় পিতাকে সমুদ্রগর্ভ থেকে উদ্ধার করেন। তখন পিতা পুত্রের কৃতিত্ব দেখে তাঁর অভিসম্পাদ প্রত্যাহারপূর্বক পুত্রের সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দৈহিক বক্রতা বিনাশ করেন।" এই উপাখ্যান মহাভারতে আছে। শাস্ত্রের সত্যতা প্রমাণার্থ এই সব সিদ্ধ ঋষি বা দেবীর আবির্ভাব ঘটে।

বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটী মৎসদৃশ সন্ন্যাসী

গণেশ পূজা করলেন। নৈবেদ্যের জন্য অনেক পাকা কলা প্রভৃতি ফল আসা হয়েছে। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "আপনি প্রতিমায় গনেশ পূজার সংকল্প করেছেন ও রোজ গণেশমন্ত্র জপছেন। তাই আপনার সূক্ষ্মদেহ এই সূক্ষ্মপূজা করলেন।"

১৩ই শুক্রবার দুপুরে একতলার বারান্দায় আমি, মহাগৌরী ও বিশ্বরূপানন্দ খেতে বসেছি। আমরা সারদেশ্বরী আশ্রম ও সারদা মঠ প্রভৃতির কথা আলোচনা করছি। তখন আমার ইষ্টদেবীকে বহুবার দেখলাম এবং ব্রহ্মর্ষি ভাগুরি এসে মা কালীর পাশে হাতমুখ নেড়ে আমাকে বললেন, "এইসব বৃথা চর্চা ছেড়ে ইষ্টচিন্তায় ডুবে যাও ও সাধন শেষ কর। ইহাই এখন তোমার প্রথম কর্তব্য।"

৪ঠা বুধবার মধ্যরাত্রে স্বশয্যায় নিদ্রিত অবস্থায় দেখছি, একটী দেবতা আমাকে কিছু বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? তিনি শ্বেত বর্ণ অক্ষরে লিখে দিলেন, আমি কুমার-শক্তি। ৬ই শুক্রবার দুপুরে আহারান্তে স্বীয় শয্যায় শুয়ে আমি দেখছি, একজন একটী মস্ত বড় হাত বাড়িয়ে আমাকে একটী ছোট ঝুড়িতে কিছু দিলেন। আমি তাঁর হাতটী শুধু দেখতে পেলাম। ক্ষণকাল পরে দেখলাম, পূর্ণমূর্তিতে একটী নারী ও একটী পুরুষ এবং তাঁদের পার্শ্বে ইষ্টদেবী কৌমারী। এই সম্বন্ধে স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "এই পুরুষ ও নারী উভয়েই স্বামী-স্ত্রী এবং কৌমারী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাই তাঁরা আপনাকে সিদ্ধিফলের ঝুড়ি দেখালেন। অমরোলীমুদ্রাভ্যাস কৌমারীসাধনের প্রধান অঙ্গ। ইহার ফলে পূর্বোক্ত দম্পতী উর্দ্ধরেতা হয়েছেন। শিব সংহিতা ও হঠযোগ প্রদীপিকা গ্রন্থদ্বয়ে অমরোলী মুদ্রার বিবরণ প্রদত্ত। পূর্বোক্ত দম্পতী ত্রেতাযুগের লোক। কুমার বা কৌমারী জ্ঞানসিদ্ধিদানে অসমর্থ; কিন্তু গণপতি জ্ঞানসিদ্ধি দানে সমর্থ। পূর্বোক্ত দম্পতী কার্তিক-লোকবাসী। কার্তিকলোক শিবলোকের নিম্নেও ব্রহ্মলোকের উর্দ্ধে অবস্থিত।

রজোবিন্দু (নাদবিন্দু নয়) সাধনে সিদ্ধসিদ্ধাগণ কার্তিকলোক প্রাপ্ত হন। সেইজন্য ব্রহ্মাবৎ কুমার বা কৌমারী ইষ্টজ্ঞানে পূজিত হন না; কারণ এঁরা তত্ত্বাতীত নন। আর গণেশ ঠাকুর তত্ত্বাতীত বলে ইষ্টরূপে আরাধিত হন। কার্তিক ও গণেশ পরমাত্মার শেষ সৃষ্ট দেবতা। ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগে বৈবস্বত মন্বন্তরে এই দুই দেবতা আবির্ভূত হন।"

৬ই শুক্রবার মধ্যরাত্রে স্বীয় শয্যায় শুয়ে মুদ্রিত নয়নে দেখছি, আমার শয্যার উপরে শূন্যে একটী মৎসদৃশ সাধুমূর্তি উপবিষ্ট। উনি গেরুয়া কাপড় ও গেরুয়া জামা পরা ও তাঁর গাত্রবর্ণ রক্তাভ। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "ঐ সাধু আপনার সাধনরত সূক্ষ্মদেহ। জ্ঞানসিদ্ধি বা মোক্ষলাভের জন্য যখন রজোস্তরের সাধন চলে, তখন সূক্ষ্মদেহ রক্তাভ বর্ণ ধারণ করে।"

১৫ই রবিবার মহাষষ্ঠীর সকালে ধর্মচক্রের একতলায় জীবন্মুক্ত ভৈরবানন্দকে মা দুর্গা গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহ এসে বললেন, "আমার পূজার ব্যবস্থা কর।" স্থানীয় সার্বজনীন দুর্গাপূজা আমাদের বিবেকানন্দ নাটমন্দিরে হবে এবং তজ্জন্য প্রতিমা আনা হয়েছে। তখন মহাগৌরী তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি আমাদের মন্দিরবাসিনী কল্কি-পত্নী পদ্মাদেবীকে অনুরোধ করলেন, মা, তুমি শারদীয়া দুর্গাপূজা এই মন্দিরে সূক্ষ্মভাবে কর। ঐ দিন সন্ধ্যায় তিনি বালি বাসায় গেলেন ও মঙ্গলবার মহাষ্টমীর বৈকালে ফিরলেন ও দেখলেন, পদ্মাদেবী দুর্গাদেবীর সূক্ষ্মপূজা মহাষ্টমীতে করেছেন। সন্ধ্যায় সন্ধিপূজা পড়েছিল। তখন তিনি দেখলেন, পদ্মা দেবী সন্ধিপূজার আয়োজন ও সুবৃহৎ সমুচ্চ স্বর্ণঘট স্থাপন করেছেন। উক্ত সূক্ষ্ম ঘট প্রায় তিন হাত উচ্চ, একটী বড় জালার মত ও লম্বা গলা। ঘটের উপর আম্রপল্লব ও ডাব প্রভৃতি স্থাপিত।

ভাগুরি ঠাকুর পূজক ও তৎগুরুভ্রাতা তন্ত্রধারক। দশ বারটী থালায় আতপাদিসহ বিবিধ নৈবেদ্য সাজান হয়েছে। তাহা ছাড়াও ফল মিষ্টির নৈবেদ্য দুই তিন গামলায় রক্ষিত। পূজাকালে প্রথমে দুর্গাদেবী

ও পরে চামুণ্ডা এলেন। পূজান্তে দেখা গেল, তণ্ডুল ব্যতীত ফল মিষ্টান্নাদি সূক্ষ্মদ্রব্য কোন পাত্রে নাই। তখন আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসেছিলাম। সন্ধিপূজা শেষ করে পূজক ভাগুরি ও তন্ত্রধারক বাহিরে এলেন এবং আমি উভয়কে প্রণাম করলাম। অনন্তর কন্যাতুল্যা পদ্মাদেবী বারান্দায় এসে পূর্ণমূর্তিতে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন ও বৃহদাকার সূক্ষ্মঘট দেখালেন। এঁরা চলে যাবার পরে স্বর্গবাসিনী করুণাময়ী পশ্চিম বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে আমাকে দুই বার নমস্কার করলেন। তখন মহাগৌরী তাঁকে দেখলেন। রাত্রি নয়টার পর আমি স্বীয় শয্যায় আলো নিভিয়ে শুয়েছি। তখন পুনরায় করুণাময়ী এসে পূর্ণমূর্তিতে আমার বিছানায় বসলেন। তাঁর এত স্পষ্ট পূর্ণ মূর্তি আমি কখনো দেখিনি। কয়েক মিনিট থেকে তিনি চলে গেলেন। ১৮ই বুধবার নবমী তিথিতেও মহাগৌরী দেখিলেন, পদ্মাদেবী আয়োজন এবং ভাগুরি ও তদীয় গুরুভ্রাতা ক্রৌঞ্চ দুর্গাপূজা করলেন।

১৯ শে বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে ১২॥০ টার সময় আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়েছিলাম এবং মহাগৌরী আমার চোখে জলীয় ঔষধ ড্রপারে দিচ্ছিলেন। তখন আমি দেখলাম, আমার ইষ্টদেবী এসে শয্যার উপরে দাঁড়ালেন—মাথায় অল্প শাড়ী দেওয়া, স্নেহময়ী জননীর মত। অনন্তর তিনি আমার সূক্ষ্মদেহকে টেনে বাহির করে তাঁর কাছে বসালেন। আমার সূক্ষ্মদেহ অতিশয় শুভ্রবর্ণ, ত্রিনয়ন, অবিকল মৎসদৃশ ও অপেক্ষাকৃত হৃষ্টপুষ্ট। আমি আবিষ্ট হয়ে স্পষ্ট ভাবে ঐ সূক্ষ্মদেহ দেখলাম। প্রায় পাঁচ মিনিট ঐ সূক্ষ্মদেহ বাহিরে থেকে আমার বুকে এসে ঢুকল। সূক্ষ্মদেহ হৃদয়েই বিরাজ করে। তারপর আমি পশ্চিম দিকে মাথা করে মন্দিরের জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে শুইলাম। তখন রঙ্গপ্রিয় গোপালজী শিশু মূর্তিতে ছোট জামা কাপড় পরে আমার মাথার কাছে এসে মাথা নীচু করে আমাকে প্রণাম করলেন। মহাগৌরী ও আমি গোপালকে আদর

ও চুম্বন করলাম। তারপর এলেন আমার দেবকন্যা চতুষ্টয়—প্রথমে সুভদ্রা, তৎপরে পদ্মা, বিষ্ণুপ্রিয়া ও সুপর্ণা। সকলেই বৃদ্ধ অন্ধ মর্ত্য পিতাকে পূর্ববৎ প্রণাম করলেন। তৎপরে এলেন কল্কিদেব বালক মূর্তিতে, দশ বার বর্ষ বয়স্ক চেহারা, খালি গা, সাদা কাপড় পরা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলছে, গলায় পৈতে। আমি স্নেহভরে প্রণাম করতে নিষেধ করায় ব্রাহ্মণকুমার কল্কিদেব আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং আমিও দাড়ি ধরে আদর ও চুম্বন করলাম। সর্বশেষে এলেন কৌমারী—শীর্ণকায় বালিকামূর্তি, সাদা ফ্রগ পরা ও হাতে একটী মিষ্টি। নমস্কারান্তে কৌমারী হাতের মুঠোতে মিষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। মহাগৌরী মুঠো খুলে মিষ্টি দেখাতে বলতে তিনি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন ও পরে আমাকে ঐ দিব্য মিষ্টি খেতে দিলেন। তারপর আমার ইহজন্মের জননী এসে বিছানায় বসলেন ও বিজয়ার আশীর্বাদ করলেন। মন্দির মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে তাঁদের দাদুকে শ্রদ্ধা জানালেন। কৌমারীর পূর্বে হলুদে শাড়ী পরা ছদ্মবেশে দুর্গাদেবী বিছানায় এসে কন্যারূপে আমাকে শ্রদ্ধা জানালেন। দেবতাদের মধ্যেও মর্ত্য প্রথা প্রচলিত! মন্দিরস্থ দেবগণের কাণ্ড দেখে আমি বিস্মিত ও বিহ্বল হলাম, আমার অন্তঃস্থল আলোড়িত হলো এবং আমার মধ্যাহ্ন বিশ্রাম হলো না। প্রায় ২॥০ টায় বিছানা থেকে উঠে দেখি, আমার গায় স্বল্প জ্বর হয়েছে। বৈকালে ৪॥০ টায় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে "চা খাইতেছিলাম, তখন ব্রহ্মর্ষি ভাগুরি এসে আমাকে বিজয়ার আশীর্বাদ করলেন। আমি তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণামপূর্বক প্রার্থনা করলাম, হে পিতঃ, হে গুরো, অদ্য শুভ দিনে আশীর্বাদ করুন. যেন এই দেহে আমার সাধন শেষ ও মোক্ষজ্ঞান লাভ হয়।" ব্রহ্মর্ষি 'তথাস্তু' বলে অন্তর্হিত হলেন।

২২শে রবিবার সকালে আমি ও মহাগৌরী একটী ভক্ত সহ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির দর্শনে গেলাম। পথে বাসে দেখা গেল, মা কালী ও

ব্রহ্মর্ষি ভাগুরি ও কালভৈরব প্রমুখ আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। আলম বাজারে অন্য কাজ সেরে আমরা রাণী রাসমণির কালীবাড়ীর বাহির ফটকে যেতে ফটকের উপরে বিদ্যমান ভৈরব নেমে আমাদের সঙ্গে চললেন। আমরা মন্দিরের উঠানে প্রবেশ করতেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী ভবতারিণী প্রমুখ বেরিয়ে এলেন। মন্দিরদ্বারে কালীমূর্তি দর্শন করেই মহাগৌরী সমাধিস্থা হলেন। মন্দিরে মা কালীর সঙ্গে দুই যোগিনী ছিলেন। স্নেহের গোপালজী বিবিধ ফল-মিষ্টির নৈবেদ্য দিয়ে মা কালীর পূজা করলেন। তখন রাণী রাসমণি, মথুরানাথ, পূর্ব-পূজক প্রভৃতি অনেক সূক্ষ্মদেহী এসে মহাগৌরীকে প্রণামান্তে দাঁড়ালেন। বিষ্ণুমন্দিরে প্রণাম করে মহাগৌরী রাধাকৃষ্ণকে দেখলেন। পার্শ্বস্থ কক্ষে রামলালা দর্শনকালে শ্যামল বালক শ্রীরামকে দেখা গেল। শিবমন্দিরসমূহে জাগ্রত দ্বাদশ শিবদর্শন হলো। অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে গিয়ে আমরা দেখলাম, ঠাকুর বড় খাটের উপরে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন এবং শ্রীমা ছোট খাট থেকে নেমে এসে আমার সম্মুখে বসলেন। তথায় মহাগৌরী বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও ভাবাবিষ্ট হলেন। আমরা পঞ্চবটী ও বেলতলা দর্শনান্তে পঞ্চবটীর পশ্চিম পাশে অবস্থিত সাধন কুটীরে গেলাম। তখন তথায় তোতাপুরী ছিলেন না, মহাগৌরীর আবিষ্ট আহ্বানে মুহূর্ত মধ্যে এলেন। আমি ইষ্টমন্ত্র জপ করছিলাম। তিনি আমায় বজ্রনাদে ধমক দিয়ে বললেন, আরে বেটা, প্রেষমন্ত্র জপ করো। তন্নির্দেশে আমি প্রেষমন্ত্র জপ করলাম। আমি প্রেষমন্ত্র জপ করে তাঁকে প্রণাম করতে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। অনন্তর বালিখাল থেকে বাসে ফেরার পথে দুই তিনটী সূক্ষ্মদেহী সুন্দরী নারী মহাগৌরী ও ভাগুরি প্রভৃতিকে দেখছিল। আমরা বেলা একটায় ধর্মচক্রে ফিরলাম এবং দেড়টায় একতলার বারান্দায় খেতে বসলাম। তখন আমিও মহাগৌরী দেখলাম, রাসমণি ও মথুরানাথ সূক্ষ্মদেহে এলেন। রাসমণি গৌরবর্ণা সুন্দরী রমণী, অধুনা দেবী-

লোকবাসিনী। স্বর্গবাসী মথুরামোহন স্বর্ণবর্ণ সুদর্শন রাজপোষাক পরা। তাঁর গায়ে নেভি ব্লু রঙের দামী কোট, ঐ কোটে সোণার জরি দেওয়া। আহারান্তে বৈকাল ২টার পরে আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়েছি পশ্চিম দিকে মাথা ও মন্দিরের জানালার দিকে মুখ রেখে। তখন আমি দেখলাম, আমার শুভ্রবর্ণ সূক্ষ্মদেহ বেরিয়ে দেওয়ালের পাশে বিছানার উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে রইল। আমি উহা স্পষ্টভাবে দেখে মহাগৌরীকে ডাকলাম। মহাগৌরীও এসে আমার বহিরাগত সূক্ষ্মদেহকে দেখলেন। কয়েক মিনিট পরে উহা আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হলো। সূক্ষ্মদেহ হৃদয়ে বাস করে। মন্দিরে সান্ধ্য ধ্যানকালে আমি দেখলাম, আমার পূর্বজন্মের গুরুদেব পরমানন্দ গিরি পরমহংস মৎসমক্ষে পদ্মাসনে সমাধিস্থ। তাঁকে সর্বদা ঐ অবস্থায় দেখা যায়।

২৫ শে বুধবার প্রাতঃকালীন নামকীর্তনান্তে আমি যখন মন্দিরে জপধ্যান করছিলাম, তখন ইষ্টদেবী গৌরবর্ণা স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিতে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। তিনি কয়েক মিনিট রইলেন এবং হাসতে হাসতে কিছু বললেন। আমি তাঁকে প্রণামান্তে বললাম, আমার সাধন ইহজীবনে শেষ হউক। সম্ভবতঃ সেই সম্বন্ধে তিনি কিছু বললেন, কিন্তু আমি তাঁর কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না। মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় থেকেই আমার ইষ্টদেবীকে দেখলেন। আমি ও মহাগৌরী বেড়িয়ে এসে পশ্চিম বারান্দার দক্ষিণ পাশে বসে বিশ্রাম করছি—আমি ইজি-চেয়ারে ও মহাগৌরী টুলে বসেছেন। তখন আমার ইষ্টদেবী ছদ্মবেশে সূক্ষ্মদেহী নারীমূর্তিতে এলেন। প্রথমে আমি ভাবলাম, ইনি বোধহয় কোন স্বর্গবাসিনী সাধিকা। তাঁকে ইষ্টমন্ত্রে প্রণাম করতেই তিনি আশীর্বাদ করলেন। তখন আমরা উভয়ে বুঝলাম, ইনি আমার ইষ্টদেবী। অন্য কেউ হলে প্রণাম না নিয়ে সরে যেতেন। তিনি একটী ছোট থালায় সোণালী রঙের পিঠেও চিনি পাঁচ ভাগে এনে আমাকে

খাওয়ালেন এবং ছোট ছোট মাছ দেখিয়ে বললেন, ছোট ছোট মাছ খাও, তাহলে শরীর সুস্থ থাকবে। গতকাল আবার জ্বর ও কোমর ব্যথা হয়েছিল বলে আজ কোন হোমিওপ্যাথের কাছে হোমিও ঔষধ খেয়ে এলাম। আমি যখন ইষ্টদেবীকে বললাম, "মাছ কোথায় পাব? কে আমাকে মাছ খাওয়াবে?" তখন তিনি বিরক্ত হয়ে আমাকে চড় মারতে এলেন। ইষ্টসিদ্ধি হলে সাধকের সহিত ইষ্টদেবী জননীবৎ স্নেহময় আচরণ করেন—কখনও স্নেহ করেন, কখনও শাসন করেন। সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে যেমন জননী সর্বদা থাকেন, ঠিক তেমনি ইষ্টদেবী তখন ব্যবহার করেন। আজ একমাস যাবৎ প্রত্যহ বহুবার ইষ্টদেবীর দিব্য দর্শন পেয়ে ও তাঁর স্নেহময় আচরণ দেখে ইহা অনুভব করেছি। বৈকাল ৪টায় আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় উঁচু চেয়ারে বসে লিখছি, এমন সময় দেখলাম, আমার ইজিচেয়ারে একটী দিব্যদেহী সিদ্ধঋষি এসে পা ছড়িয়ে বসলেন ও আমার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর মাথায় জটা ও সারা গায় লোম ও মুখ সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল। আমি তাঁকে প্রণাম করতে তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু তাঁর আশীর্বাদে আতিশয্য ছিল না। মহাগৌরীও তাঁকে দেখলেন। একটু পরে আমরা বুঝলাম, ইনি লোমশ মুনি—আমার আদি পিতামহ, আমাকে ৺বিজয়ার আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন। দুই তিন মিনিট থেকেই লোমশ মুনি চলে গেলেন।

২২ শে রবিবার দুপুরে আহারান্তে আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে গোপালজী ও লক্ষ্মীদেবীকে দেখলাম। ২৩শে সোমবার কোজাগরী পৌর্ণমাসী। আমাদের নাটমন্দিরে স্থানীয় সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি এই বৎসর প্রতিমায় দুর্গাপূজা করার পর প্রতিমায় লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করলেন। একটী সুন্দর পর্ণকুটীরের মধ্যে লক্ষ্মীপ্রতিমা স্থাপিত হলো। আমরাই লক্ষ্মীপূজা করলাম। সকাল নয়টায় আমি 'পুরোহিত দর্পন'

থেকে লক্ষ্মীপূজার মন্ত্রাবলী শুনছিলাম। তখন একটী দিব্যদেহী সিদ্ধঋষি এসে টেবিলে বসলেন। তাঁর মাথার চুল শোনের মত সাদা, অতি বৃদ্ধদেহ, শুভ্রবর্ণ। পূজাপদ্ধতির মধ্যে নন্দীশ্বর মুনির কথা আছে। আমি ও মহাগৌরী জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি নন্দীশ্বর মুনি? তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন এবং যতক্ষণ আমরা লক্ষ্মীপূজার মন্ত্রাবলী পড়লাম, লক্ষ্মীর ধ্যান ও প্রণাম ও স্তবাদি আবৃত্তি করলাম, ততক্ষণ তিনি শান্তমূর্তিতে বসে রইলেন। অনন্তর আমি ও মহাগৌরী বালি বাজারে গিয়ে একটী বড় তাম্র ঘট কিনে আনলাম আমাদের মন্দিরের জন্য। এই তাম্রঘট স্থাপনপূর্বক আমরা সন্ধ্যার পর নাটমন্দিরে প্রতিমায় লক্ষ্মীপূজা করলাম। পূজার পূর্বে আমি মন্দিরে বসে এক ঘণ্টা যাবৎ লক্ষ্মীমন্ত্র জপ করেছি। আমরা পূজায় বসার পরেই নন্দীশ্বর মুনি লক্ষ্মী প্রতিমার সামনে এসে বসলেন। তৎপরে লক্ষ্মী, কালী, নারায়ণাদি দেবতা এলেন। নন্দীশ্বর মুনি ও মহাগৌরী উভয়ে প্রতিমায় লক্ষ্মীদেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন। এই ধ্যানে লক্ষ্মী পূজা হল।—

পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণিভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্॥
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালংকারভূষিতাং।
রৌক্ম পদ্মব্যাগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥

লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণ ভাগে পাশাস্ত্র ও জপমালা এবং বামভাগে পদ্ম ও অংকুশ। তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্টা ত্রিভুবনের মাতা, গৌরবর্ণা, সুরূপা ও নানা আভরণে ভূষিতা ও তাঁর বাম হস্তে স্বর্ণপদ্ম সুশোভিত। তিনি ডান হাতে বরদান করিতেছেন। এই মন্ত্রে লক্ষ্মী দেবীকে প্রণাম করতে হয়।—

বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্বতঃ পাহিমাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তু তে।

হে পদ্মধারিণি, হে পদ্মবাসিনি, হে শুভপ্রদে, হে মহালক্ষ্মী, তুমি

বিশ্বরূপ নারায়ণের পত্নী। মা, আমাকে সর্ব দুঃখ থেকে রক্ষা কর। তোমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি। এই লক্ষ্মীস্তোত্রে দেবীর দ্বাদশ নাম উল্লিখিত।—

ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মী-চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদী চ শ্রীঃ পদ্মধারিণী॥
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেৎ তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥

ঈশ্বরী, কমলা, লক্ষ্মী, চঞ্চলা, ভূতি, হরিপ্রিয়া, পদ্মা, পদ্মালয়া, সম্পদ, ঈ, শ্রী ও পদ্মধারিনী—এই দ্বাদশ নাম লক্ষ্মীপূজান্তে পাঠ করলে ধনলাভ হয়। পরদিন প্রাতে বিসর্জন সময়েও এসেছিলেন নন্দীশ্বর মুনি। লক্ষ্মীপূজায় ঘণ্টাবাদ্য নিষিদ্ধ। তাই আমরা নিঃশব্দে দেড় ঘণ্টা ধরে নিষ্ঠাভরে বিধিপূর্বক লক্ষ্মীপূজা করিলাম। ৩০শে সোমবার ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রে ব্রহ্মর্ষি নন্দীশ্বরকে আহ্বান করলেন। অবিলম্বে নন্দীশ্বর এলেন ও মহাগৌরী তাঁকে দেখলেন। ভৈরবানন্দ পরমহংস বলেন, "নন্দীশ্বর জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই কোজাগরী পূর্ণিমায় সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত লক্ষ্মী দেবীকে প্রথমে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র পূজা করেন ও উহা প্রচার করেন। সত্য ও ত্রেতার সন্ধিক্ষণে সমুদ্র মন্থন হয়েছিল।"

২৬শে বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন বিশ্রামান্তে বৈকাল ২টায় আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে দেখছি, কার্তিক লোকের অধিষ্ঠাত্রী কৌমারী দেবী অষ্টম বৎসরের বালিকা মূর্তিতে এসে আমার শয্যায় তাকিয়ার উপর দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন—গায়ের রঙ সোণালী, খোলা গা, ছোট জাংগিয়া পরা, মাথার রুক্ষ কেশ প্রত্যেকটী আলাদা হয়ে ফুলে উঠেছে! মহাগৌরীও উত্তর বারান্দা থেকে এসে তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখলেন। স্নেহের কৌমারী উক্ত ভাবে কয়েক মিনিট থেকে অন্তর্হিত হলেন। কৌমারী কন্যামূর্তিতে আমার সঙ্গে এই মন্দিরে দিব্য লীলা করছেন।

রাজেন শেঠ লেনে সান্ধ্য ভ্রমণকালে আমি ও মহাগৌরী দেখলাম, আমাদের মন্দিররক্ষক কালভৈরব বৃহৎ মূর্তি ধরে আমাদের দিকে মুখ করে পেছন হাঁটছেন। শিবসিদ্ধা মহাগৌরীকে কালভৈরব এই ভাবে সর্বত্র রক্ষা করেন দুষ্ট প্রেতাদির দৃষ্টি থেকে। সন্ধ্যা ৭টায় মোনবেড়ের বিষ্ণুভক্ত মোহন ঘোষ মন্দিরে জপধ্যানের পূর্বে প্রণাম কালে দেখলেন, স্নেহের গোপালজী তিন বর্ষের শিশুরূপে হামাগুড়ি দিয়ে এলেন ও বাম হাত মেজেতে রেখে ডানহাত তুলে অভয় দিলেন। গোপালজীর শ্যামল শরীর ও মাথায় মুকুট। উক্ত ভক্ত পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণকে ইষ্টরূপে চিন্তা করতেন বলে তাঁকে প্রণাম করছিলেন। এখন তিনি বিষ্ণুকে ইষ্টরূপে চিন্তা করেন বলে বিষ্ণুর পূর্ণাবতার কৃষ্ণ, যিনি বৎসরাধিক কাল এখানে লীলা করছেন, তাঁকে গোপাল মূর্তিতে দেখা দিলেন। ঐ ভক্ত এই মন্দিরের বারান্দায় জন্মাষ্টমীর পূর্বে গোপালজীর আংশিক দর্শন পেয়েছিলেন।

২৭শে শুক্রবার সকাল থেকেই আমার শরীর অসুস্থ হয়েছিল। দুপুরে অল্প কিছু খেয়ে মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে আছি এবং মহাগৌরী কাছে বসে আমার কোমরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। এমন সময় আমি দেখলাম, একটি দিব্যদেহী নারীমূর্তি রাজরানীর পোষাকে আমার খাটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমি মহাগৌরীকে তাঁর কথা বলায় মহাগৌরী বললেন, "দাদু, ইনি বোধ হয় আপনার মেয়ে সুপর্ণা।" তদুত্তরে আমি বললাম, "আমার মেয়েদের ত আমি চিনি; ইনি চেনা মুখ মনে হচ্ছে না।" তখন ঐ দিব্যনারীমূর্তি বললেন, "আমি রাজা জনমেনজয়ের ধর্মপত্নী বপুষ্টোমা এবং তোমার দাদুর জননী।" এই কথা মহাগৌরী আমাকে বলায় আমি তাঁকে মাতৃজ্ঞানে সভক্তি প্রণাম করলাম ও 'মা', বলে ডাকলাম। তখন তিনি স্নেহভরে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ এবং দাড়ি ধরে আদর করলেন। তাঁর গায়ে সোণালী রঙের কারুকার্য্যখচিত ওড়না ছিল। তিনি

সেই ওড়না খুলে হাতে রাখলেন। তখন তাঁর পূর্ণমূর্তি আমরা স্পষ্টভাবে দেখলাম—সাদা শাড়ী পরা, গাত্রবর্ণ সোণালী, মাথার চুল খোলা মনোহর মুখমণ্ডল, দেবীতুল্যা মাতৃমূর্তি। মহাগৌরী তাঁকে বললেন, "আপনার ছেলে ত অসুস্থ হয়েছেন। আপনি তাঁকে দেখুন।" তখন তিনি খাটের উপর শিয়রে বসে আমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁর পূতস্পর্শে আমি অবিলম্বে সুস্থ বোধ করলাম। যাবার সময় আমি তাঁকে পুনরায় সভক্তি প্রণাম করে বললাম, "মা তুমি আবার আসবে।" দ্বাপর যুগে কোন পূর্বজন্মের জননী আমাকে সহাস্য বদনে সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন। মাতৃস্নেহ বহুজন্ম ব্যাপী অবিস্মৃত, অবিচ্ছিন্ন থাকে; মাতাপুত্রের সস্নেহ সম্বন্ধ লোকান্তরে বা যুগান্তরেও ব্যাহত হয় না। ২৮শে শনিবার বৈকালে স্বামী ভৈরবানন্দের আহ্বানে রানীমাতা বপুষ্টোমা এলেন। তখন আমি, মহাগৌরী ও ভৈরবানন্দ মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসেছিলাম। বপুষ্টোমা দেবীলোকবাসিনী সিদ্ধা শাক্ত সাধিকা। আমি ইজিচেয়ারে বসেছিলাম। তিনি এসে উক্ত চেয়ারে বসে আমার কোলে একপদ রাখলেন ও তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দের মুখে তত্ত্বকথা শুনলেন। তখন আমি সজল নয়নে মাতৃপদে মাথা রেখে মানস প্রণাম করলাম। প্রায় আধঘণ্টা থেকে জননী দেবীলোকে গেলেন।

বৈকাল চারটায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় চেয়ারে বসে আমি 'দিব্যদৃষ্টি' গ্রন্থের প্রুফ দেখছিলাম। তখন মহাগৌরী ও বিশ্বরূপানন্দ যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ বারান্দায় কর্ম্মরত ছিলেন। সেই সময় আমি সম্মুখে প্রত্যক্ষ করলাম, শুভ্রবর্ণ সুবৃহৎ অক্ষর ওঁকার। ওঁকারের চন্দ্রবিন্দু ও সর্বাংশ পূর্ণরূপে স্পষ্টভাবে আমাকে দেখালেন একটি দেবীমূর্তি তৎ পার্শ্বে দাঁড়িয়ে। অবিলম্বে আমি মহাগৌরীকে ডেকে ঐ দর্শনের কথা বললাম। মহাগৌরী উহা দেখে বললেন, "ইনি আপনার ইষ্টদেবী

ছদ্মবেশে।" উক্ত দর্শনে ইষ্টদেবী ইঙ্গিত করলেন, "এখন অন্য মন্ত্র জপ ছেড়ে শুধু ব্রহ্মবীজ ওঁকার সাধন কর। সর্বমন্ত্র ওঁকারে লয় হয়। ওঁকার ব্রহ্মে লয় হয়। ওঁকার চতুর্বিধ—মূলাধারে তমোগুণী ওঁকার, হৃৎপদ্মে রজোগুণী ওঁকার আজ্ঞাপদ্মে সত্বগুণী ওঁকার ও সহস্রারে তুরীয় ওঁকার। এই তুরীয় ওঁকার গুণাতীত, তত্বাতীত ও ব্রহ্মবাচক। উপনিষদে ওঁকারতত্ত্ব ব্যাখ্যাত। স্নেহময়ী ইষ্টদেবী সম্প্রতি মোক্ষসাধনে গুরুরূপে আমাকে সর্বদা নির্দেশ দিচ্ছেন এবং মাতৃবৎ সস্নেহে হাত ধরে মোক্ষধামে নিয়ে চলছেন। প্রাত্যহিক ইষ্টলীলা সন্দর্শনে আমি বিস্মৃত ও বিমূঢ় হয়েছি।

২৯ শে রবিবার সকালে আমি, ভৈরবানন্দ, মহাগৌরী, শিবপ্রিয়া প্রভৃতি পাঁচজন চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমে যাত্রা করলাম। পথে ইলেকট্রিক ট্রেণে ক্রৌঞ্চ ঋষিকে দেখলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে ট্রেণে দিব্যদেহে চললেন। বিগত শারদীয়া দেবীপক্ষে পূজক ভাগুরির সঙ্গে আমাদের মন্দিরে এসে তিনি দুর্গাপূজার তন্ত্রধারক হয়েছিলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "ঋষি ক্রৌঞ্চ ক্রোষ্টুকি ভাগুরির গুরুভ্রাতা। ক্রৌঞ্চ ও ক্রোষ্টুকি ব্রহ্মবিৎ ঋষিদ্বয় মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের শিষ্য।" আমরা ট্রেণ থেকে নেমে রিক্সাতে চড়ে প্রবর্তক আশ্রমে গেলাম ও আশ্রমে পৌছিবার পূর্বে সংঘগুরু মতিলাল ও তৎপত্নী রাধারাণী সূক্ষ্মদেহে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করলেন এবং আমরা যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণ আমাদের অদূরে যুক্ত করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁরা উভয়ে এখন পিতৃলোকের সত্বস্তরে বাস করেন। আমরা পূর্বাহ্নে সমীপবর্তী গঙ্গাতীরে স্বর্গগত জিতেন ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কন্যাকুমারী আশ্রম দেখতে গেলাম। উক্ত আশ্রমের মন্দিরে আমরা দেখলাম, স্বর্গবাসী জিতেন ঠাকুর জোড় হাত করে দাঁড়িয়েছিলেন। ঐ আশ্রমে যাবার পথে আমরা বোড়াই চণ্ডীতলায় চণ্ডীমন্দিরে গেলাম ও তথায় চণ্ডীদেবীর উজ্জ্বল পিত্তলপ্রতিমা দর্শন ও প্রণাম করলাম। চণ্ডীদেবী চতুর্ভূজা এবং চারি হস্তে শংখ,

খড়্গ ও গদা বা পাশ ধারণ করেন। দেবী অসুরকে (পশুকে) পাশ দ্বারা বন্ধন, খড়্গ দ্বারা ছেদন, শংখধ্বনিদ্বারা স্তম্ভন ও ভীতি প্রদর্শন ও আকর্ষণ এবং চক্র দ্বারা ধ্বংস করেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধের পূর্বে অম্বিকা পর্বতোপরি এই মূর্তি ধারণ করেছিলেন। চণ্ডীদেবী দিব্যদেহে মন্দিরের বাহিরে এসে আমাদিগকে আশীর্বাদ করলেন। এই চণ্ডী মন্দির শ্রীমন্ত সওদাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও বাংলার একটী প্রাচীন দেবী মন্দির। 'চণ্ডী মঙ্গল' গ্রন্থে এই উপাখ্যান পাওয়া যায়।

আহারান্তে বিশ্রামকালে ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী দেখলেন, আশ্রমস্থ বিল্ববৃক্ষে একটী ব্রহ্মদৈত্য শতাধিক বর্ষ বাস করেন ও বিল্বমূলে পঞ্চমুণ্ডীর আসন অবস্থিত। এই আসন তান্ত্রিক সাধক বিনয় চক্রবর্তী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। আমরা যখন বিশ্রাম করছিলাম, তখন সূক্ষ্মদেহে বিনয় চক্রবর্তী এসে আমাদের খাটে বসলেন ও তৎপ্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডী আসনের কথা বললেন। বিনয়বাবু ঐ আসনে ইষ্টসিদ্ধি লাভ করেন ও দেহান্তে বিদেহ মুক্তির সাধন করছেন। 'কল্কিগীতা' সম্বন্ধে প্রবর্তক আশ্রমে কর্তৃপক্ষের সহিত তুমুল তর্কযুদ্ধ হবার পর চন্দননগরের স্ট্র্যাণ্ড ও কলেজাদি দেখে আমরা ফিরে এলাম।

সোমবার শেষরাত্রে বা মঙ্গলবার ভোরে শিবপ্রিয়া মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় শয্যায় ধ্যানান্তে বিশ্রামকালে দেখলেন ভগবান কল্কিদেবকে। বহু লোক এসে ভিড় করে শিবপ্রিয়াকে অবজ্ঞাভরে বলছে, 'কল্কিগীতা'য় লেখা আছে, ভগবান্ কল্কিরূপে আসবেন। এ সব মিথ্যা প্রচারিত কল্কিকথা আমরা বিশ্বাস করি না।" এমন সময় চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি এলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন, কারা 'কল্কিগীতায়' বিশ্বাস করে না? তখন শিবপ্রিয়া বললেন, এই যে এরা। ইহাতে বিষ্ণুদেব দ্বিভুজ কল্কিমূর্তি ধরে এগুতে লাগলেন এবং অবিশ্বাসীদের দিকে কটাক্ষপাত করতেই তারা সব কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন! এইরূপে 'কল্কিগীতা' কল্কির যে আসন্ন আবির্ভাব

প্রচার করেছে, তা কেউ শুনবে, কেউ শুনবে না। তারপর কল্কি এসে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ ও অস্ত্রধারণ করে পাষণ্ড দলন ও সদ্ধর্ম স্থাপন করবেন।

দেবীকবচে আছে, চক্ষুষোঃ শংখিনী রক্ষেৎ। আমাদের দুই চক্ষু শংখিনী দেবী রক্ষা করুন। শংখিনী দেবী চক্ষুরক্ষক। ৩০ শে সোমবার বৈকালে মৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মন্ত্রদ্রষ্টা ভৈরবানন্দ শংখিনীর বীজমন্ত্র 'ওঁ শ্রীং শংখিনীদেব্যৈ নমঃ' যোগবলে জেনে বললেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে আমি ঐ বীজমন্ত্র ১০৮ বার জপ করতেই এলেন শংখিনী দেবী—শংখবৎ শুভ্রবর্ণা, ত্রিনয়না, এলোকেশী ও শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে মা? তিনি আমার একটী চক্ষুতে আঙ্গুল দিয়ে ইংগিতে বললেন, আমি চক্ষুরক্ষক দেবতা। পরদিন ও উল্লিখিত সিদ্ধমন্ত্র জপ করার পর তাঁকে দেখেছি। পূর্বোক্ত দেবীকবচে আছে, উদরে শূলধারিণী। ইহার অর্থ, দেবী শূলধারিণী উদর-রক্ষক। ২৮ শে শনিবার মহাগৌরী উদরাময়ে আক্রান্ত হয়ে বহুবার মলত্যাগ করেন। তখন ভৈরবানন্দ শূলধারিণীর বীজমন্ত্র 'ওঁ শোং শূলধারিণীদেব্যৈ নমঃ' বলেন।॥ রাত্রে মহাগৌরী ঐ মন্ত্র জপ করতেই শূলধারিণী দেবী এলেন—শুভ্রবর্ণা, শূলহস্তা, এলোকেশী ত্রিনয়না বৃহৎচক্ষু উগ্রমূর্তি। তৎপরে এই দেবী মহাগৌরীর কাছে বহুবার এসেছেন। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "দেবীকবচোক্ত সর্বদেবী সত্যই আছেন এবং প্রত্যেকের বীজমন্ত্র আছে।" রাত্রি দশটায় মহাগৌরী পায়খানায় গেলেন। আমি ও তাঁর সঙ্গে গেলাম ও অদূরে রইলাম। যথা সময়ে উভয়ে ফিরে এলাম। মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুলেন ও আমি পশ্চিম বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন আমি স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করলাম, ঐ বারান্দায় মানুষের মত একটি দেবতা দণ্ডায়মান—তিনি রজতগিরিনিভ শ্বেতবর্ণ, মাথায় অর্ধচন্দ্র ও মহাসর্প, কোমরে বাঘছাল। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে মহাগৌরী বললেন, "ইনি

আমার ইষ্টদেবতা স্বয়ং শিব ও আমার সঙ্গে নীচে গিয়েছিলেন। আজ শিববার বলে তিনি কৃপা করে আপনাকে দেখা দিলেন।" এত স্পষ্ট ভাবে সচ্চিন্ময় শিবমূর্তি আমি কখনো দেখি নি।

২৮ শে শনিবার দুপুরে আহারান্তে সাড়ে বারটার সময় আমি একা স্বীয় শয্যায় শুয়ে আছি। এমন সময় একটী সিদ্ধ ঋষি সস্ত্রীক এলেন। তিনি কৌপিন-পরা, বাম হাতে চিম্‌টা, ডান হাতে কাঠের কমণ্ডলু, মাথার চুল ঝুঁটি বাঁধা, শ্যামবর্ণ চেহারা। তাঁর স্ত্রী সুন্দরী, মাথায় জটা, সাদা শাড়ী পরা। উভয়ে আমার শিয়রে কয়েক মিনিট থেকে চলে গেলেন। মহাগৌরা উত্তর বারান্দা থেকে এসে তাঁহাদিগকে দেখলেন। ২৮ শে শনিবার বৈকালে মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় পূর্ণপ্রজ্ঞ যোগিবর ভৈরবানন্দের আহ্বানে তাঁরা উভয়ে এলেন। তখন জানা গেল, তাঁরা দ্বিতীয় চ্যবন ঋষি ও তৎপত্নী সুকন্যা। এই চ্যবন সাধন করতে করতে মৃত্তিকাতে, বল্মীকে চাপা পড়েন। শুধু তাঁর চোখ দুটী জোনাকি পোকার মত দেখা যাচ্ছিল। যখন রাজা বৃহদ্রথ স্ত্রী, কন্যা, সৈন্যাদি সহ বনবিহারে আসেন, তখন তাঁর মেয়ে সুন্দরী সুকন্যা বনমধ্যে বিচরণ কালে মাটীর ঢিপির মধ্যে দেখেন, কোন কিছু চিক চিক করে জ্বলছে। তিনি ক্রীড়াচ্ছলে শলাকা সেই জ্বলন্ত দ্রব্যে ফুটিয়ে দিয়ে উহা কি তাহা পরীক্ষা করেন। ইহার ফলে চ্যবন মুনি চীৎকার করে উঠেন ও তাঁর এক চক্ষু নষ্ট হয়। তখন সুকন্যা ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে যান। চ্যবনের শাপে রাজা, রাণী, সুকন্যা ও সৈন্যাদি সকলের মলমূত্র বন্ধ হয়ে যায়। ইহার কারণ অন্বেষণার্থ বৃহদ্রথ চিন্তিত হন ও ভাবতে থাকেন, এই সর্বনাশ কেন হল? তখন রাজকন্যা তাঁর পূর্ব কর্ম বিবৃত করেন। এই কথা শুনে বৃহদ্রথ সুকন্যা সহ উক্ত স্থানে গিয়ে এই মুনির পা ধরে স্তবস্তুতি করে চ্যবনকে বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন। তখন চ্যবন মুনি রাজা বৃহদ্রথকে বললেন, "তোমার কন্যা ক্রীড়াচ্ছলে আমার

চক্ষু নষ্ট করেছে। যদি আমার সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দাও, তবে আমি ইহার প্রতিকার করবো।" চ্যবনের প্রস্তাবে রাজা চিন্তিত হলেন, সুকন্যাও স্বকৃত দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বৃদ্ধ মুনিকে বিয়ে করতে সম্মত হন। যথাসময়ে চ্যবনের সহিত সুকন্যার বিবাহ হয় ও রাজা বিপদমুক্ত হন। ইহার কিছুকাল পরে অশ্বিনীকুমার যুগল সুকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে চান। তখন সুকন্যা তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ও অভিশাপ দিতে উদ্যত হন। অগত্যা অশ্বিনী-কুমারদ্বয় বলেন, যদি আপনার স্বামীকে যুবা করে দিই, আপনি আমাদিগকে বিয়ে করবেন কি? সুকন্যা দ্বিতীয় প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। পুনরায় অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলেন, "আপনার স্বামীকে জরামুক্ত করলে তিনি আমাদের মত তারুণ্যমণ্ডিত সুপুরুষ হবেন। তখন যদি আপনার স্বামীকে চিনে নিতে পারেন, তাহলে আমরা আপনার সঙ্গ ত্যাগ করবো, নচেৎ নয়।" এই প্রস্তাবে সুকন্যা সম্মত হন। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় চ্যবনকে নিয়ে জলমধ্যে প্রবেশ করলেন এবং কিছু সময় পরে তিনজন একই প্রকার মূর্তিতে এসে উপস্থিত হলেন। পতিব্রতা সুকন্যা তাঁদের মধ্য হতে তাঁর স্বামী চ্যবনকে চিনিয়া লইলেন। ইহাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আনন্দিত ও চমৎকৃত হয়ে সুকন্যার পদধূলি নিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। চ্যবন ও সুকন্যা উভয়ে ব্রহ্মজ্ঞ। ইহাদের উপাখ্যান মহাভারতে ও দেবী ভাগবতে আছে।

২৫ শে বুধবার সকাল সাতটায় মন্দিরে ধ্যানকালে ইষ্টদেবী গৌরবর্ণা স্নেহশীলা মাতৃমূর্তিতে এসে হেসে হেসে দুই চার মিনিট ধরে বললেন, "এই শীতকালে অদ্য থেকে (কার্তিকের মধ্য) চৈত্র শেষ পর্যন্ত পাঁচ ছয় মাস সব কাজ ফেলে সাধনে ডুবে যাও এবং সাধন শেষ করার জন্য প্রাণপণ কর। এই সুবর্ণ সুযোগ হারিও না।" ২২ শে রবিবার দুপুরে আহারান্তে বিছানায় শুয়ে আমি দেখছি, কোন সিদ্ধ ঋষি আমাকে

লিখে দিলেন—প্রকৃতি। তৎপরে ইষ্টদেবীকে দর্শন করলাম। ইহার অর্থ, "স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ব প্রকৃতির সহিত পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়ে সাধন করা দরকার প্রত্যেক মুমুক্ষু সাধকের পক্ষে। তাহলে পর পর স্তর অতিক্রম করে জ্ঞানসিদ্ধি লাভ হবে, নচেৎ নয়। প্রত্যহ চার সন্ধ্যায় বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতিদ্বয়ের সাম্য বা ঐক্য ঘটে। যেমন স্থূল জগতে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি আছে, তেমনি অন্তর্জগতে সূর্য্যাদি কোথায় বিরাজ করেন, তাহা অনুভব কর। এই দুই জগৎ ও উহাদের প্রকৃতি মূলতঃ সুসদৃশ।"

২৬ শে বৃহস্পতিবার সকালে মন্দিরে জপধ্যানকালে দেখলাম, একটী কৃষ্ণবর্ণ সিদ্ধ ঋষি বেদীর সম্মুখে বিরাজিত। তাঁর মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, নগ্ন দেহ। মহাগৌরীও উত্তর বারান্দা থেকে তাঁকে দেখলেন এবং তাঁকে ব্রহ্মমন্ত্রে প্রণাম করতেও তিনি সরে গেলেন না। আমি তাঁকে প্রারব্ধদেবতা ভেবে ভয় পেয়েছিলাম। আমি প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টা জপধ্যানে কাটালাম। ততক্ষণ তাঁকে উক্তরূপে দেখা গেল। বেলা দশটায় আমি ও মহাগৌরী দক্ষিণ বারান্দায় বসে লেখাপড়া করছিলাম। তখন তিনি পূর্ব মূর্তিতে আবার এসে আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়ালেন। আমরা তাঁর নাম ও আসার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি হাত নেড়ে নিষেধ করলেন ও বিরক্ত হলেন। তখন তিনি কৃষ্ণবর্ণ ছদ্মবেশ ছেড়ে শুভ্রমূর্তি ধরলেন। তাঁর কপালে রক্তবর্ণ অত্যুজ্জ্বল তিলক দেখা গেল, তাঁর চোখ দুটী বড় বড়, অত্যন্ত সুন্দর। আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম করতে তিনি বললেন, তোমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছি। কয়েক মিনিট পরে তিনি অন্তর্হিত হলেন। ইহার পর বহুবার তিনি এসেছেন। ২৯ শে শনিবার বৈকালে ত্রিকালজ্ঞ তত্ত্বদর্শী ভৈরবানন্দের আহ্বানে তিনি আবার মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় আমাদের সমক্ষে এলেন। ইনি নর ঋষি ও ত্রেতাযুগের প্রথম পাদে আবির্ভূত হন এবং

বদরিকাশ্রমে গন্ধমাদন পর্বতে সাধনপূর্বক সিদ্ধিলাভ করেন। ইনি তৎকালীন সাধুদ্বেষী অসুরগণকে অস্ত্রবলে ধ্বংস করেছিলেন। ইনি নারায়ণের অংশভূত দেবীভক্ত ব্রহ্মর্ষি। ইহার সাধনধারা অবলম্বন করে রাজর্ষি ঋষভ ত্রেতার দ্বিতীয় পাদের শেষভাগে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। অবতার পরশুরামের পরে এই জ্ঞানী ঋষির আবির্ভাব ঘটে।

দেবী ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়দ্বয়ে নর ঋষির উপাখ্যান বর্ণিত। ব্রহ্মার হৃদয় হতে ধর্ম নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ধর্ম দক্ষ প্রজাপতির দশ কন্যাকে বিবাহ করেন। ধর্মের ঔরসে দক্ষকন্যাদের গর্ভে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ নামে চার পুত্র জাত হন। তন্মধ্যে নর ও নারায়ণ হিমাচলে গিয়ে বদরিকাশ্রম তীর্থে গঙ্গাতটে সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। সেই তপোনিষ্ঠ ধর্মপুত্র ঋষিদ্বয়কে শচীপতি ইন্দ্রদেব নানা লোভ ও নানা ভয় দেখালেন; কিন্তু তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত বা উচ্চাটিত হইলেন না। ইন্দ্রপ্রেরিত রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা, পুষ্পগন্ধা, সুকেশী, মহাশ্বেতা, মনোরমা, প্রমোদ্বরা, চারুহাসিনী, ঘৃতাচী, চন্দ্রপ্রভা, কোকিল-ভাষিণী, সোমা, অম্বুজাক্ষী, কাঞ্চনমালিনী, বিদ্যুৎলতা প্রমুখ স্বর্গবেশ্যা অপ্সরাগণ এই তাপস যুগলের তপোবিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেন নি। ৪ নভেম্বর শনিবার ১৯৬১ পূর্বাহ্নে ১০৷৷০ টার সময় মহাগৌরী দেবী-ভাগবতের পূর্বোক্ত তিন অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় পড়ে আমাকে শুনালেন। তখন নর ঋষি স্বয়ং এসে অদূরে বিরাজ করলেন। মহাভারত, বামনপুরাণ ও শ্রীমদ্ ভাগবতে নর ঋষির উপাখ্যান বর্ণিত।

প্রসঙ্গক্রমে স্বামী ভৈরবানন্দ ধর্মচক্রে অবস্থানকালে এই সময়ে বলেছিলেন, "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় সিহোড়বাসী হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় পুনরায় দেহধারণ করেছেন, সম্ভবতঃ দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়রামের পুনর্জন্মের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ইহজন্মে হৃদয়রামের বয়স এখন প্রায় চল্লিশ বৎসর হয়েছে। ১৩৬৬ সালে আমি

তাঁকে দুইবার দেখেছি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর পুরাতন গঙ্গাঘাটে প্রাতঃ-কালে। তিনি ভোরবেলা গঙ্গাস্নানান্তে ঘাটে বসে বসে উপু হয়ে জপ করেন। তিনি শ্যামবর্ণ ও হৃষ্টপুষ্ট দেহলাভ করেছেন। তাঁর বর্তমান নামটী পর্য্যন্ত আমি জেনেছিলাম, কিন্তু এখন ভুলে গেছি।

৭ই নভেম্বর ১৯৬১ মঙ্গলবার আমাদের নাটমন্দিরে সপ্তম বার্ষিক কালী-পূজা হলো মৃন্ময়ী প্রতিমায়। গত ছয় বর্ষের ন্যায় এই বৎসরও আমি নিজেই পূজকের আসনে বসে ইষ্টপূজা করলাম। এবার মা কালীর সঙ্গে অন্য দুই মহাবিদ্যা বগলা ও মাতঙ্গীর পূজা করলাম। সূর্য্যের কুলদেবী মাতঙ্গী ও ইষ্ট বিষ্ণু। আর বগলা মঙ্গলগ্রহের ইষ্টদেবী। তিন মহাবিদ্যার মৃন্ময়ী প্রতিমা নাটমন্দিরে আনা হলো। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রতিমার সম্মুখে শিবপ্রিয়া আলপনা দিলেন ও মহাগৌরী সদ্যক্রীত তাম্র ঘট স্থাপন করলেন ও চোদ্দ মোমবাতি জ্বালিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির দীপালোকে আলোকিত হলো। অনন্তর শালকিয়া বীণাপাণি সম্মিলনী দুই ঘণ্টার অধিক কালীকীর্তন গাইলেন এবং দুই শতাধিক নরনারী কালীপ্রতিমার সম্মুখে বসে তন্ময় হয়ে কালীকীর্তন শুনলেন। কীর্তনকালে আমি মাতা বগলাকে স্পষ্টভাবে পূর্ণমূর্তিতে দেখলাম। তিন দিন যাবৎ কালীপূজার আয়োজনার্থ অতিরিক্ত পরিশ্রমহেতু সন্ধ্যার পূর্বেই আমি শয্যাগত হই। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেখলাম, আমার শয্যাপার্শ্বে বৈকুণ্ঠবাসী চিকিৎসক বৃন্দাবন ধর এসে দাঁড়ালেন। আমি নাটমন্দিরে বসে কালীকীর্তন শুনছিলাম, তখনও তিনি এসে আমার পাশে বসলেন। তিনি প্রায় আড়াই ঘণ্টা থেকে আমার চিকিৎসা করলেন এবং তাঁর দৈব চিকিৎসায় আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে রাত্রি নয়টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত আট ঘণ্টা কালীপূজা, মাতঙ্গীপূজা, কালাপূজা ও হোমাদিতে কাটাতে পারলাম। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী উভয়ে বৈকুণ্ঠবাসী বৃন্দাবনকে দেখলেন। কীর্তনকালে আমার পূর্বজন্মের গুরুদেব পরমানন্দ গিরি পরমহংস দিব্যদেহে মন্দির থেকে নেমে

কালী প্রতিমার সম্মুখে বসলেন। তিনি আমার ডান দিকে আসন নিলেন। মা কালী তাঁরও ইষ্টদেবী। আমার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন পাছে ইষ্টপূজায় বিঘ্ন ঘটে, তাই তিনিই পূজকের আসনে বসলেন। তাঁর তন্ত্রধারক হলেন ভাগুরি। ঋষি ক্রৌঞ্চও উপস্থিত ছিলেন। দেবীঘট সংস্থাপিত ও মন্ত্রপূত হলে উহা চিন্ময় ঘটরূপে প্রতিভাত হলো। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী কর্তৃক প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হলে প্রতিমা জীবন্ত হয়ে উঠল। পরমানন্দজী আত্মিক ও যৌগিক পূজা করলেন, আর আমি করলাম বাচনিক মন্ত্র পূজা। যেমন স্থূলদেহী পরমহংস বাচনিক পূজাপাঠ ও দীক্ষাদানে অসমর্থ, তেমনি দিব্যদেহী পরমানন্দজী বাচনিক পূজাপাঠে অক্ষম। যখন ষোঢ়ান্যাস, ঋষিন্যাস, মাতৃকান্যাস, জীবন্যাসাদির মন্ত্রাবলী উচ্চারিত হলো, তখন পরমানন্দজীর সর্ব অঙ্গে সেই সেই দেবতা ফুটে উঠলেন। দেবতা না হলে দেবপূজা যথাযথ হয় না। আমার নামে পূজাব সংকল্প হলো, এই দেহে সাধন শেষ ও জ্ঞানলাভ হউক। মহাবিদ্যাত্রয় ব্যতীত শিব, গণেশ, শ্রীরামকৃষ্ণ, কল্কি, গোপাল, কৌমারী ও কামধেনুর পূজা করলাম পৃথক নৈবেদ্য দিয়ে। সোমবার মন্ত্রদ্রষ্টা ভৈরবানন্দ বললেন, "কামধেনু ধরিত্রীকন্যা ও তাঁর বীজমন্ত্র—ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং কামধেনু দেব্যৈ নমঃ।" গণেশ পূজা কালে সিদ্ধিদাতা গণপতি মহাগৌরীকে গাণপত্য সাধনের আঠার স্তর ও বীজ দেখালেন। তন্মধ্যে মহাগৌরী ষোলস্তর পূর্ণভাবে দেখলেন, শেষ দুই স্তরে সমাহিত হলেন। ভৈরবানন্দ বলেন, গণেশ সাধনের ষোল স্তর পর্যন্ত নির্বিকল্প সমাধি এবং শেষ দুই স্তরে পারমহংস্য ও তত্ত্বজ্ঞান সাধন করতে হয়। হোমাগ্নিতে কালী, বগলা; মাতঙ্গী, শিব, গণেশ, রামকৃষ্ণাদি দেবগণ অগ্নিমূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। অন্নভোগ কালে পূজিত ও অপূজিত অসংখ্য দেববৃন্দ এসে নিবেদিত অন্নভোগাদি গ্রহণ করলেন। সারারাত্রি জেগে প্রায় ষাটজন নরনারী আমাদের কালীপূজা দেখলেন। এইরূপ স্থূলপূজাও সূক্ষ্মপূজা যুগপৎ অধুনা কোথাও হয় কি?

৩০ অক্টোবর ১৯৬১ সোমবার রাত্রি এগার টায়,আমি দেখলাম, একজন সূক্ষ্মদেহী এসে আমার ডান হাত ধরে কিছু বললেন ও অভয় দিলেন। তাঁর হাত জ্যোৎস্নাবৎ শুভ্র, তাঁর হাতের কনুই পর্য্যন্ত দেখা গেল, কিন্তু তাঁকে দেখা গেল না। একটু পরে আর একটী গৌরবর্ণ সূক্ষ্মদেহী এসে আমার শয্যায় বসলেন। তিনি বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ও স্বাস্থ্যবান্ ও প্রৌঢ় বয়স্ক। তাঁর পূর্ণমূর্তি আমি স্পষ্টভাবে দেখলাম এবং তিনিও আমাকে কিছু বললেন। এই দর্শন সম্বন্ধে স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন,"ইহা আপনার স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের কর মর্দন, স্থূল সূক্ষ্মের খেলা। যে সূক্ষ্মদেহ পাপ-পুণ্য ভোগ ও মোক্ষলাভ করে, তাহা স্থূলদেহকে বলছে, তুমি এইসব ঐহিক ব্যাপার ছেড়ে মোক্ষ সাধনে মনোনিবেশ কর। সূক্ষ্মদেহ স্থূল দেহকে হাত ধরে মোক্ষমার্গে টানছে। ইহা সুবিবেক বা সাধন বিবেক ও কুবিবেক বা বিষয়বুদ্ধির দ্বন্দ্ব। ইহা সাধন বিজ্ঞানের একটি মৌলিক তত্ত্ব। সূক্ষ্মদেহের ইঙ্গিত না শুনলে পরিণাম শোচনীয় হয়। যিনি পরে এলেন পূর্ণমূর্তিতে, তিনিই ক্ষণকাল পূর্বে এসে আমার হাত ধরেছিলেন। ইহা আমার সূক্ষ্মদেহ।

ঐদিন মধ্যরাত্রে কামধেনুকে স্পষ্টভাবে দেখলাম একটী ধবল বাছুর রূপে। একটু পরে তিনি বয়োবৃদ্ধা দেবীমূর্তি ধরলেন। ইনি আমাদের মন্দিরবাসিনী ধরিত্রীকন্যা সবলা বা কামধেনু। ইনি দর্শন দিয়ে পূজা চাইলেন। তাই আমরা ৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার কালীরাত্রিতে তাঁর পূজা করলাম। দেবীভাগবতে কামধেনুর কথা আছে। উক্ত মহাপুরাণ অনুসারে কামধেনু সমুদ্রমন্থনে সমুদ্ভূত। স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, "কামধেনু স্বরূপতঃ দেবী ও তাঁর বীজমন্ত্র—ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং কামধেনুদেব্যৈ (বা সবলা দেব্যৈ) নমঃ। কামধেনু সর্বসম্পদদায়িনী। বিদ্যাও একটী সম্পদ। সেইজন্য বিদ্যাবীজ, ধনবীজ ও কামবীজ (সমস্ত কামনা পূরক)—এই তিন ভোগবীজে উক্ত মন্ত্র রচিত।" কামধেনু দেববৃন্দ ও সিদ্ধ ঋষিসংঘকে বিবিধ আহার্য্য প্রদান করেন।

১৬ই নভেম্বর ১৯৬১ বৃহস্পতিবার কার্তিক সংক্রান্তিতে আমাদের নাটমন্দিরে মৃন্ময়ী প্রতিমায় কার্তিকপূজা ও কৌমারীপূজা যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়। কৌমারীদেবী অষ্টশক্তি বা অষ্ট মাতৃকার অন্যতমা। সেজন্য কৌমারীপূজান্তে অন্যান্য সপ্তশক্তির পূজা বিহিত। তাই উক্ত দিন প্রাতঃকালে মন্ত্রতত্ত্ববিৎ ভৈরবানন্দজীকে অষ্টশক্তির বীজমন্ত্র জিজ্ঞাসা করি। তিনি মন্দিরের বারান্দায় বসে সমাহিত হয়ে মুহূর্তমধ্যে মন্ত্রাবলী আবিষ্কার করেন।

দেবী ভাগবতে আছে, মহামুনি কশ্যপের নিকট স্বপত্নী বিনতা অদিতির পুত্র ইন্দ্রাদি দেবগণাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রমশালী পুত্রদেবতা কামনা করেন। তখন কশ্যপ বিনতাকে বলেন, "তোমাকে বিষ্ণুব্রত করতে হবে। আমি মন্ত্রোদ্ধারার্থ তপস্যায় যাচ্ছি। আমি সেই সব মন্ত্র পেলে তোমাকে দিব। তুমি সেই মন্ত্রাবলী সাধন সহ বিষ্ণুব্রত করলে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।" কশ্যপ উক্ত তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে বিনতাকে লব্ধ মন্ত্র দেন। সেই মন্ত্রজপ ও বিষ্ণুব্রত করায় বিনতা দেবগণাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী পুত্রদ্বয় গরুড় ও অরুণকে লাভ করেন। ভৈরবানন্দ কশ্যপকেআহ্বান পূর্বক তাঁর স্তবস্তুতি করে বলেন, "প্রভো, আমাকে মন্ত্রোদ্ধার কৌশল শিখিয়ে দিন। "তখন কশ্যপ ভৈরবানন্দকে মন্ত্রোদ্ধার বিজ্ঞান শিক্ষা দেন।

বৃহস্পতিবার সকাল নয়টা থেকে বৈকাল ২॥০ টা পর্য্যন্ত ৫॥০ ঘণ্টা আমরা কার্তিকপূজা ও কৌমারীপূজা, হোম ও অন্নভোগাদিতে কাটালাম। আমি পূজকের আসনে বসলাম ও সংকল্প করলাম, স্বমোক্ষ সাধনেও কল্কিলীলা প্রচারে দেবশক্তি আমার সহায় হউন। কার্তিকপূজার প্রবর্তক ঋষিবর বিভাণ্ডক পূজামণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বয়ং শিব ও গৌরী পূজার ভার নিলেন। আমি গৌরীদেবীর পূর্ণমূর্তি স্পষ্টভাবে দেখলাম—সোণালী শাড়ী পরা নানা অলংকারে ভূষিত হেমবর্ণা দেবীমূর্তি। স্বামী ভৈরবানন্দ পূজামণ্ডপে গৌরীদেবীর এই বীজমন্ত্র আমাকে বললেন—

ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং গৌরীদেব্যৈ নমঃ। ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী কর্তৃক প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর কার্তিক ও কৌমারী প্রতিমাদ্বয় জীবন্ত হয়ে উঠলেন স্ব স্ব বাহন ময়ূর ও কুক্কুট সহ। হোমে—ওঁ কং দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ায় স্বাহা—এই মন্ত্রে ৫৪ সাজ্য বিল্বপত্র এবং ওঁ কীং কৌমারীদেব্যৈ স্বাহা মন্ত্রে ৫৪ সাজ্য বিল্বপত্র আহুতি দেওয়া হলো। 'পুরোহিতদর্পণ' গ্রন্থে নিম্নোক্ত কৌমারীধ্যান দৃষ্ট হয়।—

ওঁ কৌমারীং কুংকুমাভাসাংত্রিনেত্রাং শিখিসংস্থিতাম্।
চতুর্ভুজাং শক্তিপাশাংকুশাভয়বিধারিণীম্॥
নানালংকারশোভিতাং প্রমত্তাং পরিচিন্তয়েৎ।

কৌমারী ব্যতীত অন্য সপ্তশক্তির পূজা এবং শিব, গোপাল, কল্কি, কালী, রামকৃষ্ণ ও গণেশাদি দেবতার পূজা ও হোম হোলো। ষোড়শ উপচারে পূজাকালে আমি যখন কার্তিক ঠাকুরের ধূপদীপের আরতি করলাম, তখন শিবসুত দেবসেনাপতি প্রতিমা অপেক্ষা বৃহত্তর দিব্যমূর্তিতে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন ও আমার গলায় রক্ত পুষ্পমাল্য পরিয়ে দিলেন। তখন তাঁর পীঠে তীরধনু বাঁধা ও তাঁর যোদ্ধবেশ ছিল। সান্ধ্য আরতির পর কাঁচড়াপাড়া শীতলী সংঘ শ্রীশ্রীচণ্ডীগান করলেন। ১৭ই শুক্রবার প্রাতে আমরা একতলার পশ্চিম বারান্দায় চা খেতে বসেছিলাম। তখন কৌমারী ও কার্তিক এসে হাত নেড়ে চা খেতে চাইলেন। আমি তাঁদের হাত-নাড়া স্পষ্টভাবে দেখলাম। ১৮ই শনিবার সন্ধ্যায় কোন্নগর ভবতারিণী ভক্তসংঘ মাতৃসঙ্গীত গাইলেন এবং ১৯শে রবিবার সন্ধ্যায় কার্তিক-কৌমারী প্রতিমা গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দেওয়া হোলো। বিসর্জনান্তে গঙ্গাতীরেই কার্তিক দেবতার এক শুদ্ধ সত্ত্বা এসে আমাতে প্রবেশ করলেন। ইহার ফলে রাত্রে আমার শরীর অসুস্থ হোলো। দেবশক্তি ধারণ সাধনসাপেক্ষ।

দেবী ভাগবতে 'কুমারসম্ভব' বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস

কৃত মহাকাব্য 'কুমারসম্ভব' অতিশয় মনোহর। যখন মহাদেব কামার্ত হয়ে মহামায়ার সঙ্গমাসক্ত ছিলেন, তখন দেবগণ ভাবিলেন, যদি শিবের ঔরসে মহামায়ার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহলে তিনি দেবজগতের ভীতিপ্রদ হবেন। বিষ্ণুর আদেশে দেবগণ অগ্নিকে অগ্রে নিয়ে শিবের যৌনক্রিয়া ভঙ্গ করিতে চলিলেন। তাঁরা কৈলাসে গিয়ে ভক্তিভরে শিবের স্তবাদি করলেন। সেই আকুল আহ্বানে গৌরীগর্ভে অমোঘ অমর বীর্য্য পতনের পূর্বে শিব তাঁকে ছেড়ে দেবগণকে দর্শন দিলেন। তখন শিববীর্য্য স্খলিত হয়ে অগ্নির অঙ্গে পড়ে। অগ্নি সেই তেজ সহ্য করতে না পেরে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন এবং অগ্নি ষট্‌শক্তি বা ষট্‌মাতৃকাকে আহ্বান করে শিববীর্য্য ধারণ করতে বলেন। তাঁর আদেশে ষট্‌মাতৃকা গঙ্গা থেকে শিববীর্য্য আহরণপূর্বক স্ব স্ব শরীরে ধারণ করেন। প্রসবকালে ছয় দেবী ছয়ভাগে ইহা প্রসব করে একত্রে যোজন করেন। সেইজন্য কার্তিকেয় ষড়ানন। অনন্তর গৌরী ক্রোধভরে উত্থিত হয়ে দেবগণকে অভিসম্পাত দেন, "আজ তোমরা যেমন আমাকে পুত্রলাভে বাধা দিলে, তেমনি তোমাদের দেবীসঙ্গ ব্যর্থ হবে, কোন সন্তান হবে না। তাই বৈবস্বত মন্বন্তরের পর (ত্রেতার প্রথম ভাগ) হতে আজ পর্য্যন্ত কোন দেবতা সন্তানলাভে সমর্থ হন নাই। কার্তিকের ছয় আনন ও আঠার নয়ন হলেও মানব কল্পনায় তাঁকে দ্বিভুজ দ্বিনয়ন করা হয় পুত্রেষ্টি যজ্ঞের নিমিত্ত। কৌমারী ত্রিনয়না ও কুমার শক্তি। তারকাসুর বধের পর ঋষিবর বিভাণ্ডক কার্তিকপূজা মর্ত্যলোকে প্রচার করেন। তিনদিন বিভাণ্ডক আমাদের মন্দিরে বিরাজিত ছিলেন। শুক্রবার বৈকালে পূজিত ঘট বিসর্জন করার পর কার্তিক, কৌমারী ও বিভাণ্ডক আমাকে দর্শন দিয়ে চলে গেলেন। তখন আমি মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় পশ্চিম মুখো হয়ে বসেছিলাম ও তাঁহাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখলাম ও প্রণাম করলাম।

সন্ন্যাসিনী মহাগৌরীর ২৭তম জন্মতিথি বেলুড় ধর্মচক্রে উদ্‌যাপিত হয়

৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে। উক্ত দিন প্রাতঃকালে কোন ভক্ত কলিকাতা থেকে এক ভাঁড় উৎকৃষ্ট রাবড়ি এনে মন্দিরে রেখেছিলেন। পশ্চিম বারান্দায় উপবিষ্ট ভৈরবানন্দ পরমহংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন স্নেহের গোপালজী উক্ত ভাঁড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে। গোপালজী রাবড়ি, দই, সন্দেশ প্রভৃতি দুগ্ধজাত মিষ্টদ্রব্য খেতে ভালবাসেন। অনন্তর শিবকে ও গোপালকে পৃথক্ পাত্রে রাবড়ি নিবেদন করলেন মহাগৌরী স্বয়ং। দুপুরে আমি ও মহাগৌরী মন্দিরে নিত্যপূজা করলাম এবং শিব, কালী, কল্কি ও শ্রীরামকৃষ্ণকে পৃথক্ পূজা ও পৃথক্ নৈবেদ্য দিলাম। শিবস্নানান্তে শিবপূজাকালে আমি শিবভাবে সমাহিত হলাম। তখন শিব স্বয়ং আমাকে শিবের সাজ পরালেন—হাতের উপরে ও নীচে রুদ্রাক্ষের মালা, উপর হাতে ও গলায় ও মাথায় সাপ জড়ান, ললাটে অর্ধচন্দ্র ও কোমরে ব্যাঘ্রচর্ম ও ডানহাতে ত্রিশূল। ইহার অর্থ, এখন থেকে আমাকে রুদ্রভৈরব ভাবে সাধন করতে হবে। নিত্যাভ্যাস বসে আমি যখন শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানে মগ্ন হবার চেষ্টা করলাম, তখন সম্মুখে উপবিষ্ট মহর্ষি কশ্যপ ডান হাত তুলে আমাকে নিষেধ করলেন। ইহার ফলে আমার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল ও আমি পার্শ্বে উপবিষ্টা মহাগৌরীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। মহাগৌরী ভৈরবানন্দকে উপরে ডেকে আনলেন। ভৈরবানন্দ মন্দিরে আসতেই কশ্যপমুনি তাঁকে বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ এখান থেকে সরে গেছেন গত ২৩শে নভেম্বর বুধবার এবং ভগবান কল্কিদেব স্বয়ং এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আগে তাঁর পূজাদি করা এখন থেকে এখানে তাঁর নিত্যপূজা হবে।"

তখন আমরা সর্বপ্রথমে কল্কিধ্যান ও কল্কিপূজা করলাম। কল্কিদেব মাকড়দহে ভৈরবানন্দকে বললেন, "শ্রীরামকৃষ্ণকে সরিয়ে আমি ধর্মচক্রের মন্দিরে বসেছি। আজ থেকে আমি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হয়েছি"। আপনিএই কথা ওঁকে জানিয়ে দিবেন।" ভৈরবানন্দ কল্কিদেবের

বর্তমান মুখপাত্র। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে খণ্ডশক্তি বলে আমরা প্রচার ও প্রমাণ করায় এবং আধুনিক ধর্মগ্লানি উদ্ঘাটিত করায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা ও এগারজন পার্ষদ আমার প্রতি রুষ্ট হয়ে আমাকে নানা ভাবে বিপর্যস্ত ও বিপদ্‌গ্রস্ত করেন। তাই কল্কিদেব উক্তরূপ অপ্রীতিকর আচরণ করতে বাধ্য হন। ৭ই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে এসে এই অদ্ভুত সংবাদ সংগোপনে আমাকে ও মহাগৌরীকে বলেন। আর বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে মহাগৌরী সমাহিত অবস্থায় দেখেন, ভগবান্ কল্কিদেব স্বর্ণময় সিংহাসনে মন্দিরে বিরাজমান। আমিও শুক্রবার কল্কিপূজা কালে ইহা অনুভব করলাম। অবশ্য পূজাকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে কল্কির পেছনে বসলেন। অন্নভোগ নিবেদিত হলে ঠাকুর ও শ্রীমা এলেন, কিন্তু পার্ষদগণ এলেন না। ইহার পর মন্দিরে রামকৃষ্ণ নাম-কীর্তনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ আসেন না—শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতারযুগল এসে কল্কির দুই পাশে দাঁড়ান। বিবেকানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, অঘোরমণি দেবী ও নাগ মহাশয় পূর্বোক্ত চক্রান্তে যোগ দেন নি। বলা বাহুল্য, সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ বেলুড় মঠ ত্যাগ করেছেন ও বেলুড় ধর্মচক্র ছেড়ে জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরে বিরাজ করছেন।*

* ১৬ই নভেম্বর ১৯৬১ বৃহস্পতিবার ধর্মচক্রে প্রতিমায় কার্তিক-কৌমারী পূজা হল। পূর্বদিন বুধবার রাত্রি ১॥০ টায় মন্দিরে ঠাকুরের পার্ষদদের একটি সভায় আলোচিত হল, "জগদীশ্বরানন্দ ঠাকুরকে খণ্ডশক্তি অবতার বলে প্রচার করছে। এখন কি করে তাকে রোধ করা যায়?" ঐ সভায় স্বামিজী, অদ্ভুতানন্দজী, অঘোরমণি ও নাগ মহাশয় ছিলেন না। ভৈরবানন্দজী একতলায় খাটে স্থূল দেহে শায়িত থেকে সূক্ষ্ম দেহে মন্দিরে ঐ সভায় এলেন ও সব দেখলেন। আমাকে ও কার্তিকঠাকুর এসে ঐ রাত্রে ঐ বিষয় জানিয়ে দিলেন। মহাগৌরীও দেখলেন, ইহাতে শিব, কালী ও কল্কি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

১৭ই শুক্রবার রাত্রে দেড়টায় আবার উক্ত সভা হবার কথা ছিল; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণ ১২টার পূর্বেই এলেন। কল্কিদেব তুমুল আপত্তি করায় সভা এখানে হল না। তাই পার্ষদদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, "একে দেখে নেবো।" ১৮ই শনিবার বা ২রা অগ্রহায়ণ রাত্রে ৩টার পরে

পূজান্তে মহাগৌরীর জন্মদিন উপলক্ষে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হলো। ইহাতে ভৈরবানন্দ পরমহংস পৌরোহিত্য করেন। আমিই সর্বপ্রথমে স্নেহাস্পদ মহাগৌরীকে মাল্যভূষিত ও চন্দন-চর্চিত করলাম। প্রথমে মহাগৌরীর ইষ্ট শিব এসে মাথায় মুখে ও গায় হাত বুলিয়ে দাড়ি ধরে চুমু খেয়ে তাঁর গলার রুদ্রাক্ষমালা সিদ্ধ ভক্তের গলায় পরিয়ে দিয়ে জ্যোতিঃমূর্তিতে তাঁর শরীরে প্রবেশ করলেন। ইহার ফলে মহাগৌরী সমাধিস্থ হলেন। কালী ও গৌরী দুই দেবী উক্তরূপে তাঁকে স্নেহাদর করে স্ব স্ব গলার দুই হার মহাগৌরীর গলায় পরিয়ে স্বর্গীয় মিষ্টান্ন ও পানীয় খাওয়ালেন। অনন্তর কল্কিদেব ভাবী গুরু মহাগৌরীর পদদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করলেন। ইতোমধ্যে গোপালজী এসে মহাগৌরীর কোলে

হঠাৎ ঝড় উঠলো। ঝড়ের বেগে বাহিরের পর্দা ভিতরে এসে গুটান ক্যাম্প খাটকে জোরে ধাক্কা দিয়ে শিবপ্রিয়ার উপরে ফেলল। ইষ্ট কৃপায় তার প্রাণ রক্ষা হলেও তার ডান হাতে ভীষণ আঘাত লাগলো। ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বললেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দই ক্রোধভরে ঐ খাট হঠাৎ ঝড় তুলে শিবপ্রিয়ার উপরে ফেলেছেন।

২১শে মঙ্গলবার বেলা ১২টায় আমরা খেতে বসেছি একতলার পশ্চিম বারান্দায়। আমি ইষ্টদেবীকে অন্নব্যঞ্জনাদি নিবেদন করতেই ঠাকুর মন্দির থেকে নেমে পূর্ণ মূর্তিতে আমার সামনে এলেন। উপরোক্ত কারণে আমি তাঁকে তিরস্কার করতেই তিনি রুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। আমি ভাবছি, অন্যদিন ঠাকুরকে ডাকলেও আসেন না। আজ অনাহুত হয়েও এলেন কেন? একটু পরে মহাপুরুষ এসে আমাকে হাত নেড়ে কিছু বললেন ও বকলেন। ইহার কারণ, ভৈরবানন্দ স্বামী এবার ২৯শে ডিসেম্বর মাকড়দহে ফিরে গিয়ে ঠাকুর ও মাকে ডেকে বলেছেন, "আপনারা বাবাকে অযথা লাঞ্ছনা করছেন বলে আপনাদের বিদেহ মুক্ত পার্ষদদের মারণ যজ্ঞ করব, তাদের শক্তি হরণ করে নেব, যেমন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের মারণ যজ্ঞ করেছিলেন। আর আপনাদের দুইজনকে বেলুড়মঠ থেকে সরাব।" এই জন্য মহাপুরুষজী এসে আমাকে বললেন, "তুমি তাকে ওসব করতে নিষেধ কর।" ঠাকুরের এগার পার্ষদকে ভৈরব স্বামী আটকে রাখায় ঠাকুর ও শ্রীমা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেলুড়মঠ ছেড়ে যেতে সম্মত হয়েছেন এবং কয়েকদিন পরেই বেলুড়মঠ ও ধর্মচক্র ছেড়ে জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরে গিয়ে বিরাজ করছেন।

বসলেন। আবার আমার আহ্বানে মন্দিরস্থ দেবগণ, কল্কিপত্নী পদ্মা ও বিষ্ণুপ্রিয়া এবং কল্কি-ভগিনী সুভদ্রা ও সুপর্ণা, কার্তিক ও গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি এসে মহাগৌরীকে বরণ করলেন এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের পেছনে মুখ ভার করে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার পিতা-মাতাও মহাগৌরীকে যথাসাধ্য বরণ করলেন। অনন্তর ভৈরবানন্দ পরমহংস তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। তখন সপ্তঋষি—কশ্যপ, শুক্রাচার্য্য, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, পুলস্ত্য ও পুলহ মহাগৌরীকে আশীর্বাদ করলেন। তৎপরে আমি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বদেবদেবীকে আহ্বানপূর্বক খঞ্জনি বাজিয়ে নামকীর্তন করি। সেই সময় পরমাত্মালোক থেকে দিব্য-জ্যোতির্মণ্ডল মহাগৌরীকে গ্রাস করতে উদ্যত হলেন। ইহার ফলে মহাগৌরী সবিকল্প সমাধিমগ্ন হলেন। ঐ ব্রহ্মজ্যোতিঃস্রোত মহাগৌরীকে গ্রাস করলে তিনি নির্বিকল্প সমাধিলাভ করতেন। কিন্তু তাঁর বয়স অল্প ও স্বাস্থ্য সুদৃঢ় নয় বলে স্বামী ভৈরবানন্দ এই জ্যোতিঃ রোধ করলেন। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানান্তে আমি মন্দিরের বাহিরে এসে পশ্চিম বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফটকের উপরে মাধবী কুঞ্জের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। তখন দেখলাম, দাড়িযুক্ত শ্যামবর্ণ স্থূলকায় একটি সূক্ষ্মদেহী মন্দিরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে বসে আছেন। আমি ভাবলাম, ইনি হয়ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত রামদত্ত। তাই সত্বর আমি মহাগৌরীকে ডেকে ঐ সূক্ষ্মদেহীকে দেখালাম। মহাগৌরী ভৈরবানন্দকে অবিলম্বে তাঁর কথা বললেন। যোগিরাজ ভৈরবানন্দ তাঁকে দিব্যদৃষ্টিতে দেখে জানালেন, "উনি ঠাকুরের সন্ন্যাসী পার্ষদ সিঁথিবাসী বুড়ো গোপাল ওরফে অদ্বৈতানন্দ স্বামী। এখন উনি স্বর্গবাসী এবং মন্দির মধ্যে যেতে না পেরে হাত নেড়ে প্রসাদ চাইছেন।" অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ঠাকুর বা শ্রীমা বা কোন পার্ষদ তাঁর কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করলেন না। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ, অঘোরমণি দেবী, দুর্গাচরণ নাগ ও স্বামী অদ্ভুতানন্দ—

এই চারিজন ব্যতীত ঠাকুরের কোন শিষ্যই স্থূলদেহে জ্ঞানলাভ করেন নাই। স্বামী শিবানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অভেদানন্দ প্রমুখ সকলেই দেহান্তে সাধন করে জ্ঞান লাভ করেছেন। শুধু তাহাই নহে, গিরিশ ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্ণ ঘোষ, রামদত্ত, স্বামী নির্মলানন্দ প্রভৃতি এখনো স্বর্গবাস করছেন। ঠাকুর গৌরীপুরীর শিক্ষাগুরু ছিলেন, দীক্ষাগুরু নন। গৌরীপুরীও তৎপ্রতিষ্ঠিত সারদেশ্বরী আশ্রমে সূক্ষ্মদেহে থেকে এখনো মোক্ষসাধনে মগ্ন আছেন। সান্ধ্য আরতির সময় মহাগৌরী প্রমুখ আমরা সকলে ভক্তকবি জয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্র সমস্বরে গাইলাম। তখন বামনাদি অবতার আবির্ভূত হলেন এবং কশ্যপতনয় বামনাবতার আমার মাথায় ডান পদ রেখে আশীর্বাদ করলেন। মন্দিরে মহাগৌরীর সাধন ও সিদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। তখন মদীয় ইষ্টদেবী আমার বাম পাশে দাঁড়ালেন ও কল্কিদেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে মন্দির আলো করে বসেছিলেন। আমরা যতবার কল্কি প্রণাম করলাম, উল্লিখিত সপ্তঋষি ততবার মাথা নীচু করে অনাগত অবতারকে সভক্তি প্রণতি জানালেন। রাত্রি ১০॥০টায় আহারান্তে আমি স্বীয় শয্যায় শুয়েছি ও মহাগৌরী উত্তর বারান্দায় শুয়েছেন। তখন আমি দেখলাম, একটী দেবী এসে আমার দিকে পেছন ফিরে বসলেন, যেমন বাপের কাছে স্নেহের কন্যা বসে। আমি তাঁর মাথার আঁচড়ান লম্বমান কৃষ্ণ কেশদাম দেখতে পেলাম। তাঁকে দেখে আমি মহাগৌরীকে স্বশয্যা থেকেই ডেকে বললাম, ইনি কি আমার কন্যা কৌমারী? মহাগৌরী বললেন, তা মনে হচ্ছে না। ক্ষণকাল পরে নবাগতা দেবীমূর্তি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। তখন আমি তাঁকে স্পষ্টভাবে দেখলাম—গৌরবর্ণা ও কমলা রঙের ওড়না গায়, শালোয়ার ও পাঞ্জাবী পরা সৌম্যমূর্তি। একটু পরে তিনি পাশ ফিরে আমার কাছে বসলেন। তখন আমি তাঁর

সুকুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ ও গণ্ডদেশ দেখলাম। আমি তাঁকে চিনতে না পেরে নীচে গিয়ে ভৈরবানন্দকে তাঁর কথা বললাম। ভৈরবানন্দ দিব্যদৃষ্টিতে তাঁকে দেখে ও যোগবলে জেনে বললেন, ইনি কল্কিপত্নী কমলা, যিনি পূর্ব পাঞ্জাবের চন্দ্রিগড়ে জন্মাবেন। কল্কিগুরুর জন্মদিনেই কল্কি-পত্নী কমলা আমাদের মন্দিরে এলেন ও আমাকে প্রীতিভরে দেখা দিলেন। সেদিন থেকে তিনি পদ্মা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে এই মন্দিরে বিরাজ করছেন।

মহাগৌরীর জন্মোৎসব উপলক্ষে আমরা আমাদের নাটমন্দিরে মৃন্ময়ী প্রতিমায় গণেশ পূজা করলাম পরদিন শনিবার ৯ই তারিখে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য পূজামণ্ডপে বিরাজ করলেন পরদিন বিসর্জন পর্য্যন্ত। শিব, কল্কি, রামকৃষ্ণ, কালী, সূর্য্য ও কামধেনুকে পৃথক্ নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করা হলো। সদ্যপ্রাপ্ত আঠার মন্ত্রে সিদ্ধিদাতা গণপতিকে আমি গন্ধপুষ্প ও ঘৃতসিক্ত বিল্বপত্র আহুতি দিলাম। অদ্য প্রাতে স্বামী ভৈরবানন্দ উক্ত মন্ত্র সমূহ আমার নিকট প্রকাশ করলেন।

পূজান্তে গণেশ হোমে—ওঁ গং সর্বসিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতায়ৈ স্বাহা মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত সাজ্য বিল্বপত্র আহুতি দিলাম। হোমাগ্নিতে গণপতি অগ্নিমূর্তি ধারণপূর্বক মদত্ত আহুতি নিলেন। শিব, কল্কি, কালী, কার্তিক, কৌমারী, কামধেনু, গঙ্গা, রামকৃষ্ণাদি যে সকল দেবতার নামে আহুতি দেওয়া হলো, তাঁরা সকলে হোমাগ্নিতে আবির্ভূত হয়ে স্বলে আমার আহুতি নিলেন ও হোম শিখা তিন হাতের অধিক উঁচু হয়ে উঠল। যখন চতুর্ভুজ গণপতিপ্রতিমায় ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন গণেশ ঠাকুর চার হাতে গদা, পদ্ম, শংখ ও চক্র ধরে প্রতিমায় প্রবেশ করলেন ও মৃণ্ময়ী প্রতিমা থরথর করে কেঁপে উঠল। অন্নভোগ নিবেদিত হলে উল্লিখিত গণেশাদি দেবগণ অন্নভোগ গ্রহণপূর্বক পরিতৃপ্ত হলেন। সকাল ৯।০ টা থেকে বৈকাল ২।০ টা পর্য্যন্ত পাঁচ ঘণ্টা গণেশ পূজা ও গণেশ হোমাদিতে আমরা কাটালাম। অতিরিক্ত

মানসিক পরিশ্রমহেতু বৈকাল ৪টায় আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় আমি মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় স্বীয় শয্যায় শুয়েছিলাম। তখন হিমকুন্দমৃণালাভ সর্বশাস্ত্র প্রবক্তা শুক্রাচার্য্য এসে আমার শয্যায় দাঁড়ালেন। তাঁর সুপুণ্য সান্নিধ্যে আমি অবিলম্বে সুস্থবোধ করলাম ও সান্ধ্য আরতি করতে সমর্থ হলাম। সান্ধ্য আরতির পর বিবেকানন্দ নাটমন্দিরে গণেশ প্রতিমার সম্মুখে হাওড়া মায়ের মন্দির শ্রীরামপ্রসাদ গীতিনাট্য পরিবেশন করলেন এবং প্রায় আড়াই শত নরনারী সওয়া দুই ঘণ্টা শান্ত ভাবে বসে এই সুমধুর গীতিনাট্য শুনলেন। তখন মন্দিরস্থ কল্কি ও শিবাদি দেবগণ এবং শুক্রাচার্য্য ও কশ্যপঋষি প্রতিমার সমীপে উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি ১১টায় আমি স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিত নয়নে দেখলাম, গোলাকার লম্বা নলের মুখ থেকে সর্পাকৃতি শ্বেতবর্ণ সজীব বস্তু বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার এই দর্শন সম্বন্ধে স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, "মূলাধারে সুষুম্না নাড়ীর নিম্ন মুখ ধুতুরা ফুলের মত প্রবস্থিত। উক্ত নাড়ী মধ্যে বজ্রিণী নাড়ীতে অবস্থিত ব্রহ্মনাড়ী আছে। এই ব্রহ্মনাড়ী কুণ্ডলিনীর লীলাক্ষেত্র। ঐ নাড়ী দিয়াই কুণ্ডলিনী মূলাধার থেকে সহস্রারে যাওয়া-আসা করেন। পূর্বোক্ত দর্শনের ইহাই যোগার্থ। এই ভাবে সকল সাধককে ইষ্টদেবতারা সাধন শিক্ষা দেন।"

রবিবার পূর্বাহ্নে আমরা গণেশ পূজার বিজয়াকৃত্য করলাম। তখন গণেশ, গণেশ-পত্নী রম্ভা দেবী, শুক্রাচার্য্য, কশ্যপাদি সপ্তঋষি, শিব ও কল্কি প্রমুখ মন্দিরস্থ দেবগণ পূজামণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন এবং নিবেদিত 'দধি-কড়মা' গ্রহণ করলেন। রম্ভাদেবী পূর্বদিন ও অদ্য মণ্ডপে ছিলেন। রম্ভাদেবী ব্রহ্মার কন্যা ও তাঁর বীজমন্ত্র—ওঁ ঘ্রৌং রম্ভাদেব্যৈ নমঃ। পূজাকালে মহাগৌরী সমাধিস্থ হয়ে দেখলেন, গণেশ, রম্ভা, কশ্যপ ও শুক্রাচার্য্য—এই চারিজনের বক্ষঃস্থলে তাঁদের বীজমন্ত্র শুভ্রবর্ণ বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। গণেশ ও রম্ভার বীজমন্ত্র ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

কশ্যপের মন্ত্র—ওঁ কশ্যপঋষয়ে নমঃ ও শুক্রাচার্য্যের বীজমন্ত্র—ওঁ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যায় নমঃ। পূজান্তে যখন আমি আরতি করলাম, তখন সিদ্ধিদাতা গণপতি আমাকে স্বহস্তস্থিত পদ্ম ও শংখ উপহার দিলেন। শংখ নাদব্রহ্মের প্রতীক ও পদ্ম স্বস্তিত্বের প্রতীক। শান্তি, আরোগ্য ও অভয়সূচক এই দিব্যপদ্ম। স্বামী বিবেকানন্দ ঋষিলোকের ঋষিদের সঙ্গে এলেন, তাঁর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে পূর্ববৎ এলেন না। ইহার অর্থ, তিনি গুরুভ্রাতৃসঙ্গ ছেড়ে পুরাতন ঋষিসংঘে যোগদান করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা ধর্মচক্র থেকে চলে যাবার পরে আমাদের আহ্বানে পূজাকালে তাঁরা আসেন, কিন্তু পার্ষদবৃন্দ আসেন না। ঐ দিন দুপুরে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী গঙ্গাস্নানে গেলাম। গঙ্গাগর্ভে দাঁড়িয়ে গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তিকালে আমি গঙ্গাদেবীর মাতৃমূর্তি দেখলাম। গঙ্গাস্নানান্তে আমরা পার্শ্বস্থ শ্মশানে শ্মশানকালী দর্শনে গেলাম। আমরা শ্মশান কালীকে সভক্তি প্রণাম করার পর কালীমাতা আমাকে ও ভৈরবানন্দকে ভস্ম-তিলক কপালে, মাথায় (সহস্রারে), দুই কর্ণে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিতে, মূলাধারে, ঈড়া নাড়ীতে, পিঙ্গলা নাড়ীতে, সুষুম্না নাড়ীতে, বাম ও ডান হাতের কব্জীতে ও বাহুতে পরিয়ে দিলেন। বৈকালে শ্রীরামপুর, কাঁচড়াপাড়া, ঢাকুরিয়া, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক ধর্মপিপাসু নরনারী এসে স্বামী ভৈরবানন্দের মুখে তিন ঘণ্টার অধিক সময় স্বোপলব্ধ তত্ত্বকথা শুনলেন। তন্মধ্যে একটী শিক্ষিতা কুমারী ছিলেন, যাঁর বয়স তেত্রিশ বৎসর। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে আমাকে বললেন, এই মহিলা ত্রেতাযুগের শেষপাদে রাবণের পুত্রবধু ইন্দ্রজিৎ-পত্নী প্রমিলা ছিলেন। বলা বাহুল্য, যোগদৃষ্টিতে ভৈরবানন্দ তৎপশ্চাতে দেখলেন, প্রমিলার সুদীর্ঘ সুবৃহৎ সুন্দরী মূর্তি। প্রমিলা মন্দোদরীতুল্যা সুন্দরী ও দানবকন্যা ছিলেন। সন্ধ্যায় মহাগৌরী গৌরীস্বরূপে সমারূঢ় হয়ে প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আরতি করলেন।

তখন গণেশ ঠাকুর দিব্য যুবক পুত্রমূর্তিতে সম্মুখে এসে গৌরীপদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে করজোড়ে আশীস ভিক্ষা করে মাথা বাড়িয়ে দিলেন। তখন মহাগৌরী দাঁড়িয়েই নিশ্চল অবস্থায় গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন, তৎহস্তস্থিত পঞ্চ প্রদীপও অচল রহিল। অনন্তর শ্রীরামপুর কীর্তন সমিতি তিন ঘণ্টার অধিক সময় কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন করলেন। তখন কালী, দুর্গা, গণেশ, কল্কি, শিব, গোপাল, কার্তিকাদি দেবগণ পূজামণ্ডপে বিরাজ করলেন। রবিবার মধ্যরাত্রে আমি গণেশ ও রম্ভাকে স্পষ্টভাবে দেখলাম। রম্ভাদেবী গাঢ় হলুদ রঙের শাড়ীপরা ও গৌরবর্ণা, তাঁর মুখখানি পূর্ণচন্দ্রবৎ শুভ্রবর্ণ ও সুষমামণ্ডিত। আর গণপতি গজানন ছিলেন না। এটী তাঁর আদিমূর্তি। যখন গণেশ জন্মগ্রহণ করেন, তখন বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ শিবপুত্র গণপতিকে আশীর্বাদ করতে আসেন। সেই সময় সূর্য্যাদি গ্রহের সঙ্গে শনিও আসেন। সকল দেবতাই গণেশকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু শনি মুখ ফিরিয়ে রইলেন। তা দেখে জগন্মাতা শনিকে বললেন, আপনিও আশীর্বাদ করুন। শনি বললেন, মা, আমার পত্নী আমাকে অভিশাপ দিয়েছে যে, আমি যাঁর দিকে তাকাব, তার সর্বাঙ্গ পুড়ে যাবে। ইহা শুনেও গণেশজননী পুত্রকে আশীর্বাদ করার জন্য শনিকে অনুরোধ করলেন। শনি গণেশের দিকে ফিরে তাঁর মুখদর্শন করা মাত্র গণেশ-মস্তক নষ্ট হয়ে গেল। অবিলম্বে বিষ্ণু ইন্দ্র-হস্তী ঐরাবতের মুণ্ড সুদর্শন চক্র দ্বারা কেটে এনে গণেশ-স্কন্ধে বসিয়ে দিলেন। তাই গণপতি গজানন হয়েছেন। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মাথা উড়ে গেল, মানুষের আর কি কথা! আমি গণেশের আদি মূর্তি দেখেছি ত্রিনয়ন চতুর্ভুজ নরমূর্তি তুল্য। পরদিন সোমবার সন্ধ্যায় আমাদের গণেশপ্রতিমা গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দেওয়া হলো। যখন মহাগৌরী নাটমন্দিরে প্রতিমা বরণ করলেন, তখন প্রতিমা সজীব হয়ে উঠল। গণেশ, রম্ভা দেবী, শুক্রাচার্য্য ও বাহন মূষিক পূর্ণরূপে বিরাজ

করলেন। আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে প্রতিমা পার্শ্বে দেখলাম। যখন প্রতিমাকে রিক্সাতে তুলে গঙ্গাভিমুখে আমরা ঢাকবাদ্যসহ চললাম, তখন প্রতিমার দক্ষিণে ময়ূরবাহনে সশস্ত্র কার্তিক এবং বামে শিব পার্ষদ নন্দী ও ভৃঙ্গী চলিলেন। গঙ্গাগর্ভে প্রতিমা স্থাপিত হলে স্বয়ং গঙ্গাদেবী বিদ্যুদ্বর্ণ ময়ূরপংখী পান্‌সি সহ তীর সন্নিকটে আসিলেন। গণেশের মূল সত্ত্বা ঐ দিব্য পান্‌সিতে আরোহণ করলেন এবং গণেশের সত্ত্বগুণী সত্ত্বা এসে আমার মধ্যে ঢুকলেন। তাই সারারাত্রি গণেশ-চিন্তায় আমার মন অভিভূত ছিল। এইরূপে আমাদের তিনদিনব্যাপী আনন্দোৎসব সমাপ্ত হোলো।

আলোচ্য প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত অদ্ভুত ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সন ১৩৬৮ সালে আষাঢ় মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত মাকড়দহে স্বামী ভৈরবানন্দের বাড়ীতে নারিকেল-ঘরে ইঁদুরগুলো মাটি তুলে পাকা দেওয়ালে ও মেজেতে গর্ত করে প্রায় ত্রিশটা গোটা নারিকেল ছাঁদা করে খেয়ে ফেলল। ঐ ঘর পরিষ্কার করা সত্ত্বেও ইঁদুরগুলো পালিয়ে গেল না, আবার মাটি তুলে পূর্ব্ববৎ অনিষ্ট করতে লাগল। তখন ভৈরবানন্দ মনঃস্থ করলেন, মুড়ি ও ফুলুরি আদি খাদ্যে র‍্যাট বম্ব (ইঁদুর মারার বিষ-বোমা) মিশিয়ে মূষিক-বংশ ধ্বংস করবেন। তখন মূষিকবাহন গজানন এসে লালশুঁড় নেড়ে মৃদুহাস্যে বললেন, "বিষ খাইয়ে আমার বাহন বংশ ধ্বংস করো না। এরা আর তোমার ক্ষতি করবে না।" তাই ভৈরবানন্দ পরমহংস র‍্যাট বম্ব দিয়ে মূষিককুল নাশ করতে নিরস্ত হলেন। ইহার পরে উক্ত ঘরে মূষিকদের উপদ্রব বন্ধ হয়ে গেল। এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা কেউ কোথাও শুনেছেন কি ?

১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে মহাগৌরী স্নানাগারে স্নান করছিলেন। তখন গণেশপত্নী রম্ভাদেবী তাঁর স্বর্ণভৃঙ্গারে স্নানজল নিয়ে তাঁকে শাশুড়ী জ্ঞানে তাঁর মাথায় দিব্য জল ঢাললেন। গৌরীত্ব-প্রাপ্তা মহাগৌরী ত্রেতাযুগের রম্ভার মূর্তি (১০॥ হাত লম্বা) দেখে ভয়

পেলেন। এইভাবে দেবতারা সিদ্ধ ভক্তসঙ্গে লীলা করেন। আজ পূর্বাহ্ণে দুটী ভক্ত স্বামী-স্ত্রী রামনগর থেকে দীক্ষা নিতে এলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে তাঁদের ইষ্টমন্ত্র আবিষ্কারকালে দেখলেন, তাঁরা উভয়ে পূর্বজন্মে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁদের পূর্বজন্মের দীক্ষাগুরুকে দেখতে চাইলে আমার দেহ থেকে পণ্ডিত শশধর বেরিয়ে টেবিলের উপর বসলেন। বলা বাহুল্য, আমিও আমার পূর্বজন্মের সূক্ষ্ম মূর্তি দেখলাম—গৌরবর্ণ, স্থূলকায় হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, গলায় যজ্ঞসূত্র ও রুদ্রাক্ষমালা এবং ডান হাতের কুনুইয়ের উপরে সোনার তারে বাঁধা রুদ্রাক্ষ, প্রবাল ও বড় স্বর্ণ মাতুলীর মধ্যে পুরশ্চরণসিদ্ধ দেবীকবচ বাঁধা। বলা বাহুল্য, আমার এই মূর্তি আমি পূর্বেও দেখেছি।

বেলুড় মঠের স্বামী মৈথিল্যানন্দ আমার সুপরিচিত সুপণ্ডিত গুরুভ্রাতা ছিলেন। ১৯৬১ সালে ফাল্গুণ মাসে দোলপূর্ণিমার উৎসব সময় বেলুড়মঠ ছেড়ে তিনি এখানে আসেন এবং এখান থেকে বসিরহাটে গিয়ে কিছুকাল বাস করেন। ইহার পর তিনি কাঁথিতে গিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের কয়েক দিবস পরেই তিনি এখানে আসেন উলঙ্গ প্রেতমূর্তিতে। গণেশপূজা দিবস শনিবার বৈকালে ও তিনি এসে পার্শ্ববর্তী রাস্তায় হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকেন ও যোগিরাজ ভৈরবানন্দকে দেখলেই নমস্কার করেন। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে ভৈরবানন্দ ধর্মরাজকে আহ্বানপূর্বক উক্ত সাধুপ্রেতকে ঊর্দ্ধগামী করতে প্রার্থনা করেন। তখন ধর্মরাজ জানালেন, ঐ প্রেতকে কর্মফলে তিন বৎসর এইভাবে থাকতে হবে। বৈদিক সন্ন্যাসীর কি শোচনীয় পরিণাম! স্বামী ভৈরবানন্দ ঐ সাধুপ্রেতকে মঙ্গলবার প্রাতে তাঁর গুরুস্থান বেলুড় মঠে পাঠিয়ে দেন। প্রথমে উক্ত প্রেত গুরুস্থানে যেতে চান নি। তাই চারজন যমদূত এসে তাঁর গলা টিপে ধরে তথায় নিয়ে গেলেন। পৃথিবী থেকে অন্তরীক্ষ পর্যন্ত তিন স্তর আছে। তন্মধ্যে প্রথম স্তরে

ঐ প্রেত থাকবে—দ্বিতীয় স্তরে উঠতে বা পৃথিবীতে পা দিতে পারবে না। ধর্মরাজ আরও জানালেন, প্রায় পাঁচ শত যম দূতকে ঐ সঙ্গে বেলুড়মঠে পাঠিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা চলে যাবার পর বেলুড় মঠ যমপুরীতে পরিণত হয়েছে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীর শেষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীসারদা ও পার্ষদগণ সহ ধর্মচক্রের মন্দির ছেড়ে এক বর্ষাধিক কাল চলে যান। তখন আমাদের মন্দির প্রেতপুরীতে পরিণত হয়েছিল—মন্দিরের উত্তর বারান্দায় অষ্ট প্রেত ও মন্দির মধ্যে দুই যমদূত রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে এক প্রেত ব্রাহ্মণকুমারী আমার মন্ত্রশিষ্যা ছিল, সে শ্রীরামপুরে আত্মহত্যা করেছিল। ঐ চৌদ্দ মাস যাবৎ রাত্রিকালেও দুই যমদূতকে আমি প্রায়ই মন্দির মধ্যে দেখতাম।

শনিবার গণেশপূজাকালে মহাগৌরীর মহাবায়ু অপান, সমান ও প্রাণ একত্রে বিশুদ্ধে উঠে পড়ায় তিনি মণ্ডপ থেকে চলে এলেন ও স্বীয় শয্যায় বেহুঁস হয়ে শুলেন। তখন তিনি দেখলেন, তিনি শয্যার মত অতি বৃহৎ শুভ্রবর্ণ পদ্মের উপর শুয়ে আছেন। ইহা বৃহদাকার ষোড়শদল বিশুদ্ধ পদ্ম। যে অনুভূতি তাঁর হলো, সেটী ইষ্ট দেখিয়ে দিলেন। এইভাবে ইষ্টদেব সিদ্ধভক্তকে সাধন শিক্ষা দেন। অধুনা এই মন্দিরে গৌরীদেবী পূজাকালে সারদার সিংহাসনে বসে পূজা নেন। তখন শিব স্বীয় সিংহাসনে বসে থাকেন। আমিও আমাদের মন্দিরে ভগবান কল্কিদেবকে সমুজ্জ্বল স্বর্ণময় সিংহাসনে রাজবেশে তলোয়ার হাতে বসতে দেখেছি। এখন এখানে কল্কি রাজা হয়েছেন ও ধর্মচক্রে কল্কিলীলা চলছে। ওঁ ভগবতে কল্কিদেবায় নমঃ।

৪ঠা মে ১৯৬২ শুক্রবার সকাল নয়টায় মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় বসে আমি 'কল্কি-গীতা'র ইংরাজি অনুবাদ লিখিতেছিলাম। রচনাকালে মনে প্রশ্ন উঠিল, কল্কিপুরাণের রচয়িতা কে? প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে ইহা ব্যাস কৃত; কিন্তু ব্যাসদেব ভৈরবানন্দকে বলেছেন,

কল্কিপুরাণ বাৎসায়ন বিরচিত। এই সম্বন্ধে আমার অন্তরে সন্দেহ উঠায় ব্যাসদেব পার্শ্বস্থ খাটের উপরে আবির্ভূত হয়ে বসে হাত নেড়ে আমাকে জানালেন, "আমি ভৈরবানন্দকে যাহা বলেছি, তাহা সত্য। আমার ডাকে মহাগৌরীও উপরে এসে খাটে সমাসীন ব্যাসদেবকে দেখলেন—বড় মাথা, বড় বড় চোখ, হৃষ্টপুষ্ট, গায় সাদা চাদর ও মাথায় পাকা চুল। আমি তাঁকে সভক্তি প্রণাম করতে তিনি মন্দিরে চলে গেলেন।

২৮ এপ্রিল সোমবার বেলা ২॥০ টায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে তন্দ্রিত নয়নে আমি দেখলাম, কোন দিব্যদেহী সিদ্ধঋষি এসে আড়ালে থেকে একটী বড় বাঁধান বই খুলে পাতা উলটে আমাকে দেখালেন, কিন্তু আমি তাঁকে আদৌ দেখতে পেলাম না। স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, উক্ত গ্রন্থ লক্ষশ্লোকী বিষ্ণুপুরাণ। উহা আপনাকে ব্যাসের প্রধান শিষ্য সূতমুনি দেখালেন ও বললেন, "আদি বিষ্ণুপুরাণ বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হয়েছে। তুমি যে সব কল্কি কথা 'কল্কি গীতা'য় ও 'দিব্যদৃষ্টি'তে প্রকাশ করছ, তৎসমুদায় অধুনালুপ্ত বিষ্ণুপুরাণে ছিল, তুমি পুনরায় এই সব কথা প্রকাশ করে ধন্য হলে।"

৫ই মে শনিবার রাত্রি ৮॥০ টায় মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় বসে আমি স্বামী বিশ্বরূপানন্দ দ্বারা দেওঘর প্রবাসী কোন বাঙ্গালী পণ্ডিতকে চিঠি লিখাইতেছিলাম, কল্কিপুরাণের কোন সংস্কৃত টীকা আছে কিনা? তখন একটী দিব্যদেহী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এসে আমাদের সম্মুখে শূন্যে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে জানালেন, কল্কিপুরাণের সংস্কৃত টীকা আছে। আমি তাঁর বৃহৎ স্বর্ণ হস্ত স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেলাম। আমার ডাকে মহাগৌরী নীচে থেকে উপরে এসে তাঁকে দেখলেন এবং তৎপরে মন্দিরে ঢুকে আমাকে বললেন, বোধ হয়, ইনি কল্কিপুরাণের রচয়িতা বাৎসায়ন। ইতো মধ্যে ঐ দিব্যদেহী পূর্বদৃষ্ট ব্রাহ্মণমূর্তি পরিবর্তনপূর্বক

স্বমূর্তি পরিগ্রহ করলেন—মাথায় জটা, শুভ্রদেহ, কপাল উজ্জ্বল, খালি গা, কোমরে ছোট সাদা কাপড় পরা, চোখদুটী বড় বড়, রুক্ষ দৃষ্টি ও বৃহৎ মূর্তি। তখন আমরা উভয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ঋষিবর বাৎসায়ন? ইহাতে তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন ও আমি সভক্তি প্রণাম করতে অদৃশ্য হলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, ইনি ঋষি বাৎসায়ন ও বিষ্ণুপুরাণের প্রথম টীকাকার। উক্ত টীকা অধুনা লুপ্ত হয়েছে। কল্কিপুরাণের বর্তমান টীকা পূর্ব টীকার আলোকে রচিত ও বাৎসায়ন কৃত নহে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কল্কিপুরাণের রচয়িতা রূপে বাৎসায়ন অধুনা পরিচিত নহেন। বাৎসায়ন জ্ঞানী ঋষি ও মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং ব্যাসদেবের পরে দ্বাপরের শেষে আবির্ভূত হন।

২৫ শে এপ্রিল বুধবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বেলা ১টায় আমি ও মহাগৌরী নীচতলার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করছিলাম—আমি মেজেতে মাদুরে শুয়েছি ও মহাগৌরী খাটের উপরে। এমন সময় আমার শিয়রে একটি দেবশিশু এসে বসলেন—দশ বৎসর বয়স, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল কাঁধ পর্য্যন্ত দোদুল্যমান, খালি গা, সাদা কাপড় পরা, ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়ে বসেছিলেন। এক মিনিট পরে তিনি অন্তর্হিত হলেন। অনন্তর আমরা উভয়ে বুঝিলাম, ইনি কল্কিদেবের মধ্যম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও বালকমূর্তিতে এসে আমাদিগকে প্রথম দর্শন দিলেন। বালক লক্ষ্মণের পূর্ণমূর্তি দর্শনের জন্য আমি উৎসুক হয়েছিলাম। তাই কল্কিভ্রাতা আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

৩রা মে বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্নে বেলা ৯৷৷০ টার সময় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় দক্ষিণ পাশে মাদুরে বসেছিলাম। মহাগৌরী মৎপ্রণীত 'কল্কিগীতা' থেকে স্বামী ভৈরবানন্দের জীবনী পড়ে আমাকে শুনাইতেছিলেন এবং আমি পা ছড়িয়ে শুয়ে তাঁর পাঠ

শুনিতেছিলাম। এমন সময় তন্দ্রিত নয়নে আমি দেখিলাম, একটি শ্যামবর্ণ দেবশিশু এসে মাদুরে বসে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে আমাকে নমস্কার করিতেছেন—মাথার কাল লম্বা চুল ঘাড় পর্য্যন্ত ঝুলছে, খালি গা, সাদা ধুতি পরা দশম বর্ষীয় ব্রাহ্মণ, বালক গলায় পৈতে, বড় বড় তারার মত দুই চোখ ও সমুজ্জ্বল বদনমণ্ডল। প্রথমে আমি ও মহাগৌরী ভেবেছিলাম, ইনি আমাদের রঙ্গপ্রিয় গোপালপন্থী। মুহূর্তমধ্যে আমাদের ভুল ভাঙ্গিল। হঠাৎ মনে পড়িল, বিগত ২৫শে এপ্রিল বুধবার বৈকালে একতলার ঘরে বিশ্রামকালে এইরূপ দেবশিশুমূর্তি আমি দেখেছিলাম। ইহা কল্কিভ্রাতা লক্ষ্মণের বালমূর্তি। লক্ষ্মণ ভাবী গুরুর মুখে 'কল্কিগীতা' পাঠ শুনিতেছেন। তৎক্ষণাৎ আমি সসম্ভ্রমে উঠে বসলাম এবং কল্কিভ্রাতা লক্ষ্মণ ধীর স্থির শান্ত মূর্তিতে আমাদের পাশে একই মাদুরে বসে পাঠ শুনিলেন ও পাঠ সমাপ্ত হইলে স্বস্থানে চলে গেলেন।

১৬ই মে ১৯৬২ ধর্মচক্রে অনাগত অবতার কল্কিদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হল পূর্ববর্ষবৎ। শিব, কালী, গণেশ, আদিত্যাদি নবগ্রহ, রামাদি নবাবতার পূজান্তে কল্কিপূজা ও কল্কি হোম হল। পূজাকালে সপ্ত কল্কিপত্নী—পদ্মা, বিষ্ণুপ্রিয়া, কমলা, লক্ষ্মী, সুভদ্রা, সাবিত্রী ও নারায়ণী এবং দুই কল্কিভ্রাতা রামকৃষ্ণ ও লক্ষ্মণ, দুই কল্কিভগিনী সুভদ্রা ও সুপর্ণা, একমাত্র কল্কিকন্যা শ্যামাঙ্গিনী, কল্কিজামাতা মুচুকুন্দ এবং কশ্যপ, অদিতি, গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক ও দুর্গা, গৌরী, গঙ্গা, শিব, গোপাল, কালী প্রভৃতি দেবতা উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ব্যাস, অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, ভৃগু, গর্গ, সন্দীপনী, বিশ্বামিত্র ও অঙ্গিরা, দেবগুরু বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমাগত ঋষিবৃন্দ কল্কিদেবের গলদেশে দিব্য শ্বেত পুষ্পমাল্য পরিয়ে দিলেন। কল্কিহোমে 'ওঁ কৌং কল্কিদেবায় স্বাহা' মন্ত্র সমস্বরে উচ্চারণপূর্বক আমরা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ নরনারী আহুতি দিলাম। তখন কল্কিদেব অগ্নিমূর্তিতে হোমানলে

আবির্ভূত হয়ে আমার আহুতি নিলেন এবং হোমশিখা ৩। ৩॥ হাত উঁচু হয়ে জ্বলিয়া উঠিল। অনন্তর আমরা ৫৪টী আজ্যসিক্ত বিল্বপত্রে আহুতি কালীমন্ত্রে দিলাম। তখন হোমাগ্নি হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেল, ১। ১।৹ হাতের অধিক উঠিল না বহু কাঠ ও ধুনো দেওয়া সত্বেও। আবার যখন কল্কির আবরণ দেবতাদের নামে আহুতি দেওয়া হল, তখন অল্প কাঠে অগ্নিশিখা লকলক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ইহার কারণ জগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, তোরা ত কালীমন্ত্রে আহুতি প্রদানের সংকল্প করিস্‌নি। মানবসমাজেও দেখা যায়, কোন কাজ কারোর নামে করিতে বা করাতে হলে, পূর্ব থেকে তাঁকে জানাতে হয়। তাহলে তিনি সে কাজ সানন্দে করেন। হঠাৎ তাঁকে বললে তিনি সন্তুষ্ট হন না, কার্য্যও সিদ্ধ হয় না। দেবসমাজে উক্ত বিধি প্রযোজ্য। কোন হোমে যে যে দেবতার নামে আহুতি দেওয়া হবে, হোমারম্ভেই তাহার সংকল্প করা বিধেয়। অন্নভোগ ও নৈবেদ্য প্রদানকালে দেখা গেল, বিবিধ ফলমিষ্টি ও অন্নব্যঞ্জনাদি এনে সমাগত ঋষিবৃন্দ কল্কিদেবকে খাওয়ালেন। সমবেত দেবগণ ও ঋষিবৃন্দ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছিলেন। সন্ধ্যার আরতি, 'কল্কিগীতা' পাঠ, গীতবাদ্যাদি রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত চলিল। দুপুরে প্রায় পঞ্চাশ জন ভক্ত অন্নপ্রসাদ পেলেন। সারাদিন প্রায় দেড়শত নরনারী আশ্রমে আসেন।

৭ই মে সোমবার সকাল নয়টায় আমি ও মহাগৌরী মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় মাদুরে বসেছিলাম। মহাগৌরী 'কল্কিপুরাণের গল্প' নামক পুস্তিকা পড়ে আমাকে শুনাইতেছিলেন। তখন কল্কিদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকৃষ্ণ গৌরবর্ণ বালমূর্তিতে এসে আমাদের পাশে মাদুরে বসলেন এবং কল্কিপুরাণোক্ত কল্কিকথা শ্রদ্ধাভরে শুনলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, কল্কির জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকৃষ্ণ মহাসত্বাংশে জন্মগ্রহণ করবেন মূল শক্তির কলাংশে—তাঁর মোটা জোড়া ভ্রূ যুগল, আকর্ণ বিস্তৃত আঁখি, মাথায় ঘন কৃষ্ণ কেশ, কপাল চওড়া ও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ।"

ঘুরে দেখলেন। অনন্তর তিনি ঐ জলে ডুব দিয়ে একেবারে তলদেশে মহাপঙ্কে নামলেন ও পংকাবস্থা পরিদর্শন করলেন। সেইজন্য এখনও স্থূলজগতে দেখা যায়, হংস বড় দীঘিতে অনায়াসে ভেসে বেড়াচ্ছে, আবার কখনও ডুবে তলায় যাচ্ছে। হংস ডুব দিয়ে আহারাদি সেরে আবার ভেসে উঠছে। হংসরূপী ভগবান উল্লিখিত পরা ক্রিয়া দ্বারা বুঝলেন, ঐ জলে মৎস্য জীবিত থাকতে পারে। তখন তিনি উক্ত জলে মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হলেন। তাই হংস ও মৎস্য প্রথম ও দ্বিতীয় অবতার।

যখন মৎস্যাবতার সেই জল সহ্য করতে পারলেন, মৎস্যের বংশবৃদ্ধি-ধারা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও প্রসারিত হলো, তখন পরমাত্মা কূর্মরূপে নেমে এলেন। কূর্ম জলে মুখ ভাসিয়ে থাকতে পারে, আবার পঙ্কমধ্যে ২৫।৩০ হাত গভীর গর্তেও থাকতে পারে। যখন তারা মাটীর মধ্যে ঢুকে, তখন নীচের মাটী জলের উপরে ওঠে। আবার ডিম্ব প্রসবার্থ কূর্ম ডাঙ্গায় যায়। সেইজন্য ইহারা জলের তলা থেকে মাটি ঠেলে ঠেলে নিজেরাই একটী জলশূন্যস্থান বা স্থল তৈরী করলেন। ইহার কারণ কূর্মাদি জন্তুগণ জলে বাস ও আহারাদি করলেও জলশূন্য শুষ্ক স্থানে ডিম পাড়ে ও ডিম ফোটায়। এই হেতু তারা উক্ত জলের তলায় মাটি তুলে স্থল সৃষ্টি করল। প্রথমে ভগবান্ দ্বিপদ হংসরূপে এলেন, তারপর মৎস্যরূপে ও তারপর কূর্মরূপে। একদিকে কূর্ম চতুষ্পদ, নাক মুখ চোখ মস্তকসম্পন্ন জন্তু। কূর্মের পীঠের খোলা এত শক্ত যে, তাহা ধারণাতীত। কূর্ম স্বীয় মুখ দেহমধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে। ইহাই উক্তরূপে ভগবানের আবির্ভাবের কারণ। তখনও ঐ জল জীবের সম্পূর্ণ উপযোগী হয় নি। সেইজন্য কূর্মরা চার পাঁচ ঘণ্টা, এমন কি একদিন পর্য্যন্ত স্বশরীরে মুখ লুকিয়ে আত্মরক্ষার্থ জলে বা স্থলে বসে থাকতে পারে। ইহারাই প্রথমে স্বপ্রয়োজনে স্থলভাগ সৃষ্টি করলেন। এইজন্য এদের দ্বারাই পৃথিবীর উৎপত্তি বলা যায়।

অনন্তর ভগবান বরাহমূর্তিতে অবতীর্ণ হলেন। বরাহ জলে আহার

করতে পারে। তারা জলে বহুক্ষণ থাকতে পারলেও অনিবার্য্য কারণে তারা শুষ্ক ডাঙ্গায় বাস করে। এইজন্য পরমাত্মা বরাহ অবতাররূপে নেমে এসে দেখলেন, আমার যেরূপ শরীর ও অবস্থা, তাতে কূর্মদের মত অল্পস্থানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন তিনি জলের ভিতর দাঁতের সাহায্যে মাটি তুলে তীরে জমা করে নিজ বাসস্থান সৃষ্টি করলেন। তাই শাস্ত্রে বলা হয়, বরাহ অবতার দন্তদ্বারা পৃথিবী ও বেদকে জল থেকে টেনে তুলেছেন। উক্ত মর্মে ভক্ত-কবি জয়দেব গেয়েছেন—'বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না।' মনে রাখতে হবে, আদি কূর্ম ও বরাহ বর্তমান আকারে নহে। ভগবান যে কূর্মাকারে নেমেছিলেন, সেই শরীরের পরিধি লক্ষ-কোটী যোজন বিস্তৃত ও লক্ষ কোটী যোজন উচ্চ। আর বরাহের উচ্চতা দ্বিকোটী যোজন ও বিস্তৃতি চার কোটী যোজন। ইহারাই প্রথম জল থেকে স্থলভাগ বা পৃথিবী সৃষ্টি করেন। তারপর পরমাত্মা জ্যোতিঃমিশ্রণে মহামায়াকে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁকে বললেন, তুমি এইবার বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার কর। তখন মহামায়া 'তথাস্তু' বলে বিষ্ণু ও শিবকে সৃষ্টি করেন। আর বিষ্ণুকে বলেন, তুমি বিশ্বের সৃজন ও পালন কর ও মহেশ্বরকে বললেন, তুমি সংহার কর। তখন বিষ্ণু বললেন, একক দেবতা দ্বারা এই দুই বৃহৎ কর্ম অসম্ভব। ইহাতে মহামায়া বিষ্ণুকে বললেন, ইহা সম্ভব হবে, সাধন কর। তখন শিব, যাকে যোগমার্গে সাধক-শরীরে পরম শিব বলা হয়, তথায় গিয়ে সাধনে বসলেন। আর বিষ্ণু বিশ্বের কারণ সলিলের তলদেশে সাধনে নিমগ্ন হলেন। সেইজন্য মানব শরীরে স্বাধিষ্ঠান চক্রে জলতত্ত্বে বিষ্ণুকে দেখা যায় ও বিষ্ণুর বীজমন্ত্র বং। বিষ্ণু সাধন করিতে করিতে যোগনিদ্রায় মগ্ন হইলেন। তখন তাঁর কর্ণকুহরদ্বয় হতে মধু ও কৈটভ নামে দুই দানব উৎপন্ন হন। দৈত্যদ্বয় আবির্ভূত হয়ে সেই জলমধ্যে বহুবর্ষ বিচরণ করতে লাগলেন। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি মধু-কৈটভের বংশধর। একদা মধু-কৈটভ কারণ-

সলিলে বিচরণকালে দেখলেন, বিষ্ণুর নাভিকমলে প্রস্ফুটিত পদ্মে চতুর্মুখ ব্রহ্মা সাধন করছেন। উক্ত কাজের জন্য বিশ্বপালক বিষ্ণু সৃষ্টিকর্তাকে স্বশরীর থেকে সৃষ্টি করলেন। সদ্যসৃষ্ট ব্রহ্মাকে দেখে মধু-কৈটভ আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে সংহার করতে উদ্যত হলেন। তখন ব্রহ্মা যোগনিদ্রামগ্ন বিষ্ণুকে জাগ্রত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হলেন না। অনন্তর তিনি মহামায়ার স্তব করতে লাগলেন। এই স্তব শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে ও দেবী ভাগবতে ভিন্নাকারে পাওয়া যায়। মহামায়া ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ করলেন। তাই মানব সাধক জীবনেও দেখা যায়, গভীর সমাধিতে ডুবে গেলে বা যোগনিদ্রামগ্ন হলে তাঁর ইষ্টনাম শোনালে তিনি ব্যুত্থিত হন। অনন্তর বিষ্ণু মধুকৈটভের সহিত পাঁচহাজার বৎসর বাহুযুদ্ধাদি করেন। কিন্তু স্বশরীরজাত জীবকে ধ্বংস করতে বা অধীনে আনতে পারলেন না। ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা ও শিব তিন দেবতাই পরমাত্মাধীন। এইজন্য মধুকৈটভবধহেতু তাঁকে মহামায়ার শরণ নিতে হলো। মহামায়া মায়াবলে মধু ও কৈটভকে মুগ্ধ করিলেন। তখন তাঁরা বিষ্ণুকে বললেন, "তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমাদের কাছে বর চাও।" তখন বিষ্ণু মধু ও কৈটভকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে আমার বধ্য হও। ইহাতে মধু ও কৈটভ বলিলেন, যদি তুমি আমাদের উভয়কে জলশূন্য স্থানে বধ করতে পার, আমরা তোমার বধ্য হতে সম্মত। 'শ্লাঘ্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ।' তখন উল্লিখিত বরাহসৃষ্ট জলশূন্য স্থানে বিষ্ণু মধু ও কৈটভকে এনে বধ করেন। তাহাদের মৃতদেহ কারণ সলিলে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সমগ্র সলিল পূর্ণ হয়ে বিরাট স্থূল ভূমিতে পরিণত হল। তাই শাস্ত্রে বলা হয়, মধুকৈটভের মৃত দেহ থেকে মেদিনীর উৎপত্তি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, তখন বিষ্ণু স্বীয় উরুতে জলশূন্য স্থান নির্দেশ করে সেখানে তাদের রেখে বধ করেন।

যদি এখানে বিষ্ণুর বিরাট শরীর স্বীকার করা হয়, তাহলে তাহা সম্ভব হতো। কিন্তু মধু ও কৈটভ দৈত্যদ্বয় বিষ্ণুতুল্য দেহধারী। আমাদের শাস্ত্রমর্ম সাধনালোকে জানা যায়। চণ্ডীতত্ত্ব দুরবগাহ, দুর্বিজ্ঞেয়। দেবীভাগবতে পূর্বোক্ত মধু-কৈটভ প্রসঙ্গে মহারাজা জনমেজয় ব্যাসদেবকে প্রশ্ন করলেন, যখন সকলে জলমধ্যে রইলেন, তখন বিষ্ণুর জানু কিরূপে স্থলভাগ হয়? ইহার উত্তরে ব্যাসদেব বললেন, "তখনও স্থলভাগ ছিল। সেখানে মধুকৈটভকে এনে বিষ্ণু বধ করেছিলেন।" ঐ স্থল-ভাগ উল্লিখিত বরাহ ও কূর্ম কর্তৃক সৃষ্ট। তৎপরে পালনকর্তা বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বললেন, "তুমি সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কর। তখন ব্রহ্মা সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড মানব শরীরেও সূক্ষ্মাকারে বর্তমান। মানবদেহ microcosm এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড macrocosm. মূলাধারে পৃথ্বী, স্বাধিষ্ঠানে জল, মণিপুরে অগ্নি, অনাহতে স্বর্গ, বিশুদ্ধে আকাশ, আজ্ঞাতে ব্রহ্মার লোক ও সপ্তম ভূমি সহস্রারের দ্বাদশদল পদ্মস্থ বিষ্ণুলোক বা গোলোক। এইরূপে ব্রহ্মা সপ্তব্রহ্মাণ্ড বা চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি করলেন। তাই মানব শরীরে দেখা যায়, সহস্রদল পদ্মস্থ দ্বাদশদল পদ্মের কিঞ্চিৎ উপরে একটী জ্যোতির্মণ্ডলোপরি হংসরূপ নিরঞ্জন অবস্থিত। তার নীচ থেকে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না আরম্ভ হয়ে মূলাধার পদ্মে শেষ হয়েছে। ইহাকে আমাদের সাধন শাস্ত্রে মৎস্য বলা হয়। ঐ সুষুম্নার মধ্যস্থ চিত্রিণী নামক নাড়ীতে দ্বাদশ চক্র গ্রথিত আছে উপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত। ইহা কূর্মপৃষ্ঠবৎ এত দৃঢ় যে, এক একটী চক্র ভেদ করতে মানুষের দুই তিন চার জন্ম কেটে যায়। কূর্ম দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হয়ে উক্ত সপ্ত স্থানে বিরাজ করছেন। বর্তমান কূর্মদেহের মেরুদণ্ডে সপ্তভাগে সপ্তছিদ্র বা সপ্তচক্র অবস্থিত। আর বজ্রিণী নামক যে সূক্ষ্ম নাড়ী মানব শরীরে আছে, ইহা বরাহ অবতারের প্রতীক। তন্মধ্যে অতিসূক্ষ্মাকারে কোটী দিব্য চন্দ্রসূর্য্যজ্যোতিঃসম্পন্ন যে নাড়ী আছে, তাকে ব্রহ্মনাড়ী বা পরমাত্মা নাড়ী

বলে। এই নিমিত্ত নরদেহে প্রথমে হংস, পরে মৎস্য (ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না) ও সপ্ত পদ্ম কূর্মাবতার রূপে ও বরাহ বজ্রিণী নাড়ীরূপে পূর্ণাকারে বর্তমান। তন্মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী মূল পরমাত্মধাম থেকে মূলাধারস্থ পৃথ্বীতত্ত্ব পর্য্যন্ত নেমে এসেছেন। পূর্বোক্ত অবতার চতুষ্টয়ের পর পৃথিবীর সৃষ্টি আরম্ভ হলো। সেইজন্য পূর্বোক্ত প্রকারে অবতার চতুষ্টয় পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত। পূর্বোক্ত পরমাত্মা নাড়ী বা ব্রহ্মনাড়ী সহায়ে সাধক-সাধিকা পরমাত্মলোকে বা ব্রহ্মধামে পৌছিতে হয়। প্রথম চারি অবতার সর্ব জীব দেহে বর্তমান। সেই হেতু উল্লিখিত অবতার নাড়ীগুলি জীব ও মানব দেহে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। অন্য সব নাড়ী ইহাদের পরিপূরক। যোগশাস্ত্রও বলেন, সুষুম্নাই সমস্ত শরীরের মূলনাড়ী ও অন্যান্য ৭২০০০ নাড়ী তৎসহ বিজড়িত। জন্তমূর্তি অবতার চতুষ্টয় দ্বারা জীব ও জগৎ গঠিত।

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়া অভয় সঙ্গীত পরিষদের সভ্যবৃন্দ বিবেকানন্দ নাটমন্দিরে ভক্ত কবি অভয়পদ বিরচিত শ্রীশ্রীচণ্ডীলীলা কীর্তন গাইলেন। কীর্তনের আরম্ভে স্বর্গগত অভয়পদ সূক্ষ্মদেহে এলেন। তিনি অদীক্ষিত ছিলেন ও তাঁর ইষ্টদেবী চণ্ডিকা। তিনি গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা মৃত্যুর পরে স্বর্গের তমোস্তরে উঠেছিলেন। তিনবার তাঁদের গান এই নাটমন্দিরে হলো। তিন বারেই দেখা গেল, স্বর্গবাসী অভয়পদ সূক্ষ্মদেহে কীর্তনের আসরে বন্দনার পরেই আসতেন এবং শেষ পর্য্যন্ত থাকতেন। এবার গীতিনাট্যের প্রস্তাবনার পর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ল। তখন স্বামী ভৈরবানন্দ ৺মাকালীকে স্মরণ করে আমাদের পশ্চিম মেনগেটের বাহিরে দাঁড়ালেন। যখন আসরে শ্রীশ্রীচণ্ডীর অন্তর্গত ব্রহ্মা কর্তৃক মহামায়ার স্তব গীত হলো, সেই সময় চণ্ডিকা ভৈরবানন্দকে বললেন, "তুমি আসরে বসে গান শোনগে যাও।" ভৈরবানন্দ তাঁকে বললেন, "মাগো, আমি ত কোনদিন আসরে বসে

গান শুনি না। আজ কেন বসতে বলছিস? অন্যদিন ত বলিস নি? মা কালী বললেন, "আজ তুমি আসরে যাও।" তখন ভৈরবানন্দ আসরে এসে বসলেন। ভৈরবানন্দ যখন ভাবাবিষ্ট হলেন, তখন চণ্ডিকা এসে ভৈরবানন্দকে বললেন, "মদ্‌ভক্ত অভয়পদ যাতে বিদেহ মুক্তিলাভ করতে পারে, সেই স্তরে তাকে তুলে দাও।" সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ বললেন, "মা, তুমিও চলো আমার সঙ্গে।" চণ্ডিকা হেসে বললেন, "তবে চল।" অভয়পদের কাছে গিয়ে চণ্ডিকা ও ভৈরবানন্দ উপস্থিত হলেন। অভয়পদ চণ্ডিকাকে ও ভৈরবানন্দকে সূক্ষ্মদেহে দেখে অবাক্ হলেন। অনন্তর তিনি প্রথমে চণ্ডিকা ও পরে ভৈরবানন্দকে প্রণাম করলেন। তখন চণ্ডিকা অভয়পদকে বললেন, "এখানে বস।" তখন ভৈরবানন্দ অভয় পদের পাশে বসে যোগশক্তি প্রয়োগ করলেন। স্থূল শক্তি ব্যতীত সূক্ষ্ম ক্রিয়া হয় না। যে সিদ্ধ সাধক স্থূল দেহ থেকে যোগবলে সূক্ষ্ম দেহ বাহির করতে পারেন, তিনি এই সূক্ষ্ম কর্ম করতে পারেন। দেবতারাও স্থূলদেহী তত্ত্বজ্ঞানীর সাহায্য ভিন্ন এই কাজ করতে পারেন না। ভৈরবানন্দ সিদ্ধশক্তি প্রয়োগ করলেন। সেই তেজ সইতে না পেরে অভয়পদ তাঁর ইষ্টদেবী চণ্ডিকার পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়লেন। তখন ইষ্টদেবী তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে তাঁকে সুস্থ করে দিতে অভয়পদ স্বর্গের সত্ত্বস্তরে উপনীত হলেন। এখান থেকে বিদেহ মুক্তির সাধন আরম্ভ হয়। এই স্থান থেকে সাধন করে বিদেহ মুক্তি লাভকরতে হয়।

স্বামী ভৈরবানন্দের গৃহ-কক্ষে অনেক দেবতা বিরাজ করেন। তাঁর ডান হাত কর্মক্ষম নয় বলে তিনি ব্যাসদেব দ্বারা উল্লিখিত দেববৃন্দের পূজারতি করান। প্রত্যেক দেবতার পূজারতি পৃথক্ ভাবে করলে প্রচুর সময় প্রয়োজন। তাই তিনি ব্যাসদেবকে বললেন, যত শীঘ্র পারেন, পূজারতি সমাপ্ত করুন। তখন ব্যাসদেব স্বদেহ থেকে বিশ ব্যাস সৃষ্টি করে প্রত্যেক দেবতার সামনে পৃথক্ মূর্তিতে

দাঁড়িয়ে ষোলধা আরতি করলেন। এইরূপে অল্পকালে পূজারতি সাঙ্গ হলো। ভগবান ব্যাসদেব বহুমূর্তি ধারণে সমর্থ। ব্যাসলীলা বর্ণনাতীত।

১৮ ডিসেম্বর, ১৯৬১ সোমবার বৈকাল ২॥০টায় বিশ্রামান্তে জেগে আমি নিজ বিছানায় শুয়ে আছি পূর্বদিকে মাথা ও পশ্চিম দিকে মুখ রেখে। তখন আমাদের নাটমন্দিরের ছাদ থেকে কোন্ সূক্ষ্মদেহী দুষ্ট অভিপ্রায়ে ছোট বলযুক্ত তীর ছুঁড়লেন আমার ডান চক্ষু লক্ষ্য করে। সেই সূক্ষ্ম তীর ক্ষিপ্র বেগে এসে আমার ডান চোখের একটু উপর দিয়ে চলে গেল, তীর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো। আমি ভয়ে খুব চমকে উঠে দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, একটি শুভ্রবর্ণা স্নেহময়ী দেবী মূর্তি প্রসন্ন প্রশান্ত বদনে দাঁড়িয়ে আমাকে অভয় দিচ্ছেন। তৎক্ষণেই আমি উত্তর বারান্দায় অবস্থিত মহাগৌরীকে চীৎকার করে ডাকলাম। মহাগৌরী ছুটে এসে নাটমন্দিরের ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দসদৃশ একজন দিব্যদেহী পেছন ফিরে ছুটে পালাচ্ছেন। যে রামকৃষ্ণানন্দজীর বিস্তৃত বাংলা ও ইংরাজী জীবনী দুই বর্ষ শ্রম করে বহুযত্নে লিখেছি, বেলুড় মঠে অবস্থান কালেও যাঁকে গুরুবৎ এতকাল ভক্তি করেছি, তিনি আমার একমাত্র দৃষ্টিশক্তিযুক্ত চক্ষু তীরবিদ্ধ করে আমাকে অন্ধ অক্ষম করে এই বার্দ্ধক্যে পীড়া দেবেন, তাহা আমি বিশ্বাস করতে পারিলাম না। চার দিন পরে ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বৈকালে ভৈরবানন্দ মাকড়দহ থেকে এলেন এবং বৈকাল ৪॥০টায় মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় বসে আমি ও মহাগৌরী তাঁকে পূর্বোক্ত ঘটনা বললাম। তিনি সমাহিত অবস্থায় যোগবলে পূর্বোক্ত সূক্ষ্মদেহীকে টেনে নাটমন্দিরের: ছাদে আনলেন। প্রিয় ও মহাগৌরী বিস্মিত হয়ে দেখলাম, ইনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটী পার্ষদ রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী, যিনি রামকৃষ্ণপূজা প্রবর্তন ও উক্ত পূজার

মন্ত্রাবলী রচনা করেন। তিনি আমাদের দিকে পেছন ফিরে অপরাধী-তুল্য দাঁড়িয়েছিলেন। বলিদানার্থ বেঁধে রাখা ছাগলকে ছেড়ে দিলে যেমন সে প্রাণভয়ে ছুটে পালায়, তেমনি সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ ছেড়ে দিতে রামকৃষ্ণানন্দজী ছুটে পালালেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে ধ্যানকালে আমি জ্যোতির্ময় কল্কি-মূর্তি সন্দর্শন করলাম—তাঁর দিব্যদেহ থেকে জ্যোতিঃ রশ্মি চারি দিকে বিকীর্ণ হচ্ছে।

২২শে ডিসেম্বর শুক্রবার ভোরে আমি বিছানায় শুয়ে দেখলাম, কামধেনু, গোপাল ও কৌমারী প্রভৃতি দেবতা এসে আমার শয্যায় দাঁড়ালেন এবং আমাদের সঙ্গে ঝাড়গ্রামে যাইতে চাহিলেন। আমরা তাঁহাদিগকে বুঝিয়ে নিরস্ত করলাম। মন্দিরবাসী মাতাপিতা আমার অনুমতির অপেক্ষা না করে আমাদের সঙ্গে চললেন এবং ট্রেণে আমি যখন ক্ষুধার্ত হলাম, তখন তাঁরা সূক্ষ্ম লুচি তরকারী এনে আমাকে খাওয়ালেন। আমাদের মন্দির রক্ষক কালভৈরবও সঙ্গে চললেন। কোলাঘাট ষ্টেশনের অদূরে আমি রূপনারায়ণ নদীর সোণালী বৈষ্ণবী মূর্তি দেখলাম। ট্রেনে আমরা একত্র বসেছিলাম। তখন আমি স্পষ্টভাবে দেখলাম, মহাগৌরীর ইষ্টদেব মহেশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। খড়্গপুর ষ্টেশন পার হয়ে আমরা যখন ভকপুরে গেলাম, তখন কালভৈরব ভৈরবানন্দকে ইঙ্গিত করলেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আড়ালে পশ্চাৎ অনুসরণ করছেন আমাকে চরম আঘাত দেবার জন্য, যাতে আমি ঝাড়গ্রামে গিয়ে ভাষণ দিতে না পারি। তখন ভৈরবানন্দ আমাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে বসলেন ও দিব্যদৃষ্টিতে রামকৃষ্ণানন্দজীকে দেখলেন। তৎকালে কালভৈরব ও 'জ্যান্ত ভৈরব' উভয়ে জগদম্বার নির্দেশে যুক্তি করে ছুটে গিয়ে রামকৃষ্ণানন্দকে শূলবিদ্ধ করলেন। ইহার ফলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ২।১ মাইল ছিনে ছুটে এসে কোলাঘাট ব্রিজের দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদীতীরে একটি বাঁকড়া বেলগাছের তলায় আহত হয়ে পড়ে রইলেন। কালভৈরবের ত্রিশূল

রামকৃষ্ণানন্দের সূক্ষ্মদেহ ভেদ করে মাটিতে গিথে গেল ও আহত সন্ন্যাসী যমযন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদা রামকৃষ্ণানন্দকে শূলবিদ্ধ দেখে হায়। হায়!! করে কাঁদতে লাগলেন। তিন চার দিন পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমাত্মার শক্তিবলে 'জ্যান্ত ভৈরবে'র শূলটি রামকৃষ্ণানন্দের সূক্ষ্মদেহ থেকে তুলে ফেললেন; কিন্তু কালভৈরবের মহাশূল তুলতে পারলেন না। যম-যন্ত্রণায় অধীর হয়ে রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুর ও শ্রীমাকে চীৎকার করে বলেছিলেন, "তোমাদের কি কোন শক্তি নাই, যার দ্বারা আমাকে এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে পার? ঠাকুর বললেন, কর্মফল ভোগ করতেই হবে। আট নয় দিন পরে আমরা যখন খেপুত থেকে কোলাঘাট ষ্টেশনে এলাম, তখন জগন্মাতার নির্দেশে কালভৈরব তাঁর শূলটি রামকৃষ্ণানন্দের সূক্ষ্মদেহ থেকে তুলে নিয়ে রামকৃষ্ণানন্দের সূর্য্যমণ্ডল ভেঙে দিলেন, যাতে তিনি আর মর্ত্যে নেমে কোন মর্ত্যের অনিষ্ট করতে, বা পূজাদি নিতে না পারেন। ঐ দিন থেকে মর্ত্যলোকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অবতরণ চিরতরে বন্ধ হলো। আর কোন মর্ত্যবাসী তাঁকে মর্ত্যে দেখতে পাবেন না।

শুক্রবার বৈকালে আমরা ঝাড়গ্রামে পৌছিলাম। সেবায়তনের আরোগ্য নিকেতনে একটী কক্ষে আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হলো। সারাদিন আহারাদি না হওয়ায় আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় অভিভূত হয়ে উক্ত কক্ষে স্ব স্ব খাটে শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম। তখন কল্কীপত্নী পদ্মাদেবী লম্বা কালো কোট পরে বৈকুণ্ঠ থেকে আমাদের জন্য হালুয়া প্রভৃতি সূক্ষ্ম খাদ্য আনিলেন। সেই সূক্ষ্ম দ্রব্য অন্য কেউ না খাওয়ায় তিনি আমাকে খাইয়ে চলে গেলেন। নৈশ আহারান্তে আমরা ঐ কক্ষে শুয়ে আলাপ করছিলাম। তখন ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী অনুভব করলেন, সেবায়তনের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে অগণিত অঙ্গহীন প্রেতমূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে— কারো পা নেই, কারো হাত নেই, কারো বা মাথা নেই। পরদিন

অনুসন্ধান করে জানা গেল, বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে ওখানে আহত সৈন্যদের একটি বৃহৎ শিবির হয়েছিল ও বহু সৈন্য ওখানে মরেছিল।

২৩শে ডিসেম্বর শনিবার সকাল বেলা দশটায় সেবায়তনের বাহিরে রাস্তায় ভ্রমণকালে আমরা ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্তের মন্ত্রদ্রষ্ট্রী অম্ভৃণ ঋষিকন্যা বাক্‌দেবীর কথা আলোচনা করছিলাম। তখন তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দের আহ্বানে ব্রহ্মবিদুষী বাক্‌দেবী আমাদের সমক্ষে আবির্ভূত হলেন—তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা, চিরযৌবনা, ঊর্দ্ধরেতা, মস্তকে সুদৃশ্য লম্বা জটা, দুই হাতে রুদ্রাক্ষ বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, বল্কলপরিহিতা কুমারী মূর্তি, দীর্ঘ প্রায় চৌদ্দহাত, দেবীতুল্যা জ্যোতির্ময়ী। আমরা তাঁর দিব্যমূর্তি দর্শন করে সুবিস্মিত হলাম। দুই তিন মিনিট পরে তিনি অন্তর্হিত হলেন। উক্তদিন সুদীর্ঘ সান্ধ্য ভ্রমণান্তে আমরা ফিরে এসে স্বকক্ষে বিশ্রাম করছি। রাত্রি আটটায় ভগবান কল্কিদেব ক্রুদ্ধমূর্তিতে বেলুড় ধর্মচক্র থেকে ঘোড়ায় চড়ে হাতে শাণিত কৃপাণ নিয়ে আমাদের কক্ষে এসে দাঁড়ালেন মহাগৌরী ও ভৈরবানন্দের কাছে এবং জানালেন,"আজ ওখানে আমার ভাল পূজা হয়নি। পাছে তোমাদের কোন অকল্যাণ হয়, তাই অশুভ সংবাদ জানাতে এলাম।" স্বামী ভৈরবানন্দ তাঁকে বললেন, "আপনি স্বশক্তিতে আমাদের মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এখন আপনি বৈষ্ণব বিক্রম দেখিয়ে আপনার পূজাদি আদায় করুন।" তখন তিনি গম্ভীর বদনে চলে গেলেন। ইতোমধ্যেই সূক্ষ্ম জগতে কল্কিলীলা আরম্ভ হয়েছে। তেইশ বৎসর যাবৎ সারা দেশে এই সূক্ষ্মলীলা চলবে এবং কল্কিজন্মের পরেই ইহার বহিঃপ্রকাশ দেখা যাবে।

২৪শে রবিবার ঝাড়গ্রামের অদূরে জামদা গ্রামে রামকৃষ্ণ কিশোর আশ্রমে আমি, ভৈরবানন্দ, মহাগৌরী, শিবপ্রিয়া প্রভৃতি পাঁচজন বেড়াতে গেলাম। ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষ অমিতানন্দজীর সঙ্গে কথা বলার সময় বিদেহ-মুক্ত অভেদানন্দ দিব্যদেহে এসে দাঁড়ালেন। ইহার কারণ, অমিতানন্দ

অভেদানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য। পরদিন সোমবার সকালে সেবায়তনের উত্তরে অভেদানন্দ স্মৃতিকুঠিয়া দেখতে গেলাম। ওখানে মহাগৌরী একটি শ্যামাসঙ্গীত হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইলেন ও সমাধিস্থ হলেন। তখন ঐ কুঠিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মচারীর দীক্ষাগুরু অভেদানন্দজী এলেন।

২৫শে ডিসেম্বর সোমবার বড়দিন, ভগবান যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন। পূর্বরাত্রে বহুবার বহুবর্ণ চতুষ্কোণ দেখেছি। উহা আকাশ তত্ত্বের প্রতীক এবং হলদে, কালো, নীল, সাদা প্রভৃতি নানা বর্ণে রঞ্জিত। উক্ত প্রতীক দর্শনের অর্থ, আকাশতত্ত্ব জয় বা বিশুদ্ধ পদ্মে স্থিতিলাভ। ইহার ফলে সাধক ইষ্টময় হন ও সাধকের শরীরে সর্বদেবদেবী প্রবেশ করেন। আরও কিয়ৎদূর সাধনমার্গে অগ্রসর হলে সাধক শরীরে প্রণবযুক্ত ইষ্টমন্ত্র লিখিত হয়। এই উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব সাধক ইষ্টনামাবলী গায়ে দেন ও ইষ্টমন্ত্রময় মৃতদেহ না পুড়িয়ে কবর দেন।

পূর্বদিন রবিবার সেবায়তনস্থ একটি বৃহৎ বটবৃক্ষতলে সমাহূত ধর্মসভায় আমি পৌরোহিত্য করলাম ও মহাভারতের অধ্যাত্ম সাধনা সম্বন্ধে পৌনে একঘণ্টা ভাষণ দিলাম। তখন ব্যাসদেব আমার মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং ইষ্টদেবী পশ্চাতে ও কল্কিদেব পার্শ্বে বিরাজ করলেন। আমি একমাত্র অনাগত অবতার কল্কিদেবের আসন্ন আবির্ভাব ঘোষণা প্রসঙ্গে মন্তব্য করলাম, "দ্বাদশ শতক থেকে জয়দেব প্রমুখ বাংলার ভক্ত কবিবৃন্দ প্রচার করছেন, কল্কিদেব আসবেন, তাঁর আবির্ভাব আর অধিক বিলম্ব নাই। তাই ভক্তগণ অজ্ঞাতসারে নানা স্থানে কল্কিপূজা, কল্কি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করছেন ও কল্কিকথা বলছেন।" সভাস্থ বেদীতে যোগিরাজ শ্যামাচরণের প্রতিকৃতি সুসজ্জিত ছিল। তাই শ্যামাচরণ এসে স্বালেখ্য সমীপে না বসে বটগাছের পেছনে দাঁড়ালেন। তত্ত্বজ্ঞানী ভৈরবানন্দ সভামঞ্চে বসায় তাঁর ব্রহ্মতেজ শ্যামাচরণ সইতে পারলেন না। পরমহংস ভৈরবানন্দ সমাহিত অবস্থায় সমবেত সহস্রাধিক নরনারীকে ব্রহ্মশক্তিবলে ধর্মভাবে অভিভূত করিলেন।

২৪শে ডিসেম্বর রবিবার মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে ভৈরবানন্দ সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হন। তখন তিনি ইষ্টদেবীকে প্রার্থনা করেন, "মা, সভার সময়ে আমাকে সুস্থ রাখিস, যেন সভায় বসে কাশতে না হয়।" তাই বেলা ১টার সময় ব্রহ্মময়ী ইষ্টদেবী এসে তাঁকে মাতৃস্তন্য পান করিয়ে সুস্থ করলেন। অনন্তর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এসে ভৈরবানন্দকে সনির্বন্ধ অনুনয় জানালেন, "শশীকে তুমি যে শূল মেরেছিলে, সেটি গতকাল অতি কষ্টে আমি তুলেছি। যে শূল তাকে কালভৈরব মেরেছিল, সেটি আমি তুলতে পারিনি। আমি অনুরোধ করায় কালভৈরব বললেন, 'জ্যান্ত ভৈরব' না বললে ঐ শূল তুলব না। তুমি শীঘ্র ঐ শূল তুলে দাও। স্নেহের শশী রূপনারায়ণ নদীতীরে শূলবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে ও অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে।" ভৈরবানন্দ ঠাকুরকে বললেন, "ও এখন স্বকর্মফল ভোগ করুক।"

২৫শে সোমবার সকাল সাতটায় আমাদের বাসকক্ষে আমার দুই কন্যা পদ্মা ও কমলা এসে দাঁড়ালেন। বেলা দশটায় আমরা যখন উক্ত কক্ষে বসে মুড়ি খাইতেছিলাম, তখন শ্রীরামপুরের যুক্তেশ্বর গিরি সূক্ষ্মদেহে এসে পাশ ফিরে দাঁড়ালেন—মাথায় পাগড়ি, গেরুয়া পরা, উজ্জ্বল বর্ণ। স্বামী ভৈরবানন্দ তাঁকে দেখে বলেন, ইনি চরম ইষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত ও স্বর্গের সপ্তস্তরবাসী।"

বেলা ১১টায় আমি, মহাগৌরী ও শিবপ্রিয়া পার্শ্ববর্তী রাজবাঁধ নামক বৃহৎ দীঘিতে চান করতে গেলাম, ভৈরবানন্দ গেলেন না। আমি দীঘির জলে স্নান করতে নেমে দেখলাম, আমার বিদেহমুক্ত পিতৃদেব পাশেই স্নান করতে নামলেন—তাঁর মাথায় টাক পড়েছে, মাথার পেছনে অল্প সাদা চুল আছে। গত দুই বর্ষ তিনি আমাদের মন্দিরে সাধন করে সম্প্রতি বিদেহ মুক্তি লাভ করেছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে আমরা পূর্বোক্ত কক্ষে এক একটি খাটে শুয়ে বিশ্রাম করছি। তখন আমি দেখলাম, মীরাবাঈর পতি স্বর্গবাসী যুবরাজ ভোজ এসে খাটের কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে নমস্কার

করলেন—গৌরবর্ণ সুপুরুষ তরুণ, বাম হাতে রুমাল ধরে নিজ মুখ মুছছেন, মাথায় সুকুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ, গোঁফ আছে, আচকান জামা গায়, বেনারসী সাদা ধুতি পরা। ভোজরাজের সঙ্গে তাঁর ইষ্টদেবী মা কালী ছিলেন। আমাকে নমস্কারান্তে ভোজরাজ ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরীর কাছে গিয়ে নমস্কার করলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, "ভোজ কল্কির সময়ে জন্মাবেন ও কল্কিভক্ত হবেন।" বেলা দুইটায় স্বীয় শয্যায় শুয়ে আমি দেখলাম, প্রথমে মীরাবাঈ ও কিঞ্চিৎ পরে তাঁর গুরুদেব রুইদাস এলেন। মীরাবাঈ লালপেড়ে সাদা শাড়ী পরা, গৌরবর্ণা, বৈকুণ্ঠবাসিনী, দুইহাতে সোণার বালা, মাথায় কাপড় ও গলায় মুক্তাহার। রুইদাস বিদেহমুক্ত কৃষ্ণভক্ত, গোঁফদাড়ী আছে, কোমরে উত্তরীয় জড়ানো, মাথায় কালো চুল, খালি পা, সাদা ছোট কাপড় লুঙ্গির মত পরা। বৈকালে পূর্বোক্ত বটতলায় আহুত ধর্মসভায় মীরা, চৈতন্য, তুলসীদাস, কবীর, রুইদাস, দাদু প্রভৃতি মধ্যযুগের সন্তবৃন্দ সম্বন্ধে আমি পৌনে একঘণ্টা কথকতা করলাম। পাঁচ শতাধিক নরনারী মন্ত্রমুগ্ধবৎ ধীর স্থির হয়ে আমার কথকতা শুনলেন। তখন ব্যাসদেব আমার মধ্যে ঢুকলেন, কল্কি ডান দিকে ও বিষ্ণু বাম দিকে, ইষ্টদেবী পশ্চাতে এবং সম্মুখে মীরা ও ভোজ এসে দাঁড়ালেন। যখন সন্ত দাদুর প্রসঙ্গ করলাম, তখন দাদুও এলেন। যখন যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর প্রসঙ্গ করলাম, তখন এই ব্রহ্মজ্ঞদম্পতি উপস্থিত হলেন। শ্যামাচরণ লাহিড়ী ও যুক্তেশ্বর গিরি উভয়ে পূর্বদিনবৎ সভাস্থলে বিদ্যমান ছিলেন। রাত্রি আটটায় আমরা পূর্বোক্ত কক্ষে শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম। তখন একটি স্বর্গবাসী তান্ত্রিক সাধক এসে আমাদের কাছে ঊর্দ্ধগতির প্রার্থনা জানালেন। স্বামী ভৈরবানন্দ তাঁকে বললেন, মর্ত্যে ফিরে এসে সাধন কর। তখন সেই স্বর্গবাসী নিরাশ হয়ে স্বস্থানে গেলেন। ভোর রাত্রে চারটায় মীরাবাঈ এসে আমার কাছে দাঁড়ালেন, সাদা শাড়ী পরা। আমরা পরদিন ভোরে ঝাড়গ্রামে, প্রসিদ্ধ প্রাচীন সাবিত্রী মন্দির দেখতে

যাব বলে সংকল্প করেছিলাম। তাই সাবিত্রী দেবী এসে দয়া করে আমাকে দর্শন দিলেন। সেই সময়ে আমি জপমগ্ন থাকায় প্রথমে তাঁকে দেখতে পাই নি। তাই স্নেহের মীরা আমার ডান হাতের দুই তিনটি আঙ্গুল ধরে বললেন, "গুরুজী, সাবিত্রী দেবী এসেছেন। আপনি তাঁকে প্রণামও বন্দনা করুন।" সাবিত্রী বাল সূর্যবৎ রক্তবর্ণা, ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা—খড়্গা, পাশ ও বরাভয় মুদ্রাদ্বয় চারহাতে, মাথায় সোণার মুকুট, নানা আভরণে সুভূষিতা, বালসূর্য্যবর্ণ শাড়ী পরা। তখন মৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে ভৈরবানন্দ ধ্যানযোগে জেনে এই সাবিত্রীমন্ত্র বললেন—ওঁ সোং সাবিত্রীদৈব্যৈ নমঃ। তখনই আমি একশত আটবার সদ্যপ্রাপ্ত সাবিত্রীমন্ত্র জপ ও সাবিত্রীমূর্তি ধ্যান করলাম। বলা বাহুল্য, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী উভয়ে সাবিত্রী দেবীকে তখন দেখলেন। মঙ্গলবার সকালে আমরা পাঁচজন ভৈরবানন্দ, মহাগৌরী, শিবপ্রিয়া প্রভৃতি পাঁচ মাইল পথ হেঁটে সাবিত্রী মন্দিরে গেলাম। মন্দিরদ্বার রুদ্ধ থাকায় আমি বারান্দায় বসে সদ্যপ্রাপ্ত সাবিত্রীমন্ত্র জপমালায় তিনবার একশ আট জপ করলাম। তখন সাবিত্রী দেবী দিব্য মূর্তি ধরে আমার মানস নয়নে প্রকটিত হলেন। উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঝাড়গ্রামের স্বর্গবাসী মহারাজা সত্যনারায়ণ মল্ল। তিনি ও তাঁর রাণী সূক্ষ্মদেহে এসে মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের সম্বর্ধনা করলেন। 'জ্যান্ত ভৈরব' সূক্ষ্মদেহে মন্দির মধ্যে গিয়ে সাবিত্রী দেবীর পদে প্রস্ফুটিত রক্তপদ্মত্রয়, রক্তজবা, শ্বেতপদ্ম, পারিজাত পুষ্পের মাল্যাদি দিয়ে সূক্ষ্মপূজা করলেন। স্বামী ভৈরবানন্দ বলেন, "সাবিত্রী দেবী ব্রহ্মশক্তির অংশভূতা এবং ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী ও সত্যবানের পত্নী সাবিত্রী স্বতন্ত্র। প্রথমা সাবিত্রী গায়ত্রীর প্রাতঃকালীন কুমারী মূর্তি। এই সাবিত্রী মন্দির পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন মন্দির। শ্রীসুবোধ ঘোষ প্রণীত 'কিংবদন্তীর দেশে' নামক পুস্তকে উক্ত মন্দিরের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ। সাবিত্রী মন্দিরে যাবার পূর্বে আমি ও রামু

ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ দেখেছিলাম। উহা মহারাজা নরসিং মল্ল কর্তৃক ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। সাবিত্রী মন্দির দর্শনান্তে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপীঠে গেলাম এবং তথায় ঠাকুর ঘরে প্রণামকালে আমি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাকে দেখলাম। সারদা পীঠ থেকে আমরা ঝাড়গ্রাম রাজবাটীতে শিবমন্দির ও রাধাকৃষ্ণ মন্দির দেখতে গেলাম। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি বিবিধ মণি মুক্তাখচিত অলংকারে শোভিত। বেলা দেড়টায় আমরা সেবায়তনে ফিরে আহারান্তে নির্দিষ্ট কক্ষে বিশ্রাম করছি। আমি নিজ খাটে শুয়ে দেখলাম, আমার অদূরে নৈহাটী গ্রামের গজেন দত্ত সূক্ষ্ম মূর্তিতে এসে দাঁড়ালেন। স্বামী ভৈরবানন্দ অদূরে শুয়ে ঐ সূক্ষ্মমূর্তি দেখে বললেন, "গজেনদত্ত স্বগ্রামে স্বগৃহে গভীর ভাবে চিন্তা করছেন—আমরা তাঁর পত্র পেলাম কিনা অথবা আগামী কাল তাঁর ওখানে যাবো কিনা। তাই আপনি তাঁর স্থূল দেহের প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবে দেখলেন।" পরদিন নৈহাটীতে গিয়ে গজেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করে আমি জানলাম, ইহা অতি সত্য।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমি ও মহাগৌরী সেবায়তনস্থ আরোগ্য-নিকেতনের বারান্দায় বসে আছি। তখন স্বামী ভৈরবানন্দ গেছেন ডক্টর সরোজ কুমার দাস মহাশয়ের সঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত মৈত্রেয়ীর সাধন সম্পর্কে কথা বলতে অল্প দূরে অন্য এক কক্ষে। তৎপূর্বে বিপত্নীক সরোজ দাসের মৃতা প্রথমা পত্নী তটিনী দাসের প্রেতমূর্তি দেখে আমাকে উহার হুবহু বর্ণনা দিলেন। তখন আমি সম্মুখে দেখলাম, একটি দিব্যদেহী নারীমূর্তি এসে অঙ্গপ্রভায় বারান্দা আলো করে দাঁড়ালেন। মহাগৌরী তাঁকে দেখে বললেন, 'নিশ্চয়ই ইনি ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্ম-বিদুষী ধর্মপত্নী মৈত্রেয়ী—স্বর্ণবর্ণা, আকর্ণ বিস্তৃত নয়নযুগল, তীক্ষ্ণ নেত্রা, মাথার কেশদাম পা পর্যন্ত দোদুল্যমান, নানা অলংকারে ভূষিতা, সাদা শাড়ী পরা, দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তিনি বৃক্ষতলে কিরূপ

পর্ণকুটীরে বাস করতেন তাহা মহাগৌরীকে দেখালেন। তাঁর কুটীরে খড়ের চাল ও বাঁশের খুঁটি। তাঁর অঙ্গকান্তিতে পর্ণকুটীর আলোকিত। ক্ষণকাল পরেই তিনি অন্তর্হিত হলেন। যখন যাজ্ঞবল্ক্য গৃহত্যাগ করার পূর্বে স্বীয় ঐহিক সম্পদ কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইলেন, তখন মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, "যে সম্পদ দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হব না, তা নিয়ে কি করব?" মৈত্রেয়ী ও বাক্ প্রভৃতি বৈদিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মবিদুষী।

সারদাপীঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একটি বড় মোটা কুকুর (কমলা লেবুর মত গায়ের রং) এসে ভৈরবানন্দের পায়ে পায়ে বার বার লুটিয়ে পড়ল ও জৈবভাষায় বলল, "আমার কুকুর যোনির পরমায়ু শীঘ্র শেষ করে দিন। সে রাজবাড়ীর গেষ্ট হাউস পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল। তখন সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ তার পূর্বজন্মের কথা যোগবলে জেনে কুকুরটির গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, "বুঝতে ত পারছি সবই। যতদিন কুকুর যোনি আছে ভোগ করে নাও।" সেবায়তনে ফিরে বৈকালে ভৈরবানন্দ আমাকে বললেন, "যে মোটা কুকুরটি ওখানে আমার পায়ে বারবার লুটিয়ে পড়ল, সে পূর্বজন্মে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য কৃপানন্দ স্বামী ছিল। আপনি কৃপানন্দের নাম শুনেছেন কি?" আমি কৃপানন্দের পূর্বনাম ভুলে গিয়েছিলাম বলে ভাবতে লাগলাম। নিজ খাটে শুয়ে বিশ্রাম করতে করতে আমি কৃপানন্দের পূর্বনাম স্মৃতিপথে আনার চেষ্টা করছি। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্য স্বর্গবাসী রামদত্ত সূক্ষ্মদেহে এসে স্বরচিত "রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত" বইখানি খুলে আমাকে বললেন, "আরে ভুলে গেলে! কৃপানন্দের পূর্বনাম বৈকুণ্ঠ সান্যাল।" বৈকুণ্ঠ সান্যাল সন্ন্যাস গ্রহণান্তে গুরুভ্রাতাদের সহিত তীর্থভ্রমণ ও তপস্যাদি করেছিলেন। তৎপরে তিনি সন্ন্যাস ত্যাগ ও বিবাহ করে সংসারী ও পুত্রকন্যার পিতা হন। যখন তিনি স্থূলদেহে ছিলেন, আমি তাঁকে দর্শন ও

প্রণাম করেছি। তিনি সন্ধ্যাকালে এসে উদ্বোধন কার্য্যালয়ে একতলার ঘরে স্বামী সারদানন্দের পাশে প্রায়ই বসতেন। পবিত্র বৈদিক সন্ন্যাস আশ্রম থেকে পতিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠ কুকুর যোনি প্রাপ্ত হয়েছেন। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় দুরবস্থা আর কি হতে পারে? বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য মোক্ষধর্ম সাধন। সকলে মোক্ষধর্মের অধিকারী নয় বলে বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ সকলের পক্ষে কর্তব্য নয়।

২৭শে বুধবার ভোর রাত্রি চারটায় নৈহাটী গ্রামে ভক্তগৃহে আমি শয্যায় বসে ধ্যানকালে ইষ্টদেবীকে মৎ পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখলাম ও ভৈরবানন্দকে বললাম। তখন বহুরূপী ইষ্টদেবী সাদা শাড়ী পরে মানবী মূর্তি ধরে বসেছিলেন। বুধবার মহানিশায় তিনি ভৈরবানন্দকে বললেন, "তোর বাবাকে বৈশ্বানর অগ্নিতত্ত্ব বলে দে। সে রোজ তিনবার এইভাবে বৈশ্বানর অগ্নিধ্যান করুক—স্থূল ও সূক্ষ্মদেহাদি পঞ্চশরীর বা পঞ্চকোষ ও স্বর্গ মর্ত্যাদি উর্দ্ধাধঃ সর্বলোক এক কথায় বিশ্বজগৎ বৈশ্বানর অগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সেই ছাই থেকে অগ্নিরূপী মহাকারণ সহায়ে আবার অগ্নিবর্ণ দিব্যদেহ সৃষ্ট হল।" মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত সপ্ত পদ্মে বৈশ্বানর অগ্নিধ্যান করলে যে দিব্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহার সহিত পরমাত্ম লোকাগত ব্রহ্মাগ্নি মিলিত হয়ে পঞ্চকোষ ও চৌদ্দলোক বিদগ্ধ করে। এই প্রক্রিয়ায় নিত্যকৃত পাপ নাশ ও নিত্য দিব্যভাব আশ্রয়পূর্বক দিব্যদেহ ধারণে মুমুক্ষু সাধক অভ্যস্ত হয়। বৈশ্বানর অগ্নি মূলাধারে অবস্থিত। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে চতুর্দশ শ্লোকে আছে—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥

অনুবাদ—ভগবান বলিতেছেন, আমি প্রাণিগণের দেহে বৈশ্বানর উদরাগ্নিরূপে বাস করে প্রাণ ও অপান বায়ুদ্বয়ের সহিত যুক্ত হয়ে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্বিধ খাদ্য পরিপাক করি।

যখন মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত সতের যোগচক্রে বৈশ্বানর অগ্নি জ্বলে উঠে তখন পরমাত্মার অগ্নিজ্যোতি মূলাধার পর্যন্ত নেমে আসে ও ব্রহ্মাগ্নিতে পরিণত হয়। সাধকের শরীর ভস্মাকারে পরিণত হওয়ার পর পরমাত্মাই মহাকারণ দ্বারা সাধকের দিব্য দেহ নির্মাণ করেন। এইরূপে মুমুক্ষু সাধক ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন। এই গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশ-যোগ্য নহে। নৈহাটীতে ভক্তগৃহে বুধবার মধ্যরাত্রে দুইটি সূক্ষ্মদেহী এসে আমাদিগকে শ্রদ্ধাভরে সম্বর্ধনা করলেন। আমি, ভৈরবানন্দ, মহাগৌরী, শিবপ্রিয়া প্রভৃতি পাঁচজন একই কক্ষে পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় শুয়েছিলাম। বুধবার সন্ধ্যায় আমরা নৈহাটী গ্রামে গেলাম এবং বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার থেকে শনিবার দুপুরে আহারাদি করে বেলুড়ের অভিমুখে রওনা হলাম।

২৮শে বৃহস্পতিবার সকালে আমরা পাঁচজন খেপুতে শিবতলায় দণ্ডেশ্বর শিবদর্শনে গেলাম। যখন আমরা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলাম, তখন ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী উভয়ে দেখলেন, দণ্ডেশ্বর মহাদেব পূর্ণ মূর্তিতে প্রকটিত ও তৎপার্শ্বে একটি বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ মধ্যমাকৃতি দিব্যদেহী উপবিষ্ট—তাঁর কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় ও দুই হাতে রুদ্রাক্ষমালা, মাথায় ছোট জটা, সমুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সাদা কাপড় পরা। বর্তমানে শিবপূজা যথাবিধি না হওয়ায় মন্দিরে দণ্ডেশ্বর ক্ষীণাকারে ছিলেন। যখন ভৈরবানন্দের কম্বুকণ্ঠে তিনবার নিনাদিত হল, শিবশম্ভু, শিবশম্ভু, শিবশম্ভু তখন সুবিশাল দিব্যমূর্তি ধরে দণ্ডেশ্বর শূল হাতে করে আবির্ভূত হলেন। আবির্ভূত শিবমূর্তি ৬।৭ ফুট উচ্চ ও তদনুসারে চওড়া। মহাগৌরী বসে তাঁকে প্রণাম করলেন ও সমাধিস্থ হলেন। তখন মহাদেব ভৈরবানন্দের দৃষ্টি মহাগৌরীর দিকে আকৃষ্ট করলেন এবং ভৈরবানন্দ মহাগৌরীর সমাধিভঙ্গার্থ যত্নশীল হলেন। বৈকালে পূর্বোক্ত ভক্তগৃহে আমি ভৈরবানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দণ্ডেশ্বর শিবালয়ে যে সিদ্ধপুরুষ

আবির্ভূত হলেন, তাঁর নাম কি?" মহাযোগী ভৈরবানন্দ যোগবলে তাঁকে আহ্বান করে আনলেন ও তাঁর নামাদি জেনে বললেন, "ইনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। এই স্থানে শিবারাধন করে ইনি স্থূলদেহে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। ইনি গৃহী শৈব ছিলেন ও প্রথমে তাঁর নাম বললেন শম্ভুনাথ শর্মা। আমি তাঁকে বললাম, ব্রাহ্মণ মাত্রকেই শর্মা বলা হয়, আপনার পদবী কি ছিল? তখন তিনি বললেন, আমার নাম ছিল শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দণ্ডেশ্বর শিবমন্দির থেকে আমরা ক্ষিপ্রেশ্বরী দেবী মন্দির দর্শনে গেলাম। উক্ত মন্দির প্রাঙ্গণে যাবার পূর্বে রাস্তায় আমি ভৈরবানন্দকে রঙ্গচ্ছলে বললাম, "ক্ষেপী মাগো, তোমার মাছপোড়া প্রসাদ খেতে দিও।" আশ্চর্যের বিষয়, আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে যেতেই পোড়া মাছের তীব্র গন্ধ আঘ্রাণ করলাম। তখন মন্দির দ্বার বন্ধ ছিল। আমরা রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিন বার মা! মা! মা! বলে ডাকতেই ক্ষিপ্রেশ্বরী চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা মূর্তি ধরে আমাদের সম্মুখে মন্দির দ্বারে এসে দাঁড়ালেন—বিকট দশনা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা, আলুলায়িতকেশা, অলংকৃতা ও উলঙ্গিনী। তিনি বাহিরে এসে সকলের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে আমাকে সূক্ষ্ম মাছ পোড়া প্রসাদ স্বহস্তে খাইয়ে দিলেন এবং আমিও মুখে সেই মাছ পোড়া খাবার স্বাদ পেলাম। অনন্তর মন্দিরের পুরোহিত এসে দ্বার খুলে দিলেন। আমরা মন্দিরে ঢুকে আন্তরসাধন দ্বারা মহাদেবী ক্ষিপ্রেশ্বরীর স্তব স্তুতি করলাম। তখন ক্ষেপী মাতা পুনরায় আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করলেন। ঐ সময় ভৈরবানন্দ তাঁকে বললেন—মাগো, আমার শ্লেষ্মা বেড়েছে ও বুক টাটিয়েছে। যদি আমাকে সুস্থ করে দিস্, তাহলে মহানিশায় সূক্ষ্মদেহে এসে আমি মহীরাবণবৎ সূক্ষ্ম উপচারে তোর পূজা করে যাবো। সিদ্ধভক্তের আবদার শুনে মহাদেবী সম্মতিজ্ঞাপক স্নিগ্ধ হাস্য করলেন। দেবী কৃপায় সন্ধ্যার পূর্বেই ভৈরবানন্দের অসুখের উপশম হয়ে এল। সন্ধ্যাকালে

মানুষী দুর্বুদ্ধিতে হোমিও ঔষধ সেবন করায় রাত্রি দশটার পর থেকে তাঁর কাশি বেড়ে গেল। অসুখ পুনর্বৃদ্ধি হওয়ায় ভৈরবানন্দ প্রতিশ্রুত সূক্ষ্ম পূজায় যেতে ইচ্ছুক হলেন না। মহানিশায় ক্ষিপ্রেশ্বরী এসে 'জ্যান্ত ভৈরব'কে বললেন, "কি রে, আমার পূজা করবি না?" 'জ্যান্ত ভৈরব' বললেন, "মাগো, তুমি ত তোমার প্রতিশ্রুতি রাখ নি!" তখন দেবী বললেন, "তোমাদের মানুষী দুর্বুদ্ধির জন্য তোমার অসুখ আবার বাড়ল। দেবতাকে প্রার্থনা করার পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানুষী প্রক্রিয়া করতে নেই।" তখন ভৈরবানন্দ দেবীকে বললেন, "কোন দেবতাই আমার প্রারব্ধ খণ্ডাতে পারবে না। তবে চল তোমার পূজা করে আসি।" মহানিশায় ভৈরবানন্দ সূক্ষ্ম দেহে মন্দিরে গিয়ে কামধেনুকে আহ্বান করে ষোড়শ উপচারে পূজা করে ছাগ ও মহিষ বলি দিয়ে বললেন, "মা, ক্ষেপাকালী, তোর খড়্গ আমাকে দে। আমি নিজ শির কেটে তোর পাদপদ্মে নিবেদন করি, আত্মবলি দিই।" তখন ক্ষেপী মা ভৈরবানন্দকে কোলে নিয়ে আদর ও চুম্বন করে বললেন, "আমার পূজা হয়েছে বাবা। ইহাই নরবলি দান তুল্য হয়েছে। যে সাধক ইষ্টদেবীর পাদপদ্মে আত্মবলি দিতে উদ্যত হয়, তার মোক্ষলাভ সুনিশ্চিত।" তখন ভৈরবানন্দ ক্ষিপ্রেশ্বরীকে সভক্তি প্রণাম করে ফিরে এলেন। ক্ষিপ্রেশ্বরী মন্দির মধ্যে পঞ্চমুণ্ডীর আসন বিদ্যমান। উহাতে স্থূলদেহে জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেছিলেন স্থানীয় গৃহস্থ সাধক শশিশেখর গঙ্গোপাধ্যায়। উক্ত দিন বৈকালে ভৈরবানন্দের অমোঘ আহ্বানে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ শশিশেখর এলেন ও ধনামাদি বললেন। ভৈরবানন্দ যোগবলে ক্ষিপ্রেশ্বরী বীজমন্ত্র জেনে বললেন—ওঁ খৌং ক্ষিপ্রেশ্বরীদেব্যৈ নমঃ। আমি বৃহস্পতিবার ও পরদিন উক্ত সিদ্ধমন্ত্র সহস্রাধিকবার জপ করে ৺ক্ষেপীমাকে চিন্তা করলাম। ক্ষিপ্রেশ্বরী মহীরাবণের ইষ্টদেবী মহাকালীর মহাতমোমূর্তি, চামুণ্ডা অপেক্ষাও উগ্রমূর্তি ও মোক্ষদাত্রী। ১১৮৬ বঙ্গাব্দে প্রায় পৌণে দুই শত বর্ষ পূর্বে বর্তমান ক্ষিপ্রেশ্বরী মন্দির

নির্মিত হয়। মৎ প্রণীত 'অমর ভারত' পুস্তকে ক্ষিপ্তেশ্বরী দেবী মন্দিরের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ। ঝাড়গ্রাম সেবায়তনে প্রশস্ত প্রাঙ্গনে দুই তিনটি হরিতকী বৃক্ষ আছে। প্রত্যেক গাছে অনেক হরিতকী হয়েছে এবং গাছ তলায় কাঁচা হরিতকী পড়ে আছে ও তন্মধ্যে কয়েকটি শুকিয়ে গেছে। আমরা প্রাতরাশ সমাপনান্তে ঐ সব গাছ তলায় গিয়ে কাঁচা হরিতকী কুড়িয়ে পকেটে রাখতাম ও কেটে কেটে খেতাম। মদীয় পূর্বাশ্রমে একটী হরিতকী গাছ ছিল। মনে পড়ে, বাল্যকালে আমি গাছতলায় গিয়ে হরিতকী কুড়াতাম। আমার পিতা প্রত্যহ আহারান্তে হরিতকী টুকরা মুখে দিতেন, আমিও ঐ অভ্যাস করেছি। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আছে, কদাচিৎ কুপিতা মাতা নোদরস্থা হরিতকী। প্রবাদ আছে, প্রত্যেক বৎসর প্রতি গাছে তিনটী হরিতকী পাকে—তন্মধ্যে একটী দেবতা, একটি পক্ষী ও অন্যটি ধরিত্রী খায়। ইহার অর্থ, মানুষ পাকা হরিতকী খেতে পায় না।

একদিন একটি অতিবৃদ্ধা নারী এসে আমাকে সজল নয়নে বললেন, "আমার ছেলে সাধু হয়ে প্রেমানন্দ নাম নিয়ে আমেরিকা গেছে ছত্রিশ বৎসর পূর্বে। আর দেশে আসে নি। কবে আসবে বাবা! আর আমি কি তাকে দেখতে পাবো?" আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম —আমি জ্যোতিষের গণনা জানি না, ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না। ঐ ভৈরবানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করুন। উনি যোগবলে উহা বলতে পারেন। শোকাতুরা বয়োবৃদ্ধা জননী ভৈরবানন্দ পরমহংসকে ধরে বসলেন, আমার ছেলে আমেরিকা থেকে কবে আসবে বলুন? ত্রিকালজ্ঞ ভৈরবানন্দ ক্ষণকাল সমাধিস্থ থেকে চমৎকৃত হয়ে বললেন, "মা, আপনার ছেলে প্রেমানন্দ সন্ন্যাস ত্যাগ করে মেম বিবাহ করেছে ও তার ছেলেমেয়ে হয়েছে! তাই সে লজ্জায় ভারতে এসে তোমাদের কাছে মুখ দেখাতে পারছে না।" অবিলম্বিত অনুসন্ধানে জানা গেল, ভৈরবানন্দের যোগজ মন্তব্য বর্ণে বর্ণে সত্য। প্রত্যহ এইরূপ অতি সত্য ভবিষ্যদ্বাণী ভৈরবানন্দের মুখে

শোনা যায়। এইসব লিপিবদ্ধ করিলে অভিনব মহাভারত বা রামায়ণ রচিত হইবে।

২৭শে ডিসেম্বর বুধবার ভোররাত্রে আমরা সেবায়তন থেকে পৌণে তিনটায় গরুগাড়ীতে বিছানা ও শুটকেশাদি তুলে হেঁটে ঝাড়গ্রাম ষ্টেশনাভিমুখে চললাম এবং ৪।।০ টায় গিধনি লোক্যাল ট্রেনে উঠলাম। উক্ত ট্রেনে আমার বিদেহমুক্ত পিতৃদেবকে দেখলাম—কাল কোট ও সাদা ধুতি পরা ও গায় গরম আলোয়ান। কিয়ৎদূর এসে তিনি আমার প্রতি পিতৃস্নেহ প্রদর্শনার্থ স্নেহাদর করলেন ও মহাগৌরীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল বদনে হাসলেন। মহাগৌরী আমাকে বলেন, দাত্নু, আপনার পিতার একটীও দাঁত নাই, ফোকলা হাসি, লোল চর্ম, চোখের ভ্রূ ঝুলে পড়েছে। খড়্গাপুর স্টেশনে বসে আমরা চা সিংড়া খাইতেছিলাম। তখন আমার কন্যা পদ্মা এসে সহাস্য বদনে সামনে দাঁড়ালেন—তুঁতে রঙের লম্বা কাল কোট পরা, আধুনিক নারী বেশে। ট্রেণের কামরায় বসে আমি ইষ্টদেবীকে স্পষ্টভাবে দেখলাম, যেন স্থূলকায় পূর্ণাবয়ব মানবী মূর্তি, সাদা দন্তপংক্তি স্পষ্ট ভাবে দেখলাম, গৌর গাত্রবর্ণ, মাথায় পাট করে চুল আঁচড়ান। তিনি আমার বামদিকে এসে দাঁড়ালেন স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিতে। পরক্ষণেই তিনি এসে আমার ডানদিকে বসলেন। তখন তাঁর গণ্ড, কর্ণ ও মস্তকাদি স্পষ্টভাবে দেখলাম। এত স্পষ্ট পূর্ণ ইষ্টমূর্তি পূর্বে দেখি নি বললেই চলে। গত তিন মাস যাবৎ সুমধুর ইষ্টলীলা সন্দর্শনে আমি কৃতকৃত্য হয়েছি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদা কামরার বাহিরে শূন্যে সর্বক্ষণ ছিলেন। তাঁরা উভয়ে ভৈরবনন্দকে অনুনয় করছিলেন—স্নেহের শশী কোলাঘাট পুলের দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদীতীরে শূলবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে! এর প্রতিকার করে দিয়ে যাও। ভৈরবানন্দ ইহার উত্তর না দিয়ে মৌন রইলেন। যখন আমরা পাঁচজন রূপনারায়ণ নদীতীরে

উপস্থিত হলাম, তখন আমাদের পঞ্চাশ হাত দূরে ঠাকুর ও শ্রীমা উভয়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণবর্ণ রুদ্রমূর্তি ধরে বললেন, শশীকে সত্বর শূলমুক্ত কর। তখনও ভৈরবানন্দনী রব রইলেন। মোটর লঞ্চ চলে যাওয়ায় আমরা নৌকা ভাড়া করে গোপীগঞ্জ রওনা হলাম। নৌকায় ওঠার আগে রূপনারায়ণ নদীদেবীকে 'জ্যান্ত ভৈরব' আহ্বান করে বললেন, "মা তোমার বুকের উপর দিয়ে যাবো।' তোমার কৃপায় যেন জলপথে কোন বিপদ না হয়।" নারায়ণীদেবী হাস্যমুখে বললেন, "তাই হবে বাবা; কিন্তু তুমি একটু সতর্ক থেকো।" তখন 'জ্যান্ত ভৈরব' ইষ্টদেবী ও পরমেষ্টকে ডেকে বললেন, তোমরা নৌকার দুই মুখে বসে আমাদিগকে নদীবক্ষে রক্ষা কর। রুদ্র ভৈরব ও কাল ভৈরবকে আহ্বান করে 'জ্যান্ত' ভৈরব' বললেন, তোমরা আমাদের নৌকার পঞ্চদিক—চারিদিক ও উর্দ্ধদিকে শত হস্ত পর্য্যন্ত পাহারা দিয়ে আমাদিগকে গোপীগঞ্জঘাটে পৌছে দাও। তৎক্ষণাৎ তাঁরা উভয়ে স্বকর্মে নিযুক্ত হয়ে আমাদিকেঅভয় দিয়ে বললেন—মাভৈঃ। নদীবক্ষে ঘণ্টা দেড়েক আসার পর ঠাকুর ও শ্রীমা পরমাত্মার জ্ঞানশক্তি বলে নারায়ণী বৈষ্ণবীকে আমাদের সামীপ্য থেকে কিঞ্চিৎ পিছিয়ে দেন। তখন আমাদের নৌকা ঘূর্ণীজলের সমীপবর্ত্তী হল। এমন সময় নন্দী-ভৃঙ্গী এসে দুটী মাঝির শরীরে প্রবেশ করে হাল ও দাঁড় ধরলেন। ইহার ফলে নদীস্রোত ও বায়ুপ্রবাহের বিপরীত মুখে চার ঘণ্টার অধিক সময় মাঝি ও দাঁড়ি অবিরাম স্বকার্য্য করিল ও আমাদের নৌকা অব্যাহত গতিতে চলিল। আমরা যথাসময়ে নির্বিঘ্নে গোপীগঞ্জ ঘাটে পৌছিলাম। মহাগৌরী নদীবক্ষে নৌকায় বসে দেখিলেন, নদীজলের তলদেশে গভীর চওড়া বৃহৎ কূপবৎ ঘূর্নীজল বা ঘূর্ণাবর্ত বিদ্যমান। এই স্থানে বহু নৌকা ও মোটর লঞ্চ, এমন কি ষ্টিমার ও ডুবে গেছে। একটি সূক্ষ্মদেহী শ্বেতকায় নৌকাসমীপে এসে নদী বক্ষে দাঁড়ালেন। মনে হয়, বহু পূর্বে ইনি এই নদীজলে ডুবে মরেছেন। এই ঘূর্নী দৃশ্য বৈষ্ণবী

দেবী মহাগৌরীকে দেখালেন। আমিও নদীবক্ষে বৈষ্ণবী দেবীর সোণালী মূর্তি দুইবার দেখলাম। নদীদেবী আমাকে দেখালেন, থালার মত বড় একটি সরপুটীমাছ, প্রায় আধসের ওজন। এই নদী জলে এই সব মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ঐ মাছ দেখতে যেমন সুন্দর ও শুভ্র খেতেও তেমনি সুস্বাদু। রূপনারায়ণ নদীর উভয় তীরে অবস্থিত গ্রামবাসীরা ঐ মাছ খেতে খুব ভালবাসে। আমার স্বর্গীয় পিতা নদীবক্ষে আমাকে ক্ষুধার্ত দেখে সূক্ষ্মদ্রব্য লুচিহালুয়া খাওয়ালেন। নদীবক্ষে আমি কাল ভৈরবের বিরাট শরীর দেখলাম—সমস্ত আকাশ জুড়ে তিনি মহা শূন্যে দাঁড়িয়ে আমাদিগকে রক্ষা করছেন। শিব, কালী, বৈষ্ণবী, কাল ভৈরব, রুদ্রভৈরব ও নন্দী-ভৃঙ্গী সকলে আমাদিগকে রক্ষা করায় আমরা নিরাপদে কোলাঘাট থেকে গোপীগঞ্জে আসিলাম।

২৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার আমরা খেপূত রামকৃষ্ণ আশ্রমে সারদা দেবীর জন্মোৎসব দেখতে গেলাম ও মন্দিরে বসলাম। তখন ওখানে ঠাকুর বা শ্রীমা কেহই ছিলেন না। তাই ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী শিব ও কালীকে আহ্বানপূর্বক অন্নভোগ নিবেদন করলেন। আমরা নিমন্ত্রিত হয়ে তথায় প্রসাদ খেতে গিয়েছিলাম এবং অনিবেদিত অন্নব্যঞ্জনাদি খাবো না বলে এইরূপ করতে বাধ্য হলাম। আমাদের আকুল আহ্বানে শিব ও কালী উভয়ে মন্দিরে এলেন। ভৈরবানন্দ সূক্ষ্মদেহে মন্দিরে গিয়ে নানা দিব্য উপচার দিয়ে তাঁদের সূক্ষ্ম পূজারতি করলেন। উক্ত দিন পূর্বাহ্নে দীক্ষিত গজেন্দ্রের ইষ্টমন্ত্রের বীজ পরিবর্তিত ও মন্ত্র সংস্কার করা হল তারই গৃহ মন্দিরে। তখন তার পূর্বজন্মের স্বর্গবাসী দীক্ষাগুরু এসে মন্দিরের বাইরে দাঁড়ালেন। উক্ত গুরু গৃহস্থ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন ও তাঁর নাম কিরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

৩০শে ডিসেম্বর শনিবার পূর্বাহ্নে উক্ত ভক্তের বৈঠকখানার বারান্দায় বসে আমি দুইবার স্পষ্টভাবে ইষ্টমূর্তি দেখলাম—প্রথমবারে স্নেহময়ী

মাতৃমূর্তি ও দ্বিতীয়বারে এলোকেশী মহামায়া। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে আমরা মোটর লঞ্চে চড়ে গোপীগঞ্জ থেকে কোলাঘাটে এলাম। মোটর লঞ্চে বসে আমি স্বর্ণময়ী বৈষ্ণবীদেবী ও আমার বিদেহমুক্ত পিতৃদেবকে দেখলাম। মদীয় পিতৃদেব কাল কোট পরে দুইহাতে আমার হাত ও মোটর লঞ্চ দুইহাতে ধরে প্রফুল্ল বদনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোলাঘাটে আমরা আসতেই ঠাকুর ও শ্রীমা এসে ভৈরবানন্দকে ধরে বসলেন, "শশীকে শূলমুক্ত করে যাও। স্নেহের শশী শূলবিদ্ধ অবস্থায় গত শুক্রবার থেকে আজ শনিবার পর্যন্ত নয়দিন যাবৎ রূপনারায়ণ নদীতীরে ব্রীজের দক্ষিণে একটি ঝাঁকড়া বেলগাছের তলায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে।" ভৈরবানন্দ চেয়েছিলেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ চিরতরে ব্রহ্মে লীন হয়ে যান ও সূক্ষ্মদেহ ধরে আর মর্ত্যে না আসেন। ঠাকুর ও শ্রীমা উভয়ে জগদম্বাকেও কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন। তাই জগদম্বার নির্দেশে অনুরূপ ঘটনা ঘটল। ভৈরবানন্দ স্থূলদেহে ট্রেণে বসে রইলেন, আর সূক্ষ্মদেহে বেলতলায় রামকৃষ্ণানন্দজীর কাছে গেলেন। জগদম্বার ইংগিতে কালভৈরব রামকৃষ্ণানন্দকে শূলমুক্ত করলেন, কিন্তু তিনি যাতে আর মর্ত্যলোকে নামতে না পারেন সে জন্য তাঁর শরীরস্থ সূর্য্যমণ্ডল শূলাঘাতে ভেঙ্গে দিলেন। ঠাকুর ও শ্রীমা তা দেখে হায়! হায়! বলে চীৎকার করে উঠলেন এবং প্রিয় শিষ্য শশীকে স্বর্গলোকে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলেন। এই প্রসঙ্গে স্বামী ভৈরবানন্দ মন্তব্য করেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা ও তাঁদের পার্ষদবৃন্দ পরমাত্মা কর্তৃক নিযুক্ত দিব্য কর্মরত ঋষি বা দেবতা নহেন। এই সব কর্ম তাঁরা পরমাত্মার নির্দেশে করছেন না। তাই তাঁরা উক্ত রূপ অবিহিত আচরণে প্রবৃত্ত হচ্ছেন ও তজ্জন্য শাস্তি ভোগ করছেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মলোক থেকে স্বর্গলোক পর্য্যন্ত চলাফেরা করতে পারবেন, কিন্তু তন্নিম্নে কোন লোকে আর নামতে পারবেন না।

১৮ই ডিসেম্বর সোমবার ১৯৬১ শেষ রাত্রে ৪টায় অর্থাৎ মঙ্গলবার

ভোরে আমি স্বীয় শয্যায় বসে নিবিষ্ট চিত্তে মীরা বাঈর জীবন, ভজনাবলী ও দোঁহাবলী মনে মনে আবৃত্তি করছিলাম। তখন মীরাবাঈ এসে মন্দির মধ্যে জানালার কাছে দাঁড়ালেন ও আমার দিকে সুস্মিত বদনে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর গায়ে ও মাথায় হলদে ওড়না জড়ান, নীল চোখ দুটি ভাসা ভাসা ও বড় বড়, প্রশান্ত আনন। তিনি আমাকে দুই-তিন বার বললেন, "আপনি কোন পূর্ব জন্মে আমাদের কুলগুরু গদাধর পণ্ডিত ছিলেন। তাই আমার কথা বলতে ও লিখতে আপনার এত ভাল লাগে।" স্বামী ভৈরবানন্দ যোগবলে জেনে বলেন, ইহা সত্য। আজ্ঞা চক্রের উপরে মন উঠলে, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলে সাধকের মনে পূর্বজন্ম স্মৃতি উদিত হয়। শেষ জন্মে মুমুক্ষু সাধক জাতিস্মর হয়।

কোলাঘাট থেকে হাওড়া আসার সময় ট্রেণে আমার সূক্ষ্মদেহী গর্ভধারিণীকে মৎপার্শ্বে দেখলাম। তিনি আমার সম্মুখে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রমূর্তিতে এসে দাঁড়ালেন—সাদা শাড়ী পরা, মাথায় কাপড় নাই, কপালে সিঁদুর তিলক। আমি তাঁর মাথাটি স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। ট্রেণে বসে আমি ভাবছিলাম—আমার সূক্ষ্মদেহী মাতাপিতা আমাদের সঙ্গে এই সুদীর্ঘ সফর করলেন। আমি পিতাজীকে কয়েকবারই দেখলাম, কিন্তু মাতাজীকে দেখলাম না কেন? তাই মাতাজী আমায় দেখা দিয়ে আমার সংশয় দূর করলেন। সন্ধ্যায় ধর্মচক্রের মন্দিরে ধ্যানকালে আমি কশ্যপমুনিকে উপবিষ্ট ও সমাধিস্থ দেখলাম। রাত্রি দশটায় আহারান্তে আমি, ভৈরবানন্দ ও মহাগৌরী তিনজন আমার খাটে বসে কল্কিকথা আলোচনা করছিলাম। তখন কল্কিদেব আরক্ত বদনে রুষ্ট মূর্তিতে এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে সূক্ষ্ম জগতে কল্কিলীলা আরম্ভ হয়েছে ও তেইশ বছর ধরে চলবে। মথুরায় ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে কল্কিজন্মের পরে উহার বহিঃপ্রকাশ দেখা যাবে। ৩১শে ডিসেম্বর রবিবার 'কল্কিগীতা'র সমালোচনা বাংলা দৈনিক

'যুগান্তর' পত্রিকায় এবং ইংরাজী মাসিক Modern Review য়ে জানুয়ারী ১৯৬২ সংখ্যায় উহার ইংরাজী Review বাহির হয়েছে। ইহার দ্বারা একমাত্র অনাগত অবতার কল্কির আসন্ন আবির্ভাব বার্তা সারা বাংলায় তথা সমগ্র ভারতে প্রচারিত হয়েছে। ওঁ ভগবতে কল্কিদেবায় নমঃ।

সমাপ্ত

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ প্রণীত গ্রন্থমালা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রসিদ্ধ পত্রিকার অভিমত—

১। 'শ্রীমা সারদা' মাসিকের শ্রাবণ ১৩৬৮ সংখ্যায় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতা (২য় ষট্‌ক) সম্বন্ধে নিম্নোক্ত পরিচয় বাহির হয়েছে।—"শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দের উদ্বোধন প্রকাশিত গীতা বহুল প্রচারিত। বর্তমান পুস্তকখানি শ্রীধর স্বামী কৃত টীকা ও উহার আক্ষরিক অনুবাদ এবং নানা ভাষ্য-টীকার উদ্ধৃতি সহ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ২য় ষট্‌ক, অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত। প্রথম ষট্‌ক ইতিমধ্যেই গুণী জ্ঞানীর সমাদর পেয়েছে। যাঁরা শ্রীধরস্বামী কৃত টীকা সমন্বিত গীতা পাঠ করিতে চান, তাঁরা তো এ থেকে উপকৃত হবেনই, অধিকন্তু বিভিন্ন শাস্ত্রকার ও টীকাকারগণের গীতার্থ প্রকাশে বহু বাক্য উদ্ধৃতি পাঠে আনন্দিত হবেন। পরিশিষ্টে শংকরানন্দ ও অভিনব গুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া গ্রন্থের প্রারম্ভে ও শেষে অলৌকিক গীতাধ্যান, কল্কি গীতা, কল্যাণেশ্বরী মোক্ষতীর্থে প্রভৃতি নিবন্ধগুলি অলৌকিক ঘটনায় সমৃদ্ধ। প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা বলে এই সুমহান্ গীতার সঙ্গে এগুলি যুক্ত না করে

পৃথক্ পুস্তিকাকারে প্রকাশ করলে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব অক্ষুণ্ণ থাকতো। আমরা এই গীতার বহুল প্রচার কামনা করি।”

২। কলিকাতার প্রসিদ্ধ মাসিক ‘প্রবাসী’ পত্রিকার ১৩৬৮ কার্তিক সংখ্যায় স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত ‘ঋগ্বেদ’ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।—“স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত, অনূদিত ও আলোচিত গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ ধর্মজিজ্ঞাসুর নিকট সুপরিচিত। স্বামিজী এখন বেদের বঙ্গানুবাদে হাত দিলেন। তিনি আলোচ্য প্রথম খণ্ডে ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের অর্ধাংশ প্রথম চারি অধ্যায় অনুবাদ দিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ সায়ণ-ভাষ্যের অনুগামী। তিনি পাদটীকায় বহু বৈদিক শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং নানা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়াছেন। সমগ্র ঋগ্বেদ এইভাবে অনূদিত হইলে বেদ বিস্তার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় এক বাঞ্ছনীয় সংযোজন ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামিজী তাঁহার সুদীর্ঘ উপক্রমণিকার মধ্যে পরিচয়, খিলগ্রন্থ, ছয় বেদাঙ্গ, উপাখ্যান, ঋষি ও দেবতা, বেদানুশীলন ও ঋগ্বেদ দর্শন এই সকল শিরোনামায় বেদ সম্পর্কে নানা কথার অবতারণার মধ্যে নিরুক্ত ব্রাহ্মণাদির আলোচনা করিয়াছেন, বেদের টীকা, ভাষ্য প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন, বৈদিক আখ্যানের তাৎপর্য্য বুঝাইয়াছেন, ঋষি ও দেবতার বিবরণ লিখিয়াছেন এবং কোন কোন বৈদিক গ্রন্থের কাল নির্ণয়ে মতভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। উপক্রমণিকার সমগ্র আলোচনাটি, বিশেষতঃ ‘ঋগ্বেদ দর্শন’ তথ্যবহুল এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। দেশে বিদেশে বেদ সম্পর্কে যে সকল আলোচনা হইয়া গিয়াছে, স্বামিজী নানা প্রসঙ্গে তাহার বিবরণ দিয়াছেন। তিনি গ্রন্থশেষে ‘পরিশিষ্টে’র মধ্যে পাঁচজন প্রাচীন ও নবীন বেদ-ব্যাখ্যাতার জীবন, রচনা ও কার্য্যাবলীর পরিচয় যোগ করিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য, হোরেস হেমান

উইলসন্, রমেশচন্দ্র দত্ত, দুর্গাদাস লাহিড়ী ও মাধবাচার্য্য এই পাঁচ জনের কথা পরিশিষ্টে আলোচিত হইয়াছে। বেদানুশীলনের ইতিহাসে অনুসন্ধিৎসু বাঙালী পাঠকের পক্ষে স্বামিজীর গ্রন্থখানি উপাদেয়।"

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় ষট্‌ক সম্বন্ধে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধর্মীয় মাসিক 'উদ্বোধন' অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ সংখ্যায় বলেন।—

"আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রথম ষট্‌কের ন্যায় প্রতি শ্লোকের মূল, অন্বয় ও অনুবাদ এবং শ্রীধর স্বামীর সুবোধিনী টীকা ও তাহার আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আচার্য্য শংকর ও রামানুজের গীতা ভাষ্য হইতে বহু উদ্ধৃতি এবং মধুসূদন সরস্বতী, আনন্দগিরি, শংকরানন্দ সরস্বতী, অভিনব গুপ্ত, নীলকণ্ঠ সূরি, বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাকারের বহু বাক্য এবং নানা শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে অনেক উদ্ধৃতি ব্যাখ্যাসহ গীতার অর্থ-প্রকাশের জন্য যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুবোধিনী টীকায় যেসব শ্রুতি-বাক্য বা শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইগুলি কোন গ্রন্থে কোথায় আছে, তাহা পাদটীকায় লিপিবদ্ধ হওয়ায় টীকার তাৎপর্য্য উপলব্ধির সহায়ক হইয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে 'অলৌকিক গীতাধ্যান' ও 'কল্কিগীতা' ও শেষাংশে 'কল্যাণেশ্বরী মোক্ষতীর্থে' শীর্ষক প্রবন্ধ তিনটিতে এমন সব অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লিখিত হইয়াছে, যাহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এই সব বিষয় স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতে পারিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একখানি উৎকৃষ্ট টীকার অনুবাদসহ এইগুলি প্রকাশিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

৪। কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় ৩১শে ডিসেম্বর রবিবার ১৯৬১ 'কল্কিগীতা' সম্বন্ধে নিম্নোক্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।—

"ধর্মগ্রন্থ-রচয়িতারূপে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সারা বাংলায় সুনাম

অর্জন করেছেন। আলোচ্য পুস্তকে তিনি মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, দেবীভাগবত, কল্কিপুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত কল্কি অবতার কাহিনী সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন, একমাত্র অনাগত অবতার কল্কির আবির্ভাব আসন্ন। তিনি সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দের এই ভবিষ্যদ্বাণীও উদ্ধৃত করেছেন—চব্বিশ বৎসর পরে ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণের মত ভগবান কল্কিরূপে মথুরায় কোন বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ বংশে অবতীর্ণ হবেন। এই পুস্তকে সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ ও সিদ্ধা সাধিকা মহাগৌরী সরস্বতীর সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং ভাগবতোক্ত কালযবনের কাহিনী উপন্যাস বা উপাখ্যানবৎ সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়েছে। পরিশিষ্টে 'গীতোক্ত পরাগতি' শীর্ষক নিবন্ধে সুপণ্ডিত গ্রন্থকার গীতাতত্ত্বের উপর অপূর্ব আলোকসম্পাত করেছেন। গীতা রহস্যের এই সুগভীর আলোচনা তিনি অন্তর্দৃষ্টি ও শাস্ত্রজ্ঞানের আলোকে করেছেন। পুস্তকটী বোর্ড বাঁধাই ও মনোহর প্রচ্ছদপটে শোভিত।

৫। 'উজ্জীবন' নামক বৈষ্ণব মাসিকের ১৩৬৮ ফাল্গুন সংখ্যায় 'কল্কিগীতা' সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়।—"বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্রে কলিযুগে শ্রীভগবানের কল্কি অবতাররূপে আবির্ভাবের কথা বর্ণিত আছে। বহু ধর্মগ্রন্থের প্রণেতা ও ব্যাখ্যাতা স্বামী জগদীশ্বরানন্দ লিখিয়াছেন—১৯৮৫ অব্দে বা বঙ্গায় ১৩৯২ সালের প্রারম্ভে ভগবান কল্কিদেব মথুরাধামে অবতীর্ণ হইবেন। পুনঃ পুনঃ দেবাদেশে অনুপ্রেরিত হইয়াই আমি এই অপূর্ব অদ্ভুত ঘোষণা করিতেছি। পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে বিভিন্ন পুরাণে ও ইতিহাসে কল্কি অবতারের আবির্ভাবের যে সকল বর্ণনা আছে, তাহা বিবৃত করা হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়-গুলিতে তাঁহার আশ্রমে তিনি কল্কি অবতারের আবির্ভাবের যে নিশ্চিত আভাস পাইয়াছেন, তাহারই বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উহা পড়িতে পারেন।"

৬। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধর্মীয় মাসিক 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৬৮ ফাল্গুন সংখ্যায় স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত 'ঋগ্বেদ' সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য বাহির হয়।—"আলোচ্য গ্রন্থে ঋগ্বেদের প্রথম চারি অধ্যায়ের সায়ণ ভাষ্য অনুসারে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। দুর্বোধ্য অংশের ব্যাখ্যা পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদ সরল ও মূলানুগ। বিস্তৃত উপক্রমণিকায় ঋগ্বেদের পরিচয়, খিলগ্রন্থ, উপাখ্যান, অনুশীলন, ঋষি ও দেবতা, দর্শন ও ছয় বেদাঙ্গ এবং পরিশিষ্টে সায়ণাচার্য্য, মাধবাচর্য্য, উইলসন, রমেশ দত্ত ও দুর্গাদাস লাহিড়ীর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। আশা করি, এই খণ্ড পাঠক সমাজে সমাদৃত হইবে এবং ঋগ্বেদের অবশিষ্ট অংশগুলি প্রকাশিত হইলে বাংলা সাহিত্যে একটী মূল্যবান সংযোজন হইবে।"

৭। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধর্মীয় মাসিক 'বিশ্ববাণী' পত্রিকার ১৩৬৮ ফাল্গুন সংখ্যায় 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ২য় ষট্‌ক সম্বন্ধে নিম্নোক্ত পরিচয় বাহির হয়।—

"এই গ্রন্থে সপ্তম হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত ছয় অধ্যায়ের মূল শ্লোক ও উহার অনুবাদ এবং নানা শাস্ত্র ও অনেক ভাষ্য টীকাদির সারগর্ভ উদ্ধৃতি এবং কয়েকটি মূল্যবান পরিশিষ্ট আছে।

গ্রন্থটির বিষয়-বিন্যাস

(১) গীতা প্রবচন, (২) অলৌকিক গীতাধ্যান, (৩) কল্কিগীতা, (৪) ষট্‌ক-রহস্য, (৫) সপ্তম হতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত মূল, অন্বয়, অনুবাদ, টীকা ও টীকার অনুবাদ, (৬) পরিশিষ্ট: (ক) গীতাসার, (খ) আচার্য শংকরানন্দ সরস্বতী, (গ) অভিনব গুপ্তাচার্য্য (ঘ) মহর্ষি উতংকের গুরুভক্তি, (ঙ) কল্যাণেশ্বরী মোক্ষতীর্থে।

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যে গ্রন্থই রচনা করেছেন, তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন; বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির পিছনেও সেই

নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও যত্ন রয়েছে—একথা নিতান্ত অকরুণ ব্যক্তিও স্বীকার করবেন। গ্রন্থারম্ভে 'নিবেদন' শীর্ষনামায় লেখক তাঁর ক্ষীণদৃষ্টি, ভগ্নস্বাস্থ্য, অকালবার্ধক্য ও অর্থাভাব ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'কার সুপণ্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজও "জরাতুর, বৃদ্ধ" অবস্থায় গ্রন্থ রচনা করেন, তত্রাপি গ্রন্থটির কোথাও বৃদ্ধসুলভ স্খলন-পতনের চিহ্নমাত্র নেই। স্বামী জগদীশ্বরানন্দের মননশীলতা সম্পর্কে ঐ একই কথা প্রযোজ্য। প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের সর্বত্রই লেখকের তারুণ্যের ও উৎসাহের ছাপ আছে। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তিনি যে প্রচুর পাদটীকা যোজনা করেছেন, নানা উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্যকে যেভাবে প্রাঞ্জল করেছেন, তা শুধুমাত্র তাঁর পাণ্ডিত্যকে জাহির করবার জন্য নয়, পাঠকচিত্তকে আহ্লাদিত করে। শ্রীধর স্বামীর টীকার নাম 'সুবোধিনী' টীকা এবং তা সত্যই সুবোধিনী। ঐ টীকাও যে যে স্থানে ঈষৎ অস্পষ্ট বা দুরূহ বা যেখানে অর্থান্তর ঘটতে পারে, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সেখানেই নিজস্ব মন্তব্য বা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এতে লেখকের পরিশ্রম হলেও পাঠকের একটা প্রশান্তি আছে এবং এইদিক দিয়ে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মাত্র অনুবাদক নন, কিয়দংশে সহটীকাকারও

যে কোন একটি উদাহরণ নেওয়া যাক :

১০৮ পৃষ্ঠায় মূলের অনুবাদ এরূপ—সনকাদি পূর্বতন চারিজন ও ভৃগু প্রভৃতি সাতজন মহর্ষি এবং স্বায়ম্ভুবাদি চৌদ্দ মনু আমারই প্রভাব সম্পন্ন……ইত্যাদি। এরই পাদটীকায় প্রথমে 'সনকাদি ইত্যাদির বিবরণ,' তারপর ভৃগু প্রভৃতি সাতজন মহর্ষির নাম ও পুরাণোক্ত শ্লোক যা মধুসূদন সরস্বতী-কৃত গীতা টীকায় উদ্ধৃত হয়েছে এবং তারপর চৌদ্দজন মনুর নাম বিবৃত হয়েছে। আবার শ্রীধরী টীকার সঙ্গে সমাত্মক উক্তিও তিনি উদ্ধার করেছেন। সবশুদ্ধ মিলিয়ে গোটা বইটি

পড়তে পড়তে মনে হয়, একজন অভিজ্ঞ কথক সাবলীল ভঙ্গিতে গীতা ব্যাখ্যা করে চলেছেন। তাঁর কণ্ঠের বিশিষ্ট লয়টি, ধূপ পুড়ে যাবার ক্ষণকাল পরের সৌরভটার মতই অক্ষরে অক্ষরে আশ্লিষ্ট রয়েছে।

এই দ্বিতীয় ষট্‌কটি নানা দিক্‌ দিয়ে বিশেষ মূল্যবান—(১) জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ, (২) অক্ষর ব্রহ্মযোগ, (৩) রাজযোগ, (৪) বিভূতিযোগ, (৫) বিশ্বরূপ দর্শনযোগ এবং (৬) ভক্তিযোগ। উক্ত ষড়্‌যোগ সমগ্র গীতাশাস্ত্রের মধ্যমণিস্বরূপ বললেও অত্যুক্তি হয় না। নিগূঢ় তত্ত্বকথা এখানে সূত্রাকারে সংগ্রথিত। তদ্গতচিত্ত ও তন্নিষ্ঠ না হলে এর সম্যক্‌ অবধারণ হয়ত বা অসম্ভব। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ এই বিশিষ্ট অধ্যাত্মকথা আরম্ভ ও শেষ করেছেন বিশেষ একটা ভাগবতী আবহাওয়ায়। প্রস্তাবনায়, 'অলৌকিক গীতাধ্যান' এবং 'কল্কিগীতা' শীর্ষক দুটি আলোচনায় তিনি আমাদের এমন একটি জগতে নিয়ে গেছেন, ধূলিমলিন বাস্তবতাকে এমন একটি ঊর্ধ্বস্তরে স্থাপন করেছেন, যার সঙ্গে আমরা—যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আদৌ পরিচিত নই; পরিশিষ্টের "মহর্ষি উতংকের গুরুভক্তি" ও "কল্যাণেশ্বরী মোক্ষতীর্থে" আলোচনা ও সমধর্মী। দৈনন্দিন সংসারের জ্বালায় যে মানুষ জর্জরিত, এই কটি আলোচনা হয়ত তার কাছে স্নিগ্ধ বারিধারার সন্ধান দেবে, ঊষর প্রান্তরের শেষে সে হয়ত দেখা পাবে তৃষ্ণাহারিণী ভোগবতীর। আচার্য্য অভিনব গুপ্ত এবং আচার্য শংকরানন্দ সরস্বতীর যে পরিচয় লেখক দিয়েছেন, তা বিশেষ মূল্যবান। গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট সুন্দর; গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হবে যে দু'একটি মুদ্রণী প্রমাদ আছে তা না থাকলে।"

৮। ১০ই মার্চ শনিবার ১৯৬২ কলিকাতার প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'কল্কিগীতা' সম্বন্ধে এই পরিচয় প্রকাশিত হয়।—"মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত, কল্কিপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণাদি গ্রন্থে কল্কি অবতারের আবির্ভাব সম্পর্কে বহু তত্ত্ব অভ্রান্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

সেইসব তত্ত্ব অনুসরণে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্রের সমাধিবর্তী মহাগৌরী, অলৌকিক যোগশক্তিসম্পন্ন স্বামী ভৈরবানন্দ ও গ্রন্থকারের 'সাধনালব্ধ অনুভূতি ও দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে পরিদৃষ্ট অসংখ্য অলৌকিক ঘটনাবলী অবলম্বনে কল্কিশাস্ত্রের উপক্রমণিকারূপে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রণয়ন করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে কল্কিজন্মের চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বেই কল্কিলীলা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। অপূর্ব্ব ধর্মতত্ত্ব, সাধনরহস্য ও দিব্যদর্শন ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। 'কল্কিগীতা' একখানি প্রচারধর্মী শাস্ত্রগ্রন্থ। ইহাতে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলী যুক্তিতর্কের পরিবর্তে ধর্মপ্রাণ পাঠকের ভক্তিবিশ্বাস দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করিবে বলিয়া আমরা আশা করি।"

৯। কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ১১ই মার্চ রবিবার ১৯৬২ তারিখে 'কল্কিগীতা' সম্বন্ধে এই পরিচয় বাহির হয়।—

"কল্কিদেবতা দশাবতারের মধ্যে অবশিষ্ট অনাগত অবতার, মহাভারত, দেবীভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, কল্কিপুরাণ, ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদিতে উল্লিখিত কল্কি অবতারের আবির্ভাব-কথা গ্রন্থকার সরসভাবে পুস্তকখানিতে পরিবেশন করিয়াছেন।"

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (৮ম সং) ২৲

২। শ্রীশ্রীচণ্ডী (৮ম সং) ২৲

৩। ঋগ্বেদ (১ম খণ্ড) ৪৲

৪। সামবেদ (১ম খণ্ড) ২॥০

৫। বেদান্ত ২৲

৬। উপনিষৎ (১ম খণ্ড) ২৲

৭। উপনিষৎ (২য় খণ্ড) ২৸০

৮। কিশোর গীতা ১॥০

৯। মহামায়া ১॥০

১০। আমার ভ্রমণ ৩॥০

১১। অমর ভারত ২।০

১২। স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত ১৲

১৩। স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভে ব্রহ্মচর্য্য ১৲

১৪-১৫। নবযুগের মহাপুরুষ ১ম ৬৲ ও ২য় ৫৲

১৬। স্বামী তুরীয়ানন্দ ৩॥০

১৭। দেশ বিদেশের মহামানব ৩৲

১৮। চৈনিক ঋষি লাউৎজে ২৲

১৯। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রসঙ্গ ২।০

২০। ভগবৎপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ২॥০

২১। সারদা দেবীর কথা ও গল্প ১৲

২২। স্বামিজীর দুই সন্ন্যাসী শিষ্য ১৲

২৩। প্রেমযোগ ১৲

২৪। যোগ ১॥০

২৫। কিশোরের চণ্ডী ১৲

২৬। যুগবাণী (২য় সং) ॥০

২৭-২৮। সচিত্র যৌগিক ব্যায়াম ১ম ২।০ ও ২য় ২৲

২৯। বিনা চশমায় ক্ষীণ দৃষ্টির প্রতিকার (২য় সং) ১॥০

৩০। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ৪৲

৩১। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ৯৲

৩২। স্বামী নির্মলানন্দ ৬৲

৩৩। সাধিকামালা (২য় সং) ২.

৩৪। শ্রীগুরুপ্রসঙ্গ ৩৲

৩৫। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৲

৩৬। বুদ্ধের কথা ও গল্প ৩৲

৩৭। গীতার আলো ১॥০

৩৮-৪০। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (শ্রীধর স্বামীকৃত টীকার অনুবাদ সহ) ১ম ষট্‌ক ৫৲, ২য় ষট্‌ক ৫৲ ও ৩য় ষট্‌ক

৪১। দিব্যদৃষ্টি বা স্বর্গরেণু ৬৲

৪২। কল্কিগীতা ২॥০

৪৩। The Devi-mahatmya

৪৪। Girish Ghose and H[illegible] Dram[illegible]

৪৫। The Brihadaranyaka Upanishad (2nd editi[illegible]

৪৬। Swami Vivekanand[illegible] Modern India (২য় সং

৪৭। The Story of a Dedi[illegible]

৪৮। A Real Mahapurus[illegible]

৪৯। Swami Vijnanananda

৫০। Swami Akhandanand[illegible]

৫১। হিন্দুধর্ম ২।০

৫২। A Disciple of Sri Ramakrish[illegible]